অত্যাশ্রমী

কেশবচন্দ্রের

আশ্রমধর্ম্ম ।

অত্যাশ্রমী কেশবচন্দ্রের আশ্রমধর্ম্ম *।

হে অনন্তজ্ঞানের প্রস্রবণ, তুমি আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হও। তুমি হৃদয়ে প্রকাশিত না হইলে, অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের তত্ত্ব না বক্তার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইবে, না শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে তাহা প্রতিফলিত হইবে। যে তত্ত্বের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত, উহা অতি গভীর এবং দুর্ভেদ্য, তোমার আলোক বিনা উহার অন্তস্তত্ত্ব, বল, আমরা কিরূপে পাইব। এই জন্য ভীত মনে সর্ব্বাগ্রে তোমার সন্নিধানে উপনীত হইতেছি, তুমি আলোক হইয়া হৃদয়ে অবতরণ কর যে, তোমার আলোকে আমরা বিষয়টি যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, এবং উহা দ্বারা আমরা জীবনপথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হই। তব পাদপদ্মে এই প্রার্থনা জানাইয়া আমরা অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

আমি হয় আরম্ভে নয় অন্তে এই কথা অনেকবার বলিয়াছি, কেশবচন্দ্রের বিষয় আমি যাহা বলি, তাহা চরম নহে। তাঁহার জীবন অতি গভীর, তাহার ভিতরে প্রবেশ এক ব্যক্তির জীবনের কার্য্য নয়। এখন যাহা প্রকাশ পাইতেছে তাহা অতি সামান্য। ইহার পরে যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদের নিকটে এ জীবনের আরও নিগূঢ় তত্ত্ব সকল প্রকাশ পাইবে। আলোচনার পর আলোচনা চলিতে থাকিবে, শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইবে, এ জীবনের ভিতরে এখন যাহা আমাদের নিকটে বীজাকারে প্রকাশ পাইতেছে,

* ত্রয়ঃষষ্টিতম ব্রহ্মোৎসবোপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতামূলক।

[illegible] হইবে, এবং তাঁহার দ্বারা সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। সুতরাং আমি একা এ বিষয়ে যাহা বলি তাহা কি প্রকারে পর্য্যাপ্ত হইবে। যখন পর্য্যাপ্ত হইবার নহে, তখন সত্বরে অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

কেশবচন্দ্র অত্যাশ্রমী অথচ তাঁহার আশ্রমধর্ম্মের কথা বলিতে আমি উদ্যত; ইহা শুনিয়া পণ্ডিতেরা বলিবেন, এ ব্যক্তি শাস্ত্রবিরোধী কথা বলিতেছে, ইহার কথায় কর্ণপাত করা কাহারও উচিত নয়। যিনি সকল আশ্রমধর্ম্ম অতিক্রম করিয়াছেন তিনি অত্যাশ্রমী। অত্যাশ্রমী হইয়া যদি আবার কেহ আশ্রমের আশ্রয় লয়, তাহা হইলে তাহার পতন হইল, সে পতিত ব্যক্তির কথা কাণে তোলা কাহার উচিত নয়। শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রম আছে। শৈশবে ব্রহ্মচর্য্যের আরম্ভ হইয়া যৌবনের প্রায় মধ্যকাল পর্য্যন্ত উহা ব্যাপ্ত থাকিত। আচার্য্য যত দিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারীকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার উপযুক্ত মনে না করিতেন, তত দিন তাঁহাকে গুরুকুলে বাস করিতে হইত। সন্তান ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হয়, পিতামাতা এরূপ অভিলাষ করিলে গর্ভ হইতে গণনায় পঞ্চমবর্ষে ব্রহ্মচর্য্যব্রতে শিশুকে উপনীত করা হইত, শিশু উপযুক্ত না হইয়া আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিত না। সাধারণতঃ গর্ভ হইতে গণনায় অষ্টমবর্ষে ব্রাহ্মণ, একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয় এবং দ্বাদশ বর্ষে বৈশ্য উপনীত হইয়া গুরুকুলে বাস করিতেন। ব্রাহ্মণগণের ষোড়শ, ক্ষত্রিয়গণের দ্বাবিংশ, এবং বৈশ্যগণের চতুর্ব্বিংশ বর্ষের মধ্যে উপনয়ন না হইলে তাঁহারা পতিত হইতেন। সচরাচর ছত্রিশ

গুরুর গুরুকুলে বাস করিয়া বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়সংযম ইত্যাদিতে ব্রহ্মচারীকে জীবনক্ষেপণ করিতে হইত। সংযতেন্দ্রিয় সংযতমনা হইলে যখন ব্রহ্মতত্ব হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করিত, তখন আচার্য্যের নিকট গৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য ব্রহ্মচারী অনুমতি পাইতেন। হৃদয়ে ব্রহ্মতত্বের স্ফূর্ত্তি না হইলে আচার্য্য সে বিষয়ে উপদেশ দিতেন না, কেন না যে ব্যক্তি তৎসম্বন্ধে আভাসমাত্রও পান নাই, তাঁহাকে সে বিষয়ে উপদেশ দিলে তিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবেন কি প্রকারে? আচার্য্যগণ শিষ্যগণকে যে প্রকার কঠিন শাসনের অধীন করিয়া রাখিতেন, তাহাতে সাধারণতঃ মনে হইতে পারে যে, তাঁহারা অতি নিষ্ঠুর ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের এরূপ ব্যবহার নিষ্ঠুরতা নহে, শিষ্যগণের প্রতি অতি সদয় ব্যবহার। সংযতেন্দ্রিয় সংযতমনা হইয়া সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন না করিলে সংসার তাঁহাদিগকে নিতান্ত নীচ হীন পশুর মত করিয়া ফেলিত, দেবত্ব-রক্ষা-করা দূরে থাকুক মনুষ্যত্ব-রক্ষা-করাই কঠিন হইত; সংসারের বিবিধ পরীক্ষার মধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া আত্মার মহত্ব-ও-গৌরব-বর্দ্ধনকরা একেবারে অসম্ভব হইয়া যাইত; সকল অবস্থার মধ্যে মনের শান্তি ধৈর্য্য ও প্রসন্নতা কিছুতেই রক্ষা পাইত না। এই সকল দেখিয়াই তাঁহারা শিষ্যগণকে সর্ব্বতোভাবে সংযতমনা হইবার পক্ষে যথোচিত সাহায্য করিতেন। ব্রহ্মতত্বের স্ফূর্ত্তি হইলে, ব্রহ্মপরিচয় হইলে তবে সংযমাদি নিরাপদ হয়; সংসারের প্রলোভনে ভাসিয়া যাওয়ার পথ অবরুদ্ধ হয়, এজন্য যত দিন শিষ্যের মনে ব্রহ্মতত্বস্ফূর্ত্তি না হইত, তত দিন আচার্য্য ব্রহ্মচারীকে ব্রহ্মচর্য্যের কঠিন নিয়মের অধীন করিয়া রাখিতেন। ব্রহ্মসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলে যে আস্বাদপ্রাপ্তি হয়, সে আস্বাদের নিকটে

সংস্কারের স্বাদ অতি তুচ্ছ, উহাতে আর প্রলুব্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে না, ইহা দেখিয়াই ব্রহ্মসম্বন্ধে জ্ঞান উপস্থিত হওয়ার কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতি শাস্ত্রে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যের পর গৃহস্থ হইয়া গৃহের কর্ত্তব্য সকল নির্ব্বাহকরিবার পর অরণ্যে বাসের ব্যবস্থা-ছিল। এ সময়ে গৃহের কর্ত্তব্য সকল গেল বটে, কিন্তু যজ্ঞাদি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্য পূর্ব্ববৎ রহিল, কেবল সে সময়ে পশু-মাংসাদিতে যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইত, এক্ষণে ফলমূলাদি সেই স্থান অধিকার করিল। বনে বাস করিয়া সর্ব্বথা নিবৃত্তি উপস্থিত হইলে ভিক্ষাবলম্বন করিয়া বানপ্রস্থ পরিব্রাজক হইতেন, নিরন্তকাল আর তিনি একস্থানে স্থিতি করিতেন না। এই চারি আশ্রমের নিয়ম যিনি অতিক্রম করিয়াছেন, তিনিই অত্যাশ্রমী। কেশবচন্দ্র এই সকল আশ্রমধর্ম্মই বা পালন করিলেন কবে, এ সকল আশ্রম অতিক্রম করিলেনই বা কবে? যদি তাঁহার কোন আশ্রম ছিল, সে আশ্রম গৃহস্থাশ্রম, এবং সে আশ্রমও ঠিক শাস্ত্রানুযায়ী ছিল না। এরূপ অবস্থায় অত্যাশ্রমী হইয়া তাঁহার আশ্রমধর্ম্মস্থাপন, এ কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের এ প্রতিবাদ কি আমি অগ্রাহ্য করিব? যদি অগ্রাহ্য করি তাহা হইলে শাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দগুলি অন্য অর্থে ব্যবহার করিবার আমার কি অধিকার আছে? শাস্ত্রের সঙ্গে মিল না রাখিয়া উহার ব্যবহৃত শব্দগুলি নিজের রুচির মত ব্যবহার করা কি নীতিবিরুদ্ধ নহে? শব্দ ভাবের অনুগামী। যে ভাবে যে শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সে ভাব নাই, অথচ তদনুগামী শব্দ-ব্যবহার-করা হইতেছে, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। আমি বলি, ভাব ঠিক রাখিয়াই শব্দব্যবহার করিতেছি। কেন এরূপ বলি তাহার

কারণ আমায় প্রদর্শন করিতে হইতেছে। প্রথমতঃ দেখিতে পাই, কেশবচন্দ্রের জীবন সংযম প্রধান। এই সংযমব্যাপারের আরম্ভ তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে হইয়াছিল। যৌবনারম্ভের পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাবলম্বনের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, প্রবৃত্তিসমূহ অপালিত না হয়। অন্তরের প্রেরণায় কেশবচন্দ্র যদি চতুর্দ্দশবর্ষবয়সে সংযমাবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ভাব উদ্রিক্ত হইয়াছিল, এবং তজ্জন্যই সে আশ্রমের কার্য্য তাঁহার জীবনে ঘটিয়াছে, একথা মানিতে হইবে। বাহিরে তাঁহার কোন উপদেষ্টা বা আচার্য্য ছিল না তাহাতে কিছু আসে যায় না। যেখানে অন্তরাত্মার নিগূঢ় প্রেরণায় কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে বাহিরের আচার্য্যাদির কোন প্রয়োজন থাকে না। কেশবচন্দ্রের জীবনের প্রধান লক্ষণ এই যে, তিনি জীবনের অতি প্রত্যূষে আর কাহার প্রেরণায় কার্য্য করেন নাই, অন্তরাত্মার প্রেরণায় কার্য্য করিয়াছেন। ঈদৃশ প্রেরণাকে শাস্ত্র অগ্রাহ্য করিতে পারেন না, বরং ঈদৃশ প্রেরণাকেই শাস্ত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত করেন। চতুর্দ্দশবর্ষবয়সে তাঁহার জীবনে যে সংযমের আরম্ভ হইল, সেই সংযম তাঁহাকে যৌবনে বনচারী করিল। তিনি গৃহ ছাড়িয়া বনে গেলেন না বটে, কিন্তু গৃহে থাকিয়াও তিনি বনবাসী হইলেন। অন্তরাত্মার প্রেরণায় সংযমাভ্যাস ভাবতঃ ব্রহ্মচর্য্য হইতে পারে, কেন না অন্তরের প্রেরয়িতারই সংযত করিবার পূর্ণ অধিকার। যে ব্যক্তি সেই প্রেরণায় প্রবৃত্তিসমূহের উন্মেষকাল হইতে সংযত হইতে থাকেন, তিনি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বাহ্যিক লক্ষণগুলি ধারণ না করিলেও ব্রহ্মচারী, কেন না সংযম ও শিক্ষা উভয়ই অন্তর্যামীর প্রেরণায় এখানে সাধিত

[illegible] ।

[illegible] জীবনে এইরূপই ঘটিয়াছিল। গৃহে থাকিয়া [illegible] ভিন্ন শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। যোগবাশিষ্ঠ এইরূপ [illegible] প্রয়োগ করিয়াছেন *। কেশবচন্দ্রের অরণ্যে বাস [illegible] জীবনবেদে যেরূপ বর্ণিত আছে তাহা যিনি পাঠ করিয়া[illegible] যে প্রকার বস্তু তাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা [illegible] যদি অরণ্যে বাস কাহাকেও বলে তাহা হইলে এই ঠিক [illegible]। জীবনবেদের "অরণ্যবাস ও বৈরাগ্য" বিষয়ক অধ্যা[illegible] কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন †, "যখন ধর্মভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল, উপাসনা আরম্ভ হইল, ঈশ্বরের পদতলে আশ্রয় পাইলাম, [illegible] উজ্জ্বল হইয়া আসিল, প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, তখন পূর্ব্বকার মেঘ, যাহা অঙ্গুলির মত জীবনাকাশে দেখা দিয়াছিল, যাহা কেবল মৎস্যভক্ষণেই পরিব্যাপ্ত ও পরিসমাপ্ত ছিল, সেই মেঘ ঘনীভূত হইল। এত ঘনীভূত হইল যে, মুখ মলিন হইয়া পড়িল, হৃদয় বিষাদপূর্ণ হইল, এমনই হইল যে, দিবসে শান্তি পাওয়া যায় না, রাত্রিতে শয্যাও শান্তিকর হয় না। যত প্রকার সুখভোগ যৌবনে হয়, সে সমুদায় বিষবৎ ত্যাগ করিলাম। আমোদকে বলিলাম 'তুই শয়তান তুই পাপ।' বিলাসকে বলিলাম, 'তুই নরক ; যে তোর আশ্রয় গ্রহণ করে সেই মৃত্যুগ্রাসে

---

* গৃহমেব গৃহস্থানাং সুসমাহিতচেতসাম্।
শান্তাহঙ্কৃতিদোষাণাং বিজনা বনভূময়ঃ॥
অন্তর্মুখমনা নিত্যং সুপ্তো বুদ্ধো ব্রজন্ পঠন্।
পুরং জনপদং গ্রামমরণ্যমিব পশ্যতি॥ যোগবাশিষ্ঠ।

† বলিবার সময়ে ভাবমাত্র বলা হইয়াছিল। এইরূপ অন্যত্র যেখানেই কেশবচন্দ্রের কথা উদ্ধৃত হইয়াছে সেখানেই উহা পরে সংযোজিত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে।

শরীরকে বলিতাম 'তুই নরকের পথ, তোকে মারি [..]ব্রি, তুই মৃত্যুমুখে ফেলিবি।' তখন ধর্ম জানিতাম না; [..]তাম সংসারী হওয়া পাপ, স্ত্রৈণ হওয়া পাপ। পৃথিবীতে [..]রা মরিয়াছে, তাহাদের বিষয় মনে হইল। সংসারের বিলাসেই [অ]নেক লোক মরিয়াছে। ভিতর হইতে তাই শব্দ হইল, 'ওরে [তু]ই সংসারী হোস্ না, সংসারের নিকটে মাথা বিক্রয় করিস্ না; কলঙ্ক, পাপ, এ সকল ভারি কথা, আপাততঃ আমোদ ছাড়; আমোদের সূত্র ধরিয়াই অনেকে নরকে যায়।' সংসারের প্রতি ভয় জন্মিল, যাই সংসারের কথা মনে হইত, ভাবিতাম যেন নরকের দূত আসিল।" এরূপ ভাবোদ্রেকের ফল কি হইল, মুখ হইতে হাস্য অন্তর্হিত হইল। কেশবচন্দ্র মৌন হইলেন অল্পভাষী হইলেন। বনে গেলেন না বটে, কিন্তু যে বাড়ীতে ছিলেন সেই বাড়ীকে, যে ঘরে ছিলেন সেই ঘরকে শ্মশানের মত বনের মত করিলেন। গ্রন্থের মধ্যে এ সময়ে 'রাত্রিচিন্তা' (Young's Night Thought) কেবল তাঁহার ভাল লাগিত।

এরূপ অবস্থা কোন্ সময়ে হইল? আঠার উনিশ কুড়ি বৎসর বয়সে। বিবাহের সময় উপস্থিত। গুরুজন বিবাহব্রতে ব্রতী করিতে উদ্যোগী হইলেন। কেশবচন্দ্রের মনে তখন কি হইল? কি হইল তাহা তিনি আপনি এইরূপ বলিয়াছেন, "যখন বিবাহ [ক]রিয়া সংসারে প্রবেশ করিব, দেখি, এই জায়গাই তো শ্মশান। [সং]সারের বিষয় বিশেষ বুঝিতাম না, কিন্তু সংসারের ভয় জানি[ত]াম। স্ত্রী আসিতেছেন সংসার আরম্ভ করিতে হইবে। 'সংসার [বি]লাসে তুমি সুখলাভ করিবে? স্ত্রীর কাছে তুমি বসিয়া থাকিবে? [সং]সারের কথা লইয়া তুমি আলাপ করিবে? এ সকল বিষয়

ত্যাগ করিয়া তিনি আত্মারাম অর্থাৎ ঈশ্বরময় হইয়াছিলেন, অন্য কোন বিষয়ে আর তাঁহার বাসনা ছিল না। তিনি যখন মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পিতৃসমীপে পুনরায় উপস্থিত হওয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ। মহাপ্রস্থানে প্রস্থিত পুত্রের শোকে ব্যাস অত্যন্ত অধীর হইয়াছিলেন, কেন না সংসারসম্বন্ধে মহাপ্রস্থান এবং মৃত্যু উভয়ই সমান। কেহ কেহ বলেন, শুক যোগশক্তি সমুদায় প্রত্যক্ষ করিয়া পরিশেষে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতেই পিতা এত অধীর হইয়াছিলেন। শ্রীমচ্ছঙ্কর তখন তখনই শুক দেহত্যাগ করিয়াছিলেন ইহা মানেন না, কোন অভিমত প্রদেশে গিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন তিনি এইরূপ বলেন। তখন না হউক পরে দেহত্যাগ হইয়াছিল, এ কথা বলিলেই তিনি আবার পিতার নিকটে প্রত্যাগমন করিলেন কি প্রকারে, ভাগবতশাস্ত্রাধ্যয়ন করিলেনই বা কিরূপে? ভাগবত কি এ প্রব্রজ্যার বিষয় জানিতেন না? যদি না জনিতেন, তবে 'যং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যম্' এ কথা বলিয়া তাঁহার প্রব্রজ্যার উল্লেখ করিলেন কি প্রকারে? তিনি দেহত্যাগ করেন নাই, কেবল মেরুপ্রদেশ ভেদ করিয়া অপরদিকে গমন করিয়াছিলেন এই তাঁহার মত। আমি এই ভাগবতের মতেরই অনুমোদন করি। অপরে যদি কেহ এ মতের অনুমোদন না করেন, তাহাতে ক্ষতি নাই, কেন না ভাগবতে নিবৃত্তির পর যে নিবৃত্ত-প্রবৃত্তগণের যোগের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট; কারণ কোন ব্যক্তিতে সেরূপ যোগ উপস্থিত না হইলে আর ভাগবতে তাহা নিবদ্ধ হইত না। ভাগবত মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে। ইহা সর্ব্বপ্রথমে চারিটিমাত্র শ্লোকে সূত্রাকারে নিবদ্ধ হয়। নারদ ইহাকে বিস্তার করিয়া ব্যাসকে

[illegible] বিস্তার করিয়া [illegible]
[illegible] তিনি আবার [illegible] দিন নিবৃত্ত [illegible]
[illegible] তবে উহা আবার বিস্তৃত হয়। ইহার পর আরও দুইবার ভাগবতনির্মাণ হইয়াছে। এইরূপে সাত বার যে গ্রন্থের কলেবর বিস্তার হইয়াছে, তাহাতে কত নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে কে বলিতে পারে? ভাগবতের শ্লোকসংখ্যা-নির্ণয় করিয়া শবকোক্তি নামে একখানি গ্রন্থ আছে জানিতে পারা যায়। তাহাতে অধ্যায়ে অধ্যায়ে যে শ্লোক সংখ্যা আছে, বর্ত্তমান ভাগবতের সঙ্গে তাহার ঐক্য হয় না। যে গ্রন্থের এত পরিবর্ত্তন, তাহাকে কি প্রকারে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে? এই জন্য গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, তন্মধ্যে যে পন্থা প্রচারিত হইয়াছে, উহা সত্যসঙ্গত এবং সত্যই অবিনশ্বর শাস্ত্র।

এখন এ সকল কথা যাউক, প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি। শুক নিবৃত্তিরাজ্যের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি তৎপূর্ব্বে পুত্রকন্যায় পরিবেষ্টিত গৃহস্থ ছিলেন। তিনি কন্যাকে রাজগৃহে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। এমন প্রকৃষ্ট গৃহীর প্রব্রজ্যাবলম্বন প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সন্দেহ কি? তিনি আবার গৃহে পিতৃসন্নিধানে ফিরিয়া আসিলেন কেন? ভাগবত বলেন, হরিগুণপ্রত্যক্ষ করিয়া বিক্ষিপ্তমনা হইয়া পিতার নিকটে তিনি আসিয়াছিলেন। 'হরিগুণপ্রত্যক্ষ করিয়া বিক্ষিপ্তমনা' হওয়ার অর্থ কি? নিবৃত্তিপথে নির্গুণ উদাসীন ব্রহ্মে স্থিতি হয়, অশেষকল্যাণগুণসম্পন্ন পরব্রহ্ম এ পথে আদৃত নহেন। এক বার সর্ব্বগুণবিবর্জ্জিত ব্রহ্ম যোগে প্রত্যক্ষ না হইলে গুণদর্শন সম্ভবে না, কেন না প্রথমেই ব্রহ্মের অনন্তকল্যাণগুণপ্রত্যক্ষ করিতে গেলে হৃদয় তাহাতে এমনই অভিভূত হয় যে, অন্তর ফিরে

আর দৃষ্টি থাকে না, সেই গুণসকলই সর্ব্বস্ব হইয়া পড়ে ; বাসন
সমূহের আর নিবৃত্তি হয় না। ইহাতে এই হয় যে, ভগবদৈশ্বর
আকৃষ্টচিত্ততাবশতঃ সেই ঐশ্বর্য্যসমূহই আপনার দিকে অনিবৃত্ত
চিত্ত সাধককে আকৃষ্ট করিয়া পরিশেষে প্রলোভনমধ্যে নিক্ষে
করে। এই বিঘ্নাপনয়নের জন্য সর্ব্বপ্রথমে নিবৃত্তিযোগে সি
হওয়া সকল যোগাকাঙ্ক্ষীর পক্ষেই প্রয়োজন। কোন কো
ব্যক্তি এই নিবৃত্তিযোগেই থাকিয়া যান, আর অগ্রসর হন না, আ
অগ্রসর হইতে এই ভয় করেন যে, কি জানি বা তাঁহাদের চি
আবার বিকার ফিরিয়া আইসে। এসম্বন্ধে কিরূপ ভয় একটি দৃষ্টা
দিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। স্বর্গগত পরমহংস ভাস্করান
স্বামী শঙ্করের পথাবলম্বী নিবৃত্তিযোগী। একদা তাঁহার নিক
আমাদের একজন বন্ধু সপত্নীক গমন করেন। তাঁহার পত্নী অ
সামান্যা স্ত্রীর ন্যায় তাঁহার নিকটে গিয়া সংসারের ফলকামনা
বিষয়জ্ঞাপন করেন না, কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু হন। ইহাতে স্বা
আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন। কয়েক দিনের প্রশ্নো
ত্তরে তৎপ্রতি তাঁহার স্নেহের সঞ্চার হয়। আপনাতে স্নেহে
সঞ্চার দেখিয়া তিনি ভীত হন, এবং শেষ দিনে তিনি বলেন, ম
তুমি আর আমার নিকটে আসিও না, আমার মোহ উপস্থিত
ইঁহারা স্নেহকে তমোগুণসম্ভূত অন্ধতার মূল মনে করেন, সুতরা
স্নেহ ইঁহাদিগের নিকটে মোহ বলিয়া পরিচিত।

নিবৃত্তিযোগের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত শুকদেব যখন ঈশ্বরের কল্যা
গুণের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইলেন, তখন ভাগবত বলিলেন, 'হরি
গুণে তিনি আক্ষিপ্তমতি' হইলেন। আক্ষিপ্তমতি হইলেন, ইহা
মর্ম্ম কি? নিবৃত্তিতে তাঁহার মন বৃত্তিশূন্য হইয়াছিল, সুত

হইয়া গিয়াছিল, এখন তাঁহাতে নবীন প্রবৃত্তি উপস্থিত। এ নবীন প্রবৃত্তি কি? ঈশ্বরের প্রতি চিত্তের অনুরাগ। নিবৃত্তিমার্গে অনুরাগ বিক্ষেপের কারণ, তমোগুণের কার্য্য। সর্ব্ববিধ প্রবৃত্তি-রহিত শুকচিত্তে পুনরায় প্রবৃত্তি উপস্থিত, সুতরাং নিবৃত্তিযোগীর পক্ষে উহা বিক্ষেপভিন্ন আর কি হইতে পারে? ঐ বিক্ষেপ অনুরাগ, এ বিক্ষেপ ভক্তি, এই ভক্তিতে ভাগবতের আরম্ভ হইয়াছে। বিষয়ের আকর্ষণে আক্ষিপ্তমতি না হয় এজন্য নিবৃত্তিযোগ অবলম্বিত হয়। বিষয়ের আকর্ষণ নিবৃত্ত হইলে ঈশ্বরের আকর্ষণে আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। সে আকর্ষণ অনুভূত হয় না এই জন্য যে, যোগী নিবৃত্তিসাধন করিতে করিতে আকর্ষণমাত্রকেই ভয় করেন। নিবৃত্তিযোগী শুক সেরূপ ভয় হৃদয়ে স্থান না দিয়া শ্রীহরির কল্যাণ-গুণসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া পিতৃসন্নিধানে আসিলেন, ভক্তিশাস্ত্রে দীক্ষিত হইলেন, এবং জগতে ভক্তিবিস্তার করিলেন। শুক অত্যাশ্রমী হইয়া যখন ভগবদ্‌গুণব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন, ঈশ্বরানু-রাগে আর্দ্রচিত্ত হইলেন, তখন কি তাঁহার অত্যাশ্রমিত্ব ঘুচিয়া গেল? কখনই নহে। তিনি অত্যাশ্রমী থাকিয়াই জনসমাজে ভগবল্লীলাপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি এরূপ করিলেন কেন? ভগবৎপ্রেরণায়, ভগবানের আদেশে। যে কালে ভগবৎপ্রেরণা ও ভগবদাদেশ কাহাকেও কোন কর্ত্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত করে, সে কালে সে ব্যক্তি আত্মকর্তৃত্ব বিস্মৃত, সুতরাং তাহাতে তাঁহার ব্রহ্মসংস্থতা বিলুপ্ত না হইয়া উহা আরও উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়। গতিকেই এখানে পরমহংসত্ব বা অত্যাশ্রমিত্বের কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হইতেছে না।

শ্রীহরির গুণকথন ও লীলাপ্রচার ইহাতে অত্যাশ্রমিত্বের

ব্যাঘাত জন্মিতে না পারে, কিন্তু সংসারের বিবিধকার্য্যে প্রবৃ
হইয়া অত্যাশ্রমিত্ব থাকিবে কি প্রকারে ? সংসারে থাকিতে
গেলেই বিবিধ লোকের সঙ্গ করিতে হয়, কর্ত্তব্যোপলক্ষে এমন
সকল কার্য্য করিতে হয়, যাহা যতিধর্ম্মের একান্ত বিরোধী। এরূপ
স্থলে সংসারে থাকিয়া কেশবচন্দ্রের অত্যাশ্রমিত্ব রক্ষা পাইয়াছিল
ইহা কিরূপে নির্দ্ধারণ করা যাইবে। অত্যাশ্রমী যখন ভগবদ্
গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার 'আদেশপালন করেন,' তখন ব্রহ্মসংস্থতার
ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না, ইহা আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি।
যদি সংসারের সমুদায় কার্য্য ঈশ্বরের আদেশে প্রতিপালিত হয়
তাহা হইলে সে সকল কার্য্যে ব্রহ্মসংস্থতার ব্যাঘাত হইবে কেন ?
অত্যাশ্রমীর ভগবদাজ্ঞাপালন অত্যাশ্রমিত্বের ব্যাঘাতকর নহে, ইহা
শ্রীমচ্ছঙ্করকেও স্বীকার করিতে হইবে। তিনি যখন ক্ষুধানিবৃত্তির
জন্য ভিক্ষাচর্য্যার অনুমোদন করিয়াছেন, তখন সেই দিক্ দিয়া
প্রবৃত্তিযোগে প্রবিষ্ট হইবার পথ প্রমুক্ত রহিয়াছে। ক্ষুধা শারীরিক
ব্যাপার, ক্ষুধানিবৃত্তি করিতে গিয়া যদি পরিব্রাজকের শরীরের
অধীন হইতে হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মসংস্থতা কাটিয়া গেল, ইহা
শ্রীমচ্ছঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন। স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু
ইহার প্রতিবিধান হওয়া দুষ্কর। যত দিন দেহ আছে, তত দিন
ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেই হইবে। ভিক্ষাই হউক, বা অজগরের ন্যায়
শয়ান থাকিয়া আগত ভক্ষ্যদ্রব্য গলাধঃকরণ করাই হউক, আহার-
ক্রিয়ার কোন কালে নিবৃত্তি হইবে না। ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তি আপ-
নার ক্ষুধানিবারণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। আপনার
দুঃখনিবৃত্তির পর তাহার সঙ্গে সঙ্গে জগতের দুঃখনিবৃত্তির জন্য
তাঁহাতে করুণাসঞ্চার হইয়া থাকে। বুদ্ধ নিবৃত্তির পরাকাষ্ঠালাভ

করিয়া মানবমণ্ডলীকে জরামৃত্যুব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্ত ব্যগ্র হইলেন। শ্রীমচ্ছঙ্করের দিগ্বিজয় পাণ্ডিত্যপ্রকাশের জন্ত নয়, কেন না পাণ্ডিত্যে বীতরাগ না হইলে ব্রহ্মসংস্থ হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু অজ্ঞানতার বন্ধন হইতে মানবগণকে মুক্ত করিয়া ব্রহ্মসংস্থ করিবার জন্ত। যদি এইরূপই হইল, তবে নিবৃত্তি-যোগ প্রবৃত্তিযোগে প্রবিষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না ইহাই বলিতে হইবে। শ্রীমচ্ছঙ্কর প্রবৃত্তিযোগের বিস্তার ও বিবৃতি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আদৌ যদি উহার মূল নিবৃত্তিযোগের মধ্যে না থাকিত, প্রবৃত্তিযোগ কোথা হইতে আসিত ?

'নিবৃত্তিযোগ' 'প্রবৃত্তিযোগ' এ দুই শব্দ কেশবচন্দ্র প্রচলিত করিয়াছেন। তিনি বহুশাস্ত্র পাঠ করিয়া তাহার নিষ্কর্ষস্বরূপ এ দুই শব্দ বাহির করিয়াছেন, তাহা নহে। শাস্ত্রপাঠ করিয়া তবে তিনি কোন বিষয়নির্দ্ধারণ করিতেন, তাহা নহে। তিনি আপনি অধ্যাত্মযোগে যাহা প্রত্যক্ষ করিতেন, তাহাই বলিতেন, যাঁহারা শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন, তাঁহারা শাস্ত্রের সঙ্গে তাঁহার কথার মিল দেখিতেন। শাস্ত্রপাঠ করিয়াও যাঁহারা যে বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, তাঁহার মুখে তৎসম্পর্কে কথা শুনিবার পর তাঁহারা প্রকৃত শাস্ত্রার্থ তখন বুঝিতে পারিয়াছেন। ক্ষুধা প্রভৃতিকে কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া মানিতেন। ক্ষুধা পাইলে আহার করিতে, নিদ্রোদ্গম হইলে নিদ্রা যাইতে ঈশ্বর আদেশ করেন, এই তাঁহার ধারণা। ভক্তিশাস্ত্র বলেন, দেহ আমাদের নিজের নয়, পরহিতার্থ স্বয়ং ভগবান্ দেহদান করিয়াছেন, অনাহারাদিতে উহার বিনাশসাধনে আমাদের কোন অধিকার নাই। যদি অধিকার নাই তবে উহার রক্ষণার্থ যত্ন ঈশ্বরের

আদেশ। এইরূপে শ্রীমচ্ছঙ্কর যেখানে আসিয়া কোন মীমাংসা করিতে পারেন নাই থামিয়া পড়িয়াছেন, সেখান হইতে কেশবচন্দ্র প্রবৃত্তিযোগের আরম্ভ করিয়াছেন। এরূপে প্রবৃত্তিযোগের আরম্ভ হওয়াতে যে ব্রহ্মসংস্থতার বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই, বরং উহা ঘনীভূত আকারধারণ করিয়াছে, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। বুদ্ধ শঙ্কর প্রভৃতির জনহিতার্থ স্বমতপ্রচার, তাঁহারা বলুন আর না বলুন, প্রবৃত্তিযোগেরই অন্তর্গত। এই প্রবৃত্তিযোগ নিবৃত্তিযোগকে মূলে রাখিয়া উদিত হয়। বিষয়স্পৃহা নিবৃত্ত না হইলে ভগবৎপ্রেরণা উপস্থিত হয় না। ভগবৎপ্রেরণায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া স্বকর্তৃত্বে কর্ম্মে প্রবৃত্তি বৈদিক প্রবৃত্তিমার্গ, নিবৃত্তি-মূলক প্রবৃত্তিযোগ নহে। আমরা কেশবচন্দ্রের জীবনের প্রথমা-বস্থায় নিবৃত্তিযোগের ক্রিয়া কি প্রকার প্রকাশ পাইয়াছে আলো-চনা করিয়াছি। অরণ্যোবাস ও বৈরাগ্যের পর তাঁহাতে ভক্তি ও যোগ উপস্থিত হয়। তিনি প্রথম হইতে আদেশবাদী। তাঁহার সম্বন্ধে শাস্ত্রবিধি যাহা কিছু ঈশ্বরই ছিলেন। আহার বিহার যাহা কিছু ঈশ্বরের আদেশ বিনা তিনি করিতেন না। এই আদেশবাদের ভূমিতেই তিনি শঙ্কর যেখানে থামিয়াছিলেন, সেখান হইতে নবীন পথে অগ্রসর হইলেন। এরূপে অগ্রসর হইয়া তাঁহার অত্যাশ্রমিত্ব বিনষ্ট হইল না, কেন না তিনি ব্রহ্মসংস্থ থাকিয়া নিজের ইচ্ছায় নয় ব্রহ্মেরই আদেশে নবীন আশ্রমধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইলেন।

তাঁহার আশ্রমধর্ম্ম কি? তিনি আশ্রম বলিতে আপনি কি বুঝিতেন? গৃহস্থাশ্রম না তপোবন? তাঁহার আশ্রম তপোবন ছিল। নরনারী তপোবনে বাস করিবেন, ইহা কেবল তাঁহার অভিলাষ ছিল তাহা নহে, এই ভাবে তিনি সংসারে আপনি বাস

করিতেন। এইরূপে বাস করিতেন বলিয়াই তিনি বলিতে পারিয়াছেন "যাঁহারা ঋষিপুত্র ঋষিকন্যাগণকে আশ্রমে স্থান দিতেন, আদর করিতেন তাঁহারা তাহাদিগের মুখ দর্শন করিয়া উচ্চ ধর্ম্মসাধন করিতে সক্ষম হইতেন, তাঁহারা আশ্রমে থাকিয়া হিন্দুধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিতেন। একথা পুঁথিকে লিখিত আছে, অনুষ্ঠানে জীবনক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়াছে।" এ বিষয়ে বন্ধুগণকে প্রোৎসাহিত করিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই। কি ভাবে প্রোৎসাহিত করিতেন এই কথাগুলি শুনিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। "সপরিবারে ধর্ম্মসাধন হিন্দুস্থানের সর্ব্বোচ্চ ভাব। ঈশ্বরের বিধি নহে, সংসারত্যাগ করিয়া পরিবারবিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে। ধর্ম্মসাধনে ইহা আবশ্যকও নহে। ইহা কঠিন ব্যাপার, কেন না সংসারে থাকিয়া কেহ কোন মতে ধ্যান করিতে পারে না *। কিন্তু মানুষ যদি সংসারে নিমগ্ন হয়, সংসার ছাড়িয়াও ধর্ম্মসাধন করিতে পারে না। জঙ্গলে অরণ্যে বাস করিয়াও সংসারস্মরণ হয়, সেখানেও স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করা হয়। ফল মূল আহার করিয়া কি হইবে? প্রাচীন আর্য্যস্থানে আশ্রমের সুন্দর ছবির উপন্যাস আছে। ইহা যেন সুমিষ্ট পদ্য রচনা। অতি সুন্দর ভাষা, শুনিতে আরম্ভ করিলে আর শেষ হয় না, সে দেশ সেখানকার বায়ু সকলই মনোহর। সেখানকার কথা শুনিলে হৃদয় সুখী হয়, সে বায়ু স্পর্শ করিলে অঙ্গ সুশীতল হয়। সুন্দর নদীর স্রোত চলিয়া যাইতেছে, সেই নদীকূলে মনোরম

---

* শ্রীমচ্ছঙ্কর এই কারণেই গৃহীর ধ্যানযোগে অনধিকারনির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

আছেন। সে সুন্দর ছবি দেখিতে চাও, সে গান শুনিতে তেমন অন্যটি পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। এটি সুন্দর ছবি আশ্রম সত্তম, আশ্রম ঘটিয়াছে। বনের ফল খাইয়া কুটিরে করিয়া, পশুগণকে বশীভূত করিয়া ঋষিগণ পরিবার দ্বার বেষ্টিত, মন শুদ্ধ, হৃদয় পবিত্র ব্রহ্মানন্দে মগ্ন। সকলে পথাবলম্বী হও। বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও যাহাতে বৈরাগ যোগতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব শেখা যায়, সেই দিকে চল। প্রাচীন সমাজে চল, সেখানে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার বিধি নাই, সহধর্ম্মিণী করিয়া যোগপথে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করিবার বি সে পথে চলিলে তোমার স্ত্রী তোমার অনুগামিনী হইবেন। তোমায় এই দৃশ্য প্রদর্শন করিতে হইবে। সে দেশে জনক জন্মিয়াছিলেন, সেই দেশে তোমার জন্ম হইয়াছে, যে স্থান গণের আশ্রমে পূর্ণ, সেই হিন্দুস্থান সেই ব্রহ্মের ক্রোড় তে জন্মভূমি। এমন উপায় কর, যাহাতে সপরিবারে ঈশ্বরের নি যাইতে পার।"

এই নূতন আশ্রমধর্ম্ম সন্ন্যাসধর্ম্মের উপরে স্থাপিত। স ঈশ্বরে সর্ব্বস্বসমর্পণ। তাঁহাকে সর্ব্বস্বসমর্পণ করিলে আর অ কর্ত্তৃত্ব থাকে না। তিনি যে দিকে লইয়া যান, ...া ক তাহাতেই প্রবৃত্ত হইতে হয়। যদি মনে একটু ...তঃ আই তবে সন্ন্যাসধর্ম্ম কাটিয়া যায়। নবীন আশ্রমে ঈশ্বরের আ নরনারীকে পরিণয়বন্ধনে বদ্ধ হইতে হইবে। এ পরিণয় সন্ন্য ও সন্ন্যাসিনীর পরিণয়। কেশবচন্দ্র এই জন্যই প্রার্থনায় বলি ছেন :—"যাহারা ফিরিয়া আসিলেন তাঁহাদের কথা বলিবে ন নির্ব্বাসনের কথা বলিলে, ফিরিয়া আসিবার কথা বলিবে ন

অবিবাহিত, অর্থত্যাগী, পরিবারত্যাগী, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর পরিচয় পৃথিবী পাইয়াছে। এখন স্ত্রী পুত্র পরিবারের ভিতর সন্ন্যাস পৃথিবী দেখিতে চায়। নূতন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী একত্র হইয়া কিরূপে সমস্ত সংসারকে ধর্ম্মের সংসার করে, সন্তানপালন করে, এবার তাহাই দেখাও। ইহাতে রাগ হয় না, লোভ হয় না, হিংসা হয় না, অহঙ্কার হয় না। ইহাতে টাকা হাতে পড়িলে ক্ষতি হয় না, যেন খড়ের মত।" কেশবচন্দ্র এ অদ্ভুত মত কোন্ সাহসে প্রচার করিলেন? যদি নরনারী সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীই হইবে, তবে তাহারা বিবাহ করিবে কেন? যে ধর্ম্মে প্রেম ও পুণ্যের যোগে আনন্দ প্রকাশ পাইয়াছে, সে ধর্ম্মের চরমই এই। তাই কেশবও ঐ প্রার্থনায় বলিয়াছেন, "১৮০০ বৎসর পূর্ব্বে যে যাত্রা করিয়া গেলেন, বলিয়াছিলেন আনন্দকে পাঠাইয়া দিবেন? কৈ আসিল না? ঈশা বর হইয়া আসিবেন, ঈশার সঙ্গে পৃথিবীর বিবাহ কবে হবে? কৈ বর যে আসিল না?" সন্ন্যাসধর্ম্ম বিনা ব্রহ্মসংস্থতা হয় না, ব্রহ্মসংস্থ না হইলে ঈশ্বরের পুত্রত্ব ঈশ্বরের কন্যাত্ব জন্মে না। নব আশ্রমধর্ম্মে বিবাহ হইবে কাহাদের? ঈশ্বরপুত্র ও ঈশ্বরকন্যার। আনন্দ কি না—পবিত্রাত্মা পরমাত্মা তাঁহাদের উভয়কে সম্মিলিত করিবেন। "এবার বর হইয়া ঋষিগণ নূতন বেশধারণ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিতেছেন" এ কথা তাঁহাদিগেরই সম্বন্ধে শোভা পায়, যাঁহাদিগের ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মবাণীশ্রবণ জীবনের অন্নপান হইয়াছে।

সন্ন্যাসাবলম্বন করিয়া যাঁহারা অত্যাশ্রমী হইলেন, তাঁহারা ঈশ্বরের আদেশে সংসারে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাদের সংসারাশ্রম তপোভূমি হইল। এখন তাঁহাদের আশ্রমধর্ম্ম কি? ইহাই

নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। কেশবচন্দ্র এই আশ্রমের ধর্ম্ম কি নির্দ্দেশ করিয়াছেন?

(ক) ঈশ্বর একমাত্র কর্ত্তা।

(খ) সকলে ঈশ্বরপ্রেরিত।

(গ) ইহলোকে থাকিয়া পরলোকে স্থিতি।

(ঘ) সাধুগণের সঙ্গে বাস।

(ক) নবীন আশ্রমে ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ কর্ত্তা নাই। যেখানে নরনারী আপনি কর্ত্তা হইয়া সংসার করে, সেখানে তাহারা সংসারী সন্ন্যাসী নহে। যত দিন পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমাচারে তাহারা আবদ্ধ, তত দিন তাহাদিগের আত্মকর্ত্তৃত্ব আছে, তাহারা অত্যাশ্রমী হইতে পারে না। অত্যাশ্রমী হইতে গেলেই আত্মকর্ত্তৃত্ববিসর্জ্জন দিতে হয়। অত্যাশ্রমী হইয়া আর কেহ পুরাতন আশ্রমধর্ম্মের আশ্রয়গ্রহণ করিতে পারে না, ;উহাতে পতন হয়। যিনি অত্যাশ্রমী হইয়াছেন, তাঁহার আত্মকর্ত্তৃত্ব চলিয়া গিয়াছে। তিনি যে বলিবেন আমি এইরূপে চলিব, তাহাও পারেন না, ; কেন না তাহা হইলে পুনরায় কর্ত্তৃত্বাভিমান ফিরিয়া আসিল। আমি যখন অত্যাশ্রমী হইয়াছি, তখন জীবনান্তপর্য্যন্ত এই এই বিধি পালন করিব, এরূপ নির্ব্বন্ধপ্রকাশ করিলেও আত্মকর্ত্তৃত্ব দেখা দিল, অত্যাশ্রমিত্বভঙ্গ হইল। আমার দেহ আছে অতএব দেহপাতপর্য্যন্ত আমায় ভিক্ষাচর্য্যা করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইবে, এরূপ নিয়মাবলম্বন করিলেও আত্মকর্ত্তৃত্ব তাহার সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া উঠিল। সুতরাং আত্মকর্ত্তৃত্ববিলোপকারী কোন উপায় উপস্থিত না হইলে সন্ন্যাসিত্ব বা অত্যাশ্রমিত্ব কিছুতেই রক্ষা পাইবার আর সম্ভাবনা থাকে না। আত্মকর্ত্তৃত্ব না জাগে এই

তবে অনশনে বৈপরীত্য, তাঁহাদের আত্মকর্তৃত্বের স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, কেন না ক্ষুধাকে বলপূর্ব্বক চাপিতে গিয়া আত্মারই কর্তৃত্ব ফুটিয়া উঠে। অজগরব্রতাবলম্বনেও কর্তৃত্বের বিলোপ হয় না, মুখে অন্ন তুলিয়া দিলেওতো গলাধঃকরণ করিতে হইবে? গলাধঃকরণ করার ভিতরে কি কর্তৃত্ব নাই? আত্মকর্তৃত্ব গিয়া যদি এস্থলে ভগবানের কর্তৃত্ব না আইসে, তাহা হইলে ব্রহ্মসংস্থতার ক্ষতি উপস্থিত হইবেই হইবে। সকলই গেল ক্ষুধা গেল না কেন? কেবল ক্ষুধা নয় জীবের প্রতি প্রভূত করুণাই বা কেন এ অবস্থায় উপস্থিত হয়? অবশ্য তবে এখন ঈশ্বরের ভৃত্য হইয়া সন্তান হইয়া তাঁহার প্রেরণায় তাঁহার আদেশে কার্য্যকরিবার সময় উপস্থিত। এত দিন নিজের প্রবৃত্তি ছিল, বাসনা ছিল, বিষয়তৃষ্ণা ছিল, পুরুষকার ছিল, বুদ্ধি বিচার ছিল। যাহা সন্তান ও ভৃত্য হইবার মহান্ অন্তরায় ছিল। এখন সে অন্তরায় চলিয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাহা বলেন কোন কথা না বলিয়া তাহার অনুসরণ স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। প্রভুর আদেশপালন, পিতার ইচ্ছানুবর্ত্তন, ইহাতে আর আত্মকর্তৃত্ব কোথায় রহিল? আত্মকর্তৃত্ববিরহিত সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী ঈশ্বরপুত্র ও ঈশ্বরকন্যা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ কর্তৃত্বাধীন হইয়া আশ্রম বা তপোবনে বাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহারা নবীন আশ্রমধর্ম্মের অন্তর্ভূত। কেশবচন্দ্র স্বয়ং এই আশ্রমধর্ম্মী ছিলেন।

(খ) নবীন আশ্রমে প্রবিষ্ট ব্যক্তি যেন আত্মকর্তৃত্ববর্জ্জিত হইলেন। তিনি যে সকল ব্যক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাঁহারা কি সকলেই অত্যাশ্রমী? সকলেই অত্যাশ্রমী হইবে ইহা অসম্ভব? যদি তাহা হয় তাহা হইলে গৃহের দাসদাসী অল্পবয়স্ক বালক

যাত্রিকা সকলেই ধর্ম্মের উচ্চতম সোপানে আরূঢ় স্বীকার করিয়া লইতে হয়। এরূপ স্বীকার কখন সত্যমূলক হইতে পারে না। যদি আশ্রমের সকলে অত্যাশ্রমী হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের সংশ্রবে বাসকরা অত্যাশ্রমীর পক্ষে কখনই সঙ্গত নয়। যদিই বা তাহাদের আচরণে তাঁহার ক্রোধাদির উদ্রেক না হউক, তথাপি তাহাদের হীনতা চক্ষের সম্মুখে নিয়ত প্রকাশ পাইয়া আপনার শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞান সহজেই উদ্রিক্ত হইতে পারে। যদি হয়, তাহা হইলে তাঁহার মনে অভিমানের সঞ্চার হইয়া অত্যাশ্রমিত্ব খণ্ডিত হইল। এরূপ অন্তরায় উপস্থিত না হয়, এ জন্য নবীন আশ্রমধর্ম্মী সংসারের সকলকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া গ্রহণ করেন। বুদ্ধ, ঈশা, মুষা, চৈতন্য প্রভৃতি ঈশ্বরপ্রেরিত, তাঁহাদিগের নিকটে স্বতই মস্তক প্রণত হয়। বাড়ীর দাস দাসী পুত্র কন্যা প্রভৃতি ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাহাদিগের সহিত বিনম্র ব্যবহার, ইহা কি স্বাভাবিক? যথার্থ জ্ঞানদৃষ্টি উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে প্রেরিতভিন্ন অন্য দৃষ্টিতে দেখিবার কোন সম্ভাবনা নাই। নরনারী ঈশ্বরের পুত্রকন্যা, ইহা কি অস্বীকার করিতে পারা যায়? তাহারা আপনাদিগকে ঈশ্বরের পুত্র কন্যা বলিয়া জানে নাই, এ জন্যই কি তত্ত্বদর্শীর নিকটে তাহারা ঈশ্বরের পুত্রকন্যা নহে? তাহারা তাহাদিগের আপনাকে না চিনুক, তিনি তো তাহাদিগকে চিনেন। যদি চেনেন, তবে তিনি তাহাদিগের সঙ্গে তদুপযুক্ত ব্যবহার করিবেন না কেন? কেশবচন্দ্র উৎসবের পূর্ব্বে দাস দাসী প্রভৃতিকে প্রেরিত বলিয়া গ্রহণ ও নমস্কারপূর্ব্বক উৎসবে প্রবৃত্ত হইতেন তাহার কি কোন অর্থ নাই? অভিমান যদি নবীন আশ্রমে

ঘোর শত্রু হয়, তবে তাহাকে সর্ব্বাগ্রে উচ্ছেদকরিবার উপায় করাই তো প্রয়োজন। তিনি কেবল মুখে সকলকে প্রেরিত বলিয়া গ্রহণ বা প্রণাম করেন নাই আপনার সমগ্র জীবনে তাদৃশ সম্ভ্রমের প্রমাণ দেখাইয়াছেন; সুতরাং যাহারা অত্যাশ্রমী নয় তাহাদিগের সঙ্গে নিয়ত বাস করিয়াও যে তাঁহার অত্যাশ্রমিত্বের ক্ষতি হয় নাই, ইহা অবশ্য মানিতে হইবে।

(গ) ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়া সংসারে প্রেরিতগণেতে পরিবেষ্টিত থাকিলেই কি এ নবীন আশ্রম নির্ব্বিঘ্ন হইল? বিস্তৃত জনসমাজের সঙ্গে নবীন আশ্রমধর্ম্মীর সম্বন্ধ রাখিতে হইবে, তাহাতে তো তাঁহার ব্রহ্মসংস্থতার ক্ষতির বিশেষ সম্ভাবনা আছে? কোন্ উপায়ে এ ক্ষতির তিনি নিবারণ করিবেন? যখন তিনি ব্রহ্মসংস্থ হইয়াছেন, তখনই তিনি ইহলোকে থাকিয়াও পরলোকে স্থিতি করিতেছেন। কেন না যোগীর পক্ষে স্বয়ং ব্রহ্মই তাঁহার নিত্যকালের বসতিস্থান; তাঁহার নিকটে পরলোক বলিয়া স্বতন্ত্র আর কিছু নাই। সংসারে বিবিধ লোকের সঙ্গে বাস করিয়া ইহলোকে নাই, পরলোকে আছি এ জ্ঞান জাগ্রৎ থাকিবে কি প্রকারে? কেবল কল্পনা করিলে কিছু হয় না, যাহা সত্যমূলক নহে, তাহা কি কোন কালে স্থায়ী হইয়া থাকে? ইহলোকে আছি, অথচ মনে করিতেছি, পরলোকে ঈশ্বরেতে বাস করিতেছি, ইহা কল্পনা বিনা সত্য হইবে কি প্রকারে? যদি সত্য না হয়, এ কল্পনার ঘোর শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যাইবে। সত্য পাইলে আত্মা তাহা ধরিয়া থাকিতে পারে, যেখানে সত্য নাই, সেখানে আত্মার দাঁড়াইবার ভূমি নাই। ইহা আর কে না জানে যে, আমরা দেহে যখন আছি, তখন ইহলোকে আছি, দেহবিযুক্ত হইলে

তবে আমাদের পরলোকে বাস হইবে। সত্য বটে, সাধারণ লোকের ধারণা এই প্রকারই বটে, কিন্তু যোগচক্ষে দেখিলে অন্য প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। নিবৃত্তিযোগে যেমন প্রবৃত্তি সকল নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছে, তেমনি সর্ব্বত্র ব্রহ্মসত্তাদর্শন সিদ্ধ হইয়াছে। কেবল ব্রহ্মসত্তাদর্শন সিদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে, ব্রহ্মেতে সমুদায় জগৎ ও জীবের স্থিতি প্রত্যক্ষ হইয়াছে। এই যে ব্রহ্মেতে নিয়তকাল সকলের ও আপনার স্থিতি দর্শন, ইহাকেই ইহলোকে থাকিয়া পরলোকে স্থিতি বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি ঈদৃশদর্শনে সিদ্ধমনোরথ হয় নাই, তাহার এখনও অত্যাশ্রমিত্ব-লাভ করা দুরস্থ। ব্রহ্মেতে সমুদায় জগৎ ও জীবের স্থিতি দেখিলেও নরনারীর দুরাচার যখন নিয়ত দৃষ্টিপথে নিপতিত হইতেছে, তখন সে সকলের প্রতি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই। পরলোক যদি ঈদৃশ লোকসকলের আবাসভূমি হয়, তবে সে পরলোকে প্রয়োজন কি? মৃত্যুর পর যদি পরলোকের আরম্ভ বল, তাহা হইলে এখানে যে দুরাত্মা ছিল, সে মৃত্যুহইবামাত্র সাধু হইয়া গেল ইহা যখন বলিতে পারা যায় না, তখন ইহলোকে দুরাত্মা আছে বলিয়া পরলোকে স্থিতি সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয় হইবে, তাহাতে আর অসম্ভাবনা কি? যোগী যখন দুরাত্মার ভিতরেও প্রচ্ছন্ন ঈশ্বরতনয়ত্বদর্শন করিয়া তৎপ্রতি চিত্ত নিবদ্ধ করেন, তখন তাঁহার পরলোকে স্থিতি অসদাচারী লোকদিগের দ্বারা প্রতিহত হইবে কি প্রকারে?

(ঘ) তবে কি তিনি সংসারে থাকিয়া নিয়ত অসঙ্গ উদাসীনের ন্যায় থাকিবেন? তাহা হইলে তো তিনি যে নিবৃত্তিযোগী ছিলেন, সেই নিবৃত্তিযোগীই থাকিলেন, প্রেমপ্রধান প্রবৃত্তিযোগী।

তাঁহাকে স্পর্শও করিল না? তিনি পাপদুরাচারসম্বন্ধে নিবৃত্তি-যোগী, সদা নির্লিপ্ত, কিন্তু নিয়ত সাধুসঙ্গে তাঁহার বাস। যে প্রেম ঈশ্বরের সহিত যোগ সিদ্ধ করে, সেই যোগেই সাধুগণের সহিত যোগ নিবদ্ধ হয়। কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, "ক্ষুদ্র বুদ্ধির কথা পরিত্যাগ করিয়া ভক্তির কথা গ্রহণ কর। ভক্তিপূর্ণ চক্ষু উজ্জ্বল হইবে, নদী পর্ব্বত সংসার যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে কেবল ভক্তিনয়ন খুলিবে, আর দেখিতে পাইবে অমুক সাধু আসিয়াছেন। আর একটি ঈশ্বরপ্রেরিত মহাত্মা আসিলেন, ভক্তিসাগরে টানিয়া লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। যদি ভক্তিনয়ন থাকে এখনই দেখিতে পাইবে, সুখ অনুভব করিবে, অনেক দিন প্রতীক্ষা করিতে হইবে না। এ সব সত্য কথা ভক্তি হইলে চেষ্টা না করিয়াও দেখিতে পাইবে। যত সাধু উপস্থিত হইয়াছেন, ধর্ম্মজগৎ আলোকিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে দেখিবে বিচিত্র নহে। যদি হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর হৃদয় আপনি বলিয়া দিবে। সাধুসজ্জন যাঁহারা পরলোকে আছেন, যাঁহাদের নাম শুনিয়াছ, যাঁহাদিগের কথা পুস্তকে পাঠ করিয়াছ, অথবা বন্ধুমুখে শুনিয়াছ, সেই নাম, সেই চরিত্র, সেই কথা একত্র করিয়া তুমি ভাব, তাঁহাদিগের মত ও তত্ত্ব চিন্তা কর, সেই মত ও তত্ত্বের ভিতর হইতে এক আশ্চর্য্য জ্যোতিষ্মান্ পুরুষ বাহির হইবেন, ভক্তিচক্ষুর নিকট প্রকাশিত হইবেন।" এই সাধুসঙ্গ যে ব্রহ্মস্থ ব্যক্তির পক্ষে কত দূর অপরিহার্য্য এই কথাগুলিতে তাহা প্রকাশ পাইতেছে:—"ভক্তের পর ভক্ত, সাধুর পর সাধু একটি একটি করিয়া কি বিদায় করিয়া দিতে পার? মনের যদি সে ক্ষমতা থাকে এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া চেষ্টা কর। শরীর হইতে

কিছু কিছু রক্ত বাহির করিয়া জীবিত থাকিবে ইহা যেমন অসম্ভব, মহাত্মা পবিত্রাত্মাগণকে বিদায় করিয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা তেমনই অসম্ভব।"

ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন, প্রেরিত মানবমধ্যে ঈশ্বর, নিত্য ঈশ্বরে স্থিতি এবং সাধুসঙ্গ যে আশ্রমধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ, সে আশ্রম আনন্দনিলয়। এখানকার সকল সম্বন্ধ আনন্দবর্দ্ধক। আনন্দভূমিতে এই আশ্রম স্থাপিত, এ জন্য সকলের সঙ্গে অভিন্নহৃদয় হইয়া স্থিতি এখানে সম্ভবপর। আর এই কারণেই পৃথিবীতে স্বর্গের পরিবার স্থাপন অবশ্যম্ভাবী। পরিবারে স্বর্গ প্রকাশ পাইলে সমগ্র মণ্ডলীতে স্বর্গস্থাপনে আর প্রতিবন্ধক রহিল না, কেন না অনেকগুলি পরিবারের সমষ্টিতে মণ্ডলী। কিন্তু কোন্ ব্যক্তি ঈদৃশ অধিকার লাভ করিতে সমর্থ? যিনি বৈরাগ্য ও অরণ্য বাস দ্বারা আপনাকে সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্তিবাসনার অতীত করিয়াছেন, নিবৃত্তিযোগে সিদ্ধ হইয়াছেন। এ অবস্থায় আনন্দের কথা উঠিতে পারে না; মুখে হাস্য বিরাজ করিতে পারে না। কেশবকে ধর্ম্মজীবনের আরম্ভে আমরা এইরূপই দেখিতে পাই। এক বার সমুদায় ঈশ্বরের চরণে বলিদান না করিলে, চরণে চির আনন্দের রাজ্যে ঈশ্বর ও তাঁহার পুত্র কন্যাগণকে লইয়া চির আমোদে নিমগ্ন থাকা কখনই সম্ভবপর নহে। কেশবচন্দ্রের জীবন যদি আনন্দঘন রসস্বরূপে নিমগ্ন হইয়া রোগ শোক সন্তাপ যন্ত্রণা সমুদায় ভুলিয়া গিয়া থাকে, তবে তাহা সন্ন্যাসধর্ম্মের উপরে—কাল জমির উপরে বিচিত্র স্বর্গের ছবি অঙ্কিত হইয়াছিল বলিয়া সম্ভবপর হইয়াছে। যিনি নিবৃত্তিযোগকে মূলে রাখিয়া তদুপরি প্রবৃত্তিযোগস্থাপন না করিবেন, কেশব যে পথে চলিয়াছেন

সে পথে না চলিবেন, তিনি যে নবীন আশ্রমধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইবেন তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। কেবল নিবৃত্তিযোগ আশ্রয় করিলে শুষ্ক মরুভূমিতে বাস ঘটিবে, ক্ষুধাদি স্বাভাবিক বৃত্তি চিরদিন নিবৃত্তিযোগের অন্তরায় হইয়া থাকিবে। আর যদি নিবৃত্তি-যোগনিরপেক্ষ হইয়া প্রবৃত্তিযোগে কেহ কৃতার্থ হইতে চাহেন, তিনি কল্পনার রাজ্যে ছায়াকে বস্তু বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক আত্মবঞ্চনা করিবেন, অল্পদিনের মধ্যে সংসারে বদ্ধ হইয়া পড়িবেন। কেশব-হৃদয়ে উভয় যোগের মিলন হইয়াছে, সংসারমধ্যে স্বর্গের পরিবার স্থাপিত হইয়াছে, সংসার নববৃন্দাবনে পরিণত হইয়াছে। এ দৃশ্য আর কখন প্রকাশ পায় নাই। যদি পরিবারে জনসমাজে এই মনোহর দৃশ্য প্রত্যক্ষকরিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে অত্যাশ্রমী হইয়া সকলে নবীন আশ্রমধর্ম্ম জীবনে পালন করুন। পালন করুন কেন বলিতেছি, স্বয়ং ঈশ্বরপ্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া এই দৃশ্য নিরন্তর জীবনে ও সংসারে দেখুন ও সম্ভোগ করুন।

কলিকাতা, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"
কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও নববিধান প্রচারকার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

কেশবচন্দ্র অপহারক।

কেশবচন্দ্র অপহারক।*

অদ্য কেশবচন্দ্রের জন্মদিন। তিনি কি ছিলেন তাহারই আলোচনা করা অদ্যকার দিনের উপযুক্ত কার্য্য। অনেক দিন পূর্ব্বে আর একটি বলিবার বিষয় মনে উদিত হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম এবার জন্মোৎসবে সেই বিষয়টি বিবৃত করিব। কিন্তু ইহার মধ্যে অল্প দিন হইল "কেশবচন্দ্র অপহারক" এই বিষয়টি মনে আসিয়াছে; সুতরাং উহাই এ দিনের আলোচ্য বিষয় করা হইল। 'অপহারক' এ শব্দটির প্রতিশব্দ 'চোর'। চোর শব্দটি নিতান্ত নিন্দাসূচক। 'কেশবচন্দ্র চোর', ইহা বলিয়া আলোচ্যবিষয়টি বিন্যস্ত করিলে উহা ভদ্রগণের কর্ণের উদ্বেগকর হইবে, তাই চোর শব্দের স্থলে 'অপহারক' শব্দ ভদ্রতানুরোধে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেশবচন্দ্র স্বয়ং কিন্তু আপনাকে 'চোর' ও 'প্রতারক' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে তিনি এইরূপে আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন, "যখন পৃথিবীতে (আমার) জন্ম হইল, তখন চোরের সংখ্যা যত ছিল, তাহার এক জন বাড়িল, যত প্রতারক বাস করিতেছিল তাহার এক জন বৃদ্ধি হইল।" তাঁহার এই কথাগুলির উপরে অদ্যকার বিষয় সংস্থাপিত। তিনি যখন বলিলেন, তাঁহার আগমনে চোরের সংখ্যা বাড়িল, তখন

* কেশবচন্দ্রের ঊনষষ্টিতম জন্মোৎসবদিনোপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতাসার।

[illegible] এই যুগে, [illegible] আসিবার পূর্ব্বে এ পৃথিবীতে আরও অনেক চোর আসিয়াছিলেন। এক একটি বিধান যখন পৃথিবীতে উদিত হয়, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে এক জন প্রধান চোর আসেন, তিনি আসিয়া কতকগুলি চোর সংগ্রহ করিয়া যান, যাঁহারা পৃথিবীতে তাঁহার ব্যবসায় চালাইতে থাকেন। চোর, শঠ, ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক, প্রতারক, এ সকল নাম তাঁহারা আপনারা গ্রহণ করেন না, লোকে তাঁহাদিগকে এই নাম দিয়া থাকে। এমন ধর্ম্মপ্রচারক জগতে কেহ আসেন নাই, যিনি পৃথিবীর লোকের নিকট এই রূপ নাম না পাইয়াছেন। তাঁহারা এই নামগুলি আপনারা মুখে স্বীকার করিয়া লউন বা না লউন, তাঁহাদের ব্যবসায় যে চোরের ব্যবসায়, ইহা আর তাঁহারা কাহারও নিকটে অপ্রকাশ রাখিতে পারেন নাই। কেশবচন্দ্র স্বয়ং এই সকল নাম পৃথিবীর নিকটে লাভ করিয়া তাহা আপনি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, এবং কি ভাবে তিনি চোর ও প্রতারক, তাহা আপনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এখন জিজ্ঞাসা এই, যাঁহারা জগতের হিতকারী বন্ধু বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেন, লোকে তাঁহাদিগকে এরূপে অপদস্থ করিবার জন্য কেন যত্ন করে এবং তাঁহাদিগের বিরোধী হইয়াই বা কেন দাঁড়ায়? তাঁহারা সংস্কারকের বেশে সাধারণ লোকের নিকটে উপস্থিত হন, এবং তাহারা যে সকল পুত্তলিকা পূজা করিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে তাঁহারা তীব্র আক্রমণ করিয়া থাকেন। কেহ স্ত্রী পুত্র পরিবারের পূজা করিতেছে, কেহ ধন, কেহ মান, কেহ বিলাস বা অন্য আর কিছু পার্থিব বিষয়ের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত রহিয়াছে। এ সমুদায় যে নিতান্ত অসার, নিতান্ত অলীক, নিতান্ত

[illegible], ইহা তাঁহারা প্রতিপাদন করিয়া সেই সেই পুস্তক গুলি হইতে লোকদিগকে নিবৃত্ত করিতে যত্ন করেন। এই হেতু জনসমাজে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয়। যাহারা এই সকল পুস্তকের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত তাহারা তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে অপদস্থ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়। তাহারা জানে যে তাঁহা-দিগকে অগ্রে অপদস্থ না করিয়া তাহারা কোনরূপে তাঁহাদের উপরে অত্যাচার বা তাঁহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে না; তাই তাহারা তাঁহারা যে নিতান্ত শঠ, ধূর্ত্ত, চোর, লোকের কল্যাণ করিবার ভাণ করিয়া গূঢ়ভাবে তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত, ইহাই সপ্রমাণ করিবার জন্য যত্ন করে। কোন এক ব্যক্তি নিন্দনীয় অনিষ্টকারী ইহা সাধারণ জনকের হৃদয়ঙ্গম না হইলে, তাহারা অত্যাচারের প্রতিবাদ করিবে, তাহারা তাহাদের কুচেষ্টার অবরোধ করিবে, এজন্যই তাহাদিগকে তাঁহাদের সমুদায় কার্য্যের দোষ দর্শনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। যদি অধিক ক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাঁহারা ধ্যান করেন, সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে যোগী বলিয়া সম্মান করে। এই সকল ব্যক্তি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে যে, ইঁহারা যোগী নহেন, ইঁহারা ভণ্ড। বাহিরে ইঁহাদের যোগীর বেশ, কিন্তু অন্তরে ইঁহারা কাহার কি সর্ব্বনাশ করিবেন তাহাই চিন্তা করেন ও উপায় উদ্ভাবন করেন। পৃথিবীতে যে সকল ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, সেই সমুদায়ের প্রচার ও বিস্তারকার্য্যে নিযুক্ত লোকদিগকে এই প্রকারে নিন্দিত ও কলঙ্কিত করিতে যত্ন হইয়াছে। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আরম্ভে খ্রীষ্ট ও তাঁহার অনুবর্ত্তিত শিষ্যগণের প্রতিকূলে যে প্রাণান্তিক অত্যাচার হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। পরসময়ে যাঁহারা ধর্ম্ম প্রকাশ্য প্রচার

করেন নাই, জীবনে পালন করিতে যত্নশীল ছিলেন, তাঁ
প্রতি কি ভয়ানক অত্যাচারই না হইয়াছিল। তাঁহারা ভূ
নিম্নে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া সকলে
ধর্ম্ম সাধন করিতেন, সেখান হইতেও তাঁহাদিগকে বাহির
প্রাণ বিনাশ করা হইত; তাঁহাদের আচরিত উপাসনা বন্দন
মদ্যপান যথেচ্ছাচারাদি নাম দিয়া লোকের নিকট তাঁহা
নিন্দিত, ঘৃণিত এবং দণ্ডযোগ্য বলিয়া প্রতিপাদন করা হইত।
ভক্তবর প্রেমিক চৈতন্য, তাঁহারও নামে কুৎসা রটনা করি
লোকে ক্ষান্ত ছিল? রজনীতে তাঁহাদিগের কীর্ত্তনানন্দ মদ্য
পদের উন্মত্ততার রোল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে দুষ্টব্যক্তির
অসদুপায়ই না অবলম্বন করিত। কুচবিহারের বিবাহ উ
করিয়া চারিদিকে যখন কেশবচন্দ্রের নামে ঘোর অপবাদ
তখন তিনি ব্রহ্মমন্দিরের বেদী পরিত্যাগ করিলেন। উপ
মণ্ডলী তাঁহার এই বেদীত্যাগে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া যখন তাঁ
বেদী পুনরায় গ্রহণ করিবার জন্য নিতান্ত অনুরোধ করেন,
তিনি বেদীতে বসিয়া আপনার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা তাঁহাদি
বলিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এই প্রতিশ্রুতি অনু
ব্রহ্মমন্দিরে তিনি দুইটি উপদেশ দেন। দ্বিতীয় উপদে
তিনি আপনাকে চোর ও প্রতারক বলিয়া উপস্থিত করিতে
অবশ্য সাধারণে যে অর্থে চোর ও প্রতারক বলে সে অর্থে না
বরুদ্ধাচারিগণের প্রদত্ত নামের উহা রূপান্তর ও ভাবান্তর।

কেশবচন্দ্রের আগমনের পূর্ব্বে যাঁহারা আসিয়াছি
তাঁহারা কি প্রণালীতে চৌর্য্যব্যবসায় চালাইয়াছিলেন তা
আলোচনা ভিন্ন কেশবচন্দ্রকে আমরা জানিতে পারিব না

থাকের সম্ভাবনা নাই। এজন্য তৎপূর্ব্বের কয়েক জন প্রধান মনোহারকের মনোহরণপ্রণালীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। সর্ব্বপ্রথমে ভারতের ঋষিগণ। যাহারা সংসারসুখে মত্ত হইয়া রহিয়াছে, ধনযৌবনরূপাদি যাহাদিগের চিত্ত হরণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের চিত্ত হরণ করিতে না পারিলে কখন তাহাদিগকে সংসার হইতে নিবৃত্ত, ভগবানেতে অনুরক্ত করিতে পারা যায় না। এই সকল লোকের চিত্ত হরণ করিবার জন্য ঋষিগণ কি উপায় অবলম্বন করিলেন? এই জগৎ সংসার যে কিছুই নয়, মায়িক, ক্ষণিক, নিতান্ত অসার, ঋষিগণ সর্ব্বপ্রথমে ইহাই প্রতিপাদন করিতে যত্ন করিলেন। তাঁহারা লোকসকলকে বলিলেন, এই যে ধন জন ভোগ বিলাসাদিতে সুখ অনুভব করিতেছ, এ সুখ নয় দুঃখ। এ সকল পরিণামে তোমাদিগকে দুঃখের সাগরে ভাসাইবে। ইহা-দিগের উপরে তোমরা কখন বিশ্বাস স্থাপন করিও না। সংসারীরা বলিতে লাগিল, এই সকল ঋষিগণ ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক। স্ত্রী পুত্র পরিবার, ধন জন যৌবন, পান ভোজন আমোদ, ইহারা আমাদিগকে প্রতিদিন সুখ দিতেছে। ইহারা আছে বলিয়াই সংসার আমাদিগের নিকট সুখের আলয়। যে সুখ নিত্য প্রত্যক্ষ তাহাকেই কি না ইহারা বলিতেছে মিথ্যা! যে সংসারকে শত প্রকার যত্ন করিলেও উড়া-ইয়া দেওয়া যায় না, সেই সংসারকে মায়িক, ক্ষণিক, কিছুই নয় বলা ইহা কি বঞ্চনাজাল বিস্তার করা নয়? যদি এ সকল মায়িক, ক্ষণিক, মিথ্যা, দুঃখদই হয়, তবে ইহারা নিয়ত সংসার করিতেছে কেন? ঋষিদেরও তো ঋষিপত্নী আছে, ঋষিকন্যা, ঋষিতনয় আছে? ইহারাও তো দিবারজনী ধ্যাননিমগ্ন হইয়া থাকে না, ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব করিয়া অন্নের গ্রাস হইতে বিরত হয় নাই। যৌবনে যাহা

ইহারা লোকদিগের মত অন্যকে [illegible] তাহাই উপদেশ করিয়াছে। [illegible] ইহাদের মধ্যে ইহাদের সর্ব্বতা দুর্জ্ঞেয়া বলনা আছে। ইহারা নগর পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে পর্ব্বতে নদীতীরে সুরম্য স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করে। সুখাদ্যফল সুস্বাদু নির্ম্মলবারি ইহারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ করে। ইহারা আপনারা কোন পরিশ্রম করে না; সংসারিগণের পরিশ্রমের ফলভোগী হইবার জন্য এই বঞ্চনাজাল ইহারা বিস্তার করিয়াছে। বৃথা বাগ্জাল বিস্তার করিয়া অচতুর নরনারীগণের মন হরণ পূর্ব্বক ইহারা স্বার্থ সাধন করিবে এজন্য ইহাদের সাধন ধ্যানাদি অবলম্বন। অপর সকলকে ভোগ পরিত্যাগ করাইয়া আপনাদের ভোগের উপায় বৃদ্ধি করিয়া লইবে ইহাই ইহাদের ঈদৃশ উপদেশের উদ্দেশ্য।

সংসার মায়িক, ক্ষণিক, অসার, পরিণামে দুঃখদ, এই বলিয়া ঋষিরা যে বঞ্চনাজাল বিস্তার করিলেন, সে বঞ্চনাজাল হইতে লোকে বৃথা আপনাদিগকে মুক্ত রাখিবার জন্য যত্ন করিল। ইহারা যে প্রতারণা মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, সে মন্ত্রের প্রভাব শীঘ্রই লোকে দেখিতে পাইল। জরা মৃত্যু ব্যাধি বিপদ্ পরীক্ষা আসিয়া যখন নরনারীকে ঘেরিল; তখন তাহারা সেই বঞ্চকদিগকে আর বঞ্চক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিল না। এক জন বিপুল ধনাদির অভিমানে স্ফীত হইয়া বলিতেছিল, ‘এই সকল প্রবঞ্চক ধূর্ত্তগণকে কেন লোকে ঋষি বলিয়া সমাদর করে; ইহারা যে দিবারজনী কেবল ধনাদির দোষ কীর্ত্তন করে। ইহাদের ধন ধান্য নাই; তাই ইহারা [illegible] চিত্তে উহাদিগকে তুচ্ছ বলিয়া নিশ্চিত করিতে চায়; অপ- রন্তু ঐ সকল হইতে বীতরাগ করিয়া আপনারা তাহাদের বিত্তবিত্ত [illegible] সম্মানভাজন হইবার ইহাদের আকাঙ্ক্ষা।’ এই অহঙ্কারী লোক

অদৃষ্টের ফেরে কোথা হইতে বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হইল, মুহূর্ত্তের মধ্যে ধন জন সম্পদ্ উড়িয়া গেল। যে লোক সুখের অধিকারী ছিল, দাসদাসীতে পরিবেষ্টিত ছিল, সুরম্য হর্ম্ম্যে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিত, পান ভোজন নৃত্যগীতের আমোদে গৃহ সর্ব্বদা পূর্ণ ছিল, আজ সে পথের ভিকারী হইল, একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত, ভূমিতল তাহার শয্যা হইল। লোকে ইহা দেখিল, দেখিয়া তাহাদের চক্ষু ফুটিল। সবাই বলিতে লাগিল, ঋষিগণ মিথ্যা প্রবঞ্চনাজাল বিস্তার করেন নাই, তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য হইল। এত ধন এত সম্পত্তি ইহার, কৈ কিছুই রহিল না। কে যেন আসিয়া যাদুঘারা মুহূর্ত্তের মধ্যে সকল উড়াইয়া লইয়া গেল। লোকেরা এইরূপ বলিতেছে, বলিতে বলিতে প্রতিবেশীর গৃহে মৃত্যু প্রবেশ করিল; তাহার একমাত্র প্রিয় পুত্রকে মৃত্যু হরণ করিল; সমুদয় হাহাকারধ্বনিতে পূর্ণ হইল। যাহারা সে আর্ত্তনাদ শুনিল, তাহাদের হৃদয় বিকল হইল, সংসার মায়িক, ক্ষণিক, অসার, পরিণামে দুঃখদ, এ মন্ত্রের বল তাহাদিগের জীবনে প্রকাশ পাইল। ঋষিগণের প্রবঞ্চনাজাল বিস্তার করিবার সুসময় উপস্থিত। যাহারা তাঁহাদিগকে বঞ্চক ধূর্ত্ত শঠ বলিয়াছিল, তাহারা তাঁহাদের জালে জড়াইয়া পড়িল। তাহাদের চিত্ত সংসারের প্রতি বীতরাগ হইল। তাহারা সন্ন্যাসী উদাসীন হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিল; পর্ব্বত অরণ্য গিরিগুহা আশ্রয় করিল। নির্জ্জনে ধ্যানচিন্তা-দ্বারা সংসারের মায়ামোহ হইতে আপনাদিগকে বিযুক্ত করিবার জন্য তাহারা যত্নপরায়ণ হইল। এইরূপে শত শত লোক ঋষিগণের পথ আশ্রয় করিল, তাঁহারা যে জন্য বঞ্চনাজাল বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা সফল হইল। তাঁহারা লোকের চিত্ত চুরি করিবার জন্য যে

তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন, এবং ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রথমে তিনি ইহার কারণ বলিতে কিছুতেই প্রবৃত্ত হইলেন না। পরিশেষে পুনঃ পুনঃ বিজেতার অনুরোধ অতিক্রম করিতে না পারিয়া বলিলেন, "আমার অগণ্য দাস দাসী পরিচারক পরিচারিকা ছিল, প্রতিদিন দশ উষ্ট্রে আমার আহার্য্য সামগ্রী বহন করিয়া আনিত। আজ আমি অশ্বশালার বন্দী, নীচ অশ্ব-রক্ষকের অনুগ্রহপ্রার্থী। আমার আহার্য্য এক ক্ষুদ্র পাত্রে স্থাপিত, এবং দশ উষ্ট্রের স্থলে দুইটি শৃগাল আসিয়া অনায়াসে তাহা তুলিয়া লইয়া গেল। সংসারের এই আশ্চর্য্য বিপরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। অসারের অসার সকলই অসার, এ উপদেশ আজ যেমন চিত্তে মুদ্রিত হইল, এমন আর কোন দিন হয় নাই।" বিজিতের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া বিজেতার চৈতন্যোদয় হইল, আপনার ভবিষ্যৎ অবস্থা কি হইতে পারে, ভাবিলেন এবং বিজিতকে স্বীয় রাজ্যে পুনঃস্থাপন করিয়া তিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

ঋষিগণ সংসারে ছিলেন, ঋষিপত্নী, ঋষিকন্যা এবং ঋষি-সন্তানে তপোবন ভূষিত ছিল, কিন্তু তাঁহারা শ্মশানবাসী ছিলেন, কেননা মৃত্যুকে তাঁহারা নিয়ত সম্মুখে রাখিতেন। নরনারী সর্ব্বদা মৃত্যুমুখে স্থিতি করিতেছে, এ বোধ তাঁহাদিগের নিয়ত জাগ্রৎ ছিল। যাঁহারা মৃত্যু সম্মুখে রাখিয়া সংসার করেন, তাঁহাদিগের মনের অবস্থা কিরূপ হয়, অশোক বীতশোকের আখ্যায়িকায় তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পায়। এখানে উপস্থিত অনেকেই সে আখ্যায়িকা অবগত আছেন, তাহার বিস্তৃত বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। অশোকের ভ্রাতার হস্তে সিংহাসন হইবে, এই কথা মনে

সত্ত্বেও থাকাতে রাজ্যপাট নৃত্যগীত সর্ব্ববিধ সুখদ সামগ্রী
তেই বীতশোকের চিত্তের সুখ উৎপন্ন হয় নাই, ভয় দুঃখে সর্ব্ব
তাঁহার চিত্ত অবসন্ন ছিল। মৃত্যু সম্মুখে রাখিয়া সংসার ক
এইরূপই বটে। ঋষিগণের সংসারিত্ব এইরূপ ছিল, সাধারণ লো
তাহা কি প্রকারে বুঝিবে? না বুঝিয়া তাহারা তাঁহাদি
বঞ্চক শঠ মনে করিয়াছিল বটে, কিন্তু অল্প দিন মধ্যে তা
বুঝিল, তাঁহারা বঞ্চনা করেন নাই, তাহারা যাহা সুখ ব
আলিঙ্গন করিয়াছিল বস্তুতই উহা দুঃখের আকর। যদি সং
দুঃখের আকর হইল, ক্ষণিক, অস্থায়ী, অসার হইল, তাহা হই
সুখ কোথায়, স্থিরতা লাভ হয় কোথায়, ইহাতো নির্ণীত হ
প্রয়োজন। ঋষিগণ নিত্যস্থায়ী সুখলাভের জন্য কোন্ পথ
লক্ষ্য করিলেন? ক্ষণিক, মায়িক, অসার, দুঃখদ বলিয়া সমু
উড়াইয়া দিলে চলে না, তাহার স্থলে নিত্য, সত্য, সার, সুখদ
স্থাপন করা আবশ্যক। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে সমুদায় পদা
অন্তরালে যে সার বস্তু (Essence) আছে, তাহারই অন্বে
প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা দৃশ্যপদার্থ সমুদায়কে একেবারে উড়া
দিলেন না। উহাদের অসার ভাগকে অসারের মধ্যে নি
করিয়া সার সত্য যাহা কিছু তাহাই বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিলে
তাঁহারা চন্দ্র সূর্য্যাদি সমুদায় পদার্থকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তো
কি নিত্যকাল আমাদের সঙ্গে থাকিবে? তাহারা উত্তর দি
আমরা নিত্যকাল থাকিব না। তাহারা সকলেই আপনাদের অ
নশ্বরতা স্বীকার করিল। তাঁহারা যোগবলে সমুদায় অসার অন
উড়াইয়া দিয়া তাহার মূলে যে সার সত্য আছে তাহা প্রত্যক্ষ
করেন। রাসায়নিক প্রণালীতে পদার্থসমূহকে তাঁহারা কেবল

মাত্রে পর্য্যবসিত করিতেন তাহা নহে, তাঁহারা চিন্তাশক্তিযোগে দেখিলেন যে, ঘট কপালে (খোপরায়) পরিণত হইল, কপালচূর্ণ করিয়া রজ হইল, সেই রজ যতই আরও সূক্ষ্ম হইতে লাগিল, চক্ষুর অদৃশ্য হইয়া গেল। এই চক্ষুর অদৃশ্য নিরাকার সামগ্রীই সৎ, সেই সৎ সত্তামাত্র, সেই সত্তাই কোনরূপে অন্তর্হিত হয় না, চিরদিন থাকিয়া যায়। "সত্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরীহম্" এই বলিয়া সেই সত্তাকেই তাঁহারা ধারণার বিষয় করিলেন। এই সত্তা আধুনিক মতে অপরিবর্ত্তনীয় শক্তি। এই সত্তা শূন্যসত্তা নহে, চিৎ সত্তা। চিৎসত্তা নানাবেশ ধারণ করিয়া অসারের মধ্যে সার হইয়া আছেন। যোগবলে তাঁহারা ভূতাদিসমুদায়কে উড়াইয়া দিয়া আত্মাতে সৎপদার্থ দেখিলেন। এই আত্মা অহম্‌রূপে গৃহীত হইলেন। সুতরাং সমুদায় উড়াইয়া দিয়া এক 'অহম্' অবশেষ থাকিল। এই 'অহম্‌ই' ব্রহ্মরূপে তাঁহাদিগের নিকটে প্রতিভাত হইল। এই প্রণালীতে তাঁহারা লোকের চিত্তহরণ করিলেন এবং তাঁহারা জগতের হিতকারী মঙ্গলকারী বলিয়া পরিচিত হইলেন।

ঋষিগণ সমুদায় বস্তু অসার অপদার্থ করিয়া উড়াইয়া দিয়া য অহম্‌কে অবশিষ্ট রাখিলেন, সে অহম্‌কে পর্য্যন্ত উড়াইয়া দওয়ার জন্য বুদ্ধদেবের আগমন হইল। এবার এক জন প্রধান রুক জন্মিলেন। রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজোচিত ভোগে ালিত পালিত হইয়া তিনি ভিকারী সন্ন্যাসী হইলেন, এ জন্য াহার বকমাজালে সহস্র সহস্র লোক সহজে পড়িল। তিনি বৈরাগী। পিতা শুদ্ধোদন কি জানি বা তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধ র পন্থা অবলম্বন করিয়া সংসার ত্যাগ করেন, এইজন্যে রাজ

যত্নে প্রচুর ভোগ বিলাসের মধ্যে তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। সতীসাধ্বী পত্নী গোপা রূপেগুণে নারীকুলের ভূষণ ছিলেন, রাহুল একমাত্র শিশু সন্তান, রাজ্য পাট ধন সম্পদ্ অতি প্রভূত, এ সকল কিছুই তাঁহাকে সংসারে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি জরামৃত্যুব্যাধির নিদর্শন দেখিয়া সে সকল হইতে আপনি উদ্ধার হইবেন, জীবদিগকে উদ্ধার করিবেন, এই প্রতিজ্ঞায় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নানা স্থানে ভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে গয়াধামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে ছয় বৎসর কাল কঠোর তপস্যা দ্বারা আপনার দেহ অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট করিলেন; অথচ যে বোধিলাভের জন্য এত কৃচ্ছ্রসাধন তৎসম্বন্ধে কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইলেন না। অনন্তর অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধন নয়, কৃচ্ছ্রসাধনরাহিত্যও নয়, এই মধ্য পথ অবলম্বন করিয়া এই প্রতিজ্ঞায় আসনে উপবেশন করিলেন,

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ং প্রযাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

"এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হউক, ত্বক্, অস্থি, মাংস বিনষ্ট হইয়া যাউক, বহুকল্পদুর্লভ বোধি (জ্ঞানবস্তু) না পাইয়া এই আসন হইতে আমার দেহ বিচলিত হইবে না।" কি প্রতিজ্ঞার বল! বোধি লাভ না করিয়া আর তিনি আসন হইতে উঠিলেন না। বোধি লাভ করিয়া কি হইল? এক অনন্ত জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু তাঁহার নিকটে থাকিল না। সৃষ্টি কিছুই নয়, মায়ার রঙ্গভূমি, অনন্ত জ্ঞানের সহিত সৃষ্টির কোন সম্বন্ধ নাই। যে অহংকে ঋষিগণ এত যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন, যে অহমেতে অনন্ত ও ক্ষুদ্র

ছিল, হঠাৎ সে বড় মানুষ হইল, হঠাৎ তাহার মৃত্যু হইল; সুতরাং সকলের মনে "এই আছে, এই নাই" যাদু মন্ত্র লাগিয়া গেল। দলে দলে লোক সংসার ছাড়িয়া শাক্যের অনুসরণ করিল। তিনি যদি সম্পর্কীণ লোকদিগকে ফকীর সন্ন্যাসী না করিতেন, বুঝিতে পারা যাইত যে, তিনি কেবল পরের সর্ব্বনাশ করিতেই প্রবৃত্ত। কিন্তু শাক্য বংশের রাজ্যের উত্তরাধিকারিগণকে যখনই তিনি মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসী করিলেন, তখনই এ চোর যে চোরের শিরোমণি সিদ্ধান্ত হইল। রাজ্য পাট ধন ঐশ্বর্য্য, দৃষ্ট স্পষ্ট কত ভোগ বিলাস এ গুলি ছাড়াইয়া চক্ষে দেখা যায় না, কর্ণে শুনা যায় না, হস্তে ধৃত হয় না, এমন শান্তির কথা কহিয়া লোককে বঞ্চিত করা, ইহা কি সামান্য বঞ্চনা! ভাইদিগকেই না হয় বঞ্চিত করিলেন, শাক্য বংশের উত্তরাধিকারিত্বসম্বন্ধে কণ্টকশূন্য করিলেন। একমাত্র অবশিষ্ট উত্তরাধিকারী নিজ পুত্র রাহুল দ্বাদশ বর্ষীয় শিশু, সে আসিল তাঁহার নিকটে রাজ্যাংশ লাভ করিবার জন্য। তাহার মাথা মুড়াইয়া কেন তিনি সন্ন্যাসী করিলেন? আমি ত্রিরত্ন লাভ করিয়াছি, আমার বিস্তৃত রাজ্যের ইহাকে উত্তরাধিকারী করিব, এইরূপ বঞ্চনার কথায় তাহাকে কেন তিনি পৃথিবীর সমৃদ্ধরাজ্য হইতে বঞ্চিত করিলেন? আমরাতো নববিধানের প্রেরিত প্রচারক, আমাদের ব্রতওতো বৈরাগ্যব্রত; আমরা ত্যাগী, লোকের নিকট এরূপ দান করিতেওতো আমরা ছাড়ি না। কৈ আমরা কি ইচ্ছা করি যে, আমাদের সন্তান সন্ততি সংসারের পথ ছাড়িয়া দিয়া সন্ন্যাসী ফকীর হয়? বরং যাহাতে তাহা না হয় তাহারই জন্য উপায় করিয়া দি। যে ব্যক্তি অদৃশ্য সামগ্রীর লোভ দেখাইয়া দৃশ্য সংসারকে এক যাদুমন্ত্রে উড়াইতে চাহে,

সে ধূর্ত্ত, শঠ, চোর, প্রতারকের অগ্রগণ্য, ইহা আর কে না মানিবে ?

আজ প্রায় দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে যুডিয়াদেশে আর এক জন চোরের জন্ম হয়, ইনি মহাধূর্ত্ত, চতুরের চতুর, চতুরের শিরোমণি। কেন এ কথা বলিতেছি ? শাক্য রাজ্য ত্যাগ করিলেন, পুত্রের মাথা মুড়াইলেন, কিন্তু শরীর—অবিদ্যাকৃত হইলেও—ভিক্ষান্নে রক্ষা করিলেন। যে দেহের প্রতি যোগী সাধক ভক্ত সকলেরই মমতা, সে দেহ দিয়া যিনি লোকের মন হরণ করিতে পারেন, তাঁহার মত ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক, শঠ চোর আর কে আছে ? আমরা কর্ত্তব্যের ভাণ করিয়া আমাদের দেহের প্রতি কত যত্ন করি, সুখাদ্য সামগ্রীতে যাহাতে ইহার পুষ্টি হয় তাহার উপায় করি, আর এই লোকটি সেই দেহসম্বন্ধে "ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক" এই যাদুমন্ত্র জগৎকে ভুলাইবার জন্য উচ্চারণ করিয়া ক্রুশোপরি বিদ্ধ হইলেন। এ চতুরের বঞ্চনাজাল কাটিবে কাহার সাধ্য ? ইঁহার বাড়ী ঘর আত্মীয় স্বজন ছিল না তাহা নয়, কিন্তু সে সকল ছাড়িয়া আপনাকে পথের ভিকারী করিলেন, আর লোককে বলিতে লাগিলেন 'পাখিসকলের কুলায় আছে, শৃগালসকলের গর্ত্ত আছে, কিন্তু মনুষ্যসন্তানের মাথা রাখিবার স্থান নাই।' এ সকলই চাতুরীর কথা। যে চোর যখন আসিয়াছেন, জগৎকে ভুলাইবার জন্য কোন না কোন আকারে তাঁহারা এরূপ বলিয়াছেন, এবং আচারেও তাহার সত্যতা দেখাইয়াছেন। পৃথিবীর নিকট এ চতুরতা পুরাতন হইয়া গিয়াছে, তাই ইঁহার বুদ্ধি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ; [illegible]

কি হইল? না, আমাদের পরিত্রাণের জন্য আত্মদেহ ক্রুশে বিদ্ধ হইতে দিলেন। আহা কি প্রেম!! এই বলিয়া নরনারী মাতিল, সকলেই তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে লাগিল, বঞ্চনাজাল পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে ছড়াইয়া পড়িল। যে জালে সপ্তমবর্ষীয় শিশু পর্য্যন্ত ধরা পড়ে, সে জাল কি সামান্য জাল? এ লোকটি সামান্য ধূর্ত্ত নন। ইনি মারে মন এমন কঠিন করিয়া দিতে পারেন যে, সম্মুখে সন্তান অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, কি জানি বা ঈশাকে অস্বীকার করে এই ভয়ে মা বলিতেছেন, 'বৎস ভয় নাই, প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।' শিশু হাসিতে হাসিতে অগ্নিতে দগ্ধ হইল। ঈশা ক্রুশে প্রাণ দিলেন, সে আর কত যাতনা। ইহাঁর প্রতারণায় যাঁহারা প্রতারিত হইলেন, তাঁহাদের প্রাণ বিনাশের প্রণালী পড়িলে কাহার না হৃদয়ের শোণিত শুকাইয়া যায়? সমুদায় শরীরে মধু মাখাইয়া সূক্ষ্ম রশিতে ঊর্দ্ধে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এ দিকে ভীষণ ভিমরুল দংশন করিতেছে, একটু আছাড় পিছাড় করিলেই নিম্নে প্রস্তরোপরি পড়িয়া শরীর চূর্ণ হইবে, এ কি সামান্য যাতনা! সমুদায় শরীর ধূনা দিয়া মাখাইয়া পদাঙ্গুলিতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শরীর আস্তে আস্তে পুড়িতেছে, আর তাহার আলোকে শত্রুগণ পানভোজন করিতেছে, অট্ট অট্ট হাসিতেছে। এ সকল অত্যাচারের কথা শুনিয়া কি আর একালে ঈশার বঞ্চনাজালে পড়িতে কাহার বাসনা হয়? ঈশা ক্রুশে প্রাণ দিয়া বলিলেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক"; আর অমনি সকল লোকের মুখে "ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক" এই ধ্বনি উঠিল। বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, ধনী দরিদ্র, মূর্খ জ্ঞানী, সকলে একেবারে মাতিয়া উঠিল যে ব্যক্তি এমন করিয়া লোকদিগকে ক্ষেপাইয়া তুলিতে পারেন,

শরীরের মায়া পর্য্যন্ত ছাড়াইতে পারেন, তিনি যদি ধূর্ত্ত শঠ প্রবঞ্চক প্রতারক চোরের শিরোমণি না হইবেন, তবে আর কে হইবে?

এবার বিদেশ হইতে স্বদেশে আসা যাউক। এ দেশে চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে নবদ্বীপে এক জন চোর জন্মিলেন, তাঁহার নাম শ্রীচৈতন্য। এ চোরের চুরীর প্রণালী আশ্চর্য্য! হরি হরি বলিয়া নাচিতে লাগিলেন, কাঁদিতে লাগিলেন, হাসিতে লাগিলেন, আর চারিদিকের লোকগুলি ক্ষেপিয়া উঠিল। অবশ্য লোকগুলি মূর্খ, তাহারা জানে না যে এ সমুদায়ই বায়ুবিকার! যদিও বা জানিত, এ মায়াবীর হাত এড়ান কিছুতেই সহজ নয়। অমন ষড়্দর্শন-বেত্তা কঠোর জ্ঞানী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, তাঁহাকে একটা শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া ইনি ভুলাইলেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের স্বামী বাদশাহ উজীর রূপ সনাতন, তাঁহাদিগকে ফকির করিয়া ইনি বাহির করিয়া আনিলেন। সনাতন ঘোর সংসারী ছিলেন, ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া আপনার অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সে লোকটাকে বাদশাহও কারাগারে বদ্ধ করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। কি আশ্চর্য্য! ইহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও ইঁহার আশা মিটিল না। দীন দরিদ্র ফকীর হইয়া একখানি ভোটকম্বলমাত্র গায়ে ছিল, তাহাও শ্রীচৈতন্যের দৃষ্টিপথে পড়িল। সনাতন বুদ্ধিমান্ বাদশাহ উজির, বুঝিলেন প্রভুর ইহাতে মন উঠিতেছে না, অমনি যমুনাতীরে এক জন বৈষ্ণবকে ভোটকম্বলখানি দিয়া তাহার ছিন্নকন্থা গায়ে দিয়া শ্রীচৈতন্যের নিকটে আসিলেন, আর তাঁহার মুখে হাসি ধরে না। রঘুনাথ দাস ধনী জমীদারের সন্তান, সুন্দরী রূপবতী পত্নী, ঘরে রাখিবার জন্য পিতা মাতার কত যত্ন, ভোগ বিলাসের প্রচুর সামগ্রী দ্বারা নিয়ত বেষ্টিত, শ্রীচৈতন্য তাঁহার মন চুরী করিলেন,

আর সে ব্যক্তি ঘরের বাহির হইয়া পড়িল, উ[illegible] ইন্দ্রিয় পানভোজন পরিত্যাগ করিয়া ভূতলশায়ী [illegible] অযোগ্য হইল। যত দিন পর্য্যন্ত তাঁহার সম্পূর্ণ সর্ব্বনাশ করিতে না পারিলেন, তত দিন ইঁহার মনঃপূর্ত্তি হয় নাই। যে দিন শুনিলেন যে, রঘুনাথ এখন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা ছাড়িয়া দিয়া তেলেঙ্গা যাত্রীগণের মুখভ্রষ্ট জগন্নাথের পচা প্রসাদান্ন গ্রহণপূর্ব্বক তাহাই ধৌত করিয়া ভোজন করেন, তখন আর ইঁহার আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। একেবারে তাঁহাকে জন্মের মত পাগল করিয়া দেওয়ার অভিপ্রায়ে তাঁহার সেই পর্য্যুষিত অন্ন হইতে একমুষ্টি অন্ন তুলিয়া এই বলিয়া ভোজন করিলেন, 'এমন উপাদেয় সামগ্রী তুমি নিত্য ভোজন কর, অথচ আমাকে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছ!' বলুন, সরল লোকদিগের মন চুরী করিবার জন্য চৈতন্য যেমন কৌশল জানিতেন এমন আর কে জানে? যাহার মন যেরূপে চুরী হইয়া যাইবে, এই সকল চতুর চোর বিলক্ষণ জানেন, তাই কাহারও ইঁহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। শ্রীচৈতন্য শেষটা বায়ুবিকারে প্রাণ হারাইলেন, লোকে বলিল প্রবল ভগবৎপ্রেমের আঘাতে ইনি প্রাণ সমর্পণ করিলেন। এ সকল ব্যক্তির জন্ম, জীবন, মৃত্যু এক একটি প্রকাণ্ড প্রবঞ্চনাজাল। সুচতুর নিপুণ ব্যক্তিরাও এ জাল অতিক্রম করিবেন, তাহার সম্ভাবনা কোথায়?

গৃহস্থেরা সাবধান! এবার আর এক জন বিষম চোর আসিয়াছেন। আজ তাঁহার জন্মদিন। ইনি তোমাদের সর্ব্বনাশ করিবেন। ইঁহার জালে পড়িলে আর সে জাল কাটিয়া চলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নাই, এ বিষয়ের সাক্ষী আমরা নিজে। আমরা যে

কোথায় ছিলাম, কোন দিন তাঁহার সহিত সম্বন্ধ বা পরিচয় ছিল না। অতি সামান্য সূত্র অবলম্বন করিয়া আমাদের প্রাণে তিনি প্রবেশ করিলেন, আর সেই যে মন চুরী করিলেন, আজ পর্য্যন্ত এত গণ্ডগোল হইল, অথচ সে মন ফিরিয়া পাওয়া গেল না। এই চোরের হাতে পড়িয়া ঘর গেল, বাড়ী গেল, জাতি গেল, কুটুম্ব গেল, আত্মীয় গেল, স্বজন গেল, এখন পরকে লইয়া পরের গৃহে নিয়ত একত্র বাস। এক এক চোর এক এক প্রণালী অবলম্বন করিয়া চুরী করিয়াছেন, পুরাতন প্রণালী অবলম্বন করিয়া চুরীর কার্য্য চালান না; কেন না পুরাতন রীতি শীঘ্র ধরা পড়ে। সুতরাং নূতন চুরীর পথ চাই। 'এই আছে, এই নাই' মন্ত্রে শাক্য জনসাধারণের প্রাণ হরণ করিলেন, ঈশা 'পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক' মন্ত্রে চুরী কার্য্যে সফলমনোরথ হইলেন, চৈতন্য হরি নামে, হাসিয়া কাঁদিয়া নাচিয়া জগৎকে আপনার সাথে জড়াইলেন, এ সকল মন্ত্র এখন পুরাতন হইয়াছে। অন্য একটি নূতন মন্ত্রের সঙ্গে এগুলি চলিতে পারে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্ত্র কার্য্যকর হওয়া এখন কঠিন। কেশব এমন একটা চুরীর উপায় বাহির করিলেন, যাহার মধ্যে হিন্দুভাব, বৌদ্ধভাব, খ্রীষ্ট ভাব, সকল ভাবের সমাবেশ হয়। যে লোকের যে ভাব প্রধান, তিনি সেই ভাবের দিক্ দিয়া তাহার সর্ব্বস্ব চুরী করিতে লাগিলেন। যদিও তিনি এইরূপে চুরীর কার্য্যে অনেকটা কৃতার্থ হইলেন, তবু নূতন চুরীর মন্ত্র এমন সহজ হওয়া চাই যাহা শুনিলেই সকল লোকের মনে লাগে। তিনি বলিলেন, "আমার ভিতরে এক জন আমার সঙ্গে কথা কন। আমি যাহা করি, সকলই তাঁহার কথা শুনিয়া করি। লোকে ভয় করে, এ বুঝি তবে ভূতের কথা, কিন্তু আমার কোন দিন ভূতের কথা বলিয়া ভ্রম হয় নাই।

জীবাত্মা পরমাত্মা দুই পাখী, এক বৃক্ষে বাস করেন। জীবাত্মা পরমাত্মার কথা শুনিতে পান, ইহা কখন ভূতের কথা নয়। তোমরা যাহাকে 'বিবেক' বল, মনের বৃত্তি বল, আমি তাঁহাকে ঈশ্বর বলি। তোমাদের সকলের ভিতরে থাকিয়াই বিবেক কথা কন। যত তোমরা ইঁহার কথা শুনিয়া চলিবে, তত তোমাদিগকে কেবল তিনি নিষেধ করিবেন না, কি করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিবেন।" বিবেক ঈশ্বর, বিবেকের কথা ঈশ্বরের কথা, ঈশ্বরের কথা শুনিয়া সকলকে চলিতে হইবে, এই শ্রবণব্যাপারকে তিনি সর্ব্বপ্রথম মাহমন্ত্র করিলেন। সঙ্গতের সময়ে এই মন্ত্রে তিনি কত যুবাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন, জালে জড়িত করিলেন। দিবারজনী তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে থাকিতে ভাল বাসিতেন, তিনিও তাঁহাদিগের সঙ্গ ভিন্ন আর কোন সঙ্গ জানিতেন না। তাঁহার দৃষ্টির যেন একটী মুগ্ধকরত্ব-শক্তি ছিল। যে সে দৃষ্টিতে পড়িল আর তাহার ছাড়াইয়া যাওয়ার সাধ্য ছিল না। সঙ্গতের নীতির প্রাবল্যসময়ে বিবেকমন্ত্র বিলক্ষণ আধিপত্য বিস্তার করিল, এবং কতক গুলি লোককে ভিকারী সন্ন্যাসী করিয়া তুলিল। 'ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ' এই এক খানি জালে তিনি সন্তুষ্ট রহিলেন না; 'ঈশ্বরের মুখদর্শন' আর এক খানি জাল তিনি বিস্তার করিলেন। ঈশ্বরের মুখ দর্শনের সুখে তিনি আপনি প্রমত্ত হইলেন, এবং অপরকেও তদ্দ্বারা মত্ত করিয়া বেড়াজালে ঘেরিলেন। তিনি আপনি এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "এই দর্শনের আনন্দে এই দর্শনের সুখে জগ-তের লোককে ডাকিয়া আনিয়া মত্ত করিতে হইবে, সুখী করিতে হইবে। এই আনন্দ এবং মত্ততার মধ্যে সকল কাজ করিয়া লওয়া যায়। পাঁচ জন ভাইকে বলিলাম তোমরা সকলে মিলিয়া দর্শনজন্য

আপন কর। স্বার্থপর হইয়া দুর্বলমনা এবং রিপুর বশীভূত হইয়া, কেহ সে কথা শুনিল না, শাস্ত্র জন সকল বিফল হইল। কথা বলিয়া কিছু হইল না, আস্তে আস্তে নিগূঢ়ভাবে ৫ জন, ৫ জন, ১০ জন, ২০ জনকে অধিকার করা গেল। বিনামে অধিকার হইল। ঈশ্বরের দর্শন, শ্রবণ, প্রেম, মিষ্ট সম্ভাষণ, এইরূপ একটি প্রকাণ্ড জাল বিস্তৃত হইল। যাঁহারা সংসারের রাজ্যে পথিক, তাঁহারা এক জন, দুই জন, তিন জন করিয়া ক্রমে জালে পড়িলেন। কেহ কেহ জাল কাটিয়া গেলেন বটে, কিন্তু আজও তাঁহাদের পায়ে জাল লাগা আছে। এই জালে যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহাদিগের অনেকে দূরে আছেন, এবং তাঁহারা জানিতেছেন না যে কেহ তাঁহাদিগের কিছু চুরী করিতেছে। জীবন আছে, ইহাতে যেমন নিশ্চিত বিশ্বাস, এক জনের হস্তে এখনো সকলে আছেন, ইহাও তেমনি নিশ্চিত বিশ্বাস। এটি অভ্রান্ত মত যে কেহ ছাড়িয়া যাইতে পারে না। এক জন লোক চুরী করিতেছে ইহা প্রকাশ হউক বা না হউক, সকলের উপরে চুরী চলিতেছে, এ বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সুখ আছে। প্রেম লোকের মন চুরী করিতেছে। তাহারা ধরা পড়িয়াছে, নিশ্চয় ঈশ্বরবিষয়ে ভিতরে ভিতরে কত মত গ্রহণ করিতেছে, জীবনের ভাব তাহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে।” দেখ কেশবচন্দ্র কি বিষম চোর! যখন যে উপায় খাটে, সেই উপায়ে তিনি আপনার চুরীর ব্যবস্থা চালাইতে লাগিলেন। সঙ্গতের সময়ে নীতির জাল বিস্তার করিলেন, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের কথা শুনা যায়, এই বলিয়া অনেকগুলি যুবকের মাথা খাইলেন, তাহার পর ঈশ্বর দর্শনের সুখের কথা তুলিয়া জালের উপর জালে তাঁহাদিগকে জড়াইয়া

খেলিলেন। কতকগুলি প্রচারক অর্থাৎ প্রতারক এইরূপে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে জুটিল, ব্যবসায় যাহাতে খুব বিস্তৃত হয় তাহার উপায় হইল। একই উপায়ে চুরী করা কেশবচন্দ্রের রীতি ছিল না, তাই সঙ্গতের সময়ের অবসানে মুঙ্গেরে ভক্তির তরঙ্গ তুলিলেন। এই তরঙ্গে কলিকাতা ঢাকা ময়মনসিংহ প্রভৃতির বহু অচতুর লোকেরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এ সময়ে তাঁহার চুরীর বড়ই সুযোগ হইল। কিন্তু একটী কথা এখানে বলা প্রয়োজন। যখন ঈশ্বরদর্শনের কথার বাড়াবাড়ি হইল; তখন তাঁহার ব্যবসায়ের ক্ষতি হইল। এ দর্শনের জালে লোক বড় পড়িল না। মনে হয়, কেশবচন্দ্রের এখানে একটু চতুরতার খর্ব্বতা ঘটিয়াছে। কেশবচন্দ্র চুরীর ব্যবসায় দুদিনের জন্য করেন নাই। চিরকাল এই ব্যবসায় চলে তাহার উপায় করিতে তিনি তৎপর ছিলেন। আপাততঃ ব্যবসায়ে লোকসান হইলেও তিনি জানিতেন, ভবিষ্যতে ইহাতে বিলক্ষণ লাভ দাঁড়াইবে। তিনি শূন্যের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন, কবিত্বযোগে এই শূন্যকে নানাবিধ আলঙ্কারিক ভূষণে ভূষিত করিলেন। মা কাঁদিতেছেন, তাঁহার আলুলায়িত কেশ, মার আঁচল কত হিরাপান্নায় জড়িত, এইরূপ বাক্যবিন্যাস করিয়া বলিলেন, আমি বেদান্তের অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতিকে মার সাজে সাজাইয়া গৃহস্থের বাড়ীতে আনিয়াছি। যাহারা তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইলেন তাঁহারা ধরা পড়িলেন, আর যাঁহারা শূন্য আকাশ ধোঁয়া বলিয়া তাঁহার কথায় প্রতিপ্রতারিত হইলেন না; তাঁহারা তাঁহার জাল প্রকাশ্যে অতিক্রম করিলেন। কিন্তু তিনি এক অনন্ত শক্তিকে বিবিধ সাজে সাজাইলেন, এবং শক্তিতে ভক্তিতেই মুক্তি এই কথা তিনি সদর্পে ঘোষণা করিলেন। শক্তি বিনা আর

কোন বস্তু নাই, যাহা কিছু দেখিতেছি শুনিতেছি স্পর্শ করিতেছি, এ গুলি (symbolical) গণিতের সাঙ্কেতিক ক খ প্রভৃতির ন্যায় মাত্র, শক্তি ভিন্ন বাস্তবিক কোন বস্তু স্বীকার্য্য নয়, স্পেন্সার প্রভৃতি বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এই কথা তুলিয়া ভবিষ্যতে কেশবচন্দ্রের ব্যবসায়ে যে বড়ই সুফল হইবে, তাহার উপায় করিয়া দিতেছেন। সমুদায় জার্ম্মাণ পণ্ডিতেরা সপক্ষ; সুতরাং দর্শন ও বিজ্ঞান যখন তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতেছে, তখন বর্ত্তমানে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ভবিষ্যতে ঈশ্বরদর্শনজালে লোকদিগকে চিরদিনের জন্য জড়িত করিয়া ফেলিবেন, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন।

কেশবচন্দ্র দেহ ত্যাগ করিয়া পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন, এখন আর ভয় কি? এ বলিয়া কোন বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিমতী নর নারীর অনবধান হওয়া উচিত নয়। এ সকল ব্যক্তির মৃত্যু নাই, দেহান্তে ইঁহাদের ব্যবসায় আরও বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। বুদ্ধ ঈশা চৈতন্য আজ তো আর দেহে নাই, কিন্তু ইঁহাদের আধিপত্যের নিকটে সম্রাট্‌দিগের কিরীট প্রণত। ইঁহারা আজও কত লোকের মন প্রতিদিন চুরী করিতেছেন; কত অগণ্য লোক ইঁহাদের জন্য প্রাণ দিতেছেন। কেশবচন্দ্র সামান্য চতুর চোর ছিলেন না, দেহ গেলেও যে মরণ হয় না, এ কথা তিনি অগ্রেই বলিয়া গিয়াছেন। যখন সাধু অঘোর নাথ স্বর্গারোহণ করিলেন, তখন এই এক মহাপ্রতারণার মত স্থাপন করিলেন যে, সাধুর সঙ্গে আমরা সকলেই পরলোকস্থ হইয়াছি, তাঁহার সঙ্গেই আছি। কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর প্রেরিত দরবার তাঁহার সঙ্গে নিত্য জাগ্রত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য ব্রহ্মমন্দিরে বেদী শূন্য রাখিয়াছেন। কেশবচন্দ্র নিত্যসম্বন্ধের যে জাল বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই

না।......ভাইয়েরা দুঃখ দিয়া থাকেন জানি, কিন্তু তাঁহাদের ভাবনা ভাবিয়া কত আনন্দ হয়, কত সুখ পাই। অন্য লোকের কষ্টে কষ্ট, অন্য লোকের সুখে সুখ, এই আমার সুখ, এই আমার কার্য্য।” দেখ ‘আমার এ পৃথিবীতে জমীদারী নাই,’ এই কথার মধ্যে কত গভীর চাতুর্য্য রহিয়াছে। যদি জমীদারী নাই তবে জমীদারী চাই। জমীদারী না থাকিলে আপনার ক্ষমতা প্রকাশ কোথায় হইবে? যাহারা পৃথিবীর জমীদার তাহাদের ক্ষমতা দুদিনের, এবং মানুষের শরীরের উপরে, কিন্তু ইনি যে জমীদারীর আকাঙ্ক্ষী, সে জমীদারী এ পৃথিবীর জমীদারী নয় নিত্য কালের জমীদারী। মানুষের শরীর লইয়া যে জমীদারী, সে জমীদারী শরীরের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়, কিন্তু মানুষের আত্মা লইয়া যে জমীদারী, সে জমীদারী নিত্য জমীদারী, সে জমীদারীর তো কোন দিন ধ্বংস নাই। ঈশা চৈতন্য প্রভৃতি শরীরহীন হইয়াও দেখ কেমন লোকের আত্মার উপরে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতেছেন; আজও শত শত লোক তাঁহাদের জমীদারিভুক্ত থাকিয়া তাঁহাদের জন্য ধন জন দেহ প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিতেছে। কেশবচন্দ্রের লোভ সামান্য লোভ নয়। সে লোভ পৃথিবীর জমীদারীতে তুষ্ট হইবে কেন? শাক্য যে জমীদারীর প্রত্যাশায় বিপুল রাজ্য ধন পরিত্যাগ করিলেন, স্বজন আত্মীয় আত্মজকে পরিত্যাগ করাইলেন; ঈশা আপনার প্রাণ ক্রুশোপরি সমর্পণ করিলেন, চৈতন্য আপনার পুত্রবৎসলা মাতা ও প্রিয়তমা পত্নীকে বিসর্জ্জন করিয়া চিরসন্ন্যাসব্রত আশ্রয় করিলেন, সেই জমীদারীর প্রত্যাশায় কেশবচন্দ্র নবীন প্রেমব্রত গ্রহণ করিলেন। যাঁহাদের তিনি সর্ব্বনাশ করিলেন স্বজনে নির্জ্জনে ২৪ ঘণ্টা কেবল তাঁহাদিগকে লইয়াই তিনি

থাকিতেন ; তাঁহার মন সর্ব্বদা তাঁহাদের চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিত ; তাঁহাদের অবস্থা ভাবিয়া নিরন্তর আকুল থাকা তাঁহার সমস্ত জীবনের কার্য্য ছিল। যাঁহাদের জন্য তিনি দিবারাত্রি ভাবিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে যথেষ্ট ক্লেশ দিয়াছেন, এমন কি তাঁহাদের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে অকালে তাঁহার দেহ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইল, পরিশেষে সেই সকল লোকের জন্য প্রেমানলে আত্মাহুতি দান করিলেন। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে কথান্তর হইলে সমুদায় রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইত না, ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অতএব এ প্রেমের জাল অতিক্রম করা যে কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে, ইহা আর বলিতে হয় না। বিজ্ঞান বলে, যাহার জন্য যে ব্যক্তি প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়া দিন রাত ভাবে, তাহার সেই ভাবনা ইথার আন্দোলন করিয়া যে ব্যক্তির বিষয় ভাবে তাহার মস্তিষ্ক উত্তেজিত করিয়া তাহাকে চিন্তান্বিত ব্যক্তির ভাবাধীন করিয়া ফেলে। কেশব-চন্দ্র বিজ্ঞানের এ কথার প্রতি আস্থা রাখুন বা না রাখুন তিনি অধ্যাত্মবিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। এক বার প্রেমের জালে কাহাকেও জড়াইয়া ফেলিতে পারিলে, তাহার যে আর উদ্ধার নাই, তাহাকে তাঁহার মতন হইয়া যাইতে হইবে তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। শেষ সময়ে কেবল তিনি এই বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন, আমি যে ইঁহাদিগকে ভালবাসি ইহা ইঁহারা বুঝিলেন না। যদিও আমি এই বলিয়া তাঁহাকে চুপ করাইয়া দিতাম, আপনি আর কত ভাল বাসেন, ঈশ্বর এত ভাল বাসেন তাতেই তাঁকে লোকে বড় গ্রাহ্য করে, আপনি নিজের ভাল বাসার কথা কি বলিতেছেন ? যদিও এ কথায় তিনি চুপ করিয়া যাইতেন, কিন্তু অন্তরে যে প্রেমের আগুন জ্বলিতেছে, সে আগুন কি আর

এই কথায় নির্ব্বাণ হয়। তিনি এই আগুনে আপনাকে আহুতি দিয়া অকালে স্বর্গে চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার সে প্রেমের নিগড়ে আজও আমরা বান্ধা রহিয়াছি, শত শত লোক প্রতিদিন বান্ধা পড়িতেছে। এই চোরের নাম শুনিলে ভয় হয়। ইঁহার নামও করিব না প্রতিজ্ঞা উপস্থিত হয়, কিন্তু গোপনে গোপনে যে ব্যক্তি চুরী করিতেছে তাহা হইতে সাবধান হওয়া নিতান্ত দুরূহ। যাঁহারা তাঁহার ব্যবসায়ের সঙ্গী হইয়াছেন তাঁহাদের চির দিনের জন্য সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাঁহারা পালাইয়াও তাঁহা হইতে পালাইতে পারেন না। এ সম্বন্ধে তিনি আপনি কি বলিয়াছেন পাঠ করা ভাল। শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী এ সময়ে পলায়ন করিয়াছেন; এ কথা গুলি হয় তো তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা;—"প্রত্যেক ব্যক্তি যাঁহারা ঈশ্বরের প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা প্রেমের নামে ঈশ্বরের নামে এক এক জন পাঁচ শত সাত শত লোক ঈশ্বরের কাছে আনিয়া দিবেন এবং তাঁহারা চুরী করিয়া সকলকে বদ্ধ করিবেন। যাঁহারা এরূপ কার্য্যে নিযুক্ত তাঁহারা কখন পলায়ন করিতে পারেন না। বুদ্ধি বিচার যাহা বলুক, প্রাণ ইহা কখন স্বীকার করিবে না। অতএব আমি জানি সে লোক কখন শত্রু হইতে পারে না। চোরের ভাগ্যে এই জন্য সর্ব্বদা আহ্লাদ। যাহারা আপনাদিগকে শত্রু বলিবে তাহারাও মিত্র। বক্ষের রক্তের সঙ্গে যে মিলিত হইয়া আছে, সে কিরূপে ভিন্ন হইবে? আমার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি কি আমার শরীরের সঙ্গে বিবাদ করিবে? আমি আমার কখন পর হইতে পারি না। যিনি এক বার বদ্ধ হইয়া হৃদয়ের ভিতরে প্রেমের জালে বদ্ধ হইয়াছেন, তিনি বাহিরে বিদায় হইয়া গেলেও বক্ষঃস্থলে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ আছেন,

ইহাতে আর কোন সংশয়নাই। চোরের ব্যব্যসার মহৎ ব্যবস্থা। সকল পৃথিবী চলিয়া গেলেও সেই আমার ঘরের ভিতরে ভাই বন্ধুগণ সকলেই আছেন। যিনি ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন দূরে গেলেন তাঁহাকে কি ছাড়া যায়? তিনি চিরদিনের জন্য বক্ষে বদ্ধ আছেন। চুরীর শাস্ত্রে কেহ পর হইতে পারে না।" কেশবচন্দ্রের উদার প্রেম যে এইরূপে সকলকে আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। একবার যাহার উপরে তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাহার চিত্ত তিনি চিরদিনের জন্য হরণ করিয়াছেন। অনেকে ধরা পড়িয়াও তাঁহাকে অনেক প্রকারে লাঞ্ছনা করিলেন, কিন্তু লাঞ্ছনা করিয়াও চোরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশা বৃথা। একবার ধরিলে আর ছাড়াছাড়ি নাই। বহুনিপুণ চেষ্টাতেও চোরের নৈপুণ্য অতিক্রম করা অসম্ভব। তিনি যাহাদিগকে চুরি করিয়া হৃদয়ে বাঁধিয়া ফেলিলেন, তাহারা অনন্তকালের জন্য সেই হৃদয়ে বাঁধা রহিল। যাহারা ধরা পড়িয়া বিরোধ পরিহার করিয়া চোরের সঙ্গে এক হইয়া গেল, তাহারা চির জীবনের জন্য কৃতার্থ হইল।

যে সকল চোর পৃথিবীতে আসিয়া লোকের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের এত সাহস কেন? এত অহঙ্কারই বা কেন? আমাদের হাতে কাহারও রক্ষা নাই এমন কথা কি কেউ বলিতে পারে? এ সকল চোরের বুকের পাটা এত বড় কেন, তাহার কারণ আছে। ইঁহাদের সর্দ্দার কে জান? স্বয়ং হরি। তিনি আপনি লুকাইয়া থাকিয়া অনন্ত প্রেমকে নানা সাজে সাজাইয়া চুরীর ব্যবসায় চালাইতেছেন। আর্য্য ঋষি, শাক্য, ঈশা, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি সাধুগণেরা চোর হইলেন কিরূপে? সেই হরি-

চোর তাঁহাদের প্রাণ হরণ করিয়া পাগল করিয়া দিলেম, তাঁহা-দের জ্ঞান বুদ্ধি রহিল না, আর তিনি সেই এক একটাকে মুখোস্ করিয়া যাহার তাহার বাড়ীতে চুরি করিতে লাগিলেন। পাপ, ব্যভি-চার, অজ্ঞানতা, মূঢ়তা, অবিশ্বাস, নাস্তিকতা দ্বারা আপনাদিগকে বেষ্টন করিয়া অনেকে মনে করিতেছে, আর কোন চোর তাহা-দের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিবে না ? যাহারা এরূপ মনে করে তাহাদের তুল্য মূর্খ আর কে আছে ? যখন চোরের রাজ্যে বাস, তখন পলায়ন করে কাহার সাধ্য ? জরা, মৃত্যু, ব্যাধি, বিপৎ, পরীক্ষায় চারিদিকে থানা দিয়া রহিয়াছে। এক থানা হইতে পলায়ন কর, আর এক থানায় গিয়া ধরা পড়িবে। যে যাহা কিছু বড় মূল্যবান্ মনে করে, আদর করে, যত্ন করিয়া রাখিতে চায়, অমনি তাহাদের উপর চোরের দৃষ্টি পড়ে। দৃষ্টি পড়িলে আর রক্ষা নাই। তুমি ধনিই হও, আর দরিদ্রই হও, জ্ঞানীই হও, আর মূর্খই হও, সাধুই হও, বা পাপীই হও, চোরের চুরী কর্ম্ম কিছুতেই বন্ধ করিতে পারিবে না। পৃথিবীতে প্রতিঘরে প্রতিদিন চুরী চলি-তেছে, গৃহস্থ তখন তখন জানিতে পারে না যে, চুরী হইয়া গেল, কিন্তু যখন পরিশেষে দেখিতে পায় যে লুকাইয়া লুকাইয়া কে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তখন আর চোরের না হইয়া তাহার গত্যন্তর থাকে না। যে সকল ব্যক্তি সুচতুর তাঁহারা চুরী কার্য্যে বাধা দেন না। তাঁহাদের যাহা কিছু আছে সকলি তাঁহারা চোরের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত। এখানে আর চোর কি চুরী করিবেন, আপনি তাঁহাদের নিকটে চিরদিনের জন্য বাঁধা পড়েন। ঈশা মুষা শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি এই দলের লোক। যাঁহারা চোরকে সব দিলেন তাঁহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ হইলেন ; আর তিনি তাঁহাদিগকে

চোর সাজাইয়া আপনি তাঁহাদের মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া অবাধে চুরীর কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। যাহাদের এইরূপে সর্ব্বস্ব হরণ হইল অথচ চোরকে ধরিতে পারিল না, তাহারা পূর্ণ কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিল না। এবার যে চোরকে হরি পাঠাইয়াছেন, তিনি পৃথিবীতে সকল চোরকে লইয়া এমন এক দল বাঁধিয়াছেন যে, যে দিক দিয়া যাহাকে ধরিতে পারা যায়, তাহাকে সেই দিক দিয়া ধরিয়া আনিয়া ঈশ্বরদর্শনশ্রবণজালে এমনি করিয়া জড়াইয়া ফেলিতেছেন যে, আর পালাইতে পারা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে? যাঁহাদিগকে তিনি জালে জড়াইলেন তাঁহাদিগের আর এক পদ বাহিরে পদার্পণ করিবার উপায় নাই, প্রেমকারাগারে তাঁহারা চিরবন্দী হইলেন। যখন একবার সর্ব্বনাশের ব্যাপার উপস্থিত এবং এই সর্ব্বনাশ কার্য্যে স্বয়ং হরি রসিক, তখন চোরের হাতে ধরা দিয়া প্রেমকারাগারে চিরদিনের জন্য বন্দী হইয়া থাকাই ভাল। আসুন আর আমাদের বুদ্ধি কৌশল খাটাইয়া চোরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য যত্ন করিবার কিছু প্রয়োজন নাই। সেই যখন সকল অপহৃত হইবেই, তখন আজ হইতে সমুদায় চোরের হাতে সমর্পণ করিয়া আমরা কৃতার্থ হই চোরের সর্দ্দার যিনি তিনি এবার স্বয়ং আমাদের নিকট আর আত্মগোপন করিতে পারেন না, মিষ্ট কথা শুনাইয়া সুখের মুখ দেখাইয়া আমাদের চিত্ত হরণ করিতে যখন প্রস্তুত, তখন আমরা আমাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়া সর্ব্বস্ব তাঁহার চরণে আনিয়া ঢালিয়া দি। কৃপানিধান পরমেশ্বর সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন এবার হরির অপূর্ব্ব চৌর্য্যলীলা দেখিয়া সকলে মোহিত হন, এবং চিরদিনের জন্য তাঁহার হইয়া যান।

কেশবচন্দ্র অবোধ্য কেন ?

মূল্য ৵০ আনা।

কেশবচন্দ্র অবোধ্য কেন ?*

আজ কেশবচন্দ্রের জন্মদিন। এ দিনে তাঁহার জীবনালোচনা করা স্বাভাবিক। তাঁহার জীবন লোকের নিকটে অবোধ্য কেন, ইহাই অদ্যকার আলোচ্য বিষয়। কেশবচন্দ্রের জীবন অবোধ্য, এ কথা কেন বলিতেছি, প্রত্যেক মানবের জীবন কি অবোধ্য নয় ? এমন কোন্ মানুষ আছে, যাহার মনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার অন্তরের সমুদায় তত্ত্ব আমরা বলিয়া দিতে পারি ? প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মাই তো অবোধ্য। এ কথা সত্য যে, কোন্ ব্যক্তির মনের অন্তস্তম প্রদেশে কি আছে আমরা তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার ক্রিয়ার মূল আমরা সহজে ধরিয়া ফেলিতে পারি। কোন্ ব্যক্তি কোন্ প্রবৃত্তি ও বাসনার অধীন যদি একবার আমরা ইহা জানিতে পারি, তাহা হইলে অনায়াসে বলিতে পারি, সে ব্যক্তি অমুক অমুক অবস্থাধীনে অমুক অমুক প্রকারের কার্য্য করিবে। সাধারণতঃ লোকে যে সকল প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, সেই সকল তাহাদিগকে কোন্ সময়ে কোন্ প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত করে, ইহা তাহারা অবগত আছে। অবগত আছে বলিয়াই তাহারা আপনার সমানাবস্থাপন্ন লোকদিগের বিষয়ে অনায়াসে বলিয়া দিতে পারে, তাহারা সেই সেই অবস্থায় কি প্রকার কার্য্য করিবে। পৃথিবীতে সময়ে সময়ে এ প্রকার লোক আসিয়াছেন, যাঁহারা লৌকিক প্রবৃত্তি বাসনা দ্বারা পরিচালিত হন না, যাঁহাদের ক্রিয়ার

---

* এই প্রবন্ধ ১১ নবেম্বর দিবস কেশবচন্দ্র সেনের ষট্‌পঞ্চাশত্তম জন্মোৎসবোপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতামূলক।

মূল লোকাতীত। এই সকল ব্যক্তিকে তৎকালের লো
চিনিতে পারে না। তাঁহাদিগকে যতই তাহারা বুঝিতে
করে, ততই ঘোর অন্ধকারে নিপতিত হয়। এ অবস্থায় তা
আর কি করিবে, বৃথা নিন্দাবাদ দ্বারা তাঁহাদিগকে অপদস্থ কি
যত্ন করে, কখন কখন প্রাণে পর্য্যন্ত বিনষ্ট করে। কি
এরূপ করিয়াও তাঁহাদের লোকাতীতত্ব তাহারা বিনষ্ট করি
পারে না, কালে তাহারাই আবার তাঁহাদিগকে দেবতার
আরূঢ় করে। না বুঝিতে পারিয়া যেমন তাহারা তাঁহাদিগ
নিন্দা ও ঘৃণা করিয়াছে, তেমনি না বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগে
দেবত্ব আরোপ করিল; দুই দিকেই অবোধ্যত্ব সমান।

কেশবচন্দ্রে যদি এমন কোন লোকাতীত বিষয় ছি
যাহা লোকে যত্ন করিয়াও বুঝিতে পারে না, তবে তাহা বুঝাই
জন্য যত্ন কেন? তাঁহার আপনার নিকটস্থ বন্ধুগণও যদি তাঁহ
ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে অপর লো
বুঝিবে ইহা কি সম্ভবপর? কেশবচন্দ্র প্রকাশ্যে এবং গো
আপনাকে বুঝাইবার জন্য প্রয়াস পাইয়া যদি তাহাতে অকৃতক
হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যাঁহারা আপনারাই তাঁহাকে
করিয়া বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারা তাঁহাকে অপরের বোধ
করিবার জন্য যত্ন করেন কেন? হাঁ, এ প্রকার যত্ন নিষ্ফল বা
মনে হয়; এবং যত বার এ সম্বন্ধে যত্ন করা গিয়াছে, তাহাতে
বড় কৃতকার্য্য হওয়া গিয়াছে তাহাও নহে। কেন না তাঁ
সম্বন্ধে এত বৎসর যাহা বলিয়া আসা হইতেছে, তাহ
তাঁহাকে বুঝিবার পক্ষে এ সময়ের লোকের কত দূর সাহ
হইয়াছে বলিতে পারা যায় না, কিন্তু যে সকল কথা

হইয়াছে, তাহার যে কেবল মর্ম্ম পরিগ্রহ করা হয় নাই তাহা নহে, তাহার কোন কোন অংশ অপরাপর অংশের সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া সাধারণ ব্যক্তিগণ এমন সকল অর্থান্তর ভাবান্তর ঘটাইয়াছেন যে, তাহাতে কেশবচন্দ্রকে যাঁহারা বুঝাইতে গিয়াছেন, তাঁহারা আপনারা অব্রাহ্মোচিত মত প্রচারের দোষে দোষী হইয়াছেন। কেশবচন্দ্রকে বোধগম্য করিতে গিয়া যদি তিনি আরও অবোধ্য হইয়া উঠেন, তাহা হইলে কি আর এ সম্বন্ধে কোন যত্ন করা যাইবে না? অধিকন্তু ইহাতে যদি কেবল অনিষ্টই ঘটে, তাহা হইলে ঈদৃশ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন কি? অপরকে বুঝাইতে গিয়া যদি আপনারা তাঁহাকে বুঝিতে পারি, তাহাতে কি লাভ হইল না? আর যদি আমরা নিজে বুঝিলাম, তাহা হইলে এখন না হউক ইহার পরে তো লোকে তাঁহাকে বুঝিবে। সুতরাং যদি বুঝাইতে গিয়া তিনি আরও অবোধ্য হন, তাহা হইলে দুঃখ করিবার বিষয় কি? যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিয়া যাওয়া আমাদের প্রতি আদেশ। আমরা আদেশ প্রতিপালন করিয়া নিজে কৃতার্থ হইব, সময়ে অপরেও কৃতার্থ হইবেন।

কেশবচন্দ্রের জীবনের মূলতত্ত্ব কি সর্ব্বপ্রথমে আমরা তাহাই নির্ব্বাচন করিব। তাঁহার জীবনের প্রধান মূলতত্ত্ব স্বাধীনতা। এই মূলতত্ত্বসম্বন্ধে তিনি আপনি বলিয়াছেন, "আমার ইষ্টদেবতা আমাকে যখন মন্ত্র দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্বাধীনতা মহামন্ত্র নিবিষ্ট ছিল।" "কখনও কাহারও অধীন হইও না" এই প্রধান সৎ-পরামর্শ সর্ব্বপ্রথমে তিনি ঈশ্বর হইতে লাভ করিয়াছিলেন। এই সৎপরামর্শের ফলে তাঁহার জীবনে কি হইয়াছিল আমরা সকলেই বিদিত আছি। ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও বা কিছুরই অধীন

হইবে না, এই প্রতিজ্ঞা লইয়া তিনি জীবন আরম্ভ করিলেন। তিনি বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। যদিও আমি ইঁহার লিখিত কতকগুলি বৈদিক প্রার্থনা দেখিয়াছি, এবং এরূপ প্রার্থনা বৈষ্ণবগণমধ্যে বিরল, তথাপি ইনি সর্ব্বতোভাবে দৃঢ়বিশ্বাসী বৈষ্ণব ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কেশবচন্দ্রের এক জন পরমভক্ত বৈষ্ণব হওয়াই সম্ভব ছিল। বিশেষতঃ পিতামহ যখন অতি অল্প বয়সে তাঁহাকে হরিনাম মন্ত্র দিয়াছিলেন, এবং সে মন্ত্রের প্রতি তিনি বাল্যকালেও অবহেলা প্রদর্শন করেন নাই, তখন বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া তাঁহার পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক ছিল। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে তাঁহার পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস শিথিল হইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাব আসিয়া তাঁহার উপরে নিপতিত হইল। খ্রীষ্টান পাদরিগণ তাঁহার সহিত সম্বন্ধ ও পরিচয় করিতে লাগিলেন, তাঁহার সময়ে কত কৃতবিদ্য খ্রীষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু কেশবচন্দ্রের স্বাধীন চিত্ত প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল না, খ্রীষ্টধর্ম্মের সারভূত উপায় প্রার্থনা তাঁহার জীবনের মূল অবলম্বন হইল। তিনি যখন স্বাধীন ভাব আশ্রয় করিয়াছেন, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও আশ্রয় যখন তিনি গ্রহণ করিলেন না, তখন প্রার্থনা বিনা আর তাঁহার কি সম্বল হইতে পারে? সকল বিষয়ে যখন ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিতে হইবে, তখন আর তিনি অন্য কোন উপায়ে তাহা সিদ্ধ করিবেন? তিনি বেদ বেদান্ত পুরাণ কোরাণ বা বাইবেল শাস্ত্রকে জীবনপথের আলোক করিলেন না, কোন গুরু বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের আশ্রয় লইলেন না, হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান বা

•
তিনি কোন এক সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইলেন না; কেন না স্বাধীনতা তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছিল, "অধীনতাশৃঙ্খলে শরীর মনকে বদ্ধ হইতে দেওয়া হইবে না; দাসত্ব স্বীকার করা হইবে না, কাহারও পদতলে পড়া হইবে না; গুরুজনের নিকট আত্মবিক্রয় করা হইবে না; পুস্তকবিশেষেরও কিঙ্কর হইয়া বন্দনা করা হইবে না; কোন এক সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়িয়া দিবারাত্রি তাহারই যশ ঘোষণা করা হইবে না *।" স্বাধীনতা সুতরাং তাঁহাকে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিল; ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ তাঁহার আলাপপরিচয়ের ব্যক্তি রহিলেন না। তিনি আপনার মনের কথা ঈশ্বরেরই নিকট ব্যক্ত করিতেন, দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কোন দিন পরামর্শগ্রহণের জন্য স্বীকার করেন নাই, কেন না তাহা হইলে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সেই ব্যক্তির অধীন হইতে হইবে। যখন যে কোন বিষয় উপস্থিত হইত, তাঁহাকে ঈশ্বরকেই জানাইতে হইত। সুতরাং সেই মনের কথা বিজ্ঞাপন প্রার্থনার আকার ধারণ করিবে, ইহা আর বিচিত্র কি? স্বাধীনতা হইতে প্রথম উপায় প্রার্থনার সমাগম হইল। প্রার্থনা অবলম্বিত হওয়াতে তাঁহাতে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিল।

এখন আমরা সহজে বুঝিতে পারিব, কেশবচন্দ্র প্রথম হইতে লোকের নিকটে অবোধ্য হইলেন কেন? যে ব্যক্তি আপনাতে আপনি থাকে, কাহারও নিকটে গূঢ় কথা খুলিয়া বলে না, কোন কালে কোন বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে না, তাহাদের মত কার্য্য

---

* কেশবচন্দ্রের উক্তিগুলি বলিবার সময় ও বস্তুতঃ উল্লিখিত হইয়াছিল। যদ্দূর পরিস্ফুট করিবার জন্য এখন স্থানে স্থানে উহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

কর্ম্ম উপায়াদি অবলম্বন করে না, তাহাকে বোঝা অসম্ভব। কেশব-চন্দ্র যে পথ ধরিলেন, তাহা নিতান্ত নূতন পথ। যদি তিনি বৈষ্ণব হইতেন, অন্ততঃ বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে চিনিতেন; যদি খ্রীষ্টান হই-তেন, তাহা হইলে হিন্দুগণের দ্বেষভাজন হইলেও খ্রীষ্টানগণ তাঁহার কার্য্য ও গতি বুঝিতে সমর্থ হইতেন। তিনি যদি বেদ বেদান্তের পক্ষপাতী হইয়া তাহার অনুসরণ করিতেন, বেদান্তবাদী ব্রাহ্মগণ তাঁহার ধর্ম্মের রেখা কত দূর বুঝিয়া লইতেন। তিনি বিষয় কর্ম্মের পথ ছাড়িলেন; কোন ব্যবসায়ের পথ ধরিলেন না যে, বিষয়ী লোকেরা তাঁহার বিষয় বুঝিবেন। কেশবচন্দ্র পূর্ণ স্বাধীনতা অবলম্বন করাতে সকল ধর্ম্ম, সকল সম্প্রদায়, সকল প্রকার ব্যক্তির নিকট অবোধ্য হইয়া পড়িলেন। তিনি আপনিও আপনার পথ জানিতেন না; কেন না যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হস্তে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছে, সে ব্যক্তি জানে না ঈশ্বর কখন তাহাকে কোন্ পথ দিয়া লইয়া যাইবেন। ঈশ্বর একটী সঙ্কীর্ণ পথমাত্র কেশবচন্দ্রের নিকটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার অগ্র পশ্চাৎ চারিদিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। স্বাধীনতার জন্য তিনি যাঁহার হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন যদি তাঁহার উপরে প্রথম হইতে তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস না থাকিত, তাহা হইলে কখন তিনি আপনার পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিতেন না। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে একটু একটু রেখামাত্র আলোক প্রকাশ পাইতেছে, সেই আলোকে যে একটি সঙ্কীর্ণ পথ দেখা যাইতেছে, এ দিক্ ওদিক্ দৃষ্টিপাত না করিয়া সেই সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া চলিয়া যাওয়া সামান্য বিশ্বাসের কার্য্য নহে। অন্ধকার দেখিলে ভয় হয়, ভয় হইলেই অন্ততঃ সে পথের পথিকগণকেও জিজ্ঞাসা করিতে, স্বতই মন সত্বর হয়, কিন্তু কেশবচন্দ্র স্বাধীনতামন্ত্রের

বশে স্থিরচিত্ত থাকাতে তাদৃশ ভয়ে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে অগ্রসর হন নাই। এ দিকে ও দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল ঈশ্বরের প্রতি যখন তাঁহার দৃষ্টি স্থির ছিল, তখন তিনি অন্ধকারাবিষ্ট যত সঙ্কীর্ণ পথই হউক না কেন, কেনই বা তাহা হারাইবেন? কেশবচন্দ্র যে পথে চলিতেছেন,সে পথের সংবাদ যখন তিনি আপনি জানিতেন না, বুঝিতেন না, তখন অপরে তাহা বুঝিবে কি প্রকারে? কেশবচন্দ্রে এই না জানা না বোঝার ভাব চিরদিনই ছিল। এই জন্ত তিনি বন্ধুগণকে সর্ব্বদা অনুরোধ করিতেন, যেন তাঁহার আতিশয্য তাঁহারা সকলে বহন করে,তাঁহাতে আরও অনেক বিষয় আছে যাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই। এখনও প্রকাশ পায় নাই, ইহা তিনি সর্ব্বদা বলিতেন কেন? এই জন্ত বলিতেন যে, তিনি যাঁহার হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তিনি ক্রমান্বয়ে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন, সম্মুখে আরও কত কি রহিয়াছে তাহা তিনি এখনও দেখিয়া উঠিতে পারেন নাই। কি জানি বা বন্ধুগণ পথে সঙ্গে চলিতে চলিতে কোথায় যাইতেছি বলিয়া ভয়ে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়েন, এ জন্ত পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগকে তাঁহার সাবধান করিতে হইয়াছে। আর এক কথা এই, এই ক্রমান্বয়ে অগ্রের দিকে গতি হইতে কেশবচন্দ্রে অনন্ত উন্নতিতে বিশ্বাস উৎপন্ন।

কেশবচন্দ্র লোকাতীত পথে চলিতেন, সুতরাং তিনি পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগের নিকট নিতান্ত অবোধ্য হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? এখন দেখা উচিত, স্বাধীনতা তাঁহাকে ঈশ্বরে বিশ্বাস, ঈশ্বরের নিকটে হৃদয়ের কথা জ্ঞাপনে প্রবৃত্ত করিল, তাহার পর তাঁহাকে কোথায় লইয়া গেল। 'স্বেচ্ছাচারের অধীন হওয়া

হইবে না, অহঙ্কারের অধীন হওয়া হইবে না, ক্রোধের অধীন হওয়া হইবে না, লোভের অধীন হওয়া হইবে না, কোন প্রকার রিপুর বশবর্ত্তী হওয়া হইবে না", স্বাধীনতাজনিত এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাঁহাকে বিবেকী করিল। এ সকলের আপনি বশীভূত হওয়া দূরে, অপরকে ইহার বশীভূত হইতে দেখিলে তাঁহার মনের ভিতরে কেমন প্রজ্জলিত ভাব উপস্থিত হইত। আপনার জীবনের তত্ত্ব বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, "আমি দাসত্ব সহ্য করিতে পারিতাম না, এখনও পারি না। কাহাকেও বাসনার বশবর্ত্তী, কি রিপুর বশবর্ত্তী দেখিলে অন্যায় বোধ করিতাম, কোন ক্রমেই সহিষ্ণু হইতে পারিতাম না। আমার অস্ত্র অধীনতা কাটিবার জন্য সর্ব্বদাই চক্‌মক্‌ করিত।" তিনি আপনি বিবেকের অধীন হইলেন, অপরকেও বিবেকের অধীনে আনিতে যত্ন করিলেন। এই যত্নের প্রথম ফল সঙ্গতসভা; সঙ্গতে নীতির সাম্রাজ্য ঘোষিত হইলে তাঁহার বন্ধুগণ সকলেই বিবেকী হইয়া নীতির অনুবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রোধ লোভ প্রভৃতি রিপুগণকে বিবেকের অধীন করিয়া নীতিমান হওয়া তাঁহার সকল বন্ধুর ব্রত হইল। একটু অসত্য বা মিথ্যার সংস্রব তাঁহারা দূরে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার বন্ধুগণ জনসমাজে নীতিমান্ বলিয়া পরিচিত হইলেন। সঙ্গতের প্রাধান্যসময়ে মনে হইতে পারে, কেশবচন্দ্র সকলের বোধগম্য হইলেন, কেন না নীতিমত্তা কে আর না বুঝিতে পারে; কিন্তু কেশবচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে অবোধ্যত্ব কোন কালেই পরিহৃত হইবার কারণ ছিল না। তিনি নীতিপ্রাধান্যের সময়ে অন্য দিক্ দিয়া বন্ধুগণের নিকটে পর্য্যন্ত অবোধ্য হইলেন। "বন্ধুরা বলেন এইটী কর; আমি তাহা করি না। অন্যের ভাল

কথায় ভাল কাজও করিব না, ঈশ্বরের কথায় করিব। অন্যের কথায় যাহা করিলাম না, ঈশ্বরের কথায় তাহা আগ্রহের সহিত করিব। যত ক্ষণ না ঈশ্বরের কথা শুনিব, তত ক্ষণ আমি কাজ আরম্ভ করিব না।" এইরূপ যাঁহার প্রতিজ্ঞা তিনি বন্ধুগণের নিকটে পর্য্যন্ত সর্ব্ববিষয়ে অবোধ্য থাকিবেন, ইহাতো আর বলিতেই হয় না। "বন্ধুবান্ধব যাঁহারা, ধর্ম্মেতে যাঁহাদের সহিত মিলন হইয়াছে, তাঁহাদিগকে মানিও, আত্মা বলে বড় ভয় করে। খুব যাঁহারা বিশেষ অনুগত, ধর্ম্মে সৎকর্ম্মে অনুকূল, আদরের সহিত তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিও; মনন বলে, অধীন হইতে আমি ভীত হই! কোন বিশেষ বন্ধুর মায়াতে আমি বদ্ধ হইব না।" বন্ধুগণের সম্বন্ধেও যখন এরূপ ব্যবহার, তাঁহাকে অন্য লোকে বুঝিবেন দূরের কথা, যাঁহারা সর্ব্বদা নিকটে থাকিতেন সঙ্গে থাকিতেন, তাঁহারাই তাঁহাকে বুঝিবেন, ইহা কি কখন সম্ভব?

যে ব্যক্তিতে এরূপ স্বাধীনতার প্রাবল্য, সে ব্যক্তি এতগুলি বন্ধু লইয়া চিরজীবন একত্র কি প্রকারে কাটাইয়া গেলেন, ইহাও এক বিষম সমস্যা। পৃথিবীতে তাঁহার অবস্থানকালে যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে মিলিত ভাবে ছিলেন, তাঁহার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন, ইহাতে এই দেখায় যে, ইঁহারা তাঁহার চরিত্র হইতে যে স্বাধীনতা শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই স্বাধীনতার আতিশয্যবশতঃ পরস্পরে মিলিত থাকিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার ভিতরে স্বাধীনতাব্যতিরিক্ত আর কোন মূলতত্ত্ব ছিল, যাহার জন্য তিনি সকলকে একত্র বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। এ মূলতত্ত্ব স্বাধীনতামূলক, স্বাধীনতার সহিত অবিরোধী। সে মূলতত্ত্ব কি? সমতা। এ সমতা স্বাধীনতাই

তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছে। "যাহা দ্বারা যদি সকলকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতাম, দলে দলভুক্ত করিবার যদি আশা থাকিত, আমার দল লোকে পূর্ণ হইত। স্বাধীনতাকে দলপতি [illegible]লাম। এই জন্ত আমার সঙ্গে যাঁহারা অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকে আমি বন্ধু বলি, আমি তাঁহাদের গুরু বলি না। স্বাধীনতারই জয় হইবে ...স্বাধীনতা মানুষকে ডাকিবে। ইহাতে লোক আসে আসুক; গুরুগিরি কখনও করিব না। অধীন হওয়াকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। আমাতে যাহা ঘৃণা করি, অন্তেতে তাহা ঘৃণা করি না? দলের সামান্ত কাহাকেও আমি অধীন দেখিতে পারি না। কেহ যে অন্তের অধীন হইবে, তাহা দেখিতে পারি না, আমার অধীন যদি কেহ হয় তাহাও আমার অত্যন্ত অসহ্য। অন্ত এক জন মনুষ্য আমার অধীন হইবে? পিতার নিকট আমি কি উত্তর দিব? আমার মত আর এক জনের ঘাড়ে আমি চাপিব? আমার শাসনে অপরকে শাসিত করিব? মায়ার মোহিনী মূর্ত্তি দেখাইয়া দলে আনিতে চেষ্টা করিব? অপরকে আমি আমার [illegible] করিয়া রাখিব? ইহাতে নরক আমাকে হাঁ করিয়া গিলিবে; [illegible]ও লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিবে। আমার যদি দল না হয়, এক জনও যদি কাছে না আসে, নিজে যখন দাস নই তখন অপরকেও দাস করিব না।" এ কথাগুলি কি দেখাইয়া দেয়? সমতা। আমি যেমন স্বাধীন, অপরে তেমনি স্বাধীন, আমি যেমন ঈশ্বরাধীন, অপরে তেমনি ঈশ্বরাধীন, আমি যেমন মায়াতে বদ্ধ নই, অপর-কেও তেমনি আমার মায়ায় বদ্ধ হইতে দেওয়া হইবে না। কেশব-চন্দ্র দলপতি সকলেই জানেন, এই সকল কি দলপতিসমুচিত কথা? কোথায় কোন্ দলপতি, দলের লোকদিগকে এরূপ পূর্ণ

স্বাধীনতা দিয়াছেন ও দলপতি হইয়া স্বাধীনতাকে দলপতি করিয়া দাঁড় করান, ইহা সর্ব্বথা অযোগ্য। তাঁহার আপনার লোকেই যখন তাঁহাকে এই বলিয়া ভৎর্সনা করিয়াছিলেন, "তুমি নিতান্ত দুর্ব্বল দলপতি, আপনার লোকদিগকে শাসন করিতে পার না;" তখন তিনি কি উত্তর দিয়াছিলেন, "ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহ অধীন না হইলে বলপূর্ব্বক তাহাকে অধীন করা তাঁহার (কেশবচন্দ্রের) মত নহে। যদি ইটি দুর্ব্বলতা হয়, তবে তাহা ঈশ্বরের, কেন না তিনি বলপূর্ব্বক কাহাকেও অধীন করেন না।" কেশবচন্দ্র আপনি স্বাধীন এবং অপরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াও কোন্ মূলতত্ত্বের বলে সকলকে একত্র বান্ধিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি। আত্মসমান অপরকে দর্শন করিয়া সম্ভ্রম দান করিতেন ইহাতেই তাঁহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন নাই। এই আত্মসমান অপরকে দর্শন ও সম্ভ্রমদানই সমতা।

কেশবচন্দ্রে স্বাধীনতা ও সমতা এ দুই মূলতত্ত্বের যে বাড়াবাড়ি ছিল, ইহা তাঁহার ব্যবহার হইতে সপ্রমাণ হওয়া সমুচিত। তিনি বন্ধুগণের সহিত ব্যবহারকালে কখন কাহাকেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন সময়ে আদেশ বা অনুরোধ করিতেন না। ইহাতে অনেক সময়ে কার্য্যের ক্ষতি হইত, তিনি এক কথা বলিলে সহজে যাহা হইতে পারিত, তাহা এই প্রকারে হইত না। যিনি যে বিষয়ের ভার গ্রহণ করিতেন, সে ভারসম্বন্ধে তাঁহার সর্ব্বতোমুখীন প্রভুতা থাকিত। সেই ভার গ্রহণ করিয়া এইরূপ নিরঙ্কুশ ভাবে কার্য্য করাতে তাঁহার প্রচুর প্রমাণ পারিবারিক অর্থের অপচয় হইয়াছে, তিনি কোন কথা না বলিয়া সে অপচয় বহন করিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে বন্ধুগণ পরস্পর কলহ করিয়া তাঁহার শান্তি ভঙ্গ করিয়া

গিয়াছে, সমুদায় রজনীতে তজ্জন্য তাঁহার নিদ্রা হয় নাই, অ
আপনি কোন প্রকার প্রতিরোধ করেন নাই। প্রতি ব্যক্তি আ
নার কার্য্যের জন্য ঈশ্বরের নিকটে দায়ী, অপরে তাহাতে হ
ক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই, এ বিষয়ে এত দূর তাঁহ
দৃঢ়তা ছিল যে, একবার তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, কো
ব্যক্তি যদি তাঁহার সম্মুখে খুনও করে, হয়ত তিনি তাহার প্রতি
রোধ করিবেন না *। কোন বন্ধুকে তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে কি
বলিতেন না। একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম কখনই কি
তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলিবেন না? ইহার উত্ত
তিনি বলিয়াছিলেন, যদি কোন ব্যক্তির সহিত একহৃদয়ত্ব হ
তাহার ভাবের সহিত নিজের ভাবের, তাহার কথার সহিত নিজে
কথার কোন প্রভেদ না থাকে, তাহা হইলে সাক্ষাৎসম্বন্ধে বলি

---

* এ কথা শুনিয়া মনে হয় ইহা স্বাধীনতার অপব্যবহার, কিন্তু এক
বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'হয়তো প্রতিরো
করিবেন না,' এ কথার মধ্যে ঈশ্বরের আদেশের মুখাপেক্ষিতে বিশ্বা
রহিয়াছে। একের কার্য্যে অপরের হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার না
ইহা সত্য, কিন্তু যদি ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করিতে বলেন, তাহা হইলে হস্তক্ষে
করিতে পারা যায়। কেশবচন্দ্র কখনও কাহাকে আপনি শাসন করিতে
না, শাসন করা প্রয়োজন হইলে মনগত বিবেক দ্বারা শাসন করিতেন
কেবল একবার তিনি একটি বন্ধুর বিবাহে অবিশ্বাসসূচক কথায় সাক্ষা
সম্বন্ধে 'ইহা অবিশ্বাস' এই বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বলপূর্ব্বক
কাহাকেও অধীন না করার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখিয়াছিলেন
"যেখানে আবশ্যক সেখানে অধিকারের সহিত বলিবেন।" ইহার অর্থ এই
যেখানে যাহা বলিতে তিনি ঈশ্বরের আদেশ পাইতেন সেখানে তাহা অধি
কারের সহিত (with authority) বলিতেন।

পারেন; অন্যথা কোন কালে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কিছু বলিবেন না। গুরু-শিষ্যত্বনিবন্ধনতা উপস্থিত হয়, এ ভয়ে তিনি একা কোন বন্ধুর সহিত কোন বিষয়ের মীমাংসার্থ কথা কহিতেন না, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, সকলে আসুন তাহার পর কথা হইবে। কাহাকেও কোন বিষয়ে আদেশ করা তাঁহার রীতি ছিল না। দাসগণসম্বন্ধেও এ বিষয়ের ব্যতিক্রম করিতেন না। তাহাদিগকে কিছু বলিতে হইলে, এমনই ভাবে বলিতেন যে, যেন যাহা বলিতেছেন, তাহা করা না করা তাহাদের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে। দাস দাসী প্রভৃতিকে তিনি কি দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহা তৎপ্রবর্ত্তিত উৎসবপ্রারম্ভকালে দাসদাসীগণসম্বন্ধে যে প্রার্থনা আছে তৎপাঠে সকলে বুঝিতে পারিবেন। কেশবচন্দ্র কখনও কাহারও স্বাধীন ক্রিয়াতে হস্তক্ষেপ করিতেন না, ইহাতে তাঁহার জীবনে বন্ধুবিচ্ছেদও ঘটিয়াছে। যখন কোন কোন বন্ধুর তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস সমুপস্থিত হয়, তখন তিনি তাঁহাদিগকে পাঁচটা কথা বুঝাইয়া বলিলে হয়তো সে কালের জন্য বন্ধুবিচ্ছেদ নিবারণ হইত, কিন্তু তাহা করিতে পারেন নাই; কেন না তাহা হইলে কথায় বার্ত্তায় ভুলাইয়া লোককে দলে রাখিবার জন্য যত্ন তাঁহাতে উপস্থিত হইত এবং এইরূপে অপরকে মুগ্ধ করিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি জন্মিত। এক সময়ে এক জন তাঁহার বন্ধু কোন একটী পরোপকারের কার্য্য করেন, তিনি জানিতেন এ কার্য্যের চরম ফল ভাল হইবে না; কিন্তু তৎকালে তিনি তাহার কোন প্রতিরোধ করিলেন না। যখন তিনি বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেন, তখন কেশবচন্দ্র বলিলেন, আমি ইহা পূর্ব্বে জানিতাম। বন্ধু বলিলেন, তবে কেন তখন বলেন নাই? তিনি উত্তর দিলেন, আগে বলিয়া

দিলে কি, আর শিক্ষা হইত? পরীক্ষাবিপদে পড়িয়া যে শিক্ষা হয়, কাহারও তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া সে শিক্ষা অ করা উচিত নয়, কেশবচন্দ্র ইহা বিলক্ষণ জানিতেন। পৃথি নিকটে এ সকল কার্য্যপ্রণালী অবোধ্য। এ পথ যাঁহারাই অ করিবেন নিশ্চয় তাঁহারা অবোধ্য হইবেন।

স্বাধীনতা ও সমতা এই দুই মূলতত্ত্ব হইতে তাঁহাতে উপস্থিত হইল, এখন তাহাই বলা যাউক। এক স্বাধীনতা হই তাঁহাতে বিশ্বাস, বিবেক ও প্রার্থনা সমাগত হইয়াছে, ইহা আ পূর্ব্বে দেখিয়াছি, কিন্তু বৈরাগ্যও যে সেই স্বাধীনতার অবশ্যম্ভা ফল ইহা অবশ্য মানিতে হইবে। কোন ব্যক্তি বা বিষয় যখন তাঁহা আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই, তখনই বৈরাগ্যের সাম্রা তাঁহাতে সমুপস্থিত। বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য, প্রার্থনা ও স্বাধী নতা তাঁহাকে সকলের অধীনতা হইতে বিমুক্ত করিল, এখানে যদি সকল শেষ হইয়া যাইত, তাহা হইলে তাঁহার জীবনে আ যে সকল ভাবের বিকাশ হইয়াছিল, তাহা কখন সম্ভবপর হইত না। অধীনতামাত্রকেই যখন তিনি ঘৃণা করিতেন, তখন তিনি অপরকে অধীন করিবেন বা অধীন হইতে দিবেন ইহা সহ্য করিতে পারিতেন না। ইহাই প্রকৃত স্বাধীনতার লক্ষণ। লোকে অপরকে অধীন করিয়া আপনার স্বাধীনতা প্রকাশ করিয়া থাকে, অন্যায় প্রভুত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা হইতে এ ভাবে উপস্থিত হয়। আমিও যেমন স্বাধীন, অপরেও তেমনি স্বাধীন, এ বোধ সমতামূলক, এই সমতা তাঁহাকে আপনা ব্যতিরিক্ত অপরের প্রতি সম্ভ্রমপ্রকাশে বাধ্য করিল। স্বাধীনতা ও সমতা এ দুইয়ের এই মাত্র ফলে যদি তাঁহার জীবন শেষ হইত তাহা হইলে তাঁহাতে নীতির পর

ভক্তিসমাগমের কোন সম্ভাবনা ছিল না। কেশবচন্দ্রের স্বাধীনতা ঈশ্বরাধীনতা ছিল। ঈশ্বরকে না দেখিলে না গ্রহণ করিলে তিনি কখনই স্থির স্বাধীন থাকিতে পারিতেন না, স্বাধীনতা তাঁহাতে স্বেচ্ছাচার হইয়া দাঁড়াইত। স্বাধীনতার মূলে যখন তিনি ঈশ্বরকে দেখিলেন, তখন অপরের স্বাধীনতার মূলেও ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলেন। মানুষের ভিতর হইতে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু ঈশ্বরের গুণ প্রকাশ পায়, তাহা তাহার নিজের নহে স্বয়ং ঈশ্বরের, স্বাধীনতা তাঁহাকে ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল। তিনি যখন আপনাতে স্বাধীনতা বা ঈশ্বরাধীনতা হইতে দেবগুণের সমাগম দেখিলেন, তখন অপরেতে ঠিক তাহাই কেন বিশ্বাস করিবেন না? কেশবচন্দ্র অপরের ভিতরের সেইটি খুঁজিয়া বাহির করিতেন, যেখানে সে কোন রিপু বা বাসনার অধীন নহে, ঈশ্বরের অধীন। এই ঈশ্বরাধীনতাস্থলে ভক্তি প্রেম বৈরাগ্য প্রভৃতি অপর লোকের মধ্যে তিনি দেখিতে পাইতেন এবং সেই সকলের নিকটে প্রণতি স্বীকার করিতেন। এইরূপে তাঁহাতে ঈশ্বরাধীনতা এবং ঈশ্বরতনয়গণের অধীনতা যুগপৎ উপস্থিত হইল; তাঁহার শিষ্যপ্রকৃতি উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিল। ঈশ্বরাধীনতা এবং ঈশ্বরতনয়গণের ভক্ত্যাদির অধীনতা তাঁহাতে উপস্থিত হইবামাত্র, তাঁহাতে ভক্তিসঞ্চার হইল। এখন সঙ্গতের পর মুঙ্গেরের ভক্তির সময় সমাগত। তাঁহার চক্ষু হইতে যাই ভক্তির অশ্রু নিপতিত হইল, অমনি শত শত চক্ষু হইতে ভক্তিবারি প্রবাহিত হইল। কেশবচন্দ্র স্বাধীন পুরুষ, তাঁহার আত্মসংবরণ করিবার সামর্থ্য প্রচুর। ভক্তির বিকার সমুদায় তিনি আপনার হৃদয়ে আরুদ্ধ রাখিতে সমর্থ ছিলেন, অপরের সে

সাফল্য ছিল না। সুতরাং ভক্তির অশ্রুপাত, প্রমত্ত নৃত্য, চিৎকার, ক্রন্দনের রোল ইত্যাদি ভক্তির বিকারে ব্রাহ্মসমাজ পূর্ণ হইয়া উঠিল। কলিকাতা ও ঢাকা প্রভৃতি স্থলে ইহার এত দূর আতিশয্য উপস্থিত হইল যে, নিশীথ রাত্রিতে চিৎকার ধ্বনি ক্রন্দনাদি শ্রবণ করিয়া লোক মনে করিত, ইহারা বা সুরাপান করিয়া প্রমত্ত হইয়াছে। এই সময়ে মুঙ্গেরে ভক্তির এত দূর আতিশয্য হইল যে,প্রকাশ্য পথে ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া পরস্পরের পদধূলির জন্ম কাড়াকাড়ি উপস্থিত হইল,কোন লোক সম্মুখে আছে কি না তৎপ্রতি দৃক্‌পাত রহিল না। এসময়েএতদূর প্রমত্ততা ও উৎসাহ হইয়াছিল যে, এক জন ভক্তকে কাঁকড়া বিছায় কামড়াইয়া রক্তপাত করিল, অথচ ভক্তের পদধূলি ভিন্ন অন্য কিছুরই তিনি আশ্রয় করিলেন না। প্রচারকের পদ ধৌত করিয়া দিয়া পত্নীর কেশগুচ্ছে তাহা পুঁছাইয়া দেওয়া এত দূর পর্য্যন্ত বাড়াবাড়ি উপস্থিত হইল। কেশবচন্দ্রের নামে নরপূজার অপবাদ উঠিল, কিন্তু ভক্তগণের প্রতি তৎকালে ভক্তিপ্রকাশ সাধারণ ব্যাপার ছিল। ভক্তির বিকার যাঁহাদিগেতে অধিক দেখাদিল, কালে তাঁহারা আপনাদিগকে কেশবচন্দ্র হইতেও শ্রেষ্ঠ মনে করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাদিগের নিকট কেশবচন্দ্র অবোধ্য হইয়া পড়িলেন। যখন তাঁহাদিগের নিকট অবোধ্য হইলেন,তখনঅপরের নিকটে তো হইবেনই।

কেশবচন্দ্রে ভক্তির উদয় হইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি ব্রাহ্মসমাজে ছড়াইয়া পড়িল, মৃদঙ্গাদি ভক্তির উপকরণের আদর সর্ব্বত্র বাড়িল। একটি বিষয় এখনও সর্ব্বসাধারণের হয় নাই, সেটি বৈরাগ্য। কেশবচন্দ্রের বৈরাগ্য নিতান্ত নিগূঢ়। তিনি অন্যত্র কপটাচরণের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু অন্তরের বৈরাগ্য নিগূঢ়

রাখিবার জন্য যে কপটতা তাহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। অত্যন্ত নিপুণতা সহ যাঁহারা তাঁহার আহারব্যবহারাদি পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার বৈরাগ্য নির্ব্বাচন করিয়া বাহির করিবেন সম্ভাবনা ছিল না। তিনি ব্যঞ্জনাদির মধ্যে শাক ভাল বাসিতেন, আর সকল দ্রব্য স্পর্শমাত্র করিয়া আহ্লাদ ও তৃপ্তিসহকারে শাক দিয়া ভোজন করিতেন, ইহা অল্প লোকে জানিত। বরং ভাল ভাল সামগ্রীতে তাঁহার বিশেষ তৃপ্তি ছিল, এক জন সাধারণতঃ ইহাই মনে করিত। তাঁহার বন্ধুগণ এমন এক অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন যে, প্রকাশ্যে বৈরাগ্যসাধনের ব্যবস্থা করিতে তাঁহাকে বাধ্য হইতে হইল। তিনি স্বহস্তে রন্ধনাদিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; বন্ধুগণকেও তাদৃশসাধনে নিযুক্ত করিলেন। এখানেও স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য এক বেলা সাধারণের হস্তে অন্নগ্রহণের জন্য রাখিয়া দিলেন। এই প্রকাশ্য বৈরাগ্যসাধনের ফল কি হইল ইহাই দেখা প্রয়োজন। বৈরাগ্যসাধন করিতে গিয়া লোকে উদাসীন বৈরাগী ফকির হইয়া সংসারের প্রতি কর্ত্তব্যবিমুখ হয় লোকে ইহাই জানে, এবং ইহা জানে বলিয়াই ইংলণ্ড প্রভৃতিতে এ সময় আন্দোলন উপস্থিত হইল। কিন্তু কেশবচন্দ্রে এক দিকে কর্ত্তব্যপালন, অপর দিকে বৈরাগ্যাচরণ পূর্ণ পরিমাণে ছিল। এই বৈরাগ্যাচরণসাধনে লোকে যাহা মনে করিয়াছিল তাহার বিপরীত ঘটিল। কোথায় তিনি উদাসীন বৈরাগী কৃচ্ছ্রসাধনে নিরত হইবেন, তাহা না হইয়া ঘনতর যোগে ঈশ্বর ও মানবকে তিনি আপনাতে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। বৈরাগ্যের উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার আত্মা বিহঙ্গ অনন্ত চিদাকাশে উড়িল, আত্মা পরমাত্মার সহিত একত্বসুখ অনুভব করিতে

লাগিল। যখন 'আমির' তিরোধান হইল, তখন কেশবচন্দ্র আপনি কিছু নই হইয়া গেলেন। এই সময়ে তিনি একটি বিশেষ মত প্রচার করিলেন—আমি শূদ্র আর সকলে ব্রাহ্মণ। এখানেই আমরা দেখিতে পাইতেছি, আচার্য্যনাম সেবকনামে পরিবর্ত্তিত হইবার কারণ উপস্থিত। এ সম্বন্ধে তিনি মিরারে একটি অতি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেন, যাঁহারা তাহা পাঠ করিবেন, অতি বিশদভাবে তাঁহার এই মত তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। আমিকে উড়াইয়া দিয়া ঈশ্বরের সহিত একত্বপ্রাপ্তি, প্রভু ভাব উড়াইয়া দিয়া শূদ্র হইয়া মানব মানবীর সেবায় প্রবৃত্তি, এ দুই তাঁহাকে কোথায় লইয়া গেল এখন দেখা প্রয়োজন। ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ভাবে স্থিত করিতে যিনি অভিলাষ করেন, তাঁহার আমিত্ব থাকিলে কখন তাহা সিদ্ধ হয় না, ইহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি। আমিত্ব গেলে আত্মাতিরিক্ত অপর সমুদায় নরনারী ব্রাহ্মণ এ ভাব উপস্থিত হয় কেন? পূর্ব্বে তিনি মানবমানবীমধ্যে ভক্ত্যাদি দেবগুণ প্রত্যক্ষ করিলেন, এখন তাঁহাদিগের মধ্যে স্বয়ং দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিলেন। ভক্ত্যর্থীকে বরণ করিয়া যখন তিনি বলিলেন, "আপনাকে দিলে ঈশ্বর স্বয়ং তাহা হস্তে লন, আপনাকে আক্রমণ করিলে তাঁহার প্রতি আঘাত করা হয়, আপনার অন্তরে তিনি অবস্থান করিতেছেন, আমি সেই ভক্তবিহারীকে প্রণাম করি," তখন ঈশ্বরতনয়গণেতে ঈশ্বরদর্শন কেশবচন্দ্রের জীবনে প্রধান হইয়াছে, ইহা আমরা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছি। প্রাণেশ্বরপে চিত্ত প্রবিষ্ট হইলে কোটি কোটি নরনারীর সহিত একত্ব লাভ হয়, এই যে তাঁহার চিরপোষিত মত ছিল, এখন তাহা জীবনে পরিণত হইল। অন্তরে যে একা-

ষ্ণতার আরম্ভ হইয়াছিল এখন তাহা বাহিরেও প্রকাশ পাইল।

আমরা এত ক্ষণ যাহা বলিলাম তাহাতে কেশবচন্দ্রকে না বু ঝবার মূল কি তাহা এইরূপে দেখিলাম। প্রথমতঃ তিনি স্বাধীনতা লইয়া জীবন আরম্ভ করেন, এই স্বাধীনতাতে সমতা অন্তর্নিহিত ছিল। স্বাধীনতাবশতঃ তিনি অধীনতা আপনাতে ও অপরেতে সহ্য করিতে পারিতেন না। আপনাতে ও অপরেতে অধীনতা সহ্য করিতে না পারা হইতে সমতা উদ্ভূত হইল। আমিও স্বাধীন, অপরেও স্বাধীন ইহাই সমতার মূল। লোকে যাঁহাদিগকে স্বাধীন বলিয়া বিশ্বাস করে তাঁহারা অপরের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া তাহাদিগের উপরে কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া থাকেন, কেশবচন্দ্রে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব, সুতরাং তিনি এস্থলে অবোধ্য হইবেন না তো আর কি হইবেন? যে সমতাবশতঃ তিনি অপরকেও স্বাধীন বলিয়া গ্রহণ করিলেন, সেই সমতা আবার রূপান্তর গ্রহণ করিল। যেখানে সমতা আছে সেখানে বন্ধুতা হইতে পারে, কিন্তু ভক্তিতে প্রণত হইয়া পদতলে বসা ইহাতো আসিতে পারে না। আপনাতে ঈশ্বরের প্রভাব দর্শন করিয়া অপরেতেও তাঁহার প্রভাব দর্শন করিলে অপরের দেবগুণের নিকট প্রণতিস্বীকার উপস্থিত হয়। এই প্রণতিস্বীকার ভক্তিসঙ্কারের মূল, এবং ভক্তিসঙ্কার হইতেই শিষ্যপ্রকৃতির উজ্জ্বলতা। আত্মাতে ঈশ্বরের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া যে ঈশ্বর দর্শন হয় তাহা কাজেই পরোক্ষ। স্বাধীনতার মূলে তিনি যে ঈশ্বর দর্শন করিয়াছিলেন তাহা এই প্রভাবদর্শনমূলক। "প্রার্থনা করিতে করিতে সংহের বল, দুর্জ্জয় বল, অসীম বল লাভ করিতে লাগিলাম। যে আর সে শরীর নাই, সেই ভাব নাই। কি কথায় বল,

কি প্রতিজ্ঞার বল! বলিলেই হয় প্রতিজ্ঞা করিলেই হয়। পাপকে ঘুস দেখাইতাম, আর প্রার্থনা করিতাম।" "বুদ্ধি এমনই পরিষ্কার হইল প্রার্থনা করিয়া যেন দশ বৎসর বিদ্যালয়ে ন্যায়শাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, কঠোর শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া আসিলাম।" এ সকল কথা ঈশ্বরের প্রভাবদর্শনজ্ঞাপক। এই প্রভাবদর্শন যখন অব্যবহিত দর্শনে পরিণত হইল তখন তাঁহাতে যোগের সঞ্চার হইল। ঈশ্বরের সহিত যখন তাঁহার যোগ হইল, তখন তিনি কেবল আপনাতে ঈশ্বর দর্শন করিলেন তাহা নহে, তাঁহার যোগনয়ন অপরের ভিতরেও ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিল। আপনাতে যাহা দেখিতে পাই, অপরেতে তাহা প্রত্যক্ষ করা. স্বাধীনতা ও সমতা নিয়ত এক সঙ্গে না থাকিলে কখন ঘটে না। মন্দের দিকে সাধারণ লোকেও আত্মসম অপরকে করিয়া লয়, কিন্তু আমিত্বের প্রাদুর্ভাববশতঃ আত্মসমগুণ অপরেতে দেখা ইহা সাধারণ লোকেতে কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। যোগসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে যখন আমি পাখী উড়িয়া গেল, তখন আপনি শূদ্র হইয়া সকল লোকের পদতলে তিনি সেবক হইয়া রহিলেন, এবং ব্রহ্মেতে সকলের সহিত তাঁহার একাত্মতা উপস্থিত হইল। এই একাত্মতার পরিণতি-সময়ে নববিধানের অভ্যুদয়। ব্রাহ্মধর্ম্মে নবভাব প্রবিষ্ট হইয়া "নব ব্রাহ্মধর্ম্ম" নববিধান নামে ঘোষিত হইল। এই একাত্মতা পূর্ব্বে ছিল না পরে আসিয়াছে। যে স্বাধীনতা মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সেই স্বাধীনতা মন্ত্রবলেই একাত্মতাও তাঁহাতে উদিত হইয়াছে। স্বাধীনতা তাঁহাকে কিছুতে বদ্ধ থাকিতে দেয় নাই বলিয়াই তিনি একাত্মতায় আসিয়া উপস্থিত, অন্যথা তিনি হয় খ্রীষ্টে, নয় গৌরাঙ্গে, নয় বুদ্ধে, নয় অন্য কাহাতেও বদ্ধ

হইয়া পড়িতেন; অন্য সকল লোক যে প্রকার সেই প্রকার ভক্তি প্রেম, যোগ ও কর্ম্মের কোন একটিতে বদ্ধ হইয়া চিরজীবন তাহা-তেই কাটাইতেন। তিনি বলিয়াছেন, "কে জানিত ঈশাকে মানা উচিত? যখন দেখিলাম শ্রীগৌরাঙ্গকে একত্র না করিলে চলে না, তখনই নবদ্বীপে গেলাম; নবদ্বীপ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গকে হৃদয়ে আনিয়া বসাইলাম। বুদ্ধের আবশ্যক হইল, অমনই বৃক্ষতল হইতে বুদ্ধকে প্রাণের মধ্যে আনিলাম। কে জানিত, তিন জনকে একত্র আনিতে হইবে? কে জানিত, ভগবান্ এইরূপে এক এক করিয়া আনিয়া ভক্তমণ্ডলী রচনা করিবেন! ভিতরে ভিতরে কেহ যে এরূপ কৌশল অবলম্বন করিতেছেন, তাহা জানিতাম না।" ভাবসম্বন্ধেও তাঁহার ঐ একই কথা। "কোন ভাবে মন অধিক কাল আবদ্ধ থাকিতে পারে না, অদ্যাবধি দেখি-তেছি, এই ভাবই প্রবল। অধিক কাল কোন একটি গুণের মধ্যে যে বদ্ধ থাকিব, তাহা থাকিতে পারি নাই।" "যাই দেখি-লাম সেই নৌকা এক দিকের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, আবার টানিলাম। এইরূপে হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ রাখিবার জন্য চিরদিনই চেষ্টা করিতেছি।" তাঁহার স্বাধীনপ্রকৃতি কোথাও তাঁহাকে আবদ্ধ থাকিতে দেয় নাই, তাই তিনি তাঁহার জীবনতরী কোন এক ঘাটে বান্ধিয়া রাখিতে পারেন নাই; অনন্তের টানে অনন্ত উন্নতির দিকে উহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন; ঈশ্বরের নিত্য নূতন লীলাভূমি হইয়া তিনি নিত্য নূতন দর্শনে ও নিত্য নূতন কথা শ্রবণে কৃতার্থ হইয়াছেন *। স্বাধীনতা, সমতা, একাত্মতা, এ তিন তাঁহার জীবনের নিত্য ভূষণ ছিল।

* স্বাধীনতানিবন্ধন তিনি ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহাকেও জানিতেন না।

কেশবচন্দ্রে যখন একাত্মতা উপস্থিত হইল, তখন তিনি এক আশ্চর্য্য মত প্রচার করিলেন। যে কোন ব্যক্তির আত্মা হইতে যে কোন প্রার্থনা উত্থিত হউক না কেন উহা কখন তাহার নিজের জন্য নয় সকল মানবমণ্ডলীর জন্য *। যখন তিনি যোগে ঈশ্বরে বাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন ইহলোক এবং পরলোকের ব্রহ্মতনয়গণকে এক প্রাণে প্রাণযুক্ত প্রত্যক্ষ করিলেন। যে কোন জীবে কেন কল্যাণ, মঙ্গল, উন্নতি ও পরিপুষ্টি হউক না, প্রাণশক্তিবলে গূঢ়রূপে উহা সকল জীবের কল্যাণ, মঙ্গল, উন্নতি ও পরিপুষ্টির কারণ হইবে; কেশবচন্দ্র এই বিশ্বাসে যে সকল কথা সময়ে সময়ে বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি আপনার ও অন্য লোকের নিতান্ত অবোধ্য হইয়াছেন। স্বার্থপর পৃথিবী আপনাকে চিনে অন্য আর কাহাকেও চিনে না। যে কোন ব্যক্তির সহিত সকল ব্যক্তির অচ্ছেদ্য যোগ রহিয়াছে,

---

সুতরাং ঈশ্বরের নিকটে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে মীমাংসা করিয়া লইতে হইত, এজন্য ঈশ্বরের কথা শ্রবণ অতি প্রথম হইতে তাঁহাতে ছিল। পরিশেষে যখন তাঁহার ঈশ্বরদর্শন যোগপ্রভাবে উজ্জ্বলতর হইল, তখন দেখিলেন ঈশ্বরের কথা শ্রবণ ও তাঁহার দর্শন হইতেই নব [illegible]নের নূতনত্ব উপস্থিত। "আমি যদি তোমার কথা নিরাকার মুখ হই[illegible] শুনাই ইহাই নূতন। ভগবান্‌কে দেখিতেছি, ইহা কর্ণভেদী নূতন। আমি নূতন দেখাইয়াছি এই যে, তোমাকে দেখা যায়, কাণের কাছে মুখ দিয়ে তুমি কথা কও, এ কোন শাস্ত্রে নাই।"

* (মঙ্গলবার, ৮ই পৌষ, ১৭৯৬ শক No prayer is individual but every prayer offered is related to the whole economy of entire humanity and tends to quicken the universal regeneration of mankind.

এখানে আত্মপর ভেদ করা কেবল অজ্ঞানতা, ইহা পৃথিবী বুঝিবে কি প্রকারে? এই বিশেষ মতের প্রাচুর্ভাবে কেশবচন্দ্র যে সকল কথা ও মত প্রচার করিয়াছেন তাহা আমাদিগের নিকটে অবোধ্য রহিয়াছে। যাঁহারা তাঁহার এই সকল কথা লইয়া প্রকাশে কিছু বলেন, তাঁহারাও অবোধ্য হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহার পথে যাঁহারা চলিবেন, তাঁহাদের জীবন যদি দিন দিন লোকের নিকটে অবোধ্য হয় তাহা হইলে এই বলিয়া তাঁহারা সান্ত্বনা লাভ করিতে পারেন, অবশ্য সে পথে তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন। কেশব চন্দ্রের জীবনের যে মূলতত্ত্ব, সেই মূলতত্ত্ব যদি আমাদের জীবনে না হয়, তাহা হইলে আমরা আর তাঁহার পথে কোথায় চলিতেছি? অবশ্য ভিন্ন পথে ভিন্ন দিকে আমাদের জীবনের গতি হইতেছে, ইহাই মানিতে হইবে। স্বাধীনতাই যখন কেশবচন্দ্রের জীবনের প্রধান মূলতত্ত্ব, তখন সে মূলতত্ত্বানুগত হইলে ঈশ্বরের ব্যবধায়ক জীবনে কি আর কিছু থাকিতে পারে? আমরা শত বার এ কথা বলিলেও আমাদের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ এরূপ ঘোষণা করিতে নিবৃত্ত হইবেন না, কেশবচন্দ্র ইহাদিগের পেয়াগম্বর, তিনি ইহাদিগের মধ্যবর্ত্তী, ইহারা নবসংহিতাকে কোরাণ করিয়াছে, ইহারা ব্রাহ্ম নহে মুসলমান। আমাদের কথিত কথা সমুদায়ের অগ্র পশ্চাৎ বিচার না করিয়া কেবল নিন্দা করিবার জন্য যাঁহারা এরূপ ঘোষণা করিবেন, তাঁহারা আমাদের কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবেন না, কেন না সময় আসিবে যে সময়ে ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা সকল প্রকারের মিথ্যা সংস্কার ও বিদ্বেষবিবর্জ্জিত হইয়া আমাদের সকল কথা তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিবেন, এবং তঁাহাদের বিচারে আমরা নির্দ্দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইব। যাঁহারা আমাদের মিথ্যা

নিন্দা ঘোষণা করিয়া সুখী হইতে চান হউন, আমরা যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতে যেন কদাপি ভীত না হই। বর্ত্তমানে অবোধ্য হইলে ভবিষ্যতে অবোধ্যত্ব অবশ্য তিরোহিত হইবে।

লোকের নিন্দাভয়ে কেশবচন্দ্রের যাহা প্রাপ্য তাহা হইতে আমরা তাঁহাকে কখন বঞ্চিত করিব না। তাঁহার জীবন আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে একটি পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে ইহা বলিতে আর ভয় কি? তাঁহার জীবন বৎসর বৎসর প্রকাশ্যে আলোচনা করিবার কি প্রয়োজন ছিল, যদি তাহা সাধকগণের জীবনের পক্ষে সহায় না হয়। কেশবচন্দ্রের জীবনে যে সকল মূলতত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, সে সকল তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি নহে। তিনি পৃথিবীতে যখন জীবন ধারণ করিয়াছিলেন তখন একা সে সকল মূলতত্ত্বের কল্যাণকর প্রতাপ সম্ভোগ করেন নাই, কিন্তু সমুদায় ব্রাহ্মসমাজ উহা সম্ভোগ করিয়াছে। আমরা কি জানি না, তাঁহাতে যখন যে ভাব বিকাশ লাভ করিয়াছে, উহার প্রভাব তৎক্ষণাৎ সমাজের সকলের জীবনে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীতে দেহে অবস্থান কালে যাঁহার জীবনের প্রভাব এইরূপে সকল বিশ্বাসী জীবনে বিস্তৃত হইয়াছে, তিনি এখন পৃথিবীতে দেহে নাই বলিয়া কি সে প্রভাব তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইয়াছে? এ সকল জীবন কোন কালে পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হয় না, হইতে পারে না। কেশবচন্দ্রের জীবনের মূলতত্ত্ব সকল চারি দিকের বায়ুমণ্ডল মধ্যে নিয়ত আত্মপ্রভাব বিস্তার করিতেছে। সত্য বটে কেশবচন্দ্র এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার এক জনও মনের মানুষ রহিল না, কেবল কয়েকখানি গ্রন্থমাত্র রহিল: এ সময়ে তাঁহার পরিশ্রম সমুচিত ফল বহন করিল না,

যুক্ত দশ সহস্র বৎসর পরেও অন্ততঃ উহা ফলবান্ হইবে। হায়! স্বাধীনতা ও প্রেম এ সুন্দর বীজ তিনি বপন করিয়াছিলেন, তাঁহার বন্ধুগণ এত দূর স্বাধীন হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহাকে বা পর-স্পরকে আর গ্রাহ্য করেন না; স্বাধীনতা বাড়িল তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রেমের বীজের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াই যে অকালে বিনষ্ট প্রায় হইল। তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আশা ও বিশ্বাসও ভূয়োভূয় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আক্ষেপ বাক্য শুনিয়া যেমন এক দিকে নিরাশা উপস্থিত হয়, অন্য দিকে আবার আশা ও বিশ্বাসের কথা শুনিয়া মন উৎসাহান্বিত হয়। তিনি যখন ব্রাহ্মসমাজোপযোগী মূলতত্ত্ব অনুসরণ করিতেছিলেন, তখন বন্ধুগণ তাঁহার সঙ্গে অগ্রসর হইতেছিলেন; যাই নববিধানের মূলতত্ত্ব একাত্মতা তাঁহাতে প্রকাশ পাইল, অমনি সকলে পশ্চাদ্গমন করিতে লাগিলেন; তাঁহার আক্ষেপের পরিসীমা রহিল না। কেশবচন্দ্রের শেষ একাত্মতার জীবন ও একাত্মতাকে মণ্ডলীগত ধর্ম্ম করিবার জন্য যত্ন তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অবোধ্য করিয়া তুলিয়াছে। শেষ জীবনে তিনি Utopia (মনঃকল্পিত রাজ্য) লইয়া ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, এই নিন্দা তাঁহার সম্বন্ধে রহিয়া গিয়াছে। আমরা তাঁহার বন্ধুগণ স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা আশ্রয় করিয়া তাঁহার নামে নিন্দা আরও দৃঢ়মূল করিতেছি। এখনও আমাদের জাগ্রৎ হইবার সময় অতিবাহিত হয় নাই; ঈশ্বরপ্রসাদে যদি এখনও আমরা জাগিয়া উঠি, এবং কেশবচন্দ্র যে পথ দিয়া একাত্মতাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন সেই পথ দৃঢ়রূপে আশ্রয় করি, তিনি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিব, তিনি যাহা সম্ভোগ করিয়াছিলেন

আমরা তাহা সন্তোষ করিব। আমরা কত দূর অগ্রসর হইয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পথে বসিয়া পড়িয়াছি,এখন আর আমাদের জীবনে এমন বল শক্তি উদ্যম উৎসাহ নাই যে, সকল অবসন্নতা দূরে পরিহার করিয়া আবার সতেজে কেশবচন্দ্রের গম্য পথ দিয়া ক্রম ক্রমে অগ্রসর হই। সকল প্রকার অবসন্নতা ও ঔদাসীন্য বর্জ্জন না করিলে সে পথে চলা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। যদি একবার আমরা একমাত্র ঈশ্বরকে আশ্রয় করি, অন্য দিকে দৃষ্টি আর তিলার্দ্ধের জন্য না রাখি, তিনি যে দিক্ দিয়া লইয়া যান, সেই দিক্ দিয়া চলিতে থাকি, তবে আমাদিগের জীবনেও অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে। আজ কেশবচন্দ্রের জন্ম দিনে এ সম্বন্ধে নবীন প্রতিজ্ঞা করিয়া আমাদিগের অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। ঈশ্বর আমাদের সহায়, আমরা সকলপ্রকারের ভয় ভাবনা চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, কেশবের জীবনপথ অবলম্বন করি; তাঁহার জীবনপথে অবিশ্রান্ত চলিয়া কৃতকৃত্য হই।

কেশবচন্দ্রে স্ববিরোধিতা কোন অর্থে? *

অদ্যকার আলোচ্য বিষয়টি যে নিতান্ত গভীর, ইহা শুনিবা-মাত্রই হৃদয়ঙ্গম হয়। এই গভীর বিষয় ভাল করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতে পারি ঈদৃশ সামর্থ্য আমার কোথায়? বস্তুতঃ যদি আমি এ বিষয়ে নিজ সামর্থ্যের প্রতি নির্ভর করি, নিশ্চয় আমাকে অকৃতার্থ হইতে হইবে। বিধানের আলোকে বিষয়টি সকলের নিকটে পরিস্ফুট হইবে, ইহাই আমার মনের আশা। বক্তব্য বিষয়টি যেরূপ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে, তাহাতে শ্রোতৃবর্গের সহজে মনে হইতে পারে যে, কেশবচন্দ্রে অবশ্য স্ববিরোধিতা ছিল, তবে সে স্ববিরোধিতার অর্থান্তর ঘটাইয়া বক্তা উহাকে লঘু করিবেন এই তাঁহার অভিপ্রায়। অর্থান্তর ঘটাইয়া স্ববিরোধিতার লঘুত্বসম্পাদন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, কেন না সেরূপে উহা যত কেন লঘু হউক না তথাপি উহার স্ববিরোধিতা থাকিয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ের বিজ্ঞান ও দর্শনের মত এই যে, আপাততঃ যে সকল বিষয় বিরোধী বলিয়া মনে হয়, সে সকল বিষয় যখন উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিয়া দেখা যায়, তখন তাহাদের অবিরোধিতা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। এ মতের আমরা বিশেষ সমাদর করি, কিন্তু যে সকল জীবন বিরোধিতা বা অবিরোধিতার দিকে কোন দৃষ্টি না করিয়া ক্রমাগত আন্তরিক প্রেরণার অনুসরণ করিয়া জীবনপথে

---

* নববিধান [illegible] ১১ মাঘের প্রদত্ত বক্তৃতানুসৃত।

অগ্রসর হয়, সে সকল জীবনসম্বন্ধে আমেরিকার এক[illegible] সুগভীর চিন্তাশীল ব্যক্তির উক্তি একান্ত সত্য। ইনি [illegible]শের অধিকাংশ যুবকের নিকটপরিচিত এবং বিশেষ ভাবে সম্মানিত; সুতরাং ইঁহার নাম উল্লেখ না করিলেও ইঁহার কথা শুনিলেই অনেকে ইঁহাকে চিনিয়া লইবেন। ইনি বলিয়াছেন, "নির্ব্বুদ্ধিতাসূচক পূর্ব্বাপরসঙ্গতি ক্ষুদ্র মন সকলের বিভীষিকা, ক্ষুদ্রমনা রাজনীতিজ্ঞ, দার্শনিক ও ধর্ম্মাচার্য্যগণ উহার পূজা করিয়া থাকেন। মহাত্মার পূর্ব্বাপরসঙ্গতির কিছুই প্রয়োজন নাই।" কেশবচন্দ্রসম্বন্ধে এই কথাই সত্য। ভাবিয়া চিন্তা করিয়া পূর্ব্বাপরসঙ্গতি রক্ষা করিবেন, এরূপ ভাবে তিনি জীবনপথে অগ্রসর হন নাই। তিনি আন্তরিক প্রেরণায় চলিতেন। যখন তাঁহাতে যে প্রেরণা উপস্থিত হইত, তিনি আপনাকে সেই প্রেরণার অধীন করিতেন। তিনি বাহির হইতে কিছু গ্রহণ করেন নাই, যদি করিয়া থাকেন তাহা আন্তরিক প্রেরণার অনুবর্ত্তন করিয়াই করিয়াছেন। তাঁহাতে কখন কি উপস্থিত হইবে তিনি কিছুই জানিতেন না, সুতরাং পূর্ব্বাপরসঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলা তাঁহার সম্বন্ধে কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে। এরূপ করিয়া চলাতে কেশবচন্দ্রে কি স্ববিরোধিতা ঘটিয়াছে? না, স্ববিরোধিতা ঘটে নাই, সু-অবিরোধিতা ঘটিয়াছে। কেশবচন্দ্রে স্ববিরোধিতা কোন্ অর্থে এখন সকলে বুঝিতে পারিতেছেন। তাঁহাতে স্ববিরোধিতা ছিল না, সু-অবিরোধিতা ছিল। স্ববিরোধিতা এ শব্দটির মত আর কোন ভাষাতে একটী শব্দ দ্বারা বিরোধ প্রকাশ করিয়া আবার সেই শব্দেরই বিশ্লেষে অবিরোধ প্রদর্শন করা যাইতে পারে, এরূপ শব্দ নাই। স্ববিরোধিতা শব্দটি সুতরাং কেশবচন্দ্রে যে সুন্দর অবিরোধিতা ছি[illegible]

তাহা দেখাইবার পক্ষে নিতান্ত উপযোগী। একজন দেশীয় সুপণ্ডিত ব্যক্তি কেশবচন্দ্রের বিষয় বলিতে গিয়া তাঁহাতে স্ববি-রোধিতা দোষারোপ করিয়াছেন। তাঁহা হইতে এই স্ববিরোধিতা শব্দটি গ্রহণ করা হইয়াছে। কেশবচন্দ্রে তিনি স্ববিরোধিতা দোষ ঘটিয়াছে বলিয়াছেন মাত্র, কিন্তু স্ববিরোধিতার কোন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন নাই। আমি বলিতেছি, কেশবচন্দ্রে স্ববিরোধিতা স্ববিরোধিতা নহে, সু-অবিরোধিতা।

ইতঃপূর্ব্বে কেশবচন্দ্রের জন্ম দিনে "কেশবচন্দ্র অবোধ্য কেন?" ইহার ব্যাখ্যায় তাঁহার জীবনের তিনটি মূলতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হয়;— স্বাধীনতা, সমতা, একাত্মতা। এই তিনটীরই সঙ্গে স্ববিরোধিতা আছে কি না প্রথমতঃ দেখিয়া তৎপর সে সমুদায়েতে যে স্ববি-রোধিতা নাই, সু-অবিরোধিতা আছে, ইহা দেখিতে হইতেছে। সর্ব্ব প্রথমে স্বাধীনতার বিষয় বিচার করিয়া দেখা যাউক। স্বাধীনতা যে কেশবচন্দ্রের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, এবং প্রতি ব্যক্তির স্বাধীনতা যে তিনি সমধিক সম্মান করিতেন, ইহা আমরা পূর্ব্ববারে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছি। এবার তাঁহার জীবনী হইতে ইহার বিপরীত কথা আপনাদের নিকটে পাঠ করিয়া শুনাইতেছি। ১৭৯৭ শকের ১৪ আষাঢ় তিনি ব্রহ্মমন্দিরে এইরূপ উপদেশ দেন, "যখন ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে এবং মনুষ্যের প্রতি প্রেমে মনুষ্যইচ্ছা প্রবিষ্ট হইয়া আত্মস্বভাব বিলীন করিয়া ফেলে, তখন আত্মা অধীনতার উন্নত সুখ উপভোগ করে। আত্মবশে স্বাধীনতার ব্রত পালন করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে দুঃখ সহ্য করিতে হয়। আত্মা অধীন হইতে পারিলে ঈশ্বরের সহায়তায় ধর্ম্মের সহায়তায়, পরের অধীন হইতে

স্বাদে। যে অধীনতা সুখের কারণ। ইহাতে প্রেম ভক্তি শা
পিতা লাভ হয়। ঈশ্বরের অধীন জীবের অধীন হইলে দুঃ
আর থাকে না। সেই সাধু আনন্দসাগরে নিমগ্ন হন যাঁহার আ
ঈশ্বরের পদতলে, ভ্রাতা ভগ্নীগণের পদতলে সংস্থাপিত হয়। এ
সময়ে জগতের মঙ্গল আপনার মঙ্গল এক হইয়া যায়, তিনারি
প্রেমে বিশুদ্ধ সুখ লাভ করিতে থাকি। .... স্বাধীন বুদ্ধি
অপরকে আকর্ষণ করিতে গিয়া সমুদায় ধর্ম্মানুষ্ঠানে, সমু
বিষয়ে বিচার কলহ আন্দোলন বৃদ্ধি পায়; অপ্রণয়ের সহ
সহস্র দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া জনসমাজকে ভয়ানক কষ্টে দগ্ধ করে।
"অধীনতা [illegible] স্বতন্ত্র। ইহাতে পাঁচ কোটি পাঁচ সহস্র লো
এক হইয়া যায়। পরস্পরের কল্যাণ অধীনতার নেতা, বুদ্ধি নহে
বুঝিতে পারিতেছি না তথাপি অধীন হইব। ইহাতে আম
মৃত্যু হইতে পারে, তথাপি অধীন হইব। পদে পদে বিপদ্ হ
হউক, অনৈক্যের সম্ভাবনা অল্প। ইহাতে মিলনবন্ধন প্রগা
হইয়া উঠে, পরসেবার আনন্দলাভ হয়। স্বীয় বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিব
আত্ম ইচ্ছা পরের ইচ্ছার সঙ্গে মিশ্রিত হয়। পরের অধী
হইয়া জগতের অধীন হইয়া বিনীত হইব তখন এই আত্ম
চেষ্টা। তখন এই অবস্থায় নিজের ইচ্ছা, অন্যের ইচ্ছা, ঈশ্বরে
ইচ্ছা, এ তিনের যোগ হয়। স্বাধীন বুদ্ধিতে যেন [illegible]তে ম
হয়, তখন এইরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে। এ সময়ে বিপদ আসিলেও
মঙ্গল হয়। বুদ্ধিতে বহু বিচার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা হয়,
ইহাতে তাহা হয় না। অধীনতার মধ্য দিয়া স্বর্গের আলোক
প্রকাশ পায়।" কেবল যে কেশবচন্দ্র এ সময়ে অধীনতার মাহাত্ম্য
কীর্ত্তন করিলেন তাহা নহে, তিনি প্রচারকবর্গকে অধীনতাব্র

প্রবর্তন করিলেন। তাঁহার জীবনী হইতে সেই অংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "তিনি দেখিলেন, তাঁহার প্রতি এবং পরস্পরের প্রতি বাধ্যতা না জন্মিলে প্রচারকবর্গের মধ্যে কোন কালে শান্তি ও প্রীতি সংস্থাপিত হইবার সম্ভাবনা নাই; সাধনার্থও তাঁহারা প্রস্তুত হইতে পারিবেন না। এই দেখিয়া তিনি এক দিন প্রচারকবর্গকে অপরাহ্নে আপনার গৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন। তৃতীয় তলে তাঁহার গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ ছিল। তিনি এক এক জন করিয়া প্রচারককে গৃহমধ্যে ডাকিয়া লইলেন। কেশবচন্দ্র আসনে উপবিষ্ট, সম্মুখে একখানি আসন পাতা রহিয়াছে। সমাগত প্রচারককে সেই আসনে উপবেশন এবং মনে মনে প্রার্থনা করিতে বলিয়া পরিশেষে উপস্থিত প্রচারকের হস্ত বন্ধনপূর্ব্বক প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি কাহার?' উপস্থিত প্রচারক (তাঁহার প্রেরণায় উত্তর দিলেন) 'আমি আচার্য্যের ও পরস্পরের'। তিন বার প্রশ্ন ও তিন বার উত্তর কালে তিন বার উত্থান ও উপবেশন করিলে পর সেই প্রচারককে কি করিতে হইবে বা ছাড়িতে হইবে কেশবচন্দ্র তাহা বলিয়া দিলেন। এক একটি করিয়া প্রচারকগণ গৃহে প্রবেশ করিলে পূর্ব্ববৎ সমুদায় করিলেন। প্রচারকগণ যাহাতে বিনীত হন, উদ্ধতভাব পরিহার করেন, পরস্পরের অধীন হন, এজন্য (জুলাই ১৮৭৫) সাধন প্রবর্ত্তিত হইল।"

যিনি আপনার জীবনবেদে স্পষ্ট বাক্যে বলিলেন, "অধীনতা প্রিয় কেহ যদি ঠক্ হইয়া এখানে ঢুকিয়া থাকে, সে ঠক্‌কে বাহির করিয়া দিব; দিবই দিব। অধীনের দল এখানে নয়;" তিনিই আবার সকলকে অধীনতাব্রতে থাকিতে বদ্ধ করিলেন, ইহা কি স্ববিরোধিতা দোষ নহে? যদি ইহা স্ববিরোধিতা দোষ না হয়,

তবে আর অবিরোধিতা বোধ কাহাকে বলা যাইবে? এখন
সু-অবিরোধিতা কোথায়? সু-অবিরোধিতা আছে কি ন
বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। নিজের মত তাঁহার ক
চাপাইয়া তাঁহার সু-অবিরোধিতা প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিব না
তাঁহার নিজের মতে তাঁহার সু-অবিরোধিতা সুস্পষ্ট সকলে
হৃদয়ঙ্গম হইবে, ইহাই আমার আশা। সকলেই জানেন কেশবচন্
ত্রিনীতি (Trinity) মতে বিশ্বাস করিতেন। ঈশ্বরের প্রকা
সম্বন্ধে এই ত্রিনীতি তিনি সর্ব্বত্র প্রয়োগ করিয়াছেন; যাঁহা
তাঁহার প্রার্থনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন পিতা, পুত্
পবিত্রাত্মা এই তিন ভাবে তিন গুরুতে তিনি এক গুরু স্বীকা
করিয়াছেন। তিনে এক যে গুরু তাঁহার কথা শুনিয়া চলা কেশব
চন্দ্রের বিশেষ মত। ইহা স্বাধীনতাবিরোধী নহে। তাঁহার স্বাধীন
স্বেচ্ছাচার ছিল না, ঈশ্বরাধীনতা ছিল, ইহা সেবার আলোচি
হইয়াছে। ঈশ্বরাধীন হইতে গেলে তিন স্থলে অধীনতা স্বীক
করিতে হয়, পিতার নিকটে, পুত্রের নিকটে, পবিত্রাত্মার নিকটে
খ্রীষ্টসমাজ কথায় পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা বলিয়া থাকেন, কি
কার্য্যকালে তাঁহাদের নিকটে পিতাও থাকেন না, পবিত্রাত্মা
থাকেন না, এক পুত্রেরই সাম্রাজ্য। এ পুত্রও আবার ইতিহাসে
পুত্র, তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন স্বীয় বুদ্ধির আলোকে তা
বুঝিয়া চলা অনেক খ্রীষ্টবাদীর মত। পুত্রের অনুসরণ করিবা
জন্য তবে কি খ্রীষ্টসমাজের শরণাপন্ন হইব? না, তাহা হইতে পারি
না। আমাদের শোণিতের ভিতরে হিন্দুভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, সে
ভাবের অনুরোধে পিতা ও পবিত্রাত্মাকে (পরমাত্মাকে) ছাড়িয়া আম
পুত্রের সমাদর করিতে পারি না। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এ

তিন ভাবে ঈশ্বরের ত্রিবিধ-প্রকাশ হিন্দু মানেন। কিন্তু এ তিনেতেই সেই এক পরব্রহ্ম। এই ভাবানুরোধে কেশবচন্দ্র তিন গুরুকে এক গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, অথচ তিনি তিনের ভিতরে প্রত্যেকও রক্ষা করিয়াছেন। "গুরু হয়ে তিন জায়গায় তুমি প্রকাশিত। পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা তিন, কিন্তু এক; গুরুর মত তিন প্রকারে তিন প্রণালীতে আসিতেছে। ইঁহারা ঈশ্বরতনয়, ইঁহাদের ভিতর দিয়া যা আসে তাও তোমার কথা। চন্দ্র, সূর্য্য, গিরি, নক্ষত্র লতা, পাতার ভিতর দিয়া যা আসে তাও তোমার কথা। আর আমার অন্তরে পবিত্রাত্মার ভিতরে বিবেককর্ণে যা শুনি, তাহা ব্রহ্ম-বাণী। তিন দিক্ দিয়ে শুনি অথচ গুরু এক। পিতা বেদ, পুত্র বেদ, পবিত্রাত্মা বেদ, ত্রিবেদ।" "তিন মত অথচ এক মত। তিন গুরু অথচ এক গুরু।" "ছিলেন এক, হইলেন অনেক গুরু, তাঁর নাম ব্রহ্ম।" "গুরু কথা কও, যার ভিতর দিয়া কথা বলিতে চাও বল। যার ভিতর দিয়া কথা বলিবে, আমি তার পাদপদ্মে প্রণাম করিব। স্বর্গরাজ্যের কথা যার ভিতর দিয়া প্রেরণ কর আমরা নমস্কার করিয়া গ্রহণ করিব।" এ সকল কথা কি দেখায়? এই দেখায় যে ঈশ্বরের অধীনতা অতি বিস্তৃত। এই বিস্তৃত অধীনতাই কেশবচন্দ্রের স্বাধীনতা।

এই বিষয়টি আর এক দিক্ দিয়া দেখা যাউক। কেশবচন্দ্র তাঁহার দৈনিক প্রার্থনায় বলিয়াছেন "মহর্ষি ঈশা বলিয়া গেলেন 'যেখানে থাকিবে তোমরা পাঁচ জন, সেখানে থাকিব আমি।' আমরা যেন ঈশার মত বলিতে পারি, যেখানে ধর্ম্ম সেখানে সত্য; যেখানে সত্যানুরাগ সেখানে আমি, ইনি, তিনি থাকিব।' এই কথাগুলির মধ্যে 'আমি' 'ইনি' 'তিনি' এই তিনটি সর্ব্বনাম-

নিরূপণ করিয়া থাকেন। জগতের কর্তৃত্বে তিনি পণ্ডিতগণ কর্তৃক অনুমিত; জগতের ভিতর দিয়া তিনি ভক্তগণের নিকটে প্রকাশিত। ব্রহ্ম বা পিতাকে লক্ষ্য করিয়াই কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, "চন্দ্র, সূর্য্য, গিরি, নক্ষত্র, লতা, পাতার ভিতর দিয়া যা আসে তাও তোমার কথা।" 'আমি, ইনি, তিনি' এ তিনের বিদ্যমানতা কোথায়? 'যেখানে সত্যানুরাগ সেখানে'। সত্য কোথায়? 'যেখানে ধর্ম্ম সেখানে সত্য'। ধর্ম্মের জন্য যে ব্যক্তি জীবন অর্পণ করে, সত্য তাহার নিকটে আত্মপ্রকাশ করেন। সত্য দর্শন করিলেই অনুরাগ উপস্থিত হয়। এই অনুরাগেই ঈশ্বরের ত্রিবিধ প্রকাশ সে ব্যক্তির নিকটে ব্যক্ত হয় এবং তদধীন হওয়া তাহার জীবনের সার্থকতা।

অনুরাগে ঈশ্বরের ত্রিবিধ প্রকাশের অভিব্যক্তি, এই কথা বলিয়া এস্থলে অনুরাগের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। অনুরাগের উপজীব্য অধীনতা, এই জন্য কেশবচন্দ্র অধীনতাব্রতের বিষয় বলিতে গিয়া বলিয়াছেন, "যখন ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে এবং মনুষ্যের প্রতি প্রেমে মনুষ্য ইচ্ছা প্রবিষ্ট হইয়া আত্মকতাব বিলীন করিয়া ফেলে তখন আত্মা অধীনতার উন্নতসুখ উপভোগ করে।" বিবেকে স্বাধীনতা, প্রেমে অধীনতা। যে হৃদয়ে বিবেক ও প্রেম মিলিত হইয়াছে, সে হৃদয়ে স্বাধীনতা ও অধীনতা সর্ব্ব প্রকারের বিরোধ পরিহার করিয়া এক হইয়া গিয়াছে। এ দুইয়ের একতা ভিন্ন কখন ধর্ম্মের পূর্ণতা লাভের সম্ভাবনা নাই। পূর্ণ ধর্ম্মে বিবেক ও প্রেম, স্বাধীনতা ও অধীনতা একতাবাপন্ন। যেখানে বিবেক নাই, সেখানে প্রেম কখন থাকিতে পারে না। বিবেকবিহীন প্রেম প্রেমই নয়। যাহার বিবেক নাই তাহার প্রেম আছে, এ কথা বলিলে প্রেমের অবমাননা করা হয়। হৃদয় তন্ত্র বা

হইলে স্বার্থের গন্ধ যায় না, স্বার্থের গন্ধ না গেলে প্রেমের উদয় হইবে কি প্রকারে? যাহার স্বার্থ আছে সে কি কখন আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারে? সে যাহা করে আপনার জন্যই করে। যে ব্যক্তিতে বিশুদ্ধ প্রেম আছে, তাহাতে বিবেক থাকিবেই থাকিবে। বিবেক সকল প্রকার প্রবৃত্তি বাসনার বন্ধন হইতে আমাদিগকে মুক্ত করে; এই মুক্তভাবই স্বাধীনতা। সুতরাং স্বাধীনতা বিবেকমূলক। যদি এক ব্যক্তির প্রবৃত্তি বাসনা চলিয়া গেল, তাহা হইলে তাহাতে স্বার্থের তিরোধান এবং প্রেমের আবির্ভাব অনিবার্য্য। এ অবস্থায় কি হয়? "জগতের মঙ্গল আপনার মঙ্গল এক হইয়া যায়।" প্রেম কি না কল্যাণ চায়, তাই আপনাকে ভুলিয়া গিয়া যখন উহা পরের কল্যাণ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কল্যাণও অনুস্যূত হইয়া যায়। মানিলাম বিবেক আমাদিগকে প্রবৃত্তি বাসনা হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন করিল; এই স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে নিস্বার্থভাব উপস্থিত হওয়াতে আমাদিগের মধ্যে প্রেমের উদয় হইল; কিন্তু প্রেমের উদয়ে অধীনতার উদয় ইহা কি প্রকারে আসিতেছে? আসিতেছে এই জন্য যে, প্রেম সকল প্রকারের প্রভুত্বের চেষ্টা ছাড়িয়া দেয়, কেবলই প্রণত হইয়া অপরের সেবা করে। "প্রভুত্বের চেষ্টা আপনার দিক্ রক্ষা করে; দাসত্বের চেষ্টা পরের মঙ্গল চায়।" প্রেমের ভিতরে আপনাকে অস্বীকার এবং পরকে সর্ব্বস্ব করা রহিয়াছে। আপনাকে অস্বীকার করিয়া পরকে সর্ব্বস্ব করিলেই প্রভুত্ব গেল দাসত্ব আসিল, দাসত্ব আসিলেই অধীনতা অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। আপনাকে অস্বীকার করিয়া পরকে সর্ব্বস্ব করা নারীজাতির প্রকৃতি। নারী আপনাকে অস্বীক

ধর্ম্মিণী স্বামীর সহিত এক হইয়া যান, স্বামীর কল্যাণার্থ আপনার জীবন মন সমর্পণ করেন, অধীনতা তাঁহার জীবনের ব্রত হয়। এ অধীনতাকে কে নিন্দা করিবে? এ অধীনতার নেতা যে স্বামীর কল্যাণ। কল্যাণ অধীনতার নেতা, এজন্য এখানে আপনার ইচ্ছা স্বামীর ইচ্ছা ও ঈশ্বরের ইচ্ছা তিন এক হইয়া যায়। নারীতে বিবেকের কঠোর ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না, এ জন্য তাঁহাতে বিবেকের অভাব সাব্যস্ত করিতে পারি না। তাঁহাতে প্রেম ও বিবেক এমনই মিশিয়া গিয়াছে যে, প্রেমের কোমলতা সর্ব্বদা সকলের নয়নগোচর হইলেও প্রবৃত্তি বাসনার বিরুদ্ধ পথে গতি নারী যেমন দৃঢ়তার সহিত অবরুদ্ধ রাখেন, এমন পুরুষের করিবার সামর্থ্য নাই। নারী স্বভাবতঃ পুণ্যময়ী, সুতরাং তাঁহাতে প্রথম হইতে প্রেমের প্রকাশ অনিবার্য্য তাঁহাকে কাহার বিবেকসম্ভূত শুদ্ধতা শিক্ষা দিতে হয় না, তাঁহার স্বভাবের মূলে শুদ্ধতা সর্ব্বদা বিদ্যমান। শ্রীচৈতন্য ভক্তির অবতার। প্রেম তাঁহার জীবনের মূল উপাদান। তিনি বিন্দুমাত্র শুদ্ধত্বের ক্ষতি সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি নারীভাব স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাই শুদ্ধতার প্রতি তাঁহার ঈদৃশ সুকোমল অনুরাগ ছিল। বিবেক পুরুষ, প্রীতি নারী, এ দুয়ের সম্মিলনে শুদ্ধ প্রেমের উদয়। ঈশ্বরের জন্য সর্ব্বত্যাগী প্রেমিক প্রকৃতির ভাব স্বীকার করেন, এ জন্য ছোট হরিদাসকে শ্রীচৈতন্য যখন বর্জ্জন করেন, তখন তাহার কারণ তিনি এই প্রদর্শন করিয়াছিলেন,

প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি-সম্ভাষ।
প্রভু মোর তাহ মুখ না করে দর্শন ॥

একাধারে যেখানে নরনারীপ্রকৃতি মিলিত হয় নাই, সেখানে প্রেমের উদয় হইতে পারে না ; সর্ব্বথা জগৎ, জীব ও ঈশ্বরের অধীনতা উপস্থিত হয় না ; পূর্ণ পবিত্রতার সাম্রাজ্য বিস্তার হয় না। কেশবচন্দ্র 'একাধারে নরনারীপ্রকৃতি' বিষয়ে উপদেশ দানকালে বলিয়াছেন, * "তিনি (শ্রীচৈতন্য) একাধারে রাধা কৃষ্ণের মিলন, যোগ ভক্তির ঐক্য, প্রেম পুণ্যের যোগ, এবং নরনারীর বিবাহ, অনুরাগ বৈরাগ্যের মিলন দেখাইলেন।" "পৃথিবীতে পুরুষ নারীকে বিবাহ করে, নারী পুরুষকে বিবাহ করে ; কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে পুরুষ আপনাকে বিবাহ করে, নারী আপনাকে বিবাহ করে, এই যে নরনারী আপনাকে আপনি বিবাহ করে, ইহাই স্বর্গীয় বিবাহ। এই স্বর্গীয় বিবাহপ্রথা অনুসারে চৈতন্য নিজেই নিজের স্ত্রী হইলেন।" "ঘরের বিষ্ণুপ্রিয়া এখন সন্ন্যাসীর বিষ্ণুপ্রিয়া হইলেন। চৈতন্য দেখিলেন তিনি স্ত্রীপ্রকৃতি ভক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের সময় ভক্তচূড়ামণি আপনার ঐ প্রকৃতিকে আপনি বিবাহ করিলেন।" এই আধ্যাত্মিক বিবাহে বিবেক ও প্রেম, স্বাধীনতা ও অধীনতা এক হয়।

স্বাধীনতাতে মন আপনার ভিতরে বদ্ধ থাকে, অধীনতাতে উহা প্রমুক্ত ভাবে সকল নরনারীকে আলিঙ্গন করে। জগতের কল্যাণের অধীন হইলে কি আর মানুষ আপনাতে আপনি বদ্ধ থাকিতে পারে ? কেশবচন্দ্র ভালই বলিয়াছেন, "ধন্য ঈশা চৈতন্যের ন্যায় সন্ন্যাসী, যাঁহারা একটি নার পরিবর্ত্তে সহস্র

* বক্তৃতাকালে তাবচ্ছ যাহা উল্লিখিত হইয়াছিল এবং তাহা হাতে ধর্ম্মতত্ত্ব উপদেশাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

ঘাকে বরণ করেন, সমস্ত পৃথিবীকে ভাই ভগিনী মনে করেন এবং দুই একটি অতিথির পরিবর্ত্তে হৃদয়গৃহে সহস্র সহস্র অতিথির সেবা করেন। যিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী তিনি ছোট সংসারের সঙ্গে এক প্রকাণ্ড সংসার যোগ করেন, এক খানি ঘরের পরিবর্ত্তে তিনি কোটি কোটি ঘর এবং অল্প কয়েক জন বন্ধুর পরিবর্ত্তে অসংখ্য ভাই ভগিনী লাভ করেন।" সন্ন্যাসী কে? যিনি সমুদায় ঈশ্বরের জন্য, অপরের জন্য অর্পণ করিয়াছেন। এরূপ অর্পণ অধীনতা বিনা কোন কালে সম্পন্ন হয় না, অধীনতা ও প্রেম এ জন্য চিরসংযুক্ত। এখন কথা হইতেছে, জগতের কল্যাণের অধীন হইলে কোন মানুষ বা মানুষসমূহের অধীন হওয়া হইল না, কেবল এক কল্যাণরূপী ঈশ্বরের অধীন হওয়া হইল; কিন্তু কেশবচন্দ্র যে অধীনতার ব্রত দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের এবং দলের অধীনতা-স্বীকার রহিয়াছে, এখানেও কি এ অধীনতাকে প্রেম বলিতে হইবে? তিনি যখন প্রচারকবর্গকে ব্রত দিলেন, তখন আচার্য্যের এবং পরস্পরের অধীন হইবার প্রতিজ্ঞায় তাঁহাদিগকে বদ্ধ করিলেন। "অধীনের দল এখানে নয়" এ কথার সঙ্গে তাঁহার মিল থাকিল কোথায়? তিনি যে প্রচারকগণকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া একটি অধীনের দল প্রস্তুত করিবার জন্য প্রয়াস পাইলেন। কেবল পরস্পরের অধীন হইতে নহে নিজের অধীন হইতেও কেশবচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছেন, ইহাতে কি পোপের অধিকার গ্রহণ করিবার অভিলাষ তাঁহাতে প্রকাশ পাইতেছে না? "দলের কেহই অধীনতায় জীবিত নহেন, কিন্তু স্বাধীনতায়। আমি কাহাকেও যাতায় পেষণ করিতে মানস করি না.

প্রত্যেককে স্বাধীন দেখিতে চাই। কাহাকেও গুরু অথবা শাসনকর্ত্তা বলিতে বলি না, ঈশ্বরকেই কেবল গুরু ও শাসনকর্ত্তা বলিয়া জানি।" এ সকল কথা এখন কোথায় রহিল? আপনার এবং পরস্পরের অধীন করিবার জন্ত এত প্রয়াস কেন? স্বাধীনতায় জীবিত থাকিতে না দিয়া অধীনতায় জীবিত রাখিবার জন্ত যত্ন কি ব্যর্থ যত্ন নহে? "এ দলের কেহই অধীন হইবেন না" এ কথা এখন তিনি বিস্মৃত হইলেন কেন? এত দলের সহিত স্বাধীনতা প্রচার করিয়া পরে আবার অধীনতার গুণব্যাখ্যা অধীনতাপ্রবর্ত্তনে প্রবৃত্তি, ইহা কি স্ববিরোধিতা নয়? স্ববিরোধিতা নয়, ইহার মধ্যে সু-অবিরোধিতা আছে, ইহাই দেখা প্রয়োজন। আচার্য্য এবং পরস্পরের অধীন হইব, এ প্রতিজ্ঞার কি এই অর্থ নহে যে, আচার্য্যের প্রতি এবং পরস্পরের প্রতি প্রেমে সর্ব্বথা আপনাকে উড়াইয়া দিব? যদি এ অর্থ হয়, তবে কেশবচন্দ্র এ প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করিয়া কিছু স্বাধীনতাকে উড়াইয়া দেন নাই। যাহারা স্বাধীন নহে স্বার্থের অধীন, তাহারা কি কখন এ প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারে? যদি প্রচারকগণ জীবনে ঐ প্রতিজ্ঞাপালনে অসমর্থ হইয়া থাকেন, তাহার কারণ অস্বাধীনতা বা স্বার্থাদির অধীনতা, স্বাধীনতা নহে। এ দিক্ দিয়া না দেখিয়া অন্ত দিক্ দিয়া দেখিলেও সু-অবিরোধিতা স্পষ্ট প্রকাশ পায়। আচার্য্য এবং পরস্পরের অধীনতা সংসারের অনুরোধে, না ধর্ম্মের অনুরোধে? যদি ধর্ম্মের অনুরোধে হয়, তাহা হইলে সেখানে সত্য থাকিবে, সত্যের প্রতি অনুরাগ থাকিবে। আচার্য্য ও পরস্পরের সহিত সাংসারিক সম্বন্ধ না হইয়া ধর্ম্মের সম্বন্ধ হইলে এ সম্বন্ধ বন্ধনের কারণ হইবে না, মুক্তির কারণ হইবে। কেন

যা এই বক্তৃ হইতে সত্যের আগম হইবে, সুতরাং সকলকে স্বাধীন করিবে। আচার্য্য হইতে যে সব বড় সত্যের নিত্য আগম হইতেছে, তৎপ্রতি অনুরাগ বা প্রেম যদি অধীনতার কারণ হয়, তাহা হইলে স্বাধীনতার বিলোপ হইল কোথায়? বরং উহা বাসনা প্রবৃত্তি স্বার্থ তিরোহিত করিয়া স্বাধীনতা আরও দিন দিন বর্দ্ধিতই করিবে। আগম শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

আগতঃ শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজাননে।
মতঞ্চ হৃদয়াম্ভোজে তস্মাদাগম উচ্যতে॥

ঈশ্বর হইতে এক ব্যক্তির নিকটে সত্য আসিল, সে সত্য অন্য দশ জনের হৃদয় অনুমোদন করিল, তখন সত্যের আগম হইয়াছে বুঝা গেল; কেশবচন্দ্র সত্যের আগমসম্বন্ধে কি এইরূপ কথা বলেন নাই? তিনি আপনি বলিয়াছেন, "আমি কি ইচ্ছা করি যে, আমি এই সকল বলিলাম বলিয়া তোমরা গ্রহণ করিবে? কখন নয়, আমি বিচারিত হইতে অভিলাষ করি। আমার মত সমুদায় সুতীক্ষ্ণ বিচারের অধীন হউক। গৃহে গমন কর, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটি তন্ন তন্ন করিয়া দেখ, [illegible] তুলিত কর, আমি যে সকল মূলতত্ত্ব স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিলাম [illegible] প্রত্যেকটি যত্ন সহকারে চিন্তা করিয়া দেখ, তৎপর যে কোন সত্য ঈদৃশ একান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে সেইটি গ্রহণ কর, যেটি ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইবে, সেটিকে অগ্রাহ্য কর। আমার ওষ্ঠাধর হইতে যে কোন কথা বিনিঃসৃত হয় তাহা আমার স্বদেশীয়গণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে না যদি তাঁহাদের অন্তরস্থ পরমাত্মা কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হয়।" তিনি আপনার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন মণ্ডলীর নেতৃবর্গসম্বন্ধে তাহাই সত্য। কেশবচন্দ্রকর্ত্তৃক লিখিত ঈশ্বরের কথোপকথনে

আছে, "যদি তোমাদের নেতাগণ তোমাদিগকে শিক্ষা দেয়, তোমা-দের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে আত্মকর্তৃক অনুমোদিত না হইলে অন্যায়ের জ্ঞান গ্রহণ করিও না।" কেশবচন্দ্র আপনি কি প্রার্থনা করেন নাই, "যার ভিতর দিয়া কথা বলিবে আমি তার পাদপদ্মে প্রণাম করিব। স্বর্গরাজ্যের কথা যার ভিতর দিয়া প্রেরণ কর আমরা নমস্কার করিয়া গ্রহণ করিব।" কিন্তু ঈশ্বরের কথা আসিল বুঝিব কি প্রকারে? "তারে কি খবর এলো বিবেকের ভিতর দিয়া শুনিতে হইবে।" সুতরাং বিবেক বা তন্মূলক স্বাধীনতা না থাকিলে সত্য বুঝিবার বা গ্রহণ করিবার কোন উপায় নাই। আপনি প্রত্যাদিষ্ট না হইলে সমাগত সত্য বুঝিতে বা গ্রহণ করিতে পারে কাহার সাধ্য? এই সত্যই কেশবচন্দ্র প্রার্থনায় বলিয়াছেন, "যখন পবিত্রাত্মা দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হই, তখন মাচ কথা কয়, গাছ কথা কয়, ইন্দুর ছুঁচো স্বর্গরাজ্যের সংবাদ আনে।" স্বাধীন আত্মা পবিত্রাত্মার আবাসভূমি, এবং পবিত্রাত্মা আমাদিগকে সত্যের প্রতি অনুরাগ ও অধীনতা বা শিষ্যপ্রকৃতি শিক্ষা দিয়া থাকেন। আচার্য্যের ভিতর দিয়া যে সত্য আসিল তৎপ্রতি অনুরাগ ও তদধীনতাই আচার্য্যের অধীনতা। সুতরাং ইহা অন্য কথায় ঈশ্বরাধীনতা।

আচার্য্যের অধীনতার কি অর্থ, এবং তন্মধ্যে যে স্ববিরোধিতা নাই প্রদর্শিত হইল, এখন পরস্পরের অধীনতাসম্বন্ধে যে বিশেষ কথা আছে তাহা বলিতে যত্ন করা যাউক। ধর্ম্ম, সত্য ও ঈশ্বরের নামে যাঁহারা একত্র হন, তাঁহারা ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট মণ্ডলী। এই মণ্ডলীকে আমরা কখন সামান্য দৃষ্টিতে দেখিতে পারি না, ইহা পবিত্রাত্মার আবাসভূমি। খ্রীষ্টশাস্ত্রে ঈশাকে বর, এবং মণ্ডলীকে কন্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এ উপমাটী অতি সুন্দর।

বর ও কন্যার সহিত যেমন অভিন্ন যোগ ঈশা ও মণ্ডলীর সহিত তেমনি অভিন্ন যোগ। খ্রীষ্টশাস্ত্রের এ উপমা ছাড়িয়া দিয়া আমরা অন্য দিক্ দিয়া ঈশা বা ঈশ্বরতনয় ও মণ্ডলীকে একেবারে এক বলিয়া উপস্থিত করিতে পারি। মণ্ডলী পবিত্রাত্মজাত ঈশ্বর-তনয়। তিনি যাহা বলেন, যে বিচার করেন, তাহা পুত্রের বলা, পুত্রের বিচার। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঈশ্বরতনয় ঈশা জুডিয়া দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এখন তিনি নাই, ঈদৃশ ঈশ্বরতনয় আমাদের বিশ্বাসভাজন নহেন। তিনি আমাদিগের নিকটে আমাদের সম্মুখে আছেন। কি ভাবে আছেন? কিরূপে আছেন? সাধকগণের মিলিতভাবমধ্যে আছেন, মণ্ডলীরূপে আছেন। ঈশা বলিয়াছেন, তাঁহার উপরে ঈশ্বর বিচারের ভার দিয়াছেন, তিনি আসিয়া সকলের বিচার করিবেন। তাঁহার শিষ্যগণ বহু দিন হইল প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, কৈ তিনি তো বিচার করিতে আসিলেন না! তাঁহার শিষ্যেরা মনে করিয়াছিলেন, তিনি পুনরায় শরীর ধারণ করিয়া ধরাধামে আসিবেন, সিংহাসনে বসিয়া সকল জাতির বিচার করিবেন। যাঁহারা এরূপ ভাব মনে স্থান দিয়াছিলেন, তাঁহারা ঈশার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার নামে যেখানে দুই জন বা তিন জন একত্র হয়, তাহাদের মধ্যে আমি বিদ্যমান।" এই বিদ্যমানতা লক্ষ্য করিয়াই তিনি বিচার করিতে আসিবেন বলিয়াছিলেন। কেন না তাঁহার নামে যাঁহারা মিলিত, তাঁহারা যে বিচার করেন স্বর্গে ও পৃথিবীতে তাহা দৃঢ়তর থাকিবে, এ কথা বলিয়া তিনি বিচারের ব্যাপার কিরূপে নিষ্পন্ন হইবে, তাহা আপনি সুস্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন। এখন এই সকল কথার আলোকে বিচার করিয়া দেখিলে

পরস্পরের অধীন হইবার জন্য কেশবচন্দ্র প্রচারকগণকে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ কেন করিয়াছিলেন, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। প্রেমে তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের অধীন হইবেন, ইহা সর্ব্ব প্রথম কথা, দ্বিতীয় কথা এই যে, পরস্পরের শাসন মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহারা পরস্পরের অধীনতা স্বীকার করিবেন। এ অধীনতা এত দূর যে তাঁহাদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি যদি মনে করেন যে, তিনি অমুক বিষয়ে ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথচ সকলে যদি সেই বিষয়ে তাহার বিপরীত আদেশ পান, তাহা হইলে কোন কথা না বলিয়া আপনাকে ভ্রান্তজ্ঞানে সকলে যে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাকে সেই আদেশের অনুবর্ত্তী হইতে হইবে *। প্রতিব্যক্তিকে মণ্ডলীর নিকটে এইরূপে প্রণত হওয়া যখন বিধি, তখন পরস্পরের অধীনতা স্বীকারের প্রতিজ্ঞা কখন বিরুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। মণ্ড-লীস্থ প্রতিব্যক্তি মণ্ডলীর শাসনবিধির অধীন হইবেন, ইহা

---

* ১৭৯৭ শকের আষাঢ় মাসে অধীনতাব্রতসম্বন্ধে উপদেশ হয়, শ্রাবণ মাসে প্রচারকসভায় নিয়ম হয় "বিধাতা হইতে সমাগত আদেশ বিধানস্থ সকলের নিকট এক সময়ে একই প্রকারে আসিবে, ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্নরূপে আসিবে না। ভিন্ন হইলে উহা ভ্রান্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কোন নির্দ্ধারণ ব্যক্তিগত আদেশের বিপরীত হইলেও এই জন্য তাহা বিনা প্রশ্নে মানিতে হইবে।" এই সময় প্রচারকগণ অধীনতাব্রতসাধনে প্রবৃত্ত ছিলেন। এই বিধান যে ইহার পূর্ব্ব হইতে ছিল এক বৎসরের পূর্ব্বের লিপিতে তাহা আমরা দেখিতে পাই। (২৫শে শ্রাবণ ১৭৯৬ শক) "প্রচা-রকেরা এই সভার অধীন, যদি কেহ কখন এই সভার শাসন অতিক্রম করিয়া বিপথগামী হন, তিনি ইহার কোন বিধান আক্রমণ করিতে পারিবেন না।" এ সম্বন্ধে প্রচারকগণ আপনাদিগকে অঙ্গীকারপাশে বদ্ধ করেন।

প্রতিজ্ঞা করিয়া যখন তাঁহারা মণ্ডলীভুক্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহারা সে অঙ্গীকার কখন ভঙ্গ করিতে পারেন না। মণ্ডলী তাঁহাদের সম্বন্ধে বিচারকপদে প্রতিষ্ঠিত। মণ্ডলী যে বিচার করিবেন সে বিচার স্বর্গে ও পৃথিবীতে সুসিদ্ধ হইবে। মণ্ডলীকে অগ্রাহ্য করিয়া কেহ স্বর্গে গমন করিবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। "বুঝিতে পারিতেছি না তথাপি অধীন হইব, ইহাতে আমার মৃত্যু হইতে পারে তথাপি অধীন হইব," সমবেত সাধকগণের প্রতি এরূপ দৃঢ় নিষ্ঠা যিনি পোষণ করেন না, তিনি কখন ধর্ম্মসমাজে থাকিবার যোগ্য হইতে পারেন না। আপনাকে যিনি সাধকগণমধ্যে উড়াইয়া দেন নাই, তাঁহার দ্বারা প্রেম-পরিবার সংস্থাপিত হইবে, ইহা কি কখন সম্ভব? "প্রেমব্রত গ্রহণ করিয়া স্বাধীন ইচ্ছা, স্বাধীন বুদ্ধি পরিহার কর, এক মিনিটের মধ্যে অন্ততঃ তোমাদের পাঁচজনের মধ্যেও মিল হইবে, সকল প্রকারের কলহ, বিবাদ, অপ্রণয় তিরোহিত হইবে"; আপনাকে সকলের ভিতরে উড়াইয়া না দিলে এ সত্য কি এ সংসারে প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারে? আপনাকে বজায় রাখিয়া কোন দিন প্রেম হয় নাই, হইতে পারে না, এই জন্য 'অধীনতা ব্রতের' অপর নাম 'প্রেমব্রত'।

কেশবচন্দ্রের কথা বলিতে গিয়া আত্মকথা বলা যদিও শোভা পায় না, তথাপি কেশবচন্দ্র যে মূলতত্ত্ব স্থাপন করিলেন তাঁহার অনুগামী বলিয়া যাঁহারা প্রসিদ্ধ তাঁহারা তাঁহার সেই মূলতত্ত্ব কত দূর আপনাদের জীবনে গ্রহণ করিয়াছেন পৃথিবী ইহা জানিতে চায়। আমার সম্বন্ধে মণ্ডলীমধ্যে একটি অপবাদ প্রচলিত আছে, যে অপবাদকে আমি আমার সম্বন্ধে প্রাপ্ত

মনে করিয়া থাকি। আমাদের মধ্যে অনেকে এই কথা বলেন, আমার আপনার বলিবার কোন মত নাই ; আমি আত্মমতে চলি না পরের মতে চলি। এটী আমার নিতান্ত দুর্ব্বলতা, ইহা সকলের সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমি এটীকে দুর্ব্বলতা মনে করি না, আমার জীবনে ইহাতেই বলাধিষ্ঠান। কোন একটি বিষয় উপস্থিত হইলে তৎসম্বন্ধে আমার কোন মত নাই, ইহা মনে করা সত্য নহে, সে সম্বন্ধে আমি আমার মত পশ্চাতে রাখিয়া দি, তৎসম্বন্ধে মিলিত সাধকগণের মত কি তাহাই জানিবার জন্য উৎসুকচিত্ত হই। যদি তাঁহাদিগের মতের সহিত আমার মত মিলে (অনেক সময়ে এইরূপই ঘটিয়া থাকে) আমি আনন্দিত হই, যদি না মিলে আমার মত উড়াইয়া দিয়া তাঁহাদের মতের অনুবর্ত্তন করি। কোন এক ব্যক্তির সহিত আমার মতের অনৈক্য হইলে আমি আত্মমতে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকি, কখন তাঁহার মতের অনুবর্ত্তন করি না, কেন না সমবেত সাধকগণের মতে আত্মমত বিসর্জ্জন করিতে আমি ঈশ্বর কর্ত্তৃক আদিষ্ট। সমবেত সাধক বলিতে আমি বিধানান্তর্গত ব্যক্তিগণকে বুঝি। প্রেরিতবর্গের সন্নিধানে আমার মস্তক চির অবনত, কিন্তু তাহা বলিয়া আমি তদতিরিক্ত সাধকগণের নিকটে মস্তক অবনত করি না তাহা নহে। সর্ব্ববিষয়ে প্রেরিতমণ্ডলীর অধিষ্ঠানভূমি শ্রীদরবারের অধীনতা স্বীকার আমার জীবনের ব্রত, কিন্তু ভারতের নানা স্থানে বিধানান্তর্গত যে সকল ব্যক্তি আছেন, আমি যখন তাঁহাদের সেবা করিতে যাই, তখন তত্রত্য মণ্ডলীর অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহাদের সেবা করিয়া থাকি। আমি কাহারও প্রভু নই, সকলে আমার প্রভু, ঈশ্বরকৃপায় যত দূর

সাধ্য এই সত্য প্রতিপাদনে যত্ন করি। অধীনতাব্রতকে আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত মনে করি, এই ব্রতে যেন চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারি, ইহাই আমার হৃদয়ের প্রার্থনা। কোন এক ব্যক্তির সম্বন্ধে বিচার করিবার অধিকার সমবেত সাধকগণের, এ বিধি কেশবচন্দ্র অতি যত্নের সহিত পালন করিতেন। "কোন ব্যক্তির বিচার করিতে আমি নাই" এ কথা যে তিনি মুখে বলিয়াছেন, তাহা নহে, বাস্তবিকই তিনি আপনি কখন কাহারও বিচারের ভার গ্রহণ করেন নাই। বিচারের বিষয় উপস্থিত হইলে তিনি প্রচারকগণের সভায় (পর সময়ে শ্রীদরবারে) উপস্থিত করিতেন, আপনি তৎসম্বন্ধে কিছু করিতেন না। এক সময় একটি অত্যন্ত ক্লেশাবহ বিচারের বিষয় উপস্থিত হয়। জনসমাজের নিকটে গোপন করিয়া সে বিষয়ে বিচার কর্ত্তব্য ছিল, সুতরাং একা বিচার করিলেই সকল গোল মিটিয়া যাইত, কিন্তু তিনি একা বিচার করিতে পারেন না বলিয়াই সকলকে প্রচারকসভায় সমবেত করিয়া তাঁহাদিগের নিকটে বিষয়টি উপস্থিত করিলেন এবং তৎসম্বন্ধে যাহা বিহিত করিবার ভার প্রচারকবর্গ হইতে আপনি গ্রহণ করিলেন। বিচারসম্বন্ধে যেমন তেমনি প্রচারকসভায় উপস্থিত বিষয়সম্বন্ধেও তাঁহার অধীনতাস্বীকার ছিল। কোন বিষয় সভায় উপস্থিত করিয়া সভায় এক জনেরও মত না পাইলে তিনি নিবৃত্ত হইতেন। তাঁহার এই অধীনতাস্বীকার যদি আমার জীবনে অক্ষুণ্ণ থাকে, আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব।

স্বাধীনতা ও অধীনতা এ দুই সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রে স্ববিরোধিতা ঘটে নাই সু-অবিরোধিতা ঘটিয়াছে, ইহা এক প্রকার

দেখান হইল, এখন তাঁহার দ্বিতীয় অনুসর্তব্য মূলতত্ত্ব সমতা-সম্বন্ধে স্ববিরোধিতা ঘটিয়াছে কি না বিচার করিয়া দেখা যাউক। সাম্যের বিরোধী বৈষম্য। যদি দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার আপনার সহিত অপরের সমতা তিনি স্বীকার করেন নাই, তাহা হইলে তাঁহার জীবনের মূলতত্ত্ব সমতা ছিল প্রতিপন্ন হয় না। তিনি যে বিধান প্রচার করিয়াছেন, তাহা ঈশ্বর-দর্শনপ্রধান। যাঁহাদের ঈশ্বরদর্শন হয় না, অথবা যাঁহারা বলেন ঈশ্বরদর্শন হয় না, তাঁহারা এ বিধানের লোকমধ্যে গণ্য নহেন। সকলের পক্ষেই ঈশ্বরদর্শন সম্ভব, এই কথা প্রচার করিয়া যদি কেশবচন্দ্র বলিয়া থাকেন "আমার মাকে কি দেখেছিস্ তোরা বল সত্য করে," তাহা হইলে তিনি আপনার কথা আপনি খণ্ডন করিয়াছেন, তাঁহাতে স্ববিরোধিতা দোষ উপস্থিত হইয়াছে। বিশ্বাসিমাত্রেই ঈশ্বরকে দর্শন করেন, এ কথা বলিয়া তিনি আবার বলিলেন, আমার মাকে কি তোমরা দেখিয়াছ? বন্ধুবর্গের প্রতি ঈশ্বরদর্শনসম্বন্ধে এরূপ সন্দেহ প্রকাশ কেন? 'আমার মা' এরূপ বলিবারই বা অর্থ কি? তাঁহার মা এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের মা এক নহেন, ইহাই কি তিনি ইহার দ্বারা বলিতেছেন না? এক স্থানে যদি এরূপ একটী কথা তিনি বলিতেন, তাহা হইলে মনে হইত, হঠাৎ এরূপ কথা মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, কিন্তু এরূপ বৈষম্য এরূপ প্রভেদ তাঁহার অস্থিগত ছিল, ইহা মনে করিবার বিশেষ কারণ আছে। তিনি আর এক স্থানে বলিয়াছেন, আমার হরি সত্য হরি, আর সকলের হরি খুঁটো হরি। সেই সকল খুঁটো হরিকে বিনাশ করিয়া সত্য হরির সাম্রাজ্য যাহাতে স্থাপিত হয়, তাহার জন্য

তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন। এ সকল কথায় আপনাকে বাড়াইয়া অপর সকলকে কি খর্ব্বকরণ করা হয় নাই? তাঁহার হরি বড় আর সকলের হরি খুঁটো এ কি প্রকারের কথা। ইহা যদি বৈষম্য না হয়, তাহা হইলে বৈষম্য আর কাহাকে বলে? এ আবার কিন্তু সামান্য বিষয় লইয়া বৈষম্য নয়, একেবারে ধর্ম্মের মূল লইয়া বৈষম্য। এখন দেখা যাউক এই বৈষম্যের মধ্যে সাম্য আছে কি না? 'আমার মা' 'আমার হরি' বলিয়া অপরের মা অপরের হরি হইতে কেশবচন্দ্র আপনার ঈশ্বরকে স্বতন্ত্র করিলেন কেন? প্রাচীন ও নূতন এ প্রকারে বিভাগ না করিয়া ধর্ম্মের ইতিহাস কখন পাঠ করা যাইতে পারে না। ঈশ্বর চিরদিনই এক, তাঁহাতে কোন পরিবর্ত্তন নাই, কিন্তু মানবের নিকটে তাঁহার প্রকাশ এক প্রকার নয়। কেশবচন্দ্র তাঁহার একটী প্রার্থনায় বলিয়াছেন, "তোমার বিস্তীর্ণ দরবারে বসিয়া ভাই বন্ধু সকলে মিলে তোমার পূজা করিতেছি। আগে তুমি যেমন ছিলে তেমনি রয়েছ কি না বল; অর্থাৎ আগে আমরা তোমাকে যেমন দেখিতাম তেমনি করিয়া দেখি কি না বল। ঈশ্বর আছেন, তিনি যে চিরকাল সমান, কিন্তু প্রাপ্ত ঈশ্বর তিনি কি সমান? তবে [illegible]কর্ম্ম থাক্, আর কিছু চাই না। এমন পবিত্র এমন নাস্তিক হইলাম এত দিনে? এমন দুর্দ্দশা দুর্গতি আমাদের? তুমি সমান? তবে তুমি যাও। তুমি বল আমার হরি, এই কথাটী সহজ করে বল যে, যা ছিলে তুমি তাই কি না? তোমার সম্বন্ধে তুমি তাই থাক আপত্তি নাই। যদি না থাক আপত্তি আছে। কিন্তু আমার সম্বন্ধে যদি সমান থাক, আমার যারা লব্ধ হরি যদি চিরকাল সমান থাক, তবে আমার মরা ভাল।" এই কথা গুলি ভাল

করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে মাতে মাতে প্রভেদ হরিতে হরিতে প্রভেদ কেন হয় তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। মা চিরদিন যেমন তেমনি আছেন, হরি যেমন চিরদিন তেমনি আছেন; কিন্তু আদিম কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত নরনারী কি সমান ভাবে তাঁহাকে দেখিয়াছে? তাহাদিগের গ্রহণসামর্থ্য অনুসারে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখি-য়াছে। অনেক দূরে যাইতে হয় না, য়িহুদিগণের যিহোবা এবং ঈশার পিতা, এ উভয়ের মধ্যে কত তারতম্য। অসভ্য বর্ব্বর জুলু যে ভাবে ঈশ্বরকে দর্শন করে, সভ্যতার উচ্চ ভূমিতে আরূঢ় ব্যক্তিগণ কি সেই ভাবে ঈশ্বরকে দর্শন করেন? এক সম্প্রদায়ে ঈশ্বরের ভাব যে প্রকার অন্য সম্প্রদায়ে ঈশ্বরের ভাব তাহার বিপরীত। এই ভাবের প্রভেদবশতঃ সম্প্রদায়ভেদ হইয়া পড়িয়াছে। খ্রীষ্টান ও বৈষ্ণব একত্র মিলিতে পারেন না কেন? কেবল বিজাতীয় বলিয়া মিলিতে পারেন না তাহা নহে। উভয় ধর্ম্মের বিষয় যাঁহারা বিচার করিতে সমর্থ, তাঁহারা এ দুইয়ের মধ্যে এত পার্থক্য দেখেন যে, এ দুইকে কিছুতেই এক করিতে পারেন না। আমরা সকলে এক সময়ে বাস করিতেছি, আশা করা যাইতে পারে যে, আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের ভাবসম্বন্ধে একতা থাকিবে। কিন্তু একই সময়ে একই শিক্ষাধীনে থাকিয়া ঈশ্বর-সম্বন্ধে আমাদের ভাবের কত তারতম্য! এক অখণ্ড ঈশ্বর বুদ্ধিভেদে খণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছেন, নানা জন তাঁহাকে নানা ভাবে গ্রহণ করিতেছেন। এই বুদ্ধিভেদ নিবারণ করিয়া এক অখণ্ড ঈশ্বরকে গ্রহণ করা কেশবচন্দ্রের জীবনের উচ্চতম লক্ষ্য। তিনি আপনি অখণ্ড ঈশ্বরকে গ্রহণ করিয়া খণ্ড ঈশ্বর ঈশ্বর

মনুষ্য, ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিয়াছেন, আমার হরি সত্য হরি, আর সকলের ঝুঁটো হরি। এ কথা বলাতে প্রতি-মনুষ্যের ঈশ্বরদর্শনে সামর্থ্য তিনি অস্বীকার করিতেছেন না, কিন্তু ঈশ্বরসম্বন্ধে ভ্রান্ত জ্ঞান দূরে পরিহার করিয়া সত্য ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ঈশ্বরদর্শনে সামর্থ্য কেশবচন্দ্র এবং আর সকলের সমান ইহা তিনি স্বীকার করিতেন। কিন্তু লোকে আলস্য জড়তার অধীন হইয়া ঈশ্বরদর্শনের জন্য আপনাদের সমুদায় হৃদয় মন প্রাণ সমর্পণ করে না এই জন্য সত্য ঈশ্বর তাহাদিগের নিকটে প্রকাশ পান না, ইহা তাঁহার এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য। তিনি ঈশ্বরের মাতৃভাব যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার বন্ধুগণ প্রাচীন ভাবের সহিত এ ভাবও সংযুক্ত আছেন বলিয়া সেরূপ উপলব্ধি করেন নাই, এই জন্যই বলিয়াছেন, "আমার মাকে কি দেখেছিস্ তোরা বল সত্য করে।" তাঁহার মাকে তাঁহার বন্ধুগণ কখন দেখিতে পাইবেন না, এরূপ বলা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু সকলে একই মাকে দর্শন করুন, এই বাসনা হইতে এ কথা তাঁহার হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়াছে। সকলে মিলিয়া এক সত্য হরি, এক সত্য মাকে দর্শন করিবেন, এই চেষ্টায় তিনি দেহপাত করিলেন। এ সম্বন্ধে কেহ তাঁহাতে বৈষম্য আরোপ করিবে, ইহা একান্ত অসম্ভব।

এই ঈশ্বরদর্শনসম্বন্ধে আর এক দিক্ দিয়া কেশবচন্দ্রে স্ববিরোধিতা আছে, অনেকে বলিতে পারেন। কেশবচন্দ্র ঈশ্বরদর্শনে মধ্যবর্ত্তিতা অস্বীকার করিয়াছেন, আবার বলিয়াছেন, "নিশ্চয়ই তোমরা পুত্রের মধ্য দিয়া বিনা পিতার নিকটে পৌঁছিতে পার না।

এই অবশ্যম্ভাবী যুক্তিযুক্ত মধ্যস্থিতা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না।" কি বিপরীত কথা! ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ ব্রাহ্মধর্মের প্রাণ, অথচ সেই প্রাণ কেশবচন্দ্র আপনি বিনষ্ট করিতে উদ্যত। ইহা যদি স্ববিরোধিতা না হয়, তাহা হইলে স্ববিরোধিতা আর কাহাকে বলে? ইহা আপাততঃ দেখিতে নিতান্ত স্ববিরোধী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কেশবচন্দ্রের প্রকৃত মত সমালোচন করিলে ইহা যে সু-অবিরোধী তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না। কেশবচন্দ্র ক্রমোন্মেষ (Evolution) মতের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মানুষে জড়, পশু, মানব ও দেবতা পর পর স্তরে অবস্থিত স্বীকার করিতেন। মানুষ যখন নিদ্রা আলস্য ঔদাসীন্য প্রভৃতির অধীন, তখন তাহাতে জড়ের আধিপত্য। ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি পশুভাব নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া জড়ের আধিপত্য নষ্ট করিতেছে, কিন্তু এই পশুভাব আবার মানবকে নীচ বাসনা নীচ প্রবৃত্তি সমুদায়ে বদ্ধ রাখিয়া তাহার মহত্ত্ব ও গৌরব হরণ করিতেছে। মানুষ পশুভাব নির্জ্জিত করিয়া মানবত্ব লাভ করে, কিন্তু ইহাতেও তাহার পূর্ণ ক্রমোন্মেষ সাধিত হইল না। নীচ পশুবৃত্তি সমুদায় যখন বিবেকাধীন হইল তখন মানবত্ব প্রস্ফুটিত হইল। মানবত্ব প্রস্ফুটিত হইয়াই শেষ হইল না। যখন নীচবৃত্তি ও বিবেকের মধ্যে সংগ্রাম নিঃশেষ হইয়া বিবেকের আধিপত্য স্থাপিত হইল, তখন পুণ্যের আবির্ভাব হইয়া মানবকে দেবত্ব দান করিল। কেশবচন্দ্র প্রতিমানবসম্বন্ধে এই ক্রমোন্মেষ স্থাপন করিয়াছেন। তিনি যেখানে ঈশ্বরতনয়ের মধ্যবর্ত্তিতার একান্ত অপরিহার্য্যত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সেখানে এই ক্রমোন্মেষের মত

এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;—"নিশ্চয়ই মানুষের শরীর একটি প্রকাণ্ড বাৰ্ণারস বাক্স। এটি একটি সুদৃঢ় কাষ্ঠোৎপন্ন যন্ত্র যাহার মধ্যে মানবপশু বাস করে। এই মানবপশুর বাহিরের আবরণ উন্মোচন কর মনুষ্যত্ব দেখিতে পাইবে। আর একটু গভীর প্রদেশে প্রবেশ কর মনুষ্যত্বের ভিতরে ঈশা আবৃত রহিয়াছেন দেখিতে পাইবে। দেখ। ঈশার ভিতরে পবিত্রাত্মা লুক্কায়িত, সেই পবিত্রাত্মার গভীর প্রদেশে গমন কর, তুমি অবশেষে অদৃশ্য মহান্ আর সত্য যিনি তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। মানুষ এবং ঈশ্বরের ভিতরে খ্রীষ্ট কি তবে মধ্যগত যোগশৃঙ্খল নহেন? প্রত্যেক মানবের আত্মার গভীরতম স্থানে মহান্ ঈশ্বর বিদ্যমান। কিন্তু যে বিশুদ্ধ পুত্রত্বে গূঢ় ঈশ্বরনিলয় পরিবৃত্ত, তন্মধ্য দিয়া না গেলে সে নিলয়ে যাইতে পারা যায় না। প্রতিব্যক্তিতে পুত্রের যে চরিত্র ও ভাব নিহিত আছে তাহার মধ্য দিয়া না গেলে কেহ দেবত্বে পঁহুছিতে পারে না। এই অর্থে খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যবর্ত্তী।" প্রতিব্যক্তির মধ্যে পুত্রত্ব অবস্থিত, সেই পুত্রত্ব জাগ্রৎ হইয়া না উঠিলে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাদ্দর্শন হয় না, কেশবচন্দ্র এ কথা কত স্থানে কত ভাবে বলিয়াছেন। সে সকল কথা যাঁহারা ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিবেন তাঁহারা আর এ কথা বলিতে সাহস করিবেন না যে, কেশবচন্দ্রের মধ্যবর্ত্তিত্বের মত কোন একটি বাহিরের বিষয়। আত্মাতে আমরা পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকি। কিন্তু আত্মা যখন পশুভাবের অধীন তখন ধর্ম্ম আমাদিগের হইতে দূরে। যখন ধর্ম্ম পশুত্বের উপরে কর্ত্তৃত্ব লাভ করে, তখন আমরা মানবত্বের অধিকারী হই। এই মানবভাব তখনই পূর্ণতা লাভ করে যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার

আনুগত্য আমাদের জীবনে স্বভাবসিদ্ধ হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছার আনুগত্যই ঈশা বা ঈশ্বরপুত্রনামে অভিহিত, সুতরাং উহা আর আমাদের বাহিরের কোন বিষয় হইল না। আমরা যখন সর্ব্বথা ঈশ্বরের অধীন হই তখন তাঁহার আবির্ভাবে পূর্ণ হই, অন্য কথায় তাঁহাকে দর্শন করি। পুণ্যপ্রভাবাধীন আত্মার মধ্যে আমরা ঈশ্বর দর্শন করি, এ কথা বলাও যাহা, কেশবচন্দ্রের নিকট মধ্যবর্ত্তিতার মতও তাহাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁহাতে স্ববিরোধিতা নাই, সু-অবিরোধিতাই আছে। কেশবচন্দ্র সহজ ভাষা অবলম্বন না করিয়া ঈশা বা পুত্রত্বকে এ স্থলে আনিলেন কেন, এ কথার বিচার এখানে না করিয়া পরে যথাস্থানে করা যাইবে।

ঈশ্বরদর্শনসম্বন্ধে স্ববিরোধিতা সু-অবিরোধিতায় পরিণত হইল, এখন ঈশ্বরের বাণীশ্রবণসম্বন্ধে যে স্ববিরোধিতা তাঁহার উপরে অপরে আরোপ করিয়াছেন,তৎসম্পর্কীয় বিচারের অবতারণা করা যাউক। ইহার মধ্যে বিরোধিগণের প্রাচীন পত্রিকা পাঠ করা আমার প্রয়োজন হইয়াছিল,তন্মধ্যে দেখিতে পাইলাম, কেশবচন্দ্রের এক জন নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সঙ্গী তৎপ্রতি এই দোষারোপ করিয়াছেন যে, কেশবচন্দ্র তাঁহাকে বলিয়াছেন, যত দিন তিনি জীবিত আছেন তাঁহার বন্ধুগণ কখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করিবেন না। কেশবচন্দ্রের প্রতি যদি এ দোষারোপ সত্য হয় তাহা হইলে সকলেই আদেশ প্রাপ্ত হইতে পারে কেশবচন্দ্রের প্রকাশ্যে প্রচারিত এ মত গোপনে প্রচারিত মত দ্বারা খণ্ডিত হইতেছে। এক জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিরোধী হইয়া কেশবচন্দ্রের বিরোধে যে কথা প্রচার করিলেন, তাহা কখন সত্য নহে, ইহা আমি বলিতে চাই না; কেন না তাঁহার ঘনিষ্ঠসম্পর্কীয় লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ

এ বিশ্বাস পোষণ করিতেন এবং করেন যে, এক কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করিতেন, আর কেহ ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করেন না। কেশবচন্দ্র কখন এমন কোন কথা বলিয়া থাকিবেন, যাহা শুনিয়া তাঁহাদের এ প্রকার অপ্রত্যয় উপস্থিত হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিবার হেতু আছে। কারণ আমি এক জন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি যে, এক সময়ে কোন এক জন প্রচারক অমুক প্রদেশে প্রচার করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন এই বলিয়া তথায় যাইবার ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি গোপনে কৌতুকচ্ছলে এই বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, অমুক অমুক স্থানে যাইতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার এই কথা শুনিয়া এই ফল হইয়াছে যে, কেশবচন্দ্র ছাড়া অপর কেহ যে আদেশ প্রাপ্ত হন, তৎপ্রতি এ বন্ধুর আস্থা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। কেশবচন্দ্র এরূপ কেন বলিয়াছিলেন, তাহার আমূল বিচার করিবার ইঁহার সামর্থ্য নাই, সুতরাং তাঁহার সে কথার গভীর ভাব ইনি বুঝিতে সমর্থ হইলেন না, কেবল আপনার বিশ্বাসকে চিরদিনের জন্য শিথিল করিয়া ফেলিলেন। কেশবচন্দ্রের একটী সামান্য কথায় যখন তাঁহার প্রতি আস্থাশীল ব্যক্তিগণের ইষ্টানিষ্ট উভয়ই হইতে পারে, তখন সত্য হউক মিথ্যা হউক, লোকের মনে তাঁহার কোন কথায় যদি কোন সংস্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই অযথাসংস্কারনিরসনের জন্য যত্ন করা নিতান্ত প্রয়োজন। কেশবচন্দ্রের আদেশসম্বন্ধে কি মত ছিল, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি এ মতে বিশ্বাস করিতেন না যে, সকলে সকল বিষয়েই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি যে কার্য্যে ঈশ্বরকর্তৃক নিযুক্ত, সেই কার্য্যে তিনি ঈশ্বরের আদেশ

প্রাপ্ত হন এই তাঁহার বিশেষ মত। চিকিৎসক চিকিৎসা কার্য্যে, শিল্পী শিল্পসম্বন্ধে, কবি কবিত্ববিষয়ে, বিজ্ঞানী বিজ্ঞান-সিদ্ধ আবিষ্কারে আদেশ প্রাপ্ত হন, কেশবচন্দ্র যদি এরূপ বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কেহই আর সে বিষয়ে তাঁহার উপরে দোষারোপ করিতে পারেন না। কেশবচন্দ্র যে এইরূপই মত পোষণ করিতেন তাহা তাঁহার নিজের কথাতেই ব্যক্ত আছে, সুতরাং উহা আর সপ্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। অধ্যাত্মরাজ্যেও এক এক ব্যক্তি এক এক বিষয়ে ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত হন, কেশবচন্দ্রের ইহা বিশেষ মত। 'প্রত্যাদিষ্ট' বিষয়ের উপদেশে কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, "আমাদের মধ্যে এমন সকল লোক আছেন, যাঁহাদিগের হৃদয় মনের মধ্যে ঈশ্বর অবতীর্ণ; যাঁহাদিগের চরিত্রমধ্যে আমরা ঈশ্বরের ভাব বুঝিতে পারি। এই কথা দ্বারা কেহ এরূপ মনে করিও না যে, ঈশ্বর কেবল আমাদের কয়েক জনের মধ্যেই অবতীর্ণ, আর সাধারণ লোকেরা ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নরকে বাস করিতেছে; তাহারা আর ঈশ্বরের কোন সত্য, কিংবা ভাব লাভ করিতে পারে না। ইহা অত্যন্ত জঘন্য মিথ্যা, ইহা ঘৃণিত অনৃত বাক্য। যাঁহার ভিতরে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশবায়ু ঘুরিতেছে, তিনি যে সকল বিষয়েই প্রত্যাদিষ্ট হন ইহা মিথ্যা কথা। যিনি এক মাসে প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন, তিনি যে সকল মাসেই প্রত্যাদেশ পাই-বেন ইহা সত্য কথা নহে। অথবা যিনি এক বিষয়ে প্রত্যাদেশ পান, তিনি যে সকল বিষয়ে প্রত্যাদেশ লাভ করেন, ইহা মিথ্যা। ......যাঁহারা ঈশ্বরের নিয়োগপত্র পাইয়া কার্য্য করেন, তাঁহা-দিগের কপালে ধক্ ধক্ করিয়া স্বর্গের জ্যোতি জ্বলিতে থাকে,

তাঁহারা আপনারাই বলেন, এই এই বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্ত ঈশ্বর আমাদিগকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন।" যিনি যে বিষয়ে আদিষ্ট সেই বিষয় ছাড়িয়া অন্ত বিষয়ে তাঁহার হস্তক্ষেপ করা সমুচিত নয় কেশবচন্দ্রের এই বিশেষ মত। তিনি এ সম্বন্ধে স্পষ্ট বলিয়াছেন, "তুমি ক্ষমা দ্বারা তোমার শত্রুদিগকে পরাস্ত করিতে আসিয়াছ, আর কিছু করিতে পার আর না পার, তুমি জগতে কেবল ক্ষমার দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাও, ইহাতে জগৎ উদ্ধার হইবে। তুমি জন্ম উদাসীন, ফকীর হইয়া পৃথিবীতে জন্মিয়াছে, ঈশ্বর হইতে ফকিরী ভাব পাইয়াছ, তুমি জগৎকে কেবল সেই লক্ষণ দেখাইয়া যাও, তাহাতেই জগতের পরিত্রাণ হইবে, তোমার অন্ত লক্ষণ দেখাইবার প্রয়োজন নাই।......ঈশ্বরের আদেশে যিনি গান বাঁধিতে আসিয়াছেন, তাঁহার বাদ্যে হস্ত দিবার প্রয়োজন কি? যিনি ক্ষমাচন্দ্র প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন, তিনি যেন বিনয় অথবা সাহসের দৃষ্টান্ত দেখাইতে চেষ্টা না করেন। যিনি বিনয়ী হইতে আসিয়াছেন, তিনি স্বর্গের আর কোন লক্ষণ দেখাইতে যেন অহঙ্কার না করেন। অহঙ্কারশূন্ত হইয়া আপন আপন নিয়োগপত্র দেখিয়া কার্য্য করিয়া চলিয়া যাও; কেহই অনধিকার চেষ্টা করিও না।" এরূপ অনধিকার চেষ্টা কেন কেহ করিবেন না, তাহার কারণ তিনি এইরূপে দেখাইয়াছেন, "যিনি যে কার্য্যের জন্ত প্রেরিত, তিনি যেন কেবল সেই কার্য্যই করেন, সেই কার্য্যসম্পর্কে যত দূর আবশুক তিনি প্রত্যাদেশ অথবা ঈশ্বরনিশ্বাস পাইবেন এবং পৃথিবীও সেই বিষয়ে তাঁহার অনুকূল হইয়া তাঁহার প্রয়োজনীয় সমুদায় দ্রব্য আনিয়া দিবে।" কেশবচন্দ্র ঈদৃশ মত প্রচার করিয়া প্রতিব্যক্তিসম্বন্ধে ঈশ্বরের

রিয়া সঙ্কুচিত ভূমির মধ্যে আবদ্ধ করিলেন, সকল ব্যক্তিই সকল হইতে পারেন ঈদৃশ মানবীয় সামর্থ্যকে খর্ব্ব করিলেন, কোন কোন ব্যক্তিকে বিশেষ মর্য্যাদাসম্পন্ন করিয়া অপর ব্যক্তিসকলকে তাঁহাদিগের হইতে হীন করিলেন, এরূপ দোষারোপ তাঁহার প্রতি অনেকে করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা তৎপ্রতি এরূপ দোষারোপ করিবেন, তাঁহাদের জানা উচিত যে, কেশবচন্দ্র বিজ্ঞানবাদী ছিলেন, ঈশ্বর যেরূপে কার্য্য করেন তাহাই দেখিয়া তৎসম্বন্ধীয় সত্য প্রচার করিতেন, এ সম্বন্ধে লোকে আত্মাভিমানবশতঃ কি প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করে তৎপ্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, অন্যথা তিনি কখন এ কথা বলিতেন না, "কার্য্যের জন্য অহঙ্কার এবং ঈর্ষা পোষণ করিয়া পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করিও না। তোমার পাঁচ খানি কার্য্য আছে, আমার না হয় দুই খানি কার্য্য আছে,তাহাতে আমার দুঃখের বিষয় কি? এবং তোমারই বা গৌরবের বিষয় কি? ঈশ্বর যাহাকে যাহা করিতে বলিয়াছেন, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।" জনসমাজে যদি সকল ব্যক্তিই অমুক কার্য্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া সেই কার্য্য করিত, তাহা হইলে কি সমাজের শৃঙ্খলা থাকিত, না বিবিধ প্রয়োজন নিষ্পন্ন হইত? সকলেই রজক হইলে বস্ত্র ধৌত করিতে দিত কে? সকলেই ক্ষৌরী হইলে ক্ষৌর কর্ম্ম করিত কে? প্রত্যেকে এক বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট হইলে ঠিক এই প্রকারই বিশৃঙ্খলা হইত। কেশবচন্দ্র তাই বলিয়াছেন, "কেহই আপনার অধিকার ছাড়িয়া অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিও না। ঈশ্বর যাহাকে যে স্থানে রাখিয়াছেন, তিনি যেন সেই স্থানেই বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে সকলের কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে।"

এখন কেশবচন্দ্রের এই সকল কথার সঙ্গে তাঁহার প্রতি যে তোষামোদ হইয়াছে, তাহার কত দূর ঐক্য বা অনৈক্য আছে ইহা দেখা উচিত। তিনি যদি তাঁহার কোন বন্ধুকে বলিয়া থাকেন, আমি থাকিতে অপর কাহারও আদেশ পাইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে দেখিতে হইতেছে, তাঁহার আপনার জীবনের কার্য্যসম্বন্ধে যে সকল আদেশ পাইতেন, সেই সকল বিষয় লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিয়াছেন, অথবা তাঁহার জীবিতাবস্থায় কেহ কোন প্রকারের আলোক পাইবেন না এই তাঁহার মত ছিল। এরূপ যে তাঁহার মত ছিল না তাঁহার আপনার লেখাতেই সকলে দেখিতে পাইবেন। একা কেশবচন্দ্র সকল কার্য্য করেন, আর কেহই কিছু নহেন, এই কথার প্রতিবাদে তিনি লিখিয়াছিলেন ইহা মিথ্যা কথা, ইহা ব্যর্থ তোষামোদবাক্য। তিনি আচার্য্য এ সম্বন্ধে তাঁহার যাহা প্রাপ্য তাহা গ্রহণ করিতে তিনি কুণ্ঠিত নহেন, কিন্তু আচার্য্যকৃত্য ছাড়া অন্য বহুবিধ কার্য্য আছে, যাহার জন্য তিনি অপরের নিকট হইতে সর্ব্বদা সাহায্য লাভ করিয়া থাকেন। তিনি এ সকল কথা বলিতে গিয়া স্পষ্ট বলিয়াছেন "একটি অঙ্গের সম্মাননা করিও না, [illegible] সমুদায় দেহের সম্মাননা কর।" * তিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক আচার্য্যপদে

---

* Too much adulation like too much reviling is disagreeable and ought to be proscribed ; specially if there is untruth or unfairness in it. The minister of the New Dispensation may justly be honored and respected as such, and any love or attachment he may win by personal influence,

প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিধানবাদীর যে নব নব সত্য, নব নব সদনুষ্ঠান, নব নব অবস্থান্তরের লাভ ও স্থাপন করিতেছেন, তৎ-সম্বন্ধে অন্যের মুখলোপ করা কখন অনুচিত নয়, ইহা আমি বিলক্ষণ জানি এবং এ কথা স্পষ্ট বলিতে আমি কুণ্ঠিত নহি, কেন না ইতিহাস আমার এ বিশ্বাস দৃঢ় সপ্রমাণ করিয়াছে। যদি ইতিহাস উহা সপ্রমাণ না করিত তবে তাঁহার নিজের কথাতেই আমি তাঁহাকে বঞ্চক বলিয়া স্থির করিতাম। "প্রত্যাদিষ্ট" এই উপদেশে তিনি আপনি বলিয়াছেন, "তুমি স্বীকার করিতেছ, মনুষ্যচরিত্র গঠন করিতে তুমি এই সংসারে আসিয়াছ। তোমার স্পর্শমাত্র কঠোর মন বিগলিত হয়, পাপা-সক্ত চিত্ত ঈশ্বরের দিকে পরিবর্ত্তিত হয় এবং অতি সহজে চরিত্র গঠিত হয়, যদি এরূপ না হয়, তুমি প্রবঞ্চক।" বর্ত্তমান বিধান-

---

will not be grudged being his due. But let him not receive more than is due to him. There are others too connected with the movement who are deserving of honor, and it would be unfair and wrong to transfer their share of the credit to the minister ..... It is a lie to say that the leader does everything and that he can get on without his brothers. No. Their assistance is material. They are valued auxiliaries. Their special abilities and talents for their respective fields of work, the minister does not possess. He does his work; they do theirs. Let not ignorance or flattery exclaim, he does the whole work. Such praise would not be honest. Honor not a limb; but honor the whole body, that you may glorify the God of the Church.—*The New Dispensation, May 5, 1881.*

সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের প্রত্যাদেশলাভের অতি বিস্তৃত ভূমি ছিল, সে ভূমি তিনি আপনি অধিকার করিয়া ছিলেন, অপরে সে ভূমি অধিকার করিবে, কালে অধিকার হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করিবে, ইহা তিনি কোন কালে বিশ্বাস করিতেন না, অতএব তিনি জীবিত থাকিতে তাঁহার কার্য্যসম্বন্ধে কেহ প্রত্যাদেশ লাভ করিবে, ইহা যদি তিনি বিশ্বাস না করিতেন, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে তৎপ্রতি কোন দোষারোপ করা যাইতে পারে না, কেন না এ সম্বন্ধে তাঁহার স্থিরতর মত ছিল, এবং সে মত তিনি কোন কালে গোপন করেন নাই। কোন এক জন প্রচারক অমুক প্রদেশে প্রচার করিতে যাইতে আদেশ পাইয়াছেন ইহা বলিয়া যদি তিনি ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেন, তাহাতে কেশবচন্দ্রের অপ্রত্যয় অবশ্য দোষের বিষয় অনেকে মনে করিবেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে ঈশ্বরালোকে যে বিধি প্রতিষ্ঠিত আছে, তৎপ্রতি যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা আর তজ্জন্য কেশবচন্দ্রে দোষারোপ করিতে পারেন না। কোন প্রচারকের কোন স্থানে প্রচারে গমন ব্যক্তিগত আলোকে নির্দ্ধারিত না হইয়া সমবেত আলোকে নির্দ্ধারিত হইবে, ইহাই স্থিরতর ব্যবস্থা। কেহ কোথাও প্রচারে যাইতে আদেশ পাইয়াছেন বলিতেছেন, অথচ তাঁহার সহযোগিগণের তাহাতে অনুমোদন হইতেছে না; এ স্থলে সে প্রচারকের ভ্রান্তি সমুপস্থিত বুঝিতে হইবে। এমন ঘটনা প্রচারকসভায় লিপিবদ্ধ আছে, যাহাতে এক জন প্রচারক আদেশ মনে করিয়া দূরতম দেশে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার সহযোগিগণের অনুমোদন হয় নাই। এ স্থলে এইরূপ ব্যবস্থা হইত যদি তিনি আপনার আদেশকে কার্য্যতঃ সত্য বলিয়া প্রতিপাদন

বলিতে পারেন, তাহা হইতে তাঁহার ব্যক্তিগত আদেশ, আদেশ বলিয়া স্বীকৃত হইবে। এ সকল বৃত্তান্ত যাঁহারা জানেন না বা বুঝেন না, কেশবচন্দ্রের কোন একটী কথাকে বিপরীত ভাবে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের অনিষ্ট হইবে, ইহা আর কিছু অসম্ভব নহে। ফলতঃ ঈশ্বরবাণীশ্রবণসম্পর্কীয় মতে কেশবচন্দ্রে স্ববি-রোধিতা ছিল না, স্ব-অবিরোধিতা ছিল, ইহা পূর্ব্বাপর সমুদায় বিষয় ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন। কেশবচন্দ্রের সমুদায় মত বিজ্ঞানসঙ্গত, বিজ্ঞানের প্রণালী অবলম্বন করিয়া তৎসম্বন্ধে বিচার না করিলে যেখানে স্ব-অবিরোধিতা সেখানে স্ববিরোধিতা প্রতীত হইবে ইহা আর একটা অসম্ভব ব্যাপার কি?

আর একটি বিষয়ে কেশবচন্দ্রের সমতা মূলতত্ত্ব একেবারে খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে, ইহা যে কোন ব্যক্তির মনে প্রতিভাত হইবে। তিনি অনেক স্থানে পাষণ্ড, ঈশ্বরের শত্রু প্রভৃতি শব্দ এমন তীব্রভাবে ব্যবহার করিয়াছেন যে, তাহাতে তিনি এ সম্বন্ধে মুসলমানগণ হইতে কিছু মাত্র ন্যূন ছিলেন, ইহা মনে হয় না। কতকগুলি লোক ঈশ্বরের প্রিয়, কতকগুলি লোক ঈশ্বরের অপ্রিয়, কতকগুলি লোক তাঁহার সুহৃৎ, কতকগুলি লোক তাঁহার শত্রু, এরূপ প্রভেদ যে ধর্ম্ম তিনি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে কি সমুচিত? যে কালে মানবজাতিতে ঈশ্বরসম্পর্কীয় উন্নত ভাব ছিল না সে কালে এরূপ প্রভেদ শোভা পাইত, যিনি সমুদায় মানব-জাতিকে ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মাতৃত্বে এবং সৌভ্রাত্রে এক করা আপনার জীবনের সর্ব্বোচ্চ কার্য্য বিশ্বাস করিতেন, তাঁহাতে এ প্রকার বৈষম্য কিছুতেই শোভা পায় না। তিনি একবার নয় দুই

বার বার ব্রাহ্মসমাজের ভিন্নমতের লোকদিগকে অনেকবার আক্রমণ করিয়াছেন, এমন কি 'ঈশ্বরের শত্রু' এ কথা বঙ্গভাষায় তাঁহা হইতেই প্রচলিত হইয়াছে। তিনি আপনি বলিয়াছেন, যে সমাজে স্বাধীনতার ঈদৃশ সমাদর সে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন দল হওয়া অপরিহার্য্য, অথচ তিনিই মতভেদাদি জন্য তীব্র আক্রমণ করিয়াছেন ইহা কিরূপ কথা? মতভেদের জন্য কেশবচন্দ্র কখনও কাহাকেও তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন কি না, ইহা গভীর প্রশ্ন। জ্ঞানগত বৈষম্য জন্য আক্রমণ এবং সত্য ও ধর্ম্ম হইতে স্খলন জন্য আক্রমণ, এ দুই কিছুতেই এক নহে। সমাজের অনীতি ও অধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ অন্তরের গভীর প্রেম হইতে সমুত্থিত হয়, ইহা ঈশা প্রভৃতি মানবজাতির হিতাকাঙ্ক্ষিগণের দৃষ্টান্তে আমরা দেখিতে পাই। যাহারা লোকের পাপদুঃখে উদাসীন তাহারা তাহার কোন সংবাদই লয় না, কিন্তু যাঁহারা তজ্জন্য আকুল তাঁহারা কি কখন উদাসীন থাকিতে পারেন? পাপের প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে দেখা ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। এই সকল ব্যক্তি কোন মানুষকে কোন কালে আক্রমণ করেন নাই, তাহার পাপকে আক্রমণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে একটী মত দাঁড়াইয়া গিয়াছে, পাপীকে আক্রমণ করিও না কিন্তু তাহার পাপকে আক্রমণ কর। কিন্তু লোকে বলে এরূপ মত কার্য্যতঃ জীবনে প্রতিপালিত হওয়া কি কখন সম্ভব? কেশবচন্দ্র যদি এমত প্রচার করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি জীবনে এ মত প্রতিপালন করিয়াছিলেন আশা করা যাইতে পারে, কেন না তাঁহাতে জীবন ও মত দুই স্বতন্ত্র ছিল না; যাহা তিনি জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই জগতে প্রচার করিয়াছেন। 'ঈশ্বরের শত্রু' এ শব্দ তিনি

কোন্ অর্থে ব্যবহার করিতেন, যাঁহারা তাঁহার উপদেশাদি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ভাল জানেন। 'পাপ ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা' ইহা তাঁহার বিশেষ মত। আমরা প্রতিজন যখন পাপাচরণ করি, তখন ঈশ্বরের শত্রু হই। ফলতঃ আমাদিগের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা ও মিত্রতা উভয়ই আছে। যাঁহারা মনে করেন, কেশবচন্দ্র আপনাকে বাদ দিয়া অন্ত লোককে ঈশ্বরের শত্রু নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের এ সম্বন্ধে ভ্রম ঘটিয়াছে। তিনি তীব্র-পাপবোধে আপনার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাপসম্ভাবনা দেখিয়া আপনাকে যেমন সেই সেই অংশে ঈশ্বরের শত্রু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এমন কাহাকেও করেন নাই। জুডাসের তুল্য ঘৃণিত এ পৃথিবীতে আর কে আছে? কেশবচন্দ্র কি বলেন নাই, "আমি ঈশা নই, কিন্তু আমি সেই ঘৃণিত জুডাস যে রোষপরবশ শত্রু-হস্তে ঈশাকে সমর্পণ করিয়াছিল?" তিনি আপনার সম্বন্ধে এরূপ বলিলেন কেন? বলিলেন পাপ লক্ষ্য করিয়া। "আমি তত দূর জুডাসের মত যত দূর আমি পাপ ভালবাসি।" কেশব-চন্দ্র আপনাকে এবং পরকে যে সমান দেখিতেন, পাপের প্রতি তীব্র আক্রমণব্যাপারেও তাহা কোন দিন বিঘটিত হয় নাই। তিনি আপনাতে পাপ দর্শন করিয়া তীব্রভাবে তৎপ্রতি দৃষ্টি করিতেন, তাই অপরের পাপের প্রতি সেই ভাবে দৃষ্টি করিয়াছেন। যদি কেহ বলেন, তিনি আপনার পাপের দিক্ না দেখিয়া যখন অন্ত দিক্ দেখিতেন তখন যেমন আপনাকে সুকোমল দৃষ্টিতে দেখিতেন, সে প্রকার দৃষ্টিতে কি যাঁহাদের পাপ আক্রমণ করিতেন, তাঁহাদিগকে দেখিতে পারিতেন? ঘোর পাপাচরণ করিয়া তীব্র আক্রমণের বিষয় হইয়া

তাঁহার নিকটে আসিয়াছিলেন এমন কেহ যদি আজ বর্ত্তমান থাকেন, তিনি অবশ্য সাক্ষ্য দিবেন যে, কেশবচন্দ্র তৎপ্রতি সুকোমল ব্যবহার করিতে কখন কুণ্ঠিত হন নাই, পূর্ব্বে যে প্রকার ব্যবহার করিতেন, পরেও সেই প্রকার ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা যে ভাবগোপন নহে, তাহা তাঁহার উদার ব্যবহারেই নিয়ত প্রকাশ পাইত। 'পাপ ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা" ইহাতো সাধারণ কথা, বিশেষ ভাবে কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের শত্রু কাহাকে বলিতেন দেখা যাউক। "যেখানে বিধাতা ঈশ্বর স্বহস্তে ধর্ম্ম স্থাপন করিতেছেন সেই স্থান যথার্থ বিধানভূমি। এই বিধান-ভুক্ত লোকেরা ঈশ্বরের হস্ত দ্বারা পরিচালিত। ঈশ্বরে বিশ্বাস তাঁহাদিগকে প্রত্যাদিষ্ট করে। স্বয়ং ভগবান্ যাহা করেন তাহাই তাঁহাদিগের ক্রিয়া। এই বিধানভূমির বহির্ভাগে যে সকল মনুষ্য আছে তাহারা ঈশ্বর এবং বিধানের শত্রু। এই বিধা-নের ভিতরে আমাদিগের শ্রদ্ধের এবং ভক্তিভাজন পরলোক-বাসী মহাত্মাগণ রহিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম, য়িহুদি ধর্ম্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং পৃথিবীর অন্যান্য সমুদায় ধর্ম্ম এই বিধানের অন্তর্গত। সুতরাং যাহারা বাহিরে দাঁড়াইল তাহারা ঈশ্বরের শত্রু এবং কেবল শরীর ও ইন্দ্রিয়ের উপাসক।" এ স্থলে সকলেই দেখিতে পাইবেন, যে কথায় কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের শত্রু নির্দেশ করিয়াছেন সে কথা যাঁহারা ঈশ্বর ও ধর্ম্মপরায়ণ তাঁহারা যে সম্প্রদায়ের হউন না কেন তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতেছে না। 'যাহাতে নর নারী উপাসনা না করে, ব্রহ্ম জপ না করে, ব্রহ্ম দর্শন এবং ব্রহ্মবাণী শ্রবণ না করে, অধিক কি, ব্রহ্মধ্যান না করে' এরূপ যাহাদিগের চেষ্টা, এমন কি ঈশ্বর দর্শন ও ঈশ্বরের কথা

প্রবণ যাহারা অসত্তব মনে করে, ভণ্ডামি মনে করে, বুদ্ধিকে নেতা করিয়া আত্মকর্তৃত্বে কার্য্য করে, তাহারাই ব্রহ্মের শক্ররূপে নির্দ্দিষ্ট। এরূপ ভাবাপন্ন লোকেরা যদি কোন ধর্ম্মের নামে পরিচয় দিয়া ছদ্মবেশে বিচরণ করে তবে তাহারা ঈশ্বরের বিশেষ শক্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে, ইহাই বা বিচিত্র কি? এই সকল ব্যক্তির প্রতি কি প্রকার ব্যবহার কেশবচন্দ্রের অনুমোদিত ছিল, মোহম্মদ সমাগমের গুটিকয়েক কথা শুনিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। "ইহারা নিষ্ঠুর ডাকাত, তোমার (ঈশ্বরের) শক্র জানিয়া আমরা ইহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিব, ইহাদের শরীর স্পর্শ করিব না, আক্কেল কাটিব।" "আয় ভাই মোহম্মদ আয়; শান্তি খাঁড়া নিয়ে আয়।...আমরা তাহাদের শরীর ছোঁব না, তাহাদের মঙ্গলের জন্য তাহাদের মন্দ ভাব কাটিব।" ঈশ্বর-বিরোধিগণের মঙ্গলের জন্য তাহাদের মন্দভাব তাহাদের মন্দ বুদ্ধি কাটিবার জন্য কেশবচন্দ্র যদি সুতীক্ষ্ণ বাক্যাস্ত্র চালনা করিয়া থাকেন, তজ্জন্য তাঁহার উদার প্রেমের ধর্ম্ম কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইল, ইহা কে বলিবে?

এখন দেখা যাউক তাঁহার জীবনের তৃতীয় মূলতত্ত্ব একাত্মতা মধ্যে স্ববিরোধিতা দোষ আছে কি না? এই একাত্মতাই কেশব-চন্দ্রের জীবনের বিশেষত্ব। এখানে যদি স্ববিরোধিতা দোষ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে তাঁহার সমগ্র জীবন নিষ্ফল হইয়াছে। তিনি সর্ব্বসামঞ্জস্যের ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন, এই সর্ব্বসামঞ্জস্য একা-ত্মতামূলক। পৃথিবীতে যত বিধান আসিয়াছে, সকলের সঙ্গে একী-ভূত হইয়া যাওয়া এই একাত্মতার প্রধান কার্য্য; যোগী, ঋষি, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা, মুষা প্রভৃতি সহকারে তাঁহাদের ধর্ম্মে ও সত্যে এক

হইয়া যাওয়া, ইহাই তাঁহার প্রচারিত একাত্মতা। হিন্দু ও য়িহুদী ধর্ম্মসম্বন্ধে দুই প্রধান জাতির প্রতিনিধি কৃষ্ণ ও খ্রীষ্টকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতে পারেন, "বিরোধীদের প্রাণের মধ্যেও নববিধান প্রবিষ্ট হইতেছে। খ্রীষ্টান হিন্দুতে পরস্পর আসক্ত হইতেছে। কৃষ্ণে খ্রীষ্টে মিলন হইতেছে।" কিন্তু কার্য্যকালে দেখিতে পাওয়া যায় কৃষ্ণকে প্রেমধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক বলিয়া তাঁহাকে সরাইয়া রাখিয়াছেন, খ্রীষ্টকে লইয়া যত বাড়াবাড়ী করিয়াছেন। তিনি জাতিতে হিন্দু হইয়া একজন বিজাতীয় লোককে আনিয়া ধর্ম্মরাজ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠপদ অর্পণ করিলেন ইহা এজাতি সহিবে কি প্রকারে? দেশের লোকের মুখে এই নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায় যে, কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টকে এত দূর বাড়াইয়াছেন যে, সময়ে যদি সমুদায় ভারতবর্ষ খ্রীষ্টের শরণাপন্ন হয়, তাহাতে তাঁহার বিশেষ আহ্লাদই হইবে। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় তিনি প্রচার করিলেন, কিন্তু এক ঈশাতে সমুদায় ধর্ম্মের সমন্বয় দেখাইয়া আর সকল ধর্ম্মকে কার্য্যতঃ অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিলেন। কেশবচন্দ্র কি বলেন নাই, "যে স্বর্গরাজ্য কোন সম্প্রদায় জানে না, কোন সম্প্রদায়িক মত শিক্ষা দেয় না, যাহার মূলতত্ত্ব ঈশ্বরকে ভালবাসা মানবকে ভালবাসা, যাহা সমুদায় মানবজাতিকে এক জন মানুষে, এমন কি ঈশ্বরপুত্র যিশুখ্রীষ্টে এক করে, সেই স্বর্গরাজ্যে তাঁহারা (হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান) মিলিত হয়েন।" যিনি সকল ধর্ম্ম, সকল ঋষি, সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, সর্ব্ববিধ যোগ এক করিবেন, তাঁহার মুখে ঈদৃশ কথা কি স্ববিরোধিতা প্রকাশ করে না? দেশীয় ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া তিনি কেন কৃষ্ণেতে সকলকে একীভূত করিলেন না? কৃষ্ণের ভিতরে যোগসমূহের একতাসম্পাদনের যে

ভাব ছিল, তাহা লইয়া তাঁহাতে সকলকে একীভূত করা কি যুক্তিযুক্ত নয়? এ বিষম পক্ষপাত কেন? ইহা কি ইংরাজী শিক্ষার ফল নয়? পোপস্ ও খ্রীষ্টকে এক করিয়া পোপসে সকলকে এক করা অপেক্ষা পুরুষাবতার ও কৃষ্ণে সকলকে এক করিলে কি ক্ষতি ছিল? হিন্দুগণ অবশ্য বলিবেন, কেশবচন্দ্রের খ্রীষ্টের প্রতি বিষম পক্ষপাতই ঈদৃশ অযুক্ত আচরণের হেতু। কেশবচন্দ্র আনন্দের ভূমিতে একাত্মতা স্থাপন করিলেন; ঈশাতে আনন্দ কোথায়? আনন্দতো কৃষ্ণেতেই। এ দেশের সমুদায় ধর্ম্ম যে আনন্দে পর্য্যবসন্ন। এ দেশের ধর্ম্মের সঙ্গে অন্য দেশের মিলন করাই স্বাভাবিক; অন্য দেশের ধর্ম্মের সঙ্গে এ দেশের ধর্ম্মের মিলন করাইয়া লই-বার কোন কারণ নাই। অবশ্য কারণ আছে, অন্যথা কেশবচন্দ্র ঈশাতে সকলের একতা সাধন করিতে যত্ন করিতেন না। ঈশ্বর পিতা, মানব পুত্র, পিতা পুত্রের একত্ব পরমধর্ম্ম। মানুষকে মানুষ না রাখিলে, ঈশ্বরে ও মানুষে যোগ কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। চিত্তবৃত্তির নিরোধ মূলযোগ নয়, যোগ দুই বস্তুর একত্বসম্পাদন। এক মানবে সমুদায় মানবজাতিকে এক করিয়া ঈশ্বর সহ সেই মানবের যোগসম্পাদন নবীন যোগের প্রণালী। হিন্দুগণের মধ্যে মানব বিলুপ্ত, কোথাও মানব বা ঈশ্বরতনয়ের স্থিতি নাই। কৃষ্ণ ঈশ্বরতনয় নহেন স্বয়ং ঈশ্বর। এ দেশের যত অবতার, সকলেই ঈশ্বরের অবতার, ঈশ্বরতনয়ের অবতার নহেন। শ্রীচৈতন্য আপনাকে ভক্তাবতার বলিয়া ব্যক্ত করিলেন, কিন্তু উহা এ দেশের ভাববিরোধী জন্য তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে ঈশ্বরা-বতার করিয়া স্থাপন করিলেন, এখন এত দূর হইয়াছে যে, অনেক গৌড়ীয় বৈষ্ণব চৈতন্যের নিকটে নিবেদিত অন্নদারা

কৃষ্ণের ভোগ দিয়া থাকেন। যদি তিনি আপনাকে বাহ্যতোই করিয়া দিয়াছেন, এখন বিজ্ঞান সর্ব্বগতত্ব (Immanency) প্রচার করিতে হয়। কিন্তু এ দেশে এ ভাব একেবারে বদ্ধমূল। হিন্দুরা যে পদার্থ বলেন তাহাতেই ব্রহ্মদর্শন করেন, এতদূর যে ব্রহ্ম-দর্শনে সে পদার্থ বিলীন হইয়া যায়। য়িহুদিগণের ঈশ্বর সর্ব্বাতীত (Transcendental); এই সর্ব্বাতীতত্বের প্রাধান্য জন্য ঈশা যোগী হইয়াও অপরকে উপদেশ দেওয়ার সময়ে 'স্বর্গস্থ পিতা' বলিতেন। হিন্দু যে ব্যক্তিতে ব্রহ্মাবির্ভাব অনুভব করেন সে ব্যক্তিই ব্রহ্ম হইয়া যান, সেখানে আর এই জীব এই ব্রহ্ম এরূপ ভেদ থাকে না। ঈশা যোগের একত্ব নিয়ত অনুভব করিতেন সত্য, কিন্তু পিতা ও পুত্র এ ভাব তাঁহাতে বিলুপ্ত হইত না। "আমি এবং আমার পিতা এক" এ কথা বলিয়া তিনি যোগের একত্ব ব্যক্ত করিলেন বটে, কিন্তু 'আমিও আমার পিতা" এ ভেদ কিন্তু তখনও তাঁহাতে অন্তর্হিত হয় নাই। "আমি এবং আমার পিতা এক" এ কথা শুনিয়া য়িহুদিগণ এই বলিয়া তাঁহাকে অপরাধী করিল যে, তিনি আপনাকে ঈশ্বর করিলেন। তিনি তাহাদিগকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন, আমি বলিলাম আমি ঈশ্বরের পুত্র। আপনার জীবত্ব রক্ষা করিয়া যোগের একত্ব ঈশাই আপনার জীবনে দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণ প্রভৃতি যত অবতার এ দেশে হইয়া গিয়াছেন সকলেই ঈশ্বরাবতার; কেহ পুত্রাবতার নহেন। *

---

*In Hinduism God Himself appears on earth as man. The Avatar is the identical Creator of the universe, the Infinite Supreme Brahma Himself. In Christianity it is the Son of God we see in history, not the Creator, the Unborn,

পূর্ণাবতার না হইলে সকল মানবকে এক মানবে এক করা যাইতে পারে না। ঈশা ভিন্ন বিধানের ইতিহাসে আর কেহ স্বয়ং স্বরূপাতে মানবত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সমুদায় মানবের সহিত একত্ব এবং ঈশ্বরের সহিত একত্ব ঘোষণা করেন নাই, তখন তদ্রূপ একত্ব সাধনের উপায় তিনি ভিন্ন আর কেহই হইতে পারেন না। কেশবচন্দ্র বিধানের ইতিহাসে বিধাতার লীলা যথাযথ পাঠ করিতেন। বিধাতা যাঁহাকে দিয়া যাহা নিষ্পন্ন করিয়াছেন, সে বিষয়ের জন্য কেশবচন্দ্র তাঁহাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা না করিলে তিনি ঈশ্বরের অভিপ্রায় অতিক্রম করিতেন, সুতরাং কেশবচন্দ্র এক ঈশাতে বা ঈশ্বরপুত্রে সমুদায় মানবতনয়গণের একত্ব সাধন করিয়া স্ববিরোধিতার দোষে নিপতিত হন নাই বরং ইহাতে সু-অবিরোধিতাই প্রকাশ পাইয়াছে। কেশবচন্দ্র কোন মানবকে স্বয়ং অবতীর্ণ ঈশ্বর বলিতেন না, সকলকেই ঈশ্বরতনয় বলিতেন, সুতরাং তিনি তনয়ত্বে তাঁহাদের একত্ব সাধন করিবেন, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক।

স্বাধীনতা, সমতা ও একাত্মতা, এই তিন মূলতত্ত্ব কেশবচন্দ্রের

Eternal, but the First Begotten Son. The Hindu identifies the Lord of Heaven and the Avatar on earth in an essential and indivisible unity, recognising no distinction and repudiating the very possibility of a difference. The Christian, while recognising the identity, distinguishes the one from the other as the Father from the Son. . . . . Krishna is nothing if not the Almighty God. Christ is nothing if not the Son of God.—*The New Dispensation, July 22 1881.*

জীবনে অবিরোধিভাবে বর্ত্তমান নহে, সুন্দর অবিরোধিভাবে অবস্থিত, তবে হয় এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহাতে একপ্রকার প্রতিপন্ন হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের জীবনে এই সকল মূলতত্ত্ব উঁহাদের বিপরীত মূলতত্ত্ব সহ অবিরোধিভাবে মিলিত হইয়াছে ইহা প্রতিপন্ন করিয়া আমাদের ন্যায় ব্যক্তিগণের কি লাভ? আমাদের জীবনে যদি স্বাধীনতা ও অধীনতার মিলন না হয়, বৈষম্যে সাম্য প্রকাশ না পায়, একেতে সকলের একাত্মতা সাধিত না হয়, তাহা হইলে এত ক্ষণ নিষ্ফল আলোচনায় বৃথা সময়ক্ষেপ হইল। আমরা বিবেকী হইয়া স্বাধীন হইব, প্রেমিক হইয়া অধীন হইব, রিপুগণের নিকটে আমরা কোন দিন আমাদের মস্তক প্রণত করিব না, কিন্তু ঈশ্বরতনয়গণের নিকটে আমাদের মস্তক চির অবনত রাখিব, আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব, কিন্তু যে বিষয়ে আমরা প্রত্যাদেশ পাইলাম না, অপরে সে বিষয়ে প্রত্যাদেশ পাইলেন বলিয়া অসূয়াপরবশ হইব না, বরং তাঁহাদের প্রত্যাদেশের ফলভোগের জন্য তাঁহাদের নিকটে প্রণত হইয়া উঁহা গ্রহণ করিব, অধিকন্তু সর্ব্বদা তজ্জন্য শ্রদ্ধা সম্ভ্রম হৃদয়ে পোষণ করিব, কোন ভাই বা ভগিনীকে হৃদয়ের বাহিরে রাখিব না, প্রাণমন্দিরে প্রাণেশ্বরের চরণতলে তাঁহাদের সকলকে একসূত্র একরজ্জুয়ানে মিলিত সর্ব্বদা দেখিব ও সকলের সঙ্গে এক হইয়া যাইব। কেশবচন্দ্রের জীবনের মূলতত্ত্বগুলি যদি আমাদের জীবনে প্রকাশ না পায়, এবং উঁহারা সুন্দর অবিরোধী ভাব প্রকাশ না করে, তাহা হইলে তাঁহার জীবন আমাদের সম্বন্ধে বিফল হইল। তাঁহার জীবনের তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া যদি আমরা কেবল বিস্ময়-

রসে মগ্ন হই, কি অদ্ভুত জীবন ভগবান্ এ যুগে কেশবচন্দ্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দি, তাহা হইলেই কি আমাদের নিকটে ঈশ্বর যাহা চান তাহা দেওয়া হইল। অতএব আসুন আমরা সকলে কেশবচন্দ্র যে ভাবের ভাবুক ছিলেন সেই ভাবে ভাবুক হই, যে ঈশ্বরকে তিনি প্রাণের সর্ব্বস্ব করিয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরকে আমাদের প্রাণের সর্ব্বস্ব করি। কেশবচন্দ্র কিছু নিজ গুণে অদ্ভুত জীবন লাভ করেন নাই, ঈশ্বরের তৎসম্বন্ধে যে বিশেষ অভিপ্রায় ছিল সেই অভিপ্রায় অনুসরণপূর্ব্বক তিনি ঈশ্বর হইতে তাদৃশ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের সম্বন্ধে আমাদের ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি তাহা বুঝিয়া যদি আমরা তাহার অনুসরণ করি, নিশ্চয় আমরা কেশবজীবনানুরূপ জীবন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব। যদি আমাদের ন্যায় ব্যক্তিগণের জীবনে এ ব্যাপার সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে বিধান পৃথিবীতে আসিবার কি প্রয়োজন ছিল? কৃপাময় ঈশ্বর কৃপা করুন, আমাদের প্রতিজনের জীবনের স্ববিরোধিতা দোষ, সু-অবিরোধিতায় পরিণত হউক।

কেশবচন্দ্রের অন্তর্বাহ্য ।

অশুদ্ধ শোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	১৫	নানা বিধি	নানাবিধ।
১৪	৩	পশুসাধারণ কার্য্য	পশুসাধারণ বৃত্তি।

কেশবচন্দ্রের অন্তর্বাহ্য *।

হে প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তুমি আমাদের আত্মার প্রাণ। যদি আত্মার মূলে থাকিয়া প্রাণ সঞ্চারিত না কর, তাহা হইলে সাধ্য কি যে তোমার রাজ্যের গূঢ়তত্ত্ব সকল আমরা অবগত হই। হে কৃপানিধান, আমরা অনন্যগতি অনন্যমনা হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। তুমি আমাদের প্রাণমন্দির তোমার আবির্ভাবে পূর্ণ কর; বক্তা ও শ্রোতা উভয়কে গূঢ় তত্ত্ব গূঢ় সত্য শিক্ষা দান কর। আমরা সকলে মিলিত হইয়া তোমার সত্য অবতরণের জন্য ভিক্ষা করিতেছি। যেখানে তোমার প্রতি আনুগত্য ও বাধ্যতা নাই, সেখানে সত্যাবতরণের দ্বার অবরুদ্ধ। তাই ধূলি ও তৃণাপেক্ষা নীচ হইয়া আমরা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। দেখিও, নাথ, অদ্যকার গম্ভীর ও মহত্তম বিষয়ে যেন কোন প্রকারে কল্পনা মিশ্রিত হইয়া সত্য বিকারগ্রস্ত না হয়। সকল প্রকারের অসত্য ও মিথ্যা বিনষ্ট কর; রসনার সহায় হও; এই তব পাদপদ্মে বিনীত ভিক্ষা।

অদ্য মাঘের একাদশ দিবস। আজ কেশবচন্দ্রের কথা কেন? ব্রাহ্মসমাজপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে পিতামহ রাজা রামমোহনের নাম চির-সংযুক্ত। ১১ মাঘের দিনে তাঁহার নাম সর্ব্বাগ্রে স্মরণীয়। আবহমান কাল যে নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে তাহার ব্যতিক্রম সাধনজন্য

* ষট্‌ষষ্টিতম মাঘোৎসবোপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতার সার।

আজ এ নবীন যত্ন কেন? ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা ও পুষ্টিপে
রাজর্ষি রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হইতে নিষ্পন্ন; তাঁহা
নামোল্লেখ না করিয়া কেশবচন্দ্রের নাম কীর্ত্তন, ইহা কি মানিগ
মানাপহরণে যত্ন নহে? রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ বিনা যদি কেশ
চন্দ্র স্বতন্ত্র কেহ থাকিতে পারেন, কেশবচন্দ্রের নাম করিলে য
সত্যই তাঁহাদের নাম ও গৌরব বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে ১১ মাঘে
দিনে কেশবচন্দ্রের নামকীর্ত্তন গুরু অপরাধ। অদ্যকার আলোচ
বিষয়, 'কেশবচন্দ্রের অন্তর্ব্বাহ্য'। এই বিষয়ের সঙ্গে রামমোহ
ও দেবেন্দ্রনাথের সম্বন্ধ কি? এই বিষয়ই কি তাঁহাদিগকে বিস্মৃ
করাইয়া দিতেছে না? না, তাঁহাদিগের সন্নিকর্ষ এই বিষয়ে আরও
ঘনিষ্ঠ হইতেছে। কি প্রকারে হইতেছে, এক বার দেখা যাউক।

অন্তর ও বাহ্য, এ বিষয়ে পিতামহের অভিপ্রায় কি? তিনি কি
বাহিরের সমুদায় বিষয়কে মায়িক ও মিথ্যা বলেন নাই? জগৎ মিথ্যা
হইয়া দৃষ্টির সন্নিধান হইতে উড়িয়া না গেলে পরমাত্মসাক্ষাৎকার
হয় না, এ কথা বলিয়া কি তিনি জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করেন
নাই? শঙ্করের অনুসরণ করিয়া পিতামহ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে
এই প্রকার মনে করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে, কিন্তু তিনি কি
সেরূপ মায়াবাদী ছিলেন যাহাতে জগৎকে তিনি যথার্থই স্বপ্ন মনে
করিয়া তৎপ্রতি সর্ব্বদা উপেক্ষা করিতেন? ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে
তাঁহাতে মন এমনই মগ্ন হয় যে, আর কোন বস্তু আত্মার সম্মুখে
প্রতিভাত হয় না, এই অনুভূতি অবলম্বন করিয়া তিনি জগতের
মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কেবল বেদান্তদর্শন পাঠ
করিয়া জ্ঞানে মায়াবাদ স্বীকারপূর্ব্বক মৌখিক জগতের মিথ্যাত্ব ভাণ
করা, ইহার তিনি একান্ত বিরোধী ছিলেন। অন্যথা যখন ইংরাজী

শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের তিনি প্রতিবাদ করেন, তখন বেদান্তদর্শনপাঠের বিরোধে কেন তিনি এ কথা বলিলেন, এই দৃশ্যমান জগৎকে মিথ্যা কাল্পনিক মনে করিয়া বেদান্তাধ্যায়িগণ লৌকিক ব্যবহার হইতে বিরত হইবেন, ইহাতে জনসমাজের ঘোর অকল্যাণের সম্ভাবনা *। এ কথা বলিয়া কি তিনি লৌকিক ব্যবহার ও জনসমাজসংরক্ষণ অবশ্য কর্ত্তব্য প্রতিপাদন করেন নাই? অধিকন্তু তিনি ইউরোপীয় বিজ্ঞানসমূহের প্রতি একান্ত পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়াছেন †। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সকলের পক্ষে এমন সুলভ নহে যে জগৎ যাহার তাহার নিকট স্বপ্নবৎ মিথ্যা হইয়া যাইবে, সুতরাং তিনি পাকতঃ বাহ্য জগৎ ও বাহ্য-

---

* Neither can much improvement arise from such speculations as the following which are the themes suggested by the Vedanta;—In what manner is the soul absorbed in the Deity? What relation does it bear to the Divine Essence? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence, that as father, brother &c. have no actual entity they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better.—*The Letter of R. M. Roy. to Lord Amherst.*

† We were filled with sanguine hopes that this sum would be laid out in employing European gentlemen of talents and eduction to instruct the Natives of India in Mathematics, Natural Philosophy, Cheimstry, Anatomy and other useful sciences, which the natives of Europe have carried to a degree of perfection that has raised them above the inhabitants of other parts of the world.—*Ibid.*

জগৎসম্পর্কীণ ব্যবহারসমুদায়ের অনুমোদন করিয়া অন্তর ও বাহ্য, এ উভয়েরই সমান সমাদর করিয়াছেন।

পিতামহ ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান বিনা যোগ অসম্ভব। ঋষিগণের ব্রহ্মজ্ঞান—ব্রহ্মভিন্ন অন্যবস্তু উড়াইয়া দিয়া—যোগে সাধকের মন নিবিষ্ট করে। পিতামহ ব্রহ্মজ্ঞানে স্থিতি করিলেন ব্রহ্মযোগে প্রবিষ্ট হইলেন না। তিনি কেবল এই প্রদর্শন করিলেন, চরমে ব্রহ্মজ্ঞানে যখন পরমাত্মসাক্ষাৎকার হয়, তখন ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যবস্তুর স্ফূর্ত্তি থাকে না। তিনি ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মযোগে কেন পরিণত করিলেন না, এ প্রশ্ন উত্থাপন বৃথা। তিনি যদি ব্রহ্ম-যোগ তখন আনিতেন, অন্তর ও বাহির এ দুইয়ের সমপরিমাণে সমাবেশ হইবার পক্ষে মহান্ অন্তরায় উপস্থিত হইত। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানে তিনি আপনার গতি স্থগিত করিলেন, ব্রহ্মযোগের কথা দৃঢ়তাসহকারে উত্থাপন না করিয়া সামাজিক কর্ত্তব্যাদির প্রতি জনসমাজের চক্ষু বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিলেন। তিনি বিজ্ঞা-নের প্রতি উপেক্ষার নয়নে দেখিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য আলোক তাঁহার নিকট যৎসামান্য ছিল না। দৃশ্যমান জগৎ সেই আদিকারণের অধিষ্ঠানে সঞ্জীবিত, ইহা তিনি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন। পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি সম্বন্ধ শঙ্করমতে মায়িক হইলেও তাঁহাদের প্রতি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য অবশ্য পালনীয় বলিয়া তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ বেদান্তের অন্তরবাদের প্রাধান্য তাঁহার সুতীক্ষ্ণ মনীষাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। এজন্যই তিনি (১) পারমার্থিক ও (২) লৌকিক ভেদে এক দিকে যেমন অন্তর্জ্জগতের সত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন, অন্য দিকে বাহ্য জগতেরও সেই প্রকার সত্যত্ব কার্য্যতঃ দৃঢ়মূল করিয়াছেন।

আমরা দেখিতে পাইতেছি, পিতামহ রামমোহনে যে অন্তর্ব্বাহ্য অসংশ্লিষ্ট ও আপাতবিরোধী ভাবে অবস্থিত ছিল, কেশবচন্দ্রের জীবনে তাহাই সংশ্লিষ্ট ও অবিরোধী ভাব প্রদর্শন করিয়াছে। এ সম্বন্ধে পিতা দেবেন্দ্রনাথের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কে আর জানেন না যে, মহর্ষি বিপুল সম্পত্তি ও পরিবার মধ্যে পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণের ন্যায় বাস করিয়া ব্রহ্মদর্শন সাধন করিয়াছেন। জগৎ মায়া বা মিথ্যা, এ মতের তিনি কোন দিন অনুবর্ত্তন করেন নাই। যে উপনিষদ্বাক্য প্রথমতঃ তাঁহার চিত্তকে ব্রহ্মের দিকে লইয়া যায়, সেই উপনিষদ্বাক্য তাঁহাকে এই শিক্ষা দেয়, "এই সমুদায় বিশ্ব, এই বিশ্বের সমুদায় পদার্থ সেই ঈশ্বরকর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত। অতএব আসক্তিপরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদায় ভোগ কর, কাহারও ধনে লোভ করিও না।" কি আশ্চর্য্য, রামমোহনে যাহা অপরিস্ফুট ছিল, দেবেন্দ্রনাথে তাহা পরিস্ফুট হইল; অথচ তৃতীয় ব্যক্তি যত দিন আগমন করেন নাই, তত দিন অন্তর্ব্বাহ্য যে কি ঘনিষ্ঠ যোগে সম্বদ্ধ এবং এ দুইকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়া পূর্ণ ধর্ম্মের সাধন হয় না, এ কথা আমাদের কাহারও মনে প্রতিভাত হয় নাই। মূল কথা বলিবার পূর্ব্বে এখানে একটী কথার উল্লেখ নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশ ও অপরাপর দেশ রামমোহনকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করিয়াছেন, দেবেন্দ্রনাথসম্বন্ধে সেরূপ বলা যায় না। যেখানেই জ্ঞানচর্চ্চার প্রাবল্য, সেখানেই রাজা রামমোহন। এ সময়ে জ্ঞানচর্চ্চার প্রাবল্য কোথায় নাই? কি ব্রাহ্মসমাজে বা অন্যত্র ব্রহ্মদর্শনের আদর অতি অল্প, তাই মহর্ষি আপনার উপযুক্ত প্রাপ্য কাহারও নিকট পাইতেছেন না, কিন্তু এ কথা নিশ্চয়, তাঁহাকে গ্রহণ না করিলে কাহারও সংসারভয় বা পতন নিবারণ হইবে না।

কেশবচন্দ্রের অন্তর্ব্বাহ, দুই প্রকার অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রথম কেশবচন্দ্রের অন্তর ও বাহির; দ্বিতীয় কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধে অন্তর ও বাহির। যে কোন অর্থে কেন গ্রহণ করা যাউক না ফলে একই দাঁড়ায়। কেশবচন্দ্র কেবল অন্তরের পক্ষপাতী ছিলেন না, কেবল বাহিরেরও পক্ষপাতী ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার অন্তর ও বাহির দুইয়ের [illegible]ছিল, এবং অন্তর ও বাহির দুইয়ের প্রতি তাঁহার সমান আস্থা ছিল। তিনি যোগী ছিলেন, তিনি ভক্ত ছিলেন, কেবল যোগী বা কেবল ভক্ত ছিলেন না। তাঁহাতে যোগ আগে, না ভক্তি আগে? তাঁহাতে দুইয়েরই যুগপৎ সন্নিবেশ ছিল, কেন না তিনি বাহিরের শাস্ত্র গুরু ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি বহির্নিরপেক্ষ যোগী বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, কিন্তু তিনি বাহিরের সম্বন্ধ গুলি কোন কালে পরিত্যাগ করেন নাই, ঈশ্বরকে এই সকল সম্বন্ধঘটিত বিবিধ কর্ত্তব্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। এক সময়ে তাঁহাতে ভক্তি বাড়িয়া গেল, অপর সময়ে যোগ প্রবল হইল, এরূপ হইতে পারে, কিন্তু প্রথম হইতে দুইই তাঁহাতে নিগূঢ়ভাবে ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্তর ও বাহ্য—যোগ ও ভক্তি, এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিয়ত কাল তাঁহাতে দৃষ্ট হইয়াছে। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে যখন দার্শনিক ভূমির উপরে স্থাপন করিবার জন্য যত্ন করিলেন, তখন তিনি কোন এক দর্শনের পক্ষপাতী হইয়া অপর দর্শনের প্রতিকূল হইলেন না, অন্তর্ব্বাহ্য উভয়ের সত্যত্বপ্রতিপাদক দর্শন তাঁহার দর্শনশাস্ত্র হইল।

যোগী যিনি তিনি কেবল অন্তরের রাজ্যে বিচরণ করেন। তাঁহার নিকটে পরমাত্মবস্তু সত্য, আর সমুদায় ধূঁয়ার মত অপ-

কার্য। যোগী অদ্বৈতবাদী। তিনি বলেন, আদিতে ব্রহ্ম ছিলেন, আর কিছু ছিল না; সুতরাং ব্রহ্মাতিরিক্ত যাহা কিছু প্রতীত হয়, উহা সমুদায় অজ্ঞানতামূলক; উহার বাস্তবিক সত্যত্ব নাই। যোগী যত ক্ষণ এই প্রকার কেবল অন্তররাজ্যের পক্ষপাতী, বহি-র্জগতে পদার্পণ করিতে অসম্মত, মিথ্যার রাজ্যে ছায়া ভক্ষণ করিতে কুন্ঠিত, তত দিন তাঁহাতে ভক্তির প্রকাশ অসম্ভব। যোগী ভগবানের লীলা দেখেন না, মায়ার খেলা দেখেন। তিনি কোন বিষয়ের প্রতি অনুরাগী নন, সর্ব্বদা অসঙ্গ ও উদাসীন। ভক্ত অন্তররাজ্যের প্রতি বিমুখ হইতে পারেন না, কেন না অন্তরের অন্তরতম পরমাত্মা ভক্তির উপজীবিকা। তাঁহার মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য, সৃষ্টি সত্য। তাঁহার মতে পরমাত্মা বিচিত্রশক্তিসম্পন্ন, সৃষ্টি তাঁহার বিচিত্র শক্তির প্রকাশ। শক্তিমান্ যে প্রকার সত্য, শক্তিও সেই প্রকার সত্য, শক্তি ছাড়া শক্তিমান্ অপ্রসিদ্ধ। ব্রহ্ম অন্ধ জড় বা মূক নহেন, অশেষকল্যাণগুণবিশিষ্ট; জীবগণের প্রতি অসীম উদার তাঁহার ব্যবহার। যোগী ও ভক্ত শ্রেণী সামান্য নহেন। ইহাঁদিগকে লইয়া দর্শনাদির উৎপত্তি। আত্মা (Spirit) ও জড় (Matter), এ দুই চিরবিবাদের ভূমি। কেহ আত্মা বিনা আর কিছু দেখেন না, কেহ বা জড় বিনা আর কিছুরই সত্যত্ব স্বীকার করেন না। কেহ জগতের দিক্ দিয়া সকল বিষয়ের মূল অন্বেষণ করেন, কেহ আত্মার দিক্ দিয়া জগতে গিয়া উপস্থিত হন। সুতরাং এই দুই প্রণালীর চিন্তা হইতে জড়বাদ (Materialism) ও অধ্যাত্মবাদ (Spiritua-lism) উৎপন্ন হইয়াছে। আত্মা, চিন্তা, জ্ঞান (thought), এই সকল এক মতে সত্য, আর এক মতে চিন্তা জ্ঞান প্রভৃতি দৈহিকক্রিয়া-(function) সমুৎপন্ন! এ দুই প্রকার মত, অন্তর ও বাহির, এ

দুইয়ের কোন একটির প্রাধান্য অনুসারে হইয়াছে, ইহা আর কে না জানেন ?

জর্ম্মণি ও ইংলণ্ড স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে অন্তর্ব্বাহ্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া পরস্পর হইতে ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। জর্ম্মণির অন্তর হইতে এবং ইংলণ্ডের বাহির হইতে দার্শনিক গতি। এ দুইয়ের সামঞ্জস্য বিনা দার্শনিক জগতের বিরোধ কোন দিন তিরোহিত হইবার নহে। আত্মা বা আমি (Subject) একান্ত অপরিহার্য্য। বাহিরের জগতের বিষয় অনুধাবন, চিন্তা ও পর্য্যবেক্ষণ, এই আমি বা আত্মা বিনা অসম্ভব। চিন্তা বিনা কিছুই জ্ঞানের বিষয় হয় না, যেখানে চিন্তা সেখানে আমি প্রবিষ্ট। এই আমির এত প্রাধান্য যে, কিছু নাই বলিতে গেলেও এই আমি বা চিন্তার প্রয়োজন। বাহিরের চতুর্দ্দিকের অবস্থা (Environment) যাঁহাদিগের মতে সর্ব্বস্ব, তাঁহাদেরও স্বীকার করিতে হয়, আমিতে প্রোথিত না হইলে এই চারিদিকের অবস্থা কোন স্থায়ী ক্রিয়া রাখিয়া যাইতে পারে না। বাহিরের ক্রিয়া হইতে দেহাদির নানা বিধি পরিবর্ত্তন হয় সত্য, কিন্তু দেহাদির পরিবর্ত্তন একটা আন্তরিক প্রতিষ্ঠার (typeর) অনুবর্ত্তন করে, অন্যথা একই প্রকারের উপাদান সত্ত্বে ভিন্ন দেহাদির উৎপত্তি কি প্রকারে সম্ভবে ? এক কলা (cell) ক্রমান্বয়ে উদ্ভিন্ন হইতে হইতে দেহ উৎপন্ন হইল, ভিন্ন ভিন্ন দেহের ক্রমিক পরিবর্ত্তনে ভিন্ন ভিন্ন জীব হইল, এ সকল বাহিরের চতুর্দ্দিকের অবস্থার পরিবর্ত্তন দ্বারা সিদ্ধ করিতে গেলেও আন্তরিক প্রতিষ্ঠা (type) বিনা উপাদান সকলের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সমাবেশ কিছুতেই প্রতিপন্ন হয় না। আবার যদি কেবল প্রতিষ্ঠামাত্র গ্রহণ করিয়া উপাদান ও চতুর্দ্দিকের অবস্থা অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও ক্রমিকোন্মেষ

অসম্ভব হয়। সুতরাং কেশবচন্দ্রে যোগ ও ভক্তি যেমন সমঞ্জস ভাবে মিলিত, তেমনি অন্তর ও বাহ্য সমঞ্জস ভাবে মিলিত হইবে, ইহাতো স্বাভাবিক।

ঈশ্বর, জীব ও জগৎ, এই তিন পদার্থসম্বন্ধে অন্তর্বাহ্যপ্রণালীর প্রয়োগ হয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে দুই বিরুদ্ধ মত প্রচলিত। প্রথম মতে ব্রহ্ম অসঙ্গ উদাসীন, তাঁহার সৃষ্টির সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তিনি গুণাতীত। দ্বিতীয় মতে ব্রহ্ম ক্রিয়াশীল; জগৎ ও জীব তাঁহারই ক্রিয়ায় উৎপন্ন, তাঁহারই ক্রিয়াতে বিধৃত হইয়া অবস্থিত; ব্রহ্ম অশেষকল্যাণগুণবিশিষ্ট। ব্রহ্ম যদি আপনি উদাসীন হইলেন, সর্ব্বপ্রকারের ক্রিয়াবিবর্জ্জিত হইলেন, তাহা হইলে এই সৃষ্টি আসিল কোথা হইতে? তিনিই যদি জগতের কারণ ও উপাদান উভয়ই হন, তাহা হইলে দুগ্ধ হইতে যে প্রকার দধি সমুৎপন্ন হয়, তেমনি কি জগৎ ও জীব তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? এরূপ স্বীকার করিলে ব্রহ্ম বিকারগ্রস্ত হয়েন; তাঁহার স্বরূপের একেবারে অন্যথা হইয়া যায়। এই মতকে পরিণামবাদ বলে। দেশীয় পরিণামবাদিগণ ব্রহ্মের জগৎ ও জীবরূপে পরিণাম স্বীকার করেন, কিন্তু তিনি আপনি বিকারগ্রস্ত হন, বা তাঁহার স্বরূপের অন্যথা হয় স্বীকার করেন না। এক মৃত্তিকা হইতে ঘটাদি বিবিধ আকার উৎপন্ন হয়, এক স্বর্ণ হইতে কুণ্ডলাদি বিবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত হয়, কিন্তু মৃত্তিকা ও স্বর্ণ পদার্থ যাহা তাহাই থাকিয়া যায়, ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি ইহাঁদের মতে সেইরূপ। ব্রহ্ম প্রকারী, জগৎ ও জীব ব্রহ্মের প্রকারমাত্র; ব্রহ্ম আত্মস্থানীয়, জগৎ ও জীব তাঁহার দেহস্থানীয়। বিবর্ত্তবাদিগণ বলেন, আকাশ বর্ণ ও রূপবিরহিত, অথচ তাহাতে নীলিমাদি যে প্রকার ভ্রান্তিবশতঃ প্রতীত হয়,

তেমনি রূপ ও বর্ণবিরহিত ব্রহ্মে জগৎ ও জীব ভ্রান্তিজ্ঞানে আরোপিত হইয়া থাকে।

কেশবচন্দ্র কারণে কার্য্য অন্তর্ভূত স্বীকার করিলেন। ঈশ্বরের চিচ্ছক্তি যখন ক্রিয়োন্মুখ হইলেন, তখন সেই চিচ্ছক্তির (সমুদায় জগৎ ও জীবসম্পর্কীণ জ্ঞানের) প্রথম প্রকাশ হইতে তদন্তর্ভূত (শক্তিরূপে অবস্থিত) জগৎ ও জীবরূপ কার্য্য উৎপন্ন হইল *। ব্রহ্ম আপনি নিরাকার নির্ব্বিকার, তাঁহাতে কোন প্রকারের পরিবর্ত্তন সম্ভবে না; অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত পুণ্য সর্ব্ব প্রকার পরিবর্ত্তনের অতীত; কিন্তু চিচ্ছক্তির প্রথম প্রকাশ (Logos) সমুদায় জগৎ ও জীবের উৎপত্তির হেতু হইলেন। সেই জগৎ ও জীবের অভ্যন্তরে ঈশ্বর আপনার কল্যাণগুণ এমনই মিশাইয়া দিলেন যে,জগৎ ও জীবের কল্যাণের দিকে স্বাভাবিকী গতি। কল্যাণ ভিন্ন তাহাদের হইতে আর কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না; ক্ষণিক বিপরীত ভাব দৃষ্ট হইলেও চরমে কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী; স্বয়ং ব্রহ্ম নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। জগতের ভিতরে জীবের

---

* "এক দিন সৃষ্টি হয় নাই, নিত্য সৃষ্টি হইতেছে। যাহারা বলে ব্রষ্টা এক দিন এই বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, তাহারা প্রকৃত সৃষ্টিতত্ত্ব জানে না। সৃষ্টিবীজের কার্য্য ক্রমাগত চলিতেছে, লক্ষ যুগে সৃষ্টি ফুরাইবে না।...... যাহা হইয়াছে, যাহা হইতেছে, যাহা হইবে, সমুদায় বীজের ভিতর ছিল। কারণে সমুদায় কার্য্য ছিল। ব্রহ্মাণ্ডপতির রোপিত বীজমধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড লুক্কায়িত ছিল।" (আ, উ।)

"What was creation but the wisdom of God going out of its secret chambers and taking a visible shape, His potential energy asserting itself in unending activities?" —*Lect. Ind.*

ভিতরে সর্ব্ব প্রকারের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, সে সকল তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারিতেছে না, অথচ জগৎ ও জীবের ভিতরে তাঁহার কল্যাণগুণ প্রবিষ্ট জন্য নিরন্তর কেবল কল্যাণই হইতেছে *। ব্রহ্মেতে কোন পরিবর্ত্তন নাই, জগৎ ও জীবে পরি-

---

* "ব্রহ্মের শান্তবক্ষে চাঞ্চল্য অথবা বিকার জন্মিতে পারে না, সংসারের প্রতি আসক্তি অথবা ঘৃণা, অনুরাগ অথবা বিদ্বেষ তাঁহার পক্ষে উভয়ই অসম্ভব। তিনি স্থির গম্ভীর প্রশান্ত অনন্ত সাগর, প্রবৃত্তির তরঙ্গ তাঁহাতে উত্থিত হয় না। তিনি স্বার্থত্যাগী ফকীর, এমন আর নাই।......তিনি কঠোর ফকীর নহেন, প্রেমিক উদাসীন। সন্তানপালনের সমুদায় উপায় করিতেছেন, কিন্তু নিজে অনাসক্ত। হাজার লোক কাঁদিয়া উঠিলে তাঁহার ক্লেশ হয় না, হাসিয়া উঠিলে তাঁহার উল্লাস হয় না। সৃষ্টির বিচিত্র ঘটনায় বড়ো উদাসীন মহাদেব উচ্চ বৈরাগ্যপর্ব্বতে যোগাসনে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যদি প্রলয়দশা প্রাপ্ত হয়, তথাপি ব্রহ্মাণ্ডপতি স্থির থাকিবেন। তাঁহার লক্ষ লক্ষ সন্তানের যদি মৃত্যু হয়, তথাপি তাঁহার মন মানুষের ন্যায় শোকার্ত্ত হইয়া কাঁদিবে না। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে কত রাজ্যের বিনাশ হইল, কত দেশ সমভূমি হইল; কিন্তু সর্ব্বরাজ্যেশ্বর সুস্থির ও শান্তভাবে বিরাজ করিতেছেন। নির্গুণ ও নির্ব্বিকার ব্রহ্ম অন্ধ ও বধিরের ন্যায় কিছুই দেখিলেন না, শুনিলেন না, যেমন ছিলেন ঠিক তেমনি রহিলেন। ব্রহ্মের বাহ্যিক লীলা দেখিতে কি চমৎকার! কত কার্য্য, কত ঘটনা, কত রূপ, কত গুণ, কত শক্তি! ঘোর সংসার! ব্রহ্মের অন্তর কি গভীর। একটু চাঞ্চল্য নাই, এক রূপ, এক ভাব, এক নিস্তব্ধ অচল পদার্থ। গভীর সমাধি! মনে হয় যেন বহির্ব্বাটীতে কার্য্য, ধুমধাম, প্রেমবাজার, সংসারলীলা, অনন্ত ঐশ্বর্য্য, কিন্তু অন্তঃপুরে এক মৌনী নিস্ক্রিয় ব্রহ্ম চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বাহিরের সমুদায় কার্য্য সুচারু নিয়মে চলিতেছে। মনুষ্য যথারীতি পরিশ্রম করিয়া ধন ধান্য সঞ্চয় করিতেছে, ভক্তেরা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে প্রার্থনা ও সাধন ভজন করিয়া পরমার্থ ও ধর্ম্মধন সঞ্চয় করিতেছেন।

বর্ত্তন আছে। ব্রহ্মের সান্নিধ্য বশতঃ জগৎ ও জীবে ক্রমান্বয়ে পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু সে পরিবর্ত্তন ব্রহ্মের কল্যাণগুণ সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট জন্য কল্যাণবর্দ্ধক। ব্রহ্ম সকল বস্তু সকল পদার্থের অন্তরের অন্তরতম, ব্রহ্মসম্বন্ধে জীব ও জগৎ বাহ্য হইয়াও নিয়ত ব্রহ্মের অন্তর্ভূত। ব্রহ্ম ও তাঁহার সৃষ্টি অন্তর্ব্বাহ্যভাবে সর্ব্বদা সম্বদ্ধ হইয়াও এমনি ভাবে একত্র সম্মিলিত যে, এককে অপর হইতে সর্ব্বথা স্বতন্ত্র করিতে পারা যায় না; সুতরাং এ মতে অন্তর্ব্বাহ্যের সত্যত্ব স্বীকার অপরিহার্য্য। যোগী হইয়া সাধক অন্তরের অন্তর ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইলেন, অথচ ব্রহ্মের অশেষ কল্যাণ গুণের ক্রিয়া জগৎ ও জীবে দর্শন করত তৎপ্রতি অনুরক্ত ভক্ত হইলেন। অতএব তিনি যুগপৎ যোগী ও ভক্ত উভয়ই।

কেশবচন্দ্র বিজ্ঞানবাদী। জীবসম্বন্ধে তিনি একজন ক্রমোন্নেষবাদী ছিলেন। সমুদায় মানবজাতির ক্রমোন্মেষসম্বন্ধে বিজ্ঞানের যে মত তাহা সন্দিগ্ধ, তাহা সপ্রমাণ করা সহজ নহে, কিন্তু প্রত্যেক মানবের সম্বন্ধে ক্রমোন্মেষের নিয়ম এক প্রকার প্রত্যক্ষ। জড়, উদ্ভিদ, বিবিধ জীব, পরিশেষে মনুষ্য, তৎপর দেবতা, এ ক্রম

ব্রহ্ম নিজে নির্লিপ্ত, অথচ তাঁহার সমস্ত রাজ্য, সমস্ত সংসার চলিতেছে, বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপার সকল সুসম্পন্ন হইতেছে। তাঁহার নিয়মে সূর্য্য আলোক এবং উত্তাপ দিতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, অগ্নি দহন করিতেছে, সমুদ্র দেশ দেশান্তরে বাণিজ্য বহন করিতেছে। তাঁহার নিয়মে ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে, কিন্তু তাঁহাকে কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহার স্নেহগুণে তাঁহার পালনী শক্তিতে মাতার স্তনের ভিতর দিয়া শিশুকে পোষণ করিবার জন্য দুগ্ধ আসিল, শিশু ঐ দুগ্ধ পান করিল এবং পরিতুষ্ট হইল, কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত রহিলেন।" (সে, নি, ৩৯। ৪০ পৃষ্ঠা)।

প্রতিমনুষ্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের জীবনের আরম্ভ ক্ষুদ্র বিন্দু হইতে। এই বিন্দুতে প্রাণশক্তি আপনার ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া ক্রমে তাহা হইতে মানুষ উৎপাদন করে। কেশবচন্দ্রের আত্মার সম্বন্ধে একটি মত অতি অদ্ভুত। তিনি একই আত্মার ভিতরে নিয়ত দুই আত্মা প্রত্যক্ষ করিতেন। এক আত্মাতে দেবতা—দেবাংশসম্ভূত মানব—দর্শন করিতেন, অন্য এক আত্মার মধ্যে জড় ভাব, পশুভাব ও মানবীয় ভাব অবলোকন করিতেন। জড়, পশু ও মানবভাবাপন্ন আত্মার তিরোধানে দেবাত্মার আবির্ভাব হয়; সেই আত্মাকে তিনি আপনা হইতে অভিন্ন জানিয়াও তাহাকে নমস্কার ও বন্দনা করিতেন। 'এ আমি যদিও আমি, তবু তাহাকে ভাল বাসি তাহাকে নমস্কার করি', এরূপ কথা কেশবচন্দ্র অনেক সময়ে বলিয়াছেন। আমাদের দেহ মন প্রাণের ভিতরে যে সকল ক্রিয়া চলিতেছে তাহা অনেক সময়ে আমাদের অজ্ঞাতসারে। যাহাও বা প্রথমতঃ জ্ঞাতসারে নিষ্পন্ন হয়, তাহাও পরিশেষে, দেহের এমনি স্বভাব হইয়া পড়ে যে, তৎসহকারে আমাদের চৈতন্যের কোন ক্রিয়া থাকে না। দৈহিক নিমেষ উন্মেষাদি ক্রিয়া সর্ব্বদা অক্ষুন্নভাবে চলিতেছে, অথচ তৎসহকারে আমাদের জ্ঞাতসারে কোন সম্বন্ধ নাই, ইহাতে ইহাই প্রতীতি হয় যে, দেহসম্বন্ধে আমাদের ক্রিয়া অতিপরিমিত, আমাদের প্রাণশক্তির ক্রিয়া অতি বিস্তৃত। এই প্রাণশক্তির ক্রিয়া স্মৃতির আকারে প্রকাশ পায়। এই স্মৃতির নাম বিজ্ঞানবিদেরা Organic Memory (সাংস্থানিক স্মৃতি) অর্পণ করেন। এই স্মৃতিশক্তি আমাদের আত্মার প্রতি কোন লক্ষ্য না রাখিয়া নিয়তকাল যান্ত্রিক, স্নায়বিক, পৈশিক, সকল প্রকারের ক্রিয়ানির্ব্বাহে সাহায্য করিতেছে। সুতরাং বলিতে

হইবে আমাদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন উদ্ভিদোচিত জীবন চলিতেছে, আর একদিকে পশুসমুচিত জীবনেরও অভাব নাই। ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি পশুসাধারণ কার্য্য বিনা আমাদের দেহরক্ষা হয় না, বংশবিস্তার সম্ভবে না। জ্ঞান ও নীতি আমাদের মধ্যে উদ্ভিন্ন হইয়া আমাদিগের মানবোচিত জীবন সর্ব্বদা প্রদর্শন করিতেছে। জ্ঞান ও নীতিতে মানবের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, কিন্তু এখনও তাহার প্রকৃত গৌরবের বিষয় প্রস্ফুটিত হয় নাই। যখন তাহাতে দেবত্ব প্রস্ফুটিত হয়, তখন সে আপনাকে ভুলিয়া যায়, সর্ব্বদা পরের জন্য জীবন নির্ব্বাহ করে, ইহলোকে থাকিয়াও সে স্বর্গে অবস্থিত; সে তখন ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু জানে না, ব্রহ্মের ইচ্ছা তাহার সমগ্র জীবনের নিয়ামক হয়। 'আমি কিছু করি না, পিতা এ সমুদায় করেন' এই বলিয়া সে পিতার সহিত এক হইয়া যায়। যে অনন্তশক্তি সমুদায়ের প্রাণশক্তি, সেই শক্তির সহিত জীব এক হইয়া এখন কৃতকৃত্য।

কেশবচন্দ্র আত্মার দেবাংশের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি স্থির রাখিতেন। তিনি কেবলই বলিতেন, ভিতরের ডিম্ব ফুটিয়া তাহার ভিতর হইতে নূতন মানুষের জন্ম হয়। সেই মানুষের যাহাতে জন্ম হয়, তাহারই জন্য তিনি আপনার সর্ব্বপ্রকারের যত্ন ও সাধন নিয়োগ করিতেন। তিনি আপনার ভিতরে আপনার ভাইদের ভিতরে কেবল সেই মানুষকে খুঁজিতেন *। বিজ্ঞানবিৎ সামান্য প্রাণ-

---

* "আমরা প্রত্যেকেই দুজন দুজন মানুষ। একজন মানুষের খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর একজন মানুষের খেলা আরম্ভ হইবার এখনও কিছু বাকি আছে। আমার মানুষের দিন শেষ হইবার সময় হইল, তোমার মানুষ যে, তাহার জন্ম হইবার সময় হইল। এই কৌটার ভিত রে

শক্তিযুক্ত মাংসখণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষে গিয়া পৌঁছিলেন, সেখানে গিয়া তাঁহার গতি স্থগিত হইল, স্মৃতি, সংস্থানিক স্মৃতি, ইত্যাদি কথা রচনা করিয়া তিনি মানবের ভিন্ন অবস্থার বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি খণ্ডদর্শী অখণ্ডদর্শী নহেন, অখণ্ড মহাপ্রাণশক্তিতে সকলকে একীভূত করা তাঁহার কার্য্য নহে। দর্শন এই পন্থা প্রদর্শন করেন, অধ্যাত্মবিজ্ঞান এক অখণ্ডেতে সমুদায় খণ্ডগুলি একীভূত করিয়া সকল বিবাদের মীমাংসা করিয়াছেন। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের এ কার্য্য কল্পনা নহে মিথ্যা নহে, ইহাই সমুদায় সত্যের মূল সত্য। কেশবচন্দ্রের সমুদায় জীবন এই মহৎ কার্য্য সম্পাদন জন্য অতিবাহিত হইয়াছে। জীব ও ব্রহ্ম এ দুইয়ের যোগসাধন জন্য প্রয়াস কত প্রাচীন কাল হইতে চলিতেছে। প্রকৃতির সঙ্গে বিরোধপরিহারের জন্য প্রাকৃতিকশক্তিকে সেই মহাপ্রাণশক্তির সঙ্গে একীভূত করিয়া লইবার প্রণালীও নিতান্ত নূতন নহে। কিন্তু উদ্ভিদ হইতে পশু, পশু হইতে মানব, মানব হইতে দেবতাকে বাহির করিয়া লইয়া দেবত্বে সকলের একতা সমাধান, এ যত্ন নূতন যত্ন। এ যত্ন কাহার? কেশবচন্দ্রের। কেশবচন্দ্রের অন্তর্ব্বাহ্য প্রদর্শন কিছুতেই হয় না, যদি এই যত্নের গৌরব প্রস্ফুটাকারে প্রদর্শন করা যাইতে না পারে।

মানিলাম, মানুষ এ পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান ও নীতিতে সে পশু হইতে সর্ব্বথা স্বতন্ত্র; ডারউইন প্রভৃতির শত চেষ্টাসত্ত্বেও

আর একটা জীব, এই পাখীর ভিতরে আর একটা খণ্ড।......নরদেহের উত্তাপ পাইয়া নবডিম্ব ফুটিল, উড়িতে উড়িতে বাহির হইল। অচিহ্নিত শরীরের ভিতর চিহ্নিত মানুষ ঘুমায়। অব্যক্ত দেহের ভিতর যিনি ব্যক্ত স্বীকৃত হইবেন, এমন ঋষি ঘুমাইতেছেন।" (ধ্রা, ২৫ এপ্রেল, ১৮৮২)।

পশু ও মানবের ভিন্নতা বিলোপ হয় নাই।' বিলোপ না হউক কিন্তু মানুষ মানুষ থাকিলেই কি যথেষ্ট হইল? মানুষের অপেক্ষা কি আর উচ্চ জীবন নাই? ক্রমিক উন্মেষ হইতে হইতে এখানে আসিয়াই কি উহার গতি স্থগিত হইল? এখানেই কি সৃষ্টির চরম সীমা উপস্থিত? সকলই খণ্ড খণ্ড রহিল; কেবলই ভিন্নতা, কেবলই প্রভেদ, একতা কোথায়? মন খণ্ডে সন্তুষ্ট নহে, সে একতা চায়। সে যে একতা চায়, সে একতা কিরূপে নিষ্পন্ন হইবে? পশুতে পশুতে একতা নাই, কেবল বিরোধ, বিসংবাদ, সংগ্রাম। জ্ঞানেতে নীতিতে উন্নত হইয়া মানুষ পৃথিবীতে এত কাল রাজত্ব করিতেছে, কৈ পৃথিবীতে কি নির্ব্বিবাদ শান্তির রাজ্য সমাগত হইয়াছে? ঐ স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, ঐ স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, যত বার সাধু মহাজনগণ পৃথিবীতে আসিলেন, এই শব্দ মুখে লইয়া আসিলেন। তাঁহারা কি কল্পনার রাজ্যে বাস করেন, মিথ্যার রাজ্যে বাস করেন? বর্ত্তমান দুঃখ ক্লেশ ভুলাইবার জন্য তাঁহারা কি দীন দুঃখী লোকদিগকে মিথ্যা স্তোভ-বাক্য বলিলেন? তাঁহারা মিথ্যাবাদী, না সত্যবাদী? যাহা কখন সম্ভব নহে, লোকদিগকে সে কথা শুনাইয়া মিথ্যা আশা উদ্রেক করিবার কি প্রয়োজন ছিল? তাঁহারা সে রাজ্য স্বচক্ষে দেখিয়া লোকদিগকে সংবাদ দিয়াছেন? না, না দেখিয়া মনের একটা কল্পনাকে সত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন? যে সকল মানুষ আজ সংসারে বিচরণ করিতেছে, কার্য্য কর্ম্ম করিতেছে, কত কি কীর্ত্তি পৃথিবীতে স্থাপন করিতেছে, ইহারা না মরিলে, না চলিয়া গেলে যদি সে স্বর্গরাজ্য না আইসে, তবে এরূপ মিথ্যারব তুলিবার কি প্রয়োজন ছিল? যাহা আজ লোকের নিকটে প্রত্যক্ষ হইল না, সহস্রকোটি

বৎসর পরে তাহা পৃথিবীতে সিদ্ধ হইবে, এ কাল্পনিক বিশ্বাস লইয়া কি ফল? কেশবচন্দ্র বলিতেছেন, পরে নহে এখনই সম্ভব। কি প্রকারে সম্ভব, তাঁহার প্রদর্শিত প্রণালী আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে।

কেশব বলিতেছেন, সকল মানুষের মধ্যে দুই জন দুই জন মানুষ আছে। এক জন মানুষ থাকিবার নহে, চলিয়া যাইবে, মরিয়া যাইবে, আর এক জন মানুষ নিত্যকাল থাকিবে। যে মানুষ পশুর মত খায় পরে, নিদ্রা যায়, ঝগড়া করে, কলহ করে, হিংসা দ্বেষ নীচ বাসনা নীচ প্রবৃত্তির বশীভূত হয়, সে মানুষ মরণশীল, সে থাকিবে না, কদাপি থাকিবে না। দেহই কেবল মরণশীল ধ্বংসশীল তাহা নহে, আমরা যাহাকে আজ আমি বলিতেছি, সেও অনেকটা মরণশীল ধ্বংসশীল। এই মরণশীল ধ্বংসশীল মানুষের মধ্যে আর এক জন মানুষ আছেন, তিনি নমস্য, তিনি পূজ্য, তিনি ঋষি, তিনি ব্রহ্মতনয়। তাঁহার আগমনের জন্য চারিদিকে এত আয়োজন, এত সৃষ্টির ঐশ্বর্য্য ও সম্পৎ। জড়, উদ্ভিদ্ বা পশু এ জগতের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য ব্রহ্মের অনন্তসম্পদের উত্তরাধিকারী ব্রহ্মতনয়। ইনি দেবতা; ইনি Godman (নৃহরি); ইনি প্রতি মানবের আত্মার মধ্যে আজও নিদ্রিত। কে ইঁহাকে জাগাইবে? কে ইঁহার চেতনা সম্পাদন করিবে? ধর্ম্ম। ধর্ম্ম কি আকারে আসিবেন? সত্যাকারে আসিবেন। যেখানে ধর্ম্ম সেখানে সত্য, যেখানে সত্যানুরাগ সেখানে ব্রহ্মতনয়ের জাগ্রৎ ভাবে স্থিতি। এখানে ইনি, উনি, তিনি এ সমুদায় ভেদ তিরোহিত। এখানে এক অখণ্ড ঈশ্বরে এক অখণ্ড মনুষ্য বিরাজমান। এখন বুঝা যাইতেছে, মানুষ মানুষ থাকিলে চলিবে না; মানুষ দেবতা হইলে

তবে স্বর্গরাজ্য অবতরণ করিবে। ইহা কি প্রকারে সম্ভবে? ইহার কি কোন নিদর্শন পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে? যদি না দেখা গিয়া থাকে তাহা হইলে চিরদিন ইহা কথার কথা ছিল; আজও ইহা কথার কথা থাকিয়া যাইবে।

মানুষের গৌরবাকাঙ্ক্ষা বড়ই প্রবল। সে পৃথিবীতে বড় হইতে চায়, আর সকলকে পদতলে ফেলিবার জন্য তাহার যত্ন। যে যত ধনী হয়, জ্ঞানী হয়, বিদ্বান্ হয়, পদস্থ হয়, কীর্ত্তিমান্ হয়, তত তাহার আর সকল ব্যক্তি অপেক্ষা বড় হইবার স্পৃহা বাড়িতে থাকে। জিগীষা মানুষের স্বভাব। সে অপরকে সকল বিষয়ে জয় করিয়া আপনি প্রভু হইবে, সকলে তাহার অধীন হইবে, তাহার কথা শুনিয়া চলিবে, সে ভিন্ন আর যেন কেহ দ্বিতীয় ব্যক্তি পৃথিবীতে না থাকে, এই তাহার সর্ব্বদা অভিলাষ। পতি পত্নী, পিতা সন্ততি, ভাই ভগিনী সকলেরই মধ্যে এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যখন প্রবল, তখন নরনারীর মধ্যে ভ্রাতৃভাব ভগিনীভাব স্থাপিত হইবে এ আশা নিতান্ত দুরাশা। মানুষের স্বভাবের ভিতরে যখন এক জন হওয়ার বাসনা এত প্রবল, তখন এই একজন হওয়া সম্ভবপর। তবে একজন মানুষ যে প্রণালীতে সে হইতে চায়, সে প্রণালীতে কোন কালে হইতে পারে না, হওয়া একান্ত অসম্ভব। সকল মানুষকে একজন মানুষ করিবার জন্য বহু সহস্র বৎসর হইতে যত্ন চলিতেছে, সে যত্নের ফল কিছু কিছু দেখাও গিয়াছে। যদি সেই পন্থা ধরিয়া যাহা অবশিষ্ট আছে আমরা তাহা সমাধা করিতে পারি, তাহা হইলে ভ্রাতৃত্ব নহে ভগিনীত্ব নহে, একত্ব নিষ্পন্ন হইবে, স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে অবতরণ করিবে।

এ অতি আশ্চর্য্য কথা, যখনই পৃথিবীতে কোন বিধান অবতরণ

করিয়াছে, তখনই মানুষকে একজন মানুষে পরিণত করিবার জন্ত যত্ন হইয়াছে এবং সে যত্ন কতক পরিমাণে সফলও হইয়াছে। যত দিন ধনে, জ্ঞানে, সৌন্দর্য্যে, বিদ্যাতে, সম্ভ্রমে, গৌরবে মানুষ অপর সকলকে আত্মসাৎ করিবার জন্য যত্ন করিয়াছে, তত দিন তাহার সে যত্ন বিফল হইয়াছে, কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মের নামে আগমন করিয়াছেন, ধর্ম্মই আপনাদের জীবনের সর্ব্বস্ব করিয়াছেন, ধর্ম্ম ও সত্য বিস্তারের জন্য অকাতরে আপনাদের দেহের শোণিত, মনের যত্ন, হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রেম, ইচ্ছার বিশুদ্ধি বিতরণ করিয়াছেন, আপনার বলিবার পৃথিবীতে কিছু রাখেন নাই, তাঁহারা লোকদিগের সম্ভ্রম গৌরব আদর বাড়াইয়াও তাঁহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারাই বাঁচিয়া রহিয়াছেন আর সকলে মরিয়া গিয়া তাঁহাদের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞানবিদেরা বলেন, উচ্চপ্রতিষ্ঠ (higher type) মানবেরা বাঁচিয়া থাকিবেন, নিম্নপ্রতিষ্ঠ লোকেরা ধ্বংস হইয়া যাইবে, একথা এখানে সত্য দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বিজ্ঞানবিদেরা যে অর্থে একথা বলেন, সে অর্থে উহা সংলগ্ন হইতেছে না, কিন্তু নিম্নপ্রতিষ্ঠ লোকেরা উচ্চপ্রতিষ্ঠ হইয়া নিম্নপ্রতিষ্ঠত্বসম্পর্কে মরিয়া যাইতেছেন, এ অর্থে তাঁহাদের কথা সত্য হইতেছে। ইহা সত্য হইতেছে কি প্রকারে, লোকের বিদ্বিষ্ট এক ব্যক্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া উহা প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিতেছি।

মুসলমান জাতিকে অনেকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। ঘৃণা বিদ্বেষ হিংসা কাটাকাটি মারামারি বিষয়ে তাঁহারা পৃথিবীতে এক প্রকার প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা যে কেবল মুসলমান ভিন্ন অন্ত জাতির সঙ্গে বিদ্বেষসূত্রে গ্রথিত তাহা নহে; নানা নীচ বিষয়

লইয়া তাঁহারা আপনাদের মণ্ডলীর লোকের সঙ্গে সর্ব্বদা বিরোধ বিবাদ বিসংবাদ ও শোণিতপাতে প্রবৃত্ত হন। ফলতঃ তাঁহাদিগের বিবিধ প্রকারে দুরবস্থা, অথচ এক মোহম্মদের নামে, মোহম্মদের ধর্ম্মের নামে তাঁহারা সকল বিদ্বেষ ভুলিয়া যান, ধর্ম্মের জন্য প্রয়োজন হইলে কোটি কোটি লোক একজন হইয়া প্রাণ দিতে প্রস্তুত হন। মোহম্মদের নামে কত লোকে কত প্রকার গ্লানি উপস্থিত করে, খ্রীষ্টান প্রচারকগণ যেখানে সেখানে তাঁহাকে বঞ্চক শঠ ধূর্ত্ত ইত্যাদি আখ্যা দান করেন, অথচ সেই মোহম্মদ এতগুলি লোককে এমনই করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন যে, তাঁহারা তাঁহার জন্য তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিতে অকুণ্ঠিত। এরূপ হইল কেন? মোহম্মদ যে ধর্ম্ম লইয়া পৃথিবীতে আসিলেন, সেই ধর্ম্মের সহিত এক হইয়া তিনি দেবত্ব লাভ করিলেন, সেই দেবত্বে তিনি তাঁহার অনুচরবর্গের হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। মুসলমানগণের হৃদয়ে একবার সেই দেবত্ব জাগ্রৎ করিয়া দিতে পারিলে, তাঁহারা আর স্বতন্ত্র থাকিতে পারেন না, এক হইয়া যান, তখন একজন মোহম্মদ থাকিয়া যান, আর সকল মুসলমান তাঁহাতে সর্ব্বথা বিলুপ্ত হন। এ সময়ে তাঁহাদিগের এক মত এক হৃদয় এক প্রাণ হয়। উচ্চপ্রতিষ্ঠ মোহম্মদ নিম্নপ্রতিষ্ঠ অনুযায়িবর্গকে যে আপনাতে একীভূত করিয়া উচ্চপ্রতিষ্ঠ করিয়াছেন, তাহা এই সকল বিশেষ সময়ে লোকের হৃদয়ঙ্গম হয়। দেশের জন্য, স্বজাতির জন্য, ভ্রাতৃবর্গের জন্য অনেকে অনেক সময় একত্র হইয়া সমর করিয়াছেন, কিন্তু এ সকল ভাবে একত্র মিলিত হওয়া চিরস্থায়ী হয় না। কুরু ও পাণ্ডবদিগের ভ্রাতৃবিরোধ চিরপ্রসিদ্ধ। তাঁহারাও এক সময়ে শরণাপন্ন দণ্ডী রাজার নিমিত্ত কৃষ্ণের বিপক্ষে বিরোধ ভুলিয়া গিয়া সমবেত হইয়াছিলেন।

বুদ্ধ খ্রীষ্ট নানক চৈতন্য প্রভৃতি তত্তৎসম্প্রদায়ের একত্বসাধনে কি প্রকার মূল হইয়া আছেন সকলেই নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন। লোকে বলে, তাঁহাদের গৌরবাকাঙ্ক্ষা ভারি ছিল, তাঁহারা লোক-দিগের চিত্ত আপনাদের দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের যত্ন কেবল আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য। তাঁহারা আপনা-দিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যত্ন করিয়াছেন, না তাঁহাদিগের মধ্যে যে কথা যে সত্য অবতরণ করিয়াছিল তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য যত্ন করিয়াছেন? তাঁহারা আপনাদিগেতে অবতীর্ণ কথা ও অবতীর্ণ সত্য ভিন্ন আপনাদিগকে আর কিছুই জানিতেন না। তাঁহারা আপনাদের দেবত্বাংশে সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন, অসার মানবী-য়াংশ অনুযায়িবর্গের চক্ষুর সন্নিধান হইতে তিরোহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা যখনই অনুগামিগণকে আহ্বান করিয়া-ছেন, তখনই মানবীয়াংশের নামে নহে, দেবাংশের নামে আহ্বান করিয়াছেন। দেবাংশে সমুদায় মানুষ এক হইবে, ইহাই জগৎপতির অভিপ্রায়। সে দেবাংশ যদি খ্রীষ্ট বুদ্ধাদি নামে পৃথিবীতে প্রচলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে জগৎপতির অভিপ্রায় খণ্ডিত হইল কি প্রকারে বলিব? দেবাংশ আপনার স্থিতির জন্য আধার অপেক্ষা করে, খ্রীষ্ট বুদ্ধাদি সেই আধার ভিন্ন আর কিছুই নহেন। ইঁহারা যদি আত্মগৌরবাকাঙ্ক্ষী হইতেন তাহা হইলে দুজন লোককেও একজন করিতে পারিতেন না। তাঁহাদের আত্মগৌরব বলিয়া কিছু ছিল না, তাই তাঁহারা আপনা-দের দেবত্বে অনেককে এক করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইঁহারা যাহা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে সম্পন্ন করিলেন, তাহারই অখণ্ডত্বসম্পাদনজন্য কেশবচন্দ্রের আগমন। তিনি কি করিলেন দেখা যাউক।

কেশবচন্দ্রের এ সম্বন্ধে অভিলাষ অতি উচ্চ। বুদ্ধ খ্রীষ্ট প্রভৃতি স্ব স্ব সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণকে স্ব স্ব দেবত্বে এক করিয়াছেন, কেশবচন্দ্র সকল সম্প্রদায়ের সকল প্রকারের লোককে সাধু অসাধু চণ্ডাল ব্রাহ্মণ প্রভৃতির দেবাংশে এক করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ। দুজন লোক যাঁহার যত্নে এক হইল না, তিনি এত বড় উচ্চাভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করিয়া কি আপনাকে উপহাসাস্পদ করেন নাই? তাঁহার কোন কোন কৃতবিদ্য বন্ধুর মধ্যে সংশয় এই, কেশবচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, জীবনে তাহা দেখাইতে পারেন নাই, তাঁহার কথা কেবল কথামাত্র রহিয়াছে, ফলে কিছু দাঁড়ায় নাই। যাঁহারা তৎপ্রতি এরূপ সংশয় প্রকাশ করেন, কেশবচন্দ্রের অনুকূলে কেহ দুচারিটী কথা বলিয়া তাঁহাদিগের সে সংশয় নিরস্ত করিবেন সম্ভবপর নহে। তবে কেশবচন্দ্র যে প্রণালী যে উপায় আপনার জীবনে অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং অবলম্বন করিয়া তাঁহার যত্ন মিথ্যা নয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, আমরা কেবল তাহারই উল্লেখ করিতে পারি। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পশুতে পশুতে বা মানুষে মানুষে মিলন হয়, কেশবচন্দ্র ইহা স্বীকার করিতেন না। দেবতায় দেবতায় মিলন, ইহাই তাঁহার বিশেষ মত। মানুষের পশুভাব ও মানুষের মানবীয় ভাব সর্ব্বথা অপনীত হইয়া সে দেবতা হইবে ইহা কি সম্ভব? কখন কোন মানুষ আপনাতে কি দেবতা প্রত্যক্ষ করিয়াছে? কেশবচন্দ্র বলেন, হাঁ, ইহা নিত্যপ্রত্যক্ষ বিষয়। প্রতিদিন মানুষ যখন সংসারের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া ভগবানের চরণতলে গিয়া উপস্থিত হয়, সেই প্রাণস্বরূপের সহিত প্রাণের মূলদেশে একীভূত হয়, তখন সে আর মানুষ থাকে না, দেবতা হয়। ফলতঃ পৃথিবীর ভূমি হইতে উর্দ্ধে আরোহণ না

করিলে, স্বর্গে প্রবেশ না করিলে মানুষ আপনার দেবত্ব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না। উপাসনা আর কি? পরম দেবতাতে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার দেবত্ব উপলব্ধি।

মানিলাম, ঈশ্বরেতে প্রবিষ্ট আত্মা ঈশ্বরেতে পূর্ণ হইয়া আপনার পশুত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া যায়, এবং তাহাতে দেবত্ব অবতরণ করে। সে আপনি দেবতা হইল তাহাতে সমুদায় নর নারীর সহিত তাহার একত্ব হইল কোথায়? ঈশ্বরের সহিত এক হইবার জন্য যেমন সাধনের প্রয়োজন, তেমনি ভাই ভগিনীগণের সঙ্গে এক হইবার জন্য সাধন আবশ্যক। ঈশ্বরেতে আপনাকে এবং আপনাতে সমুদায় ভাই ভগিনীকে এক করিয়া লওয়া, ইহাই এ সম্বন্ধে সাধন। আপনাতে কোটী কোটী ব্যক্তিকে এক করিতে হইলে যে সাধনপ্রণালী অবলম্বন করা প্রয়োজন, তাহাতে একটি মানবীয় মধ্যবিন্দু চাই। কেশবচন্দ্র এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য করিয়া লওয়া অনেকের পক্ষে একটু কঠিন হইয়া পড়ে। এক ঈশাকে মধ্যবিন্দু করিয়া তাঁহার সহিত তিনি সমুদায় স্বর্গস্থ ঋষি মহাজনগণকে এক করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং মানবীয় মধ্যবিন্দু বলিতে হইবে, কেশবচন্দ্রের নিকট খ্রীষ্ট। সমুদায় স্বর্গস্থ ঋষি মহাজনগণকে ঈশাতে তিনি এক করিয়া লইলেন কেন? ঈশার প্রতি এরূপ অযথা পক্ষপাত কি বিজ্ঞানসিদ্ধ নহে? না, বিজ্ঞানসিদ্ধ নহে। সমুদায় ঋষি মহাজনগণের সাধারণ ভাব কি? সাধারণ ভাব ব্রহ্মতনয়ত্ব, ব্রহ্মতনয়ত্বে তাঁহারা সকলে এক। যদি সকলকে এক করিতে হয়, তাহা হইলে এই ব্রহ্মতনয়ত্বে এক করা সম্ভবপর। ঈশা পৃথিবীতে ব্রহ্মতনয়াবতার, সুতরাং তিনি সকল যোগী ঋষি মহর্ষিকে ব্রহ্মতনয়ত্বে একীভূত করিয়া আপনার সঙ্গে এক

করিয়াছেন *। যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে এক হইবেন, তাঁহারা সুতরাং সকলের সঙ্গে এক হইবেন।

কেশবচন্দ্র যদি এই পর্য্যন্ত করিয়া নিরস্ত থাকিতেন, তাঁহার বিরুদ্ধে অতি অল্প লোকেই কিছু বলিত। শেষ সময়ে তিনি যে সকল প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহাতে আপনার পূর্ব্ব কথার বিরোধে আপনাকে তিনি বন্ধুগণসম্বন্ধে মধ্যবিন্দু করিয়াছেন স্পষ্ট দেখা যায়। যিনি গুরু নন, মধ্যবর্ত্তী নন, তিনি আপনাকে মধ্যবিন্দু করিয়া সকলই হইলেন, এ দোষারোপ কে আর তাঁহার উপর করিতে ছাড়িবে? শেষ সময়ে অবশ্য আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন, অন্যথা নিজে নিজের কথা খণ্ডন করিয়া সাধু অসাধু পাপী চণ্ডাল প্রভৃতির মিলনভূমি আপনাকে কেন করিয়াছেন? এখন জিজ্ঞাস্য এই, এটি একটী সাধনপ্রণালী কি না? যদি একটী সাধনপ্রধালী হয়, তাহা হইলে তাঁহাতে এ সাধনপ্রণালী পূর্ব্ব হইতে ছিল কি না? যদি আপনি সাধন করিয়া যখন সিদ্ধ হইয়াছেন তখন সেই সিদ্ধ বিষয় বন্ধুগণের নিকট ব্যক্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অন্ততঃ সাধনপ্রণালী বলিয়া গ্রহণ করত ইহার অতি বিস্তৃত ব্যবহারপ্রদর্শনপূর্ব্বক প্রণালীর নির্দ্দোষত্ব এবং তাঁহার পূর্ব্বাপর কথার সামঞ্জস্য দেখান যাইতে পারে। [illegible]তঃ অতি পূর্ব্ব হইতে একটী সাধনপ্রণালী তাঁহার মধ্যে কার্য্য করিতেছিল। তিনি বলিয়াছেন, "পরিবার এক; এক জনের সঙ্গে যদি

* Behold the central figure of the divine son. The radii of all human races and nationalities from the remotest parts in the circumference of humanity converge and meet in him. He attracts all into himself and reconciles all in a common fellowship with himself and with his God.—*Lect Ind.*

প্রকৃত স্বর্গীয় ভাবে সম্মিলন হয় তাহা সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইবে। কেন না মূলে চিরকাল পৃথিবীতে এক পরিবারই থাকিবে।" কি উপায়ে এই মহাব্যাপার সিদ্ধ হইবে তৎসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "'আমি' 'তুমি' 'তিনি' এ সকল কথা থাকিবে না। সেখানে সকলে এক হইয়া যাইব ইহারই জন্য আমাদের এত আয়োজন, ইহারই জন্য আমাদের একত্র উপাসনা।" এ সাধন কি কেবল অন্তরেই থাকিবে? না, বাহিরেও প্রকাশ পাইবে। "যখন অন্তরে পাঁচ জন ঈশ্বরেতে এক হইবে, তখন বাহিরেও স্বর্গরাজ্য প্রকাশিত হইবে।" ভেদ বাহ্যে অভেদ অন্তরে, এ মূলসূত্র কেশবচন্দ্র অনেক দিন পূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছেন,—"সব ভাই এক ভাই, সব ভগ্নী এক ভগ্নী, অবস্থাভেদে আমরা অনেক, কিন্তু ঈশ্বরসম্পর্কে আমরা সকলেই এক" "ঈশ্বর এক এবং তিনি সকলের প্রাণ, সুতরাং তাঁহার মধ্যে সকল নরনারী এক।" ইহা কি তিনি প্রত্যক্ষ করিয়া না অনুমান করিয়া বলিয়াছেন? সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছেন। "এই উৎসবের সময় যদি দেখিতে পাই, আমরা সকলেই এক হইয়াছি, তুমি যাহা বলিতেছ, আমিও তাহা বলিতেছি, তুমি যাঁহাকে দেখিতেছ, আমিও তাঁহাকেই দেখিতেছি, তুমি যাঁহার কথা শুনিতেছ, আমিও তাঁহারই কথা শুনিতেছি, এমন কি অনন্ত স্থান এবং অনন্তকাল যদি আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করে, তথাপি তোমার মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে তুমি এবং সকলের মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে সকলে থাকিবে।"

এটী সাধনপ্রণালী হইলে পূর্ব্বাপর সকল কথার সামঞ্জস্য হয়, কেশবচন্দ্রে কোন দোষ পড়ে না, ইহা দেখান প্রয়োজন।

এই সাধনপ্রণালীতে সর্ব্বপ্রধান কি? উপাসনা—একক নহে, দশজনকে লইয়া উপাসনা। এক জন উপাসনা করিতেছেন, দশজন তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। যিনি উপাসনা করিতেছেন, অনন্ত প্রাণের সহিত তিনি মিলিত হইয়াছেন, সেই অনন্ত প্রাণ আর দশ জনকে তাঁহার সহিত মিলিত করিয়াছেন। এস্থলে এক জনে দশ জন এক হইল, এক বিন্দুতে দশবিন্দু মিশিল, কিন্তু এরূপে মিশিবার কারণ সেই এক ব্যক্তি, না প্রাণস্বরূপ ঈশ্বর? যদি প্রাণস্বরূপ ঈশ্বর মিলনের কারণ [illegible] তাহা হইলে যে বিন্দুতে দশবিন্দু মিশিল সে বিন্দু মধ্যবিন্দু হইয়াও স্বয়ং অকর্ম্মণ্য, প্রাচীন মধ্যবর্ত্তী বা মধ্যবিন্দুর মত নহে, কেন না প্রাচীনকালে যাঁহারা মিলিত হইতেন, তাঁহাদের দৃষ্টি সেই মধ্যবর্ত্তী বা মধ্যবিন্দুতে ছিল, এখানে সেরূপ হইলে যোগ কাটিয়া যায়, অখণ্ড এক জন মানুষের অখণ্ড এক ঈশ্বরেতে প্রবেশ হয় না। সুতরাং কেশবচন্দ্র স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, নূতন বিধানে প্রাচীন বিধানের মত মধ্যবিন্দু বা মধ্যবর্ত্তী নাই, তবে সাধনার্থ যে মধ্যবিন্দু, তাহা মধ্যবিন্দু হইয়াও মধ্যবিন্দু নহে, কেন না ঈশ্বরেতে দৃষ্টি বদ্ধ না রাখিয়া উহাতে দৃষ্টি বদ্ধ রাখিলে যোগ কাটিয়া যায়। ঈশ্বর এক জনেতে দশজনকে এক করেন, ইহা ঈশ্বরের লীলা, মানুষের ইহাতে কোন হাত নাই, সুতরাং আমি মধ্যবিন্দু বা মধ্যবর্ত্তী এ অভিমান হৃদয়ে পোষণ করা কোন মানুষের পক্ষে শোভা পায় না। তবে ঈশ্বরের বিশেষ লীলাসম্ভূত নবীন সাধনপ্রণালী ঈশ্বর যাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন, সে সাধনপ্রণালী জগতের নিকটে ব্যক্ত করিবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে। সাধকমাত্রেই যখন অপর সহস্র ব্যক্তিকে লক্ষ্য স্থলে রাখিয়া এ প্রণালী নিজ নিজ জীবনে

প্রয়োগ করিতে পারেন, তখন ইহার সার্ব্বভৌমিকত্ব সকল ক্ষেত্র অপমন্থন করিতেছে।

আমি এত গুলি কথা বলিয়াও একটী কথা এখানে গোপন করিতে পারি না। সে কথা এই,—এই নবীন প্রণালী যিনিই জীবনে প্রয়োগ করিবেন কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার একাত্মতা অবশ্যম্ভাবী। কেহ নাম গ্রহণ করুন বা না করুন, ফলে এরূপ না হইয়া থাকিতে পারে না, কেন না নববিধানের এখানে বিশেষত্ব। ইহা প্রাচীন গুরুবাদ নহে। একাত্মতালাভে যে ব্যক্তির বাসনা আছে, তাঁহার মানুষ গুরু অবলম্বন করিয়া কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই, কেন না প্রাণের মূলে গিয়া প্রাণস্বরূপের সঙ্গে প্রথমতঃ সংযুক্ত না হইলে একটি ব্যক্তিকেও বাহিরে রাখিয়া তাঁহার সঙ্গে এক হইবার উপায় নাই। এখানে ঈশ্বরসম্বন্ধে বা জীবসম্বন্ধে অদ্বৈতবাদী হইবারও সম্ভাবনা নাই, কেন না ইহাতে মূলে যেমন ঈশ্বর ও জীবের সহিত একত্ব অনুভূত হয়, তেমনি স্বরূপ ও অবস্থাগত ভেদ কোন কালে অনুভূতি হইতে বিলুপ্ত হয় না। দ্বৈতমধ্যে অদ্বৈত দর্শন, শিষ্যমধ্যে গুরুদর্শন, এদুই বিপরীত ভাব অন্তর ও বাহির এ দুইয়ের একত্র সমাবেশ আছে বলিয়াই নববিধানে সম্ভবপর। কেশবচন্দ্র যেমন সকল নরনারীকে ভগবানের পাদপদ্মমূলে এক দর্শন করিলেন,তেমনি তাঁহাদিগের অবস্থাগত পার্থক্য দর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রতি ভক্তি সমর্পণের উপায় উদ্ভাবন করিলেন। কেবল যোগ হইলে চলে না ভক্তি চাই, এজন্য কেশবচন্দ্র মানুষকে প্রাণস্বরূপে এক করিয়া গ্রহণ করিলেন, আবার তাঁহাদের যেখানে দেবাংশ অবস্থিত সেখানে ভক্তি অনুরাগ অর্পণ করিলেন, শিষ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া যাঁহার নিকট হইতে যাহা শিখিবার শিখিলেন। এ সকল সাধনের বিস্তৃত কথা,

[illegible] এ সম্বন্ধে [illegible] কিছু বলা যাইতে পারে, এখানে কেবল [illegible] উল্লেখই যথেষ্ট।

এতক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহার উপসংহার প্রয়োজন। কেশবচন্দ্র যে অন্তর ও বাহির উভয়ের পক্ষপাতী ছিলেন, তাহার মূলে যোগ ও ভক্তি অবস্থান করিতেছে। যোগ একত্বমূলক, ভক্তি ভেদমূলক। এক ও বহু, এ দুইয়ের মধ্যে যিনি সমান ভাবে বিচরণ করিতে পারেন না, তিনি যোগ ও ভক্তিকে সমপরিমাণে জীবনে রক্ষা করিতে অসমর্থ হন। এক ও বহু, ভেদ ও অভেদ, এ দুই ভাবকে একই সময়ে জীবনে স্থান [illegible] অনেকের পক্ষে কঠিন, কেবল তিনিই এ সম্বন্ধে কৃতকৃত্য হইতে পারেন, যিনি নববিধানের নবীন যোগে যোগী হইয়াছেন। এ নবীন যোগে ঈশ্বর লইয়া যে বিবাদ পৃথিবীতে চলিতেছে সহজে তাহার মীমাংসা হয়; ঈশ্বরসম্বন্ধে সগুণ ও নির্গুণ, এ দুই মত এখানে অন্তর ও বাহিরের সমপরিমাণে সম্বন্ধ রক্ষা করাতে সমঞ্জস হইয়া যায়। অন্তরের অন্তরে ঈশ্বরের সহিত যোগযুক্ত ব্যক্তি তাঁহাকে অখণ্ড নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প পুরুষরূপে দর্শন করেন, আবার তাঁহারই প্রেমের বিচিত্র লীলা প্রকৃতিতে নরনারীতে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। নববিধানের সাধক যেমন ঈশ্বরের সহিত এক হন, তেমনি সমুদায় ঋষি মহাজন নরনারী সকলের সঙ্গে এক হন। এ একত্ব দেবত্বে, পশুত্ব বা মনুষ্যত্বে নহে। এ একত্বও ভক্তি বা প্রেমশূন্য নহে। অন্তরে এক হইয়া বাহিরে নরনারীর দেবাংশে ভক্তি স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাদের সেবা করিতে না পারিলে কিছুই হইল না। সুতরাং পিতামহ রাজা রামমোহন যেমন পারমার্থিক ও লৌকিক এই দুই ভাবে অন্তর ও বাহিরকে বিভাগ করিয়া পরমাত্মসাক্ষাৎকার

এ সংসারে বিবিধ কর্ত্তব্য পালন উভয়কেই রক্ষা করিয়াছিলেন, এস্থলেও তাহাই ঘটিতেছে। ইহাতে জড়বাদ (Materialism) এবং অধ্যাত্মবাদে (Spritualism এ) যে বিবাদ ছিল তাহাও অন্তর্হিত হইতেছে; কেন না অন্তর ও বাহির এর্থ যথাপরিমাণে লোকে রক্ষা করিতে পারে নাই বলিয়া পৃথিবীতে উভয়বাদের বিরোধ চলিতেছে। ঈশ্বরের সাক্ষাৎসম্বন্ধ বিনা—পবিত্রাত্মার সাক্ষাৎ ক্রিয়া বিনা যখন নব যোগ নব ভক্তির প্রণালীতে ঈশ্বর,জীব ও প্রকৃতি সহ একাত্মতা ও অনুরাগের সম্বন্ধ রক্ষা সম্ভবপর নহে, তখন প্রাচীন গুরুবাদ মধ্যবর্ত্তিবাদ এখানে আসিতে পারে না। এখানে ঈশ্বর ও জীব সহ একত্ব উপস্থিত হইয়াও অদ্বৈত ও দ্বৈত ভাবের বিলোপ হইতেছে না, সুতরাং প্রাচীন দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদের এখানে অবকাশ নাই। কেবল জ্ঞান দ্বারা অন্তর বাহিরের সামঞ্জস্য রক্ষা পায় না, যোগ ও ভক্তির একান্ত প্রয়োজন, সুতরাং সাধন ভজন প্রবত্নাদি সকলেরই এস্থলে প্রয়োজন পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতেছে। সেবা ভক্তির অন্তর্ভূত; সুতরাং এ পথে অনুরাগ-সংমিশ্র কর্ম্মযোগ বিলক্ষণ বিদ্যমান।

• পরিশেষে আত্মসম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা বলা প্রয়োজন। আমি এখন প্রকাশ্যে যাহা কিছু সকলের নিকটে বলিতে যাই, কোন না কোন আকারে কেশবচন্দ্র তাহার মধ্যে থাকেন, ইহাতে সহজে সকলের মনে এই আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে যে,আমি স্বতঃ পরতঃ কেশবচন্দ্রকে জনসমাজে স্থাপন করিবার জন্য যত্ন করিতেছি। আমার যত্নে কেশবচন্দ্র স্থাপিত হইবেন, তিনি আপনি আপনার পদোপরি দণ্ডায়মান হইতে পারেন না, ইহা আমি কখন বিশ্বাস করি না। কেশবচন্দ্র বলিয়া ক্রমান্বয়ে চিৎকার করিলে তাঁহার স্থাপনা হয়,

ইহা আমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধ কথা। তিনি যে পন্থা অবলম্বন করিয়া সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন, সে পন্থা জীবনে অবলম্বন না করিলে কেশবচন্দ্রের স্থাপনা হয় ইহা আমার বিশ্বাস নহে। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কেবল মানুষ অবলম্বন করিয়া কে কবে মহা-যোগের অধিকারী হইয়াছে? যেখানে লোকে ব্রহ্মতনয়কে চাহি-য়াছে, সেখানে সেই ব্রহ্মতনয়ে তাহাদের চিত্ত আবদ্ধ হইয়াছে, সকল সাধু মহাজন সকল নরনারীর সঙ্গে তাহারা কখন এক হয় নাই। কেশবচন্দ্র ঈশ্বরকে সর্ব্বপ্রথমে গ্রহণ করিলেন এবং ঈশ্বরাব-লম্বনে সমুদায় ব্রহ্মতনয়গণকে এক ব্রহ্মতনয়ে নিবিষ্ট করিয়া আপনাতে তাঁহাদের সকলকে এক করিলেন। এত দূর করিয়াও তিনি পাপী পুণ্যাত্মা সকল প্রকার নরনারীর সহিত এক হইতে পারিতেন না যদি আপনাকে পাপী হীন বলিয়া গ্রহণ না করিতেন, অকিঞ্চনতাযোগে যোগের সহিত ভক্তিকে না মিশাইতেন। তাঁহার প্রণালী অবলম্বন করিয়া যাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশব * না হইবেন, তাঁহারা তাঁহার যোগে যোগযুক্ত, তাঁহার ভক্তিতে ভক্তিমান্ হইবেন কি প্রকারে? লক্, হিউম, কম্‌ট, লুইস, হক্সলে, স্পেন্সার প্রভৃতি সংশয়বাদিগণের শিষ্যত্ব আমি প্রকাশ্যে আরও স্বীকার করিয়াছি।

---

* কেশব হওয়া কি? তাঁহার জীবনের মূলতত্ত্ব আত্মজীবনের মূলতত্ত্ব করিয়া লওয়া। "Those who profess to be my enemies are advocating my cause, and going about preaching my ideas and principles. They hold in their hands my banners. I see their lives, I watch their movements, and with a smile I say to myself,—why this is all my own self reproduced."
—*Lect Ind.*

তাঁহাদের শিষ্য হইয়া কোন প্রকার কুসংস্কার বা বিজ্ঞানবিরোধী বিষয়ের আমি অনুমোদন করিতে পারি না। ব্রহ্মবিজ্ঞান যাহাদের মত, তাহারা কোন প্রকারে কোন মতের দাস হইতে পারে না। ব্রহ্ম অসঙ্গ উদাসীন হইয়াও সমুদায় জগৎ ও জীবের মধ্য দিয়া নরনারীসম্বন্ধে আপনার কল্যাণাভিপ্রায়সকল ব্যক্ত করিতেছেন, এ মতের যদি আমি পক্ষপাতী না হইতাম, তাহা হইলে হয়তো যোগের পথ অবলম্বন পূর্ব্বক যাঁহাদিগের ভিতর দিয়া ভগবানের কল্যাণাভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করিতাম, না হয় ভক্তিপথের পথিক হইয়া একত্বকে শুষ্ক কঠোর ব্রহ্মজ্ঞানীর পথ মনে করিয়া ঘৃণাপূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিতাম। যে পথে আসিয়াছি, সে পথে ভগবানের অভিপ্রায়ের সহিত সংযুক্ত একটী ক্ষুদ্র নরনারীকেও * অগ্রাহ্য করিতে পারি না, ভক্তির বিষয় না করিয়া থাকিতে পারি না। ঈশ্বর আপনি যে সকল উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহার একটিকেও অগ্রাহ্য করা এখানে অপরাধ। যদি অন্তর ও বাহির, দুই সমভাবে আমরা গ্রহণ করিতে না পারি

---

* ড্রামণ্ড অন্য কথা বলিতে গিয়া এই ভাবের যে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন তৎপ্রতি সকলেরই বিশেষ মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য।
—Surely next to its love for the chief of sinners the most touching thing about the religion of Christ is its *amazing trust in the least of saints*(Italicised). Here is the mightiest enterprise ever launched upon this earth, mightier even than its creation, for it is its re-creation, and the carrying of it out is left, so to speak, to haphazard—to individual loyalty, to free enthusiasms, to uncoerced activities, to an uncompelled response to the pressures of God's Spirit.—*The City without a church.*

তাহা হইলে বর্ত্তমান বিধানের সহিত একতা কি প্রকারে হইবে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক, বর্ত্তমান বিধানের ভাব,সত্য ও মূলতত্ত্ব বিরোধিগণকেও গ্রহণ করিতে হয় সত্য, কিন্তু যদি জ্ঞাতসারে ভক্তি অনুরাগ সহকারে এ সকল গৃহীত না হয়, আত্মস্থ করা না হয়, তাহা হইলে বিধান-স্বীকারজনিত জীবনের সার্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি কি কখনও সম্ভবপর? আমার অনুরোধ, এখান হইতে যাইবার পূর্ব্বে আমরা যেন বর্ত্তমান বিধানের মহাযোগ ও মহাভক্তি গ্রহণ ও আত্মস্থ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হই। পুনঃ পুনঃ কেশবচন্দ্রকে লইয়া আলোচনা করা যেন কেবল বচনরচনামাত্র না হয়। সকলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশব হউন,এ অনুরোধ বোধ হয় কেহই আর অযুক্ত মনে করিবেন না *।

---

* জীবোপাদান (Protoplasm) যে যে উপাদানে উৎপন্ন সে গুলি একত্র সম্মিলিত করিলে তাহা মৃত অবস্থায় অবস্থান করে, জীবনীশক্তি উহাতে প্রবিষ্ট না হইলে উহা হইতে অপর জীবোপাদান উৎপন্ন হইতে পারে না। এই দৃষ্টান্তটি অধ্যাত্ম জগতে প্রয়োগ করিলে এইরূপ তত্ত্ব সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়;—নিয়ম অনুষ্ঠান বিধি সত্যাদি ধর্ম্মজীবনের উপাদান, মৃত উপাদানগুলি উদ্ভিদের অন্তরস্থ হইয়া যেমন জীবন্ত হয়, তেমনি এগুলি কোন এক ব্যক্তির জীবনে পরিণত যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ মৃত ভাবে অবস্থান করে। জীবনে পরিণত হইয়া জীবন্ত ভাব ধারণ করিলে উহা আর শত শত জীবন উৎপাদন করে। মহাজনগণের জীবন জীবন্ত জীবোপাদান (Protoplasm) সদৃশ শত শত জীবন উৎপাদনে সমর্থ। কিন্তু জীবন্ত জীবোপাদানের উৎপাদনসামর্থ্যসত্ত্বেও অন্তর্নিহিত প্রতিকৃতি (type) বা অভিপ্রায় বিনা গঠনকার্য্য যেমন নিষ্পন্ন হয় না, তেমনি মহাজনগণের জীবন জীবন্ত হইলেও পরমাত্মপ্রভাব বিনা উহা কাহারও জীবনগঠনে সমর্থ হয় না। যিনি এই সকল কথা ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিবেন,

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশব হইতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরদর্শন, ঈশ্বরের কথা শ্রবণ, তদনন্তর ঈশা মুষা প্রভৃতিকে গ্রহণ, ঈশ্বরেতে সকল মানবজাতির সহিত একত্ব সাধন প্রয়োজন। এই পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক আমরা সকলে নবযুগের নবধর্ম্মে যাহাতে দিন দিন অগ্রসর হইতে পারি, কৃপানিধান ঈশ্বর আমাদিগকে তদ্বিষয়ে আশীর্ব্বাদ করুন।

তিনি আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশব হইতে হইবে, এ কথা অযুক্ত মনে করিতে পারিবেন না।

কেশবচন্দ্র কে এবং তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি ?

কেশবচন্দ্র কে এবং তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি? *

পৃথিবী জিজ্ঞাসা করিতেছে কেশবচন্দ্র কে? যিনি আজ নব বৎসর হইল এই পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন তিনি কে, এবং তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি? হে কেশবচন্দ্র, তুমি কে? তোমাকেই আমরা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি কে? তুমি কি মহৎ কার্য্য করিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছ? তুমি আপনার কথায় আপনার বিষয় না বলিলে, তুমি যাহা নও সেই প্রকারে তোমায় যে পৃথিবী গ্রহণ করিবে! তোমার বাহিরের কথা নিস্তব্ধ হইয়াছে, তাই বলিয়া কি তোমার বাণী চিরদিনের জন্য নিস্তব্ধ? তোমার ভিতর হইতে যে বাণী নিঃসৃত হইয়াছে, সে বাণী আজও পৃথিবীতে বিদ্যমান। তুমি যাহা, তাহা সেই বাণী ভাল করিয়া পৃথিবীকে বুঝাইয়া দিক্। এই জগতে অন্যান্য বিধানে অনেক মহাত্মারাই আসিয়াছিলেন, সকলেই বলিয়া গিয়াছেন যে, আমাকে কেহ ঈশ্বর বলিও না, কিন্তু তাঁহা-দিগের শিষ্যেরা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া তাহার বিপরীত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের বাণী তাঁহাদিগের শিষ্যগণ অমান্য করিয়া যেমনিই আচরণ করিয়াছেন, তোমার অনুগামী বন্ধুগণ কি তাহাই করি-বেন? ইহা যেন না হয়, এ জন্য আমরা তোমা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ। সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেই আমরা আমাদিগকে ধন্য

* চতুঃষষ্টিতম মাঘোৎসবোপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতার সার।

পুরুষদিগের শ্রেণীভুক্ত নহেন। তিনি আপনাকে ঈশা মুষা প্রভৃতির দলে ফেলেন নাই এবং আমরাও তাঁহাকে ঐ শ্রেণী-ভুক্ত করাকে নবধর্ম্মসঙ্গত মনে করি না। যদি তাঁহাদিগের সহিত তাঁহাকে সমান করা হয় তাহা হইলে তাঁহার সম্বন্ধে অন্যায় বিচার করা হইবে। এই জন্য তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি Prophet (ভবিষ্যদ্ দ্রষ্টা) নহি। ঈশা প্রভৃতির সহিত আমি কোন কালে প্রতিযোগিতা করিতে পারি না। যদি আমাকে কেহ ঈশার প্রতিযোগী মনে করে, তবে আমি কে, তাহাদিগের জানা উচিত। আমি সেই জুডাস স্কেরিয়ট যে ঈশাকে শত্রু হস্তে অর্পণ করিয়াছিল। আমাতে যে পরিমাণে পাপ আছে, ঈশা হইতে তজ্জনিত বিচ্ছেদ আছে, সেই পরিমাণে আমি জুডাস। আমি সেই অমিতাচারী সন্তান, যে ঈশ্বরের গৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য যত্ন করিতেছে।' ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা মহা-পুরুষগণ যে কার্য্য সাধন করিতে আসিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র সেই কার্য্য করিলেন, অথচ তিনি আপনাকে সে শ্রেণীতে ভুক্ত করিতে কেন কুণ্ঠিত হইলেন? এ কি বিনয়প্রকাশ? কেশব-চন্দ্র মিথ্যা বিনয় প্রকাশ করিবার লোক ছিলেন না। তিনি যাহা সত্য জানিতেন, তাহা অকুতোভয়ে জনসমাজে প্রকাশ করিতেন। যদি তিনি আপনি উঁহাদিগের দলস্থ হইতেন, সে কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে কদাপি তিনি সঙ্কুচিত হইতেন না। সমুদায় পূর্ব্ববর্ত্তী বিধানকে আত্মস্থ করা—সকলকে একীভূত করা তাঁহার বিশেষ কার্য্য ছিল। যদি তিনি পূর্ব্ব মহাপুরুষগণের এক শ্রেণী হন, তাহা হইলে তাঁহারা যেমন এক এক জন, তিনিও তেমনি এক জন হন, তাঁহারা সকলে তাঁহাতে মিলিত...

এক জন হইবেন, ইহা সে অবস্থায় কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে? যাঁহাদিগকে আত্মস্থ করিতে হয়, যাঁহাদিগের সহিত এক হইতে হয়, তাঁহাদিগের শিষ্যস্থানীয় না হইলে কদাপি চলে না। কেশবচন্দ্র এই জন্যই ঈশা মুষা প্রভৃতি সাধু মহাত্মাদিগের অনুগত সেবক ও শিষ্য বলিয়া আপনাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদিগের দেশের যোগী ঋষিদিগের যোগতত্ত্বের ভিতর দিয়া যোগীদের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের একত্ব। ঋষিগণের পরবর্ত্তী বিধানপ্রবর্ত্তকগণের বিশেষ বিশেষ ভাব আত্মস্থ করিয়া কেশবচন্দ্র তাঁহাদিগের সহিত এক হইয়াছেন। সমগ্র প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের যোগ আমরা ইহাতে দেখিতে পাইতেছি। ইতিহাসের শ্রেণীনিবন্ধন এই প্রকারেই হইয়া থাকে। বিবিধ বিধানের ঐক্যভূমি এই বিধান কেশবচন্দ্রের মধ্য দিয়া আসিয়াছে, কেশবচন্দ্র আপনি ইহা বলিয়াছেন, অপরে ইহা বলিবে সে অপেক্ষা রাখেন নাই। এ সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষগণ সহ ইঁহার সম্বন্ধ প্রতীত হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি স্বয়ং কি এ বিষয়ে বলিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। তিনি বলিয়াছেন, ক্রাইষ্ট, মুষা, চৈতন্য, বুদ্ধ প্রভৃতি মহৎ, আমি ক্ষুদ্র। সে বারে বড় বড় লোকের ভিতর দিয়া ভগবান্ বিধান পাঠাইয়াছিলেন, এবারে এই সামান্য মুটের মাথায় দিয়া বিধান পাঠাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'বড় বড় থামের উপর বড় বড় এমারৎ হয়; বড় বড় লোকেরা বড় বড় ধর্ম্মের স্তম্ভ হয়। এবার তাঁদের পদরেণু মাথায় নিতে পারে না এমন সামান্য দুর্ব্বল লোকের উপর বড় স্বর্গের ভবন (হে ঈশ্বর) স্থাপন করিলে এই এক অলৌকিক ব্যাপার।' তাঁহার এ সকল কথায় ঈশা

প্রভৃতির শিষ্যত্ব, অথচ বিধানপ্রকাশভূয়িষ্ঠবশতঃ বিশেষত্ব, এ দুই অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। লোকে কোন একটি নূতন ব্যাপার বুঝিতে পারে না। তাহারা সকলই প্রাচীন দৃষ্টিতে দেখে, তাই এ বিধানে এক দিকে শিষ্য স্বীকার, অপর দিকে পূর্ব্ব বিধানপ্রবর্ত্তকগণের ন্যায় বিধান প্রবর্ত্তন করিয়া ভবিষ্যদ্‌-দ্রষ্টৃত্ব,মহাপুরুষত্ব,মধ্যবর্ত্তিত্ব বা অবতারত্ব অঙ্গীকার বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না। এ জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, কেশবচন্দ্র আমাদিগের মধ্যবর্ত্তী নহেন, তিনি অবতার নহেন, তিনি জগদ্গুরু নহেন,এ কথা পুনঃ পুনঃ বলিলেও লোকে পুনঃ পুনঃ তাঁহাতে এই সকল আরোপ করে। তিনি যখন আপনাকে এ সকল শ্রেণীভুক্ত করেন নাই, তখন আমরাও তাহা করিব না।

ঈশা, মুষা, চৈতন্য প্রভৃতির ধর্ম্মকে একীভূত করিতে কেশবচন্দ্র আসিয়াছিলেন ; এই কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত নববিধানের অভ্যুদয়। কেশবচন্দ্র কে? এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, তিনি বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ। বেদান্তবাদিগণ যাঁহাকে বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ বলেন, সে অর্থে এ শব্দ আমি ব্যবহার করিতেছি না। বিজ্ঞান বহুকে একে পরিণত করে, বহুকে এক করা কেশবচন্দ্রের নিয়তি ছিল। এই নিয়তি অনুসরণ করিয়া তিনি আত্মজীবনে ও আত্মমণ্ডলীতে একত্ব সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধে একত্ব সাধন করিয়াছেন তাহা নহে, বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মকে একীভূত করিয়াছেন। বাহিরে দেখিতে যে সকল পদার্থ ভিন্নপ্রকৃতির বলিয়া প্রতীত হয়, সেই সকল পদার্থের সাধারণ মূল নিষ্কর্ষণ করিয়া একীভূত করা বিজ্ঞানের কার্য্য। মাধ্যাকর্ষণ তাড়িতাকর্ষণ প্রভৃতিকে এক শক্তিতে পরিণত

করিয়া বিজ্ঞান যে একত্ব সাধন করেন, সেই একত্বসাধন কেশবচন্দ্র বিবিধ বিধানসম্বন্ধে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। বিজ্ঞানমধ্যে কিছুই বিরোধী থাকিতে পারে না, বিজ্ঞানপ্রধান কেশবচন্দ্রের জীবনে তাহাই লক্ষিত হইত। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষি মহর্ষিদিগের আদি শিষ্য। তাঁহাদিগের ভিতরকার গূঢ় তত্ত্ব সকল তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কর্ত্তা নিউটন যখন মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব বাহির করিলেন, কে বলিবে তাহার পূর্ব্বে মাধ্যাকর্ষণ ছিল না? যদিও মাধ্যাকর্ষণ পূর্ব্ব হইতে ছিল, তথাপি নিউটন যে মধ্যাকর্ষণের আবিষ্কর্তা ইহা কে অস্বীকার করিবে? সজাতীয় বস্তু সজাতীয় বস্তুর দিকেই আকৃষ্ট হয়। পাণিনির 'অস্তরম' সূত্রের ভাষ্যে পার্থিব পদার্থ পার্থিব পদার্থের দিকে গিয়া থাকে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। এ সকল নির্দ্দেশ আছে বলিয়া কি মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কর্ত্তার মাহাত্ম্য কিছু খর্ব্ব হইতেছে? তিনি মধ্যাকর্ষণের সঙ্গে গণিতের যোগ করিয়া তাহার যে ক্রিয়া অবধারণ করিয়াছেন, তাহাতেই মাধ্যাকর্ষণবিষয়ে যে সকল পূর্ব্বাভাস আছে, সে সমুদায় নিউটন আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণ নহে প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে; অথচ মাধ্যাকর্ষণ পূর্ব্ব হইতে ছিল, উহার ক্রিয়াও চলিতেছিল, লোকে উহার পূর্ব্বাভাসও পাইয়াছে, এ সকলই সত্য। এখন এই দৃষ্টান্তটি কেশবচন্দ্রের জীবনের কার্য্যে নিয়োগ করা যাউক।

কেশবচন্দ্র জগতে আসিবার দুই সহস্র তিন সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে বিধানের পর বিধানের সমাগম হইয়াছে। পূর্ব্বতন বিধানের মহাপুরুষদিগের শিষ্যানুশিষ্যবর্গের ভিতর দিয়া ক্রমে তাঁহাদিগের মত সংক্রামিত হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের মত মহম্ম

সহস্র লোকের ভিতর দিয়া আজ পর্য্যন্ত সংক্রামিত হইয়াছে। যোগী মহর্ষি ঈশা মুষার ভাব এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে যে সমস্ত লোকেরা আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগের ভাব বিবিধ শাস্ত্রের আকারে জনসমাজে ও জনহৃদয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সমস্ত বিধান ভিন্ন ভিন্নরূপে লোকে গ্রহণ করে, ইহাদিগের মধ্যে যে একতা আছে, মূলে স্বাতন্ত্র্য বা ভিন্নতা নাই, একেরই বিবিধ প্রকাশ মাত্র, এই বিজ্ঞানাসক্ত ব্যাপার কেশবচন্দ্র প্রদর্শন করিয়াছেন। বিধানসমুদায় ছিল, তাহাদের মধ্যে নিগূঢ় যোগও প্রচ্ছন্ন ভাবে বিদ্যমান ছিল, কখন কখন এই যোগের আভাস যে কাহারও মনে প্রতিভাত হয় নাই তাহাও নহে, কিন্তু একটি বিজ্ঞানসিদ্ধ মূলতত্ত্বে সে সমুদায়কে একীভূত করা কেশবচন্দ্রের কার্য্য। এই আবিষ্কৃত তত্ত্ব মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় পুরাতন সামগ্রী, ইহার ক্রিয়া চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে, ইহার আভাসও লোকে পাইয়াছে, কিন্তু সেই তত্ত্বটিতে সমুদায় নিবদ্ধ করিয়া এক অখণ্ড সামগ্রী জগতের নিকটে আর কেহ উপস্থিত করেন নাই। প্রতিব্যক্তির ঈশ্বর সহ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ এই তত্ত্ব, এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দর্শন ও শ্রবণাকারে প্রকাশিত, দর্শন ও শ্রবণে বিরুদ্ধ ইচ্ছার নিবৃত্তি, বিরুদ্ধ ইচ্ছার নিবৃত্তিতে জীবে ঈশ্বরেচ্ছার সম্রাজ্য, ঈশ্বরেচ্ছা হইতে জ্ঞান প্রেম পুণ্য বিশ্বাস প্রভৃতি বিবিধ ভাবের বিকাশ। এই বিবিধ ভাব বিবিধ বিধানের উপাদান। এই বিবিধ ভাবের গতি ঈশ্বরেচ্ছার সহিত একতার দিকে। গতি হইতে মাধ্যাকর্ষণাদির বিকাশ, পরিণামে তাহারই সঙ্গে একতা, এখানেও আমরা সেইরূপ মূল ঈশ্বরেচ্ছায় সমুদায় ভাবের পরিণতিতে মিলন দেখিতেছি। এখন দেখিতে হইতেছে,

কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মজীবনের প্রথম হইতে এই তত্ত্বের প্রকাশ হইয়াছিল কি না? তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি শাস্ত্র, গুরু, বা কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়, কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার পক্ষে শাস্ত্র গুরু ধর্ম্ম সকলই ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ ছিল এবং এক দর্শন ও শ্রবণ হইতে তাঁহার যাহা কিছু সকলই হইয়াছে। কেশবচন্দ্র আপনাতে যে তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি প্রথম হইতে দেখিলেন, সেই তত্ত্বের উপরে আপনার সমগ্র জীবন স্থাপন করিলেন, এবং তাহা হইতেই নববিধানের অভ্যুদয় হইল। তিনি আপনাতে এ তত্ত্ব অবরুদ্ধ রাখিলেন না, সমুদায় মণ্ডলীতে ছড়াইয়া দিলেন।

কেশবচন্দ্রসম্বন্ধে ষ্টেটস্‌ম্যানের সম্পাদক এক বার লিখিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্রের অনুবর্ত্তিগণ বিবিধ বিধান এবং মহাজনগণরূপ কুসুমদামের সূত্ররূপে তাঁহাকে অবলোকন করিয়া থাকেন, ইহাতে গূঢ়রূপে ইঁহারা কেশবচন্দ্রকে পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণ হইতে অবশ্য শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকেন। এ কথার প্রতিবাদ আর কাহার করিবার প্রয়োজন করে না, কেশবচন্দ্রের নিজের কথাই ইহার সম্যক্ প্রতিবাদ করিয়াছে। তিনি আপনাকে কেবল মহাপুরুষশ্রেণীভুক্ত করেন নাই তাহা নহে, আপনাকে যেমন ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত তেমনি ঈশা মুষা প্রভৃতি মহাজনগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "তোমরা (প্রেরিতগণ) এবং আমি শাক্যপ্রেরিত, ঈশাপ্রেরিত, শ্রীগৌরাঙ্গ এবং পৃথিবীর অন্যান্য মহাজনদিগের প্রেরিত। তাঁহারা পৃথিবীতে তাঁহাদিগের ভাব প্রচার করিবার জন্য আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। ... তোমরা এবং আমি তাঁহাদিগের প্রেরিত। তাঁহারা আমাদিগের পিতা, পিতামহ। তাঁহাদিগের বংশে

আমাদিগের জন্ম তাঁহাদিগের ভাবে আমরা দ্বিজাত্মা।" "পৃথিবীর অনেক ভক্তিভাজন ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষদিগের সঙ্গে, পুণ্যের প্রবর্ত্তক, মুক্তির সহায় ঈশা গৌরাঙ্গের সঙ্গে এই অনু-কের নামকে যাঁহারা এক শ্রেণীভুক্ত করিলেন, এই বেদী তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিতে কুণ্ঠিত নহেন। আমি তাঁহাদিগের সহিত এক শ্রেণীভুক্ত? এ কথা নিতান্ত অসার। যাঁহাদিগের চরণরেণু আমি মস্তকে ধরিবার উপযুক্ত নই, তাঁহাদিগের সহিত এক শ্রেণীভুক্ত হইব?...এক আসনে বসিব না। নীচে বসিয়াছেন যাঁহারা, দৃষ্টান্ত লইতেছেন যাঁহারা, উপদেশ শুনিতেছেন যাঁহারা, সেই সকল ব্যক্তির আমি অন্তর্ভূত।" * মহাপুরুষগণের প্রেরিত হইয়া শিষ্য হইয়া তাঁহাদিগের সমকক্ষতা কেশবচন্দ্রে কি প্রকারে সম্ভবে? তাঁহার অনুগামী বন্ধুগণই বা কি প্রকারে পিতৃপিতামহ স্থানীয় গুরু স্থানীয় মহাজনগণ হইতে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিবেন? কেশবচন্দ্র পূর্ব্ববর্ত্তী সাধুমহাজনগণ হইতে আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিবেন ইহা একান্ত অসম্ভব। এমন কি, তিনি তাঁহার সহযোগী প্রেরিতবর্গকেও বন্ধু বিনা কখন শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

কেশবচন্দ্রের যে নিয়োগপত্র ছিল তন্মধ্যে এইরূপ লেখা ছিল বলিয়াই তিনি অযোগ্য ব্যক্তিগণকেও বন্ধু বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি ইংলণ্ডে যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "আমি যে কিছু উপদেশ দিয়াছি, দিতেছি, কিংবা দিব,

* বলিবার সময়ে ভাবে কেশবচন্দ্রের উক্তিগুলির উল্লেখ হইয়াছিল, এখন সে গুলি স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল, এবং এতন্নিবন্ধন সম্বন্ধকার্য্য কিছু কিছু পরিবর্ত্তনও ঘটিল।

তাহাতে মনের সহিত কাহাকেও সম্পূর্ণ শিষ্য বলিতে পারি না, এটি আমার পক্ষে গৌরবের বিষয়। অনেকে আমাকে গুরু বলিয়া চিঠি পত্র লেখেন, কিন্তু আমি যে কাহাকে এক বারও শিষ্য বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি এরূপ স্মরণ হয় না। আমাদিগের মধ্যে ঠিক্ গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ হইতে পারে না। অন্যের সম্বন্ধে আমি যে বিশ্বাস না করি, আমার সম্বন্ধে অন্যে যে সে বিশ্বাস করিবে ইহা সম্ভব নহে। আমাকে কেহ সম্পূর্ণ গুরু বলিলে তাঁহার পরিত্রাণের পথে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। যিনি আমার মনোগত ভাবের অনুবর্ত্তী হয়েন, তিনিই আমার শিষ্য হইতে পারেন, এবং তাহা হইলে তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আমি তাঁহার গুরু নহি, ঈশ্বরই তাঁহার এক মাত্র গুরু।" ইদানীন্তন তিনি বলিয়াছেন "এবারকার গুরু সে, যে বলে আমার কথা কিছু শুনিও না, আমার শিক্ষা মানিও না, যদি না পবিত্রাত্মার সহিত মিলে বুঝিতে পার।" তিনি যখন বিশ্বাস করিতেন "আমরা সকলে এক," তখন তাঁহার এরূপ ভাব যে স্বতঃসিদ্ধ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? গুরুত্বশিষ্যত্বসম্বন্ধ নিবদ্ধ না হয় এ নিমিত্ত তিনি একান্ত সাবধান ছিলেন। এই উদ্দেশেই আমাদিগের মধ্যে একাকী কেহ গিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যাইত না, কিন্তু ৩।৪ জন মিলিয়া যাইলে আহ্লাদের সহিত তাহার উত্তর দিতেন এবং আনন্দিত হইতেন। যেখানে দশ জন পাঁচ জন একত্র মিলিত হন, সেখানে ভগবানের ক্রিয়া অধিক প্রকাশ পায়, কেশবচন্দ্রের এরূপ ব্যবহারের মূলে এই ভাব নিগূঢ় ছিল।

পূর্ব্বে যে সকল বিধানপ্রবর্ত্তক আসিয়াছিলেন, তিনি আপনাকে তাঁহাদিগের অনুগত শিষ্য বলিয়া প্রকাশ করিলেন কেন? পূর্ব্বতন মহাপুরুষদিগের শিষ্য না হইলে তাঁহাদিগের তত্ত্ব সকল বুঝিতে পারা কখন সম্ভব নহে এই নিমিত্ত। সকলেই জানেন, প্রকৃতির নিকট অনুগত শিষ্য হইয়া না বসিলে কেহ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বুঝিতে পারেন না। যদি প্রকৃতিনিহিত সত্যসমুদায় জানিবার জন্য শিষ্যত্বস্বীকার প্রয়োজন, তাহা হইলে উচ্চতম অধ্যাত্মরাজ্যের ভাবনিচয়লাভের জন্য যে শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাঁহার এই ভাব যে কি প্রকার সুদৃঢ় ছিল, একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন। তিনি যখন সিমলা পর্ব্বতে নবসংহিতা লেখেন, তখন আমার নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন যে, আমি যখন সংহিতা লিখিতেছি, দেখিও যেন আমি মনু প্রভৃতি সংহিতাকারদিগের সহিত একাত্মা হইয়া সংহিতা লিখিতে পারি। এই অনুগতশিষ্যত্বনিবন্ধন তিনি যে মহাজনগণের ভিতরকার গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ হইতেন, তাহার একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। তাঁহাকে এক সময়ে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, আপনি জনক নানক চৈতন্য প্রভৃতিকে আনয়ন করিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে কেন আনয়ন করিলেন না? তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে এখনও লোকের ভাব ভাল নয়। এক্ষণে কৃষ্ণের ন্যায় মহান্ ব্যক্তিকে লোকে যথাযথ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে না। যদি তাঁহাকে এ সময়ে লোকের সম্মুখে আনয়ন করা হয়, তাহা হইলে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবে তাঁহার উদার আচরণ বিকৃত ভাবে গৃহীত হইয়া দেশ বিলাসবাসনায় ডুবিয়া

যাইবে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, লোকে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাতে কোনরূপ কলঙ্ক ছিল না, তিনি অতি পবিত্রচরিত্র ছিলেন। শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এ সমুদায় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কেশবচন্দ্রের রীতি ছিল না। উপাসনা প্রার্থনার ভিতর দিয়া মহাপুরুষ সাধু ভক্তদিগের চরিত্রের মহত্ত্ব তাঁহাতে সংক্রামিত হইত। তিনি সে সময়ে স্বহস্তে কুটীরে রন্ধন করিতেন, এবং রন্ধনকালে শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধমাত্র পাঠ করিতেন, কিন্তু দশমস্কন্ধ বা অপরাপর স্কন্ধ কখন পাঠ করেন নাই। একাদশ স্কন্ধ পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের বিষয় দৃঢ়তার সহিত নির্দ্ধারণ করা আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ভিন্ন কখন ঘটিতে পারে না। কেশবচন্দ্রের নিকট শ্রীকৃষ্ণের বিষয় শুনিবার পূর্ব্বে আমি শ্রীমদ্ভাগবত পড়িয়াছিলাম, অথচ পড়িয়াও শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধচরিত্রত্ব বুঝিতে পারি নাই। কেশবচন্দ্রের নিকট শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধচরিত্রতার কথা শুনিয়া যখন দশমস্কন্ধের রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিলাম, তখন দেখিলাম যথার্থই শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধচরিত্রতা শ্রীমদ্ভাগবত স্পষ্ট বাক্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতো বলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথা রসাশ্রয়াঃ॥"

শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের অর্থে স্পষ্টবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দোষত্ব স্বীকার করিয়াছেন, মহাত্মা চৈতন্যের অনুযায়ী শিষ্যবর্গ এ শ্লোকের অর্থ আরও বিষদভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রবিশুদ্ধিসাধকরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের কথা দূরে থাকুক, যে কোন

সাধকের ভিতর হইতে তিনি তাঁহার আভ্যন্তরিক বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ ছিলেন। শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণপরমহংসের শিষ্যেরা বলিয়া থাকেন যে পরমহংসের নিকট হইতে কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের মাতৃভাব শিক্ষা করিয়াছেন। পরমহংসের শিষ্যদিগের এই কথার মূলে সত্য আছে। পরমহংসের ভিতরের গভীর ভাব তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যখন তাঁহার নিকট যাইতেন, তাঁহার ভিতরকার যাহা কিছু সার শিষ্যভাবের প্রাবল্যবশতঃ অনায়াসে আত্মস্থ করিয়া লইতেন। তাঁহার এ ভাব আমাদিগের নাই, তাই আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকট একাকী যাইতে পারিতাম না, আমার যাইতে সাহস হইত না, পাছে আমার ন্যায় দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির মতের বিকার ঘটে। কেশবচন্দ্র লোক চিনিতেন, কি ভাবে কাহার নিকটে যাইতে হইবে জানিতেন, তাই কাহারও সংসর্গে ভয় করিতেন না, কিছু আদায় না করিয়া কাহাকেও ছাড়িয়া দিতেন না।

কেশবচন্দ্রের ঈশ্বরোপাসনার বল ছিল। তিনি এক উপাসনা-যোগে সমস্ত যোগী মহর্ষিদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন। এক উপাসনার ভিতর দিয়া তাঁহার নিকট সমুদায় তত্ত্ব আসিত। কেশবচন্দ্র কে? এ প্রশ্নের শেষ উত্তরে ইহাই বলিতেছি, তিনি আচার্য্য। তিনি ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা (prophet) নহেন, গুরু নহেন, মধ্যবর্ত্তী নহেন, অবতার নহেন—তিনি আচার্য্য। তিনি আচার্য্য, এ জন্যই ব্রহ্মমন্দিরের বেদীর আসন শূন্য রাখা হইয়াছে। এই ব্যাপারের জন্য কত বিবাদ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরো কত হইবে, কিন্তু এই বেদী চিরদিন অবতারবাদের গুরুবাদের প্রতিবাদ করিবে এবং কেশবচন্দ্রের সহিত আমাদিগের সহোপাসকত্ব প্রমাণ

করিবে। এই সহোপাসকত্ব তাঁহার স্বভাবের মূলে দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ ছিল। সন্তানকে দেখিলে মাতার স্তনে স্বতই যেমন দুগ্ধের সঞ্চার হয়, তেমনি সহোপাসক বন্ধুদিগকে দেখিলে তাঁহার ভাবের সঞ্চার হইত। হিমালয়ের নির্জ্জন স্থানে পর্য্যন্ত তিনি একাকী উপাসনায় সুখী হইতে পারিতেন না। পাঁচ সাতটি বন্ধু মিলিলে তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইত। বন্ধুবর্গকে লইয়া উপাসনা করা তিনি জীবনের কার্য্য মনে করিতেন। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, আমরা তাঁহার শরীরে স্থিতি কালে সহোপাসক ছিলাম, চির দিন সহোপাসক থাকিব।

কেশবচন্দ্র কে? এ প্রশ্নের উত্তরে অভাবপক্ষে আমরা দেখিতে পাইলাম, তিনি ঋষি মহর্ষি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষবর্গের শ্রেণীস্থ নহেন, অবতার নহেন, মধ্যবর্ত্তী নহেন, গুরু নহেন। ভাবপক্ষে দেখিতেছি, তিনি নবধর্ম্ম নবভাবের প্রবর্ত্তক, তিনি বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ, তিনি নিত্য কালের জন্য আচার্য্য। এখন বিচার করিয়া দেখা যাউক, তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি? এই সম্বন্ধ বিচার করিতে গিয়া সর্ব্বপ্রথম প্রশ্ন উপস্থিত হই-তেছে, আমরা কেশবচন্দ্রকে সহোপাসক বলিলাম, ইহাতে কি তাঁহাকে যথোপযুক্ত সম্মান করা হইল?

তিনি আপনার সম্বন্ধে আপনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, অনেকের মনে হইবে, তাহার তুলনায় আমরা যাহা বলিলাম তাহা কিছুই নহে, এবং এতদ্দ্বারা তাঁহাকে খর্ব্ব করা হইল। কেশব-চন্দ্রের এ কি অম সাহসিক কথা, "স্বর্গেতে তুমি এক জন মানুষ কল্পিত করিয়াছিলে সেই মানুষ আমি। যখন আমি হইলাম, আমার হস্ত পদ নাসিকা কর্ণ সমুদায় হইল। যখন তুমি পৃথিবীতে

আমাকে আনিলে তখন আমি ছিলাম সকল অখণ্ড।" "নব-বিধান এক জন ধরিবার পূর্ব্বে আবার অখণ্ড হইবে এই বাসনা আছে। আমি বিনয় ও অহঙ্কারের সহিত বলিতেছি আমি আসি-লাম সব লইয়া আমাকে ছাড়ুক শুকাইবে।" "এঁরাও যা আমিও তা, আমিও যা এঁরাও তা। আমি আর এঁরা একটা।" এই কথা গুলি মহর্ষি ঈশা যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে ন্যূন নহে, বরং অধিক। কেন না মহর্ষি ঈশা বলিলেন 'হে আমার শিষ্যগণ, তোমরা এবং আমি এক।' এ কথা কহিয়া তিনি অনেককে বাদ দিলেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র বলিলেন "এক ঈশ্বর উপরে, এক সন্তান নীচে...সমুদায় মনুষ্যসমাজ এক।" এই কথা কহিয়া তিনি পাপী পুণ্যাত্মা, সাধু অসাধু, ধনী নির্দ্ধন, জ্ঞানী মূর্খ সকলের সঙ্গে আপনাকে এক করিলেন। এ কি সামান্য কথা। ইহাতে কি তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদায় মহাজন হইতে আপনাকে শ্রেষ্ঠ করিলেন না? যদিও তিনি বলিলেন "তাহারা (ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ) ব্রাহ্মণ আমি আমি চামার, কিন্তু এই ব্যবসা", তথাপি লোকে এই সকল উক্তি শুনিয়া এ কথায় [illegible] করিবে কেন? তিনি আপনাকে ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা না বলুন, মধ্যবর্ত্তী না বলুন, গুরু না বলুন, এ কথা গুলি শুনিয়া লোক কি বলিবে?— "আমরা গোড়া যদি না মানি, যেখান থেকে ধর্ম্মের কথা আস্‌চে তাতে যদি বিশ্বাস না রাখি, বল দেখি, পিতা, নরকের উপযুক্ত হই কি না? বিধি নিতে যদি ত্রুটি হয়, যে প্রণালী দিয়া বিধান আস্‌ছে তাতে যদি অবিশ্বাস অভক্তি হয়, তবে ভয়ানক পাপ হইল। তোমার আদেশে আদিষ্ট হয়ে যে নববিধান প্রচার করিবে, তার আজ্ঞা সর্ব্বাগ্রে শিরোধার্য্য।" "দলপতির কথা কেহ

যদি অগ্রাহ্য করে থাকেন সেই বিধিসম্বন্ধে, তা হলে আমার একটু সন্দেহ নাই, তাদের জন্য নরক আছে। অবিশ্বাস করিলে তাঁরা নরকে যাবেন এটা নিশ্চয়। আমাকে মূর্খ জেনে, পাপী জেনেও আসল বিধির জায়গা যেখানে, নববিধানের দরজা যেখানে, সেখানে দাঁড়িয়ে যা বলি, তা এঁরা বিশ্বাস করেন কি না? আমি যদি সেখানে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিতে বলি, এঁরা প্রাণ দিতে পারেন কি না? যদি পারেন তাকে বলি বিশ্বাস।" ঈশা মুষা প্রভৃতি তাঁহাদিগের অনুযায়িবর্গকে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে এ সকল কথা কি কোন অংশে ন্যূন? "এত বড় অহঙ্কারের কথা যে, আমার কথা গ্রহণ না করিলে ভাইয়ের পরিত্রাণ হবে না? কিন্তু এরূপ অহঙ্কারের কথা সোণার অক্ষরে লেখা থাকে। এ যে পরিত্রাণ লইয়া বিষয়। এজন্য ভ্রাতৃসম্বন্ধে আমার এত ভাবনা হয়।" এ উক্তি কি অল্প সাহসিক? শুধু এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কেশবচন্দ্র ক্ষান্ত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "বিধির এই অভিপ্রায় ছিল, গুরু হউক না হউক, আচার্য্য উপদেষ্টা শ্রেষ্ঠ হউক না হউক, একজন মধ্যবিন্দুতে দশজন আকৃষ্ট, দশজন মিলিত হইবে। যেখানে দশ জন শত জন তোমাতে এক হইবে, সেখানে একটা অবলম্বন চাই। একখানি প্রতিমাতে দশখানি মূর্ত্তি যদি থাকে তাহা হইলে বিসর্জ্জনের সময় দেখিতে ভাল। গুরু বলে মধ্যবর্ত্তী বলে মানিতে হয় না, কিন্তু ভগবানের লীলা বলে অভিপ্রায় বলে এ সব মানিতে হয়।"

কেশবচন্দ্রের এ সকল কথা শুনিতে আপাত একান্ত বিরুদ্ধ। যিনি আপনাকে গুরু বলিলেন না, মধ্যবর্ত্তী করিলেন না, ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণের শ্রেণীতে আপনাকে ভুক্ত করিলেন না,

তিনিই আবার আর এক দিক দিয়া যে সকল দাবী দাওয়া উপস্থিত করিলেন, তাহাতে সর্ব্বোপরি আপনার আসন তিনি স্থাপ করিলেন, ইহাই কি আসিতেছে না ? তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা সম্বন্ধ রক্ষা করিতে যাইবেন, স্বাধীনতার বিসর্জ্জন দিয়া অনুগত শিষ্য হইয়া কেশবচন্দ্র যাহা বলিবেন তাহাই তাঁহাদিগকে করিতে হইবে, ইহাই কি সিদ্ধান্ত হইতেছে না ? এরূপ আনুগত্য স্বীকার না করিলে তাঁহাদিগের পরিত্রাণ অবরুদ্ধ হইবে, এই ভয়ানক মত কি ইহাতে প্রচারিত হইতেছে না ? "গুরুর কাছে পড়ে থাকা, গুরুর সঙ্গে ঘুরে বেড়ান, কাণার মত গুরুর পথ ধরা, সে ঢের পৃথিবী দেখেছে ;" এ কথা যিনি বলিলেন, তাঁহার আবার তদ্বিপরীত কথা বলা কি সাজে ? এরূপ বিরুদ্ধভাষণ কেন ? এ সকল বিরুদ্ধভাষণ নহে, ইহার আগা গোড়া মিল আছে। এই মিল দেখিতে পাইলেই তাঁহার সঙ্গে আমাদিগের কি সম্বন্ধ স্পষ্ট প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

প্রথমতঃ তিনি আপনাকে এক অখণ্ড মানুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। স্বর্গে ও পৃথিবীতে তিনি এক জন, দুই জন নহেন, ইহা কেবল তাঁহার মত নহে, ইহাই তাঁহার জীবনসিদ্ধ সত্য। একাত্মতাসাধন তাঁহার জীবনের ব্রত। তাঁহার এই সকল কথার মধ্যে বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নাই, সর্ব্বথা আত্মবিনাশ বিদ্যমান। সকলের এ কথা জানা উচিত, তিনি ঈশ্বরসম্বন্ধে অদ্বৈতবাদী ছিলেন না, মানুষের সম্বন্ধে পূর্ণ অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তাঁহার মতে উপরে যেমন "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" তেমনি নিম্নে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" মনুষ্য। স্বর্গের নিয়োগে এই অদ্বিতীয় মনুষ্যত্ব আপনাতে সিদ্ধ দেখিয়া বলিয়াছেন, আমি সেই অখণ্ড মানুষ।

তিনি এইরূপ একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি। তিনি সমুদায় ঋষি-মহর্ষি মহাজন—সমুদায় মানবমণ্ডলীর সহিত একাত্মতা লাভ করিয়া সকল ব্যক্তিতে সেই একাত্মতা প্রস্ফুটিত করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই জন্য তিনি স্বীয় পরম প্রভুর নিকটে অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন, "এক শরীর এক আত্মা হয়ে তোমার ভিতরে মিশিতে চাই। ভিন্নতা, স্বাধীনতা স্বতন্ত্রতা 'আমি আমি' যেখানে, সেখানে আমার বাপ নাই, আমি সে 'আমি ভূতের' রাজ্যে থাকিতে চাহি না।" বর্ত্তমান কালের দর্শন ও বিজ্ঞানে যাহাকে Organic Unity (একাত্মতা) বলে, উহা তিনি আত্মজীবনে সিদ্ধ করিয়া সকলকে দেখাইয়াছেন। মানুষ মানুষনিরপেক্ষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে না, অতি সামান্য কার্য্যও একাকী নিষ্পন্ন করিতে পারে না। আমার এই গাত্রের বস্ত্র, আমার এই দেহের শোণিত কোথা হইতে আসিয়াছে? সহস্র সহস্র ব্যক্তির চেষ্টায় এই বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, সহস্র সহস্র ব্যক্তির শোণিত এই দেহের শোণিতের সঙ্গে মিশিয়া আছে। সুতরাং সমুদায় মানুষের একত্ব এ কালে কখন অস্বীকৃত হইতে পারে না। এই একাত্মতা সাধক কি প্রকারে সাধন করিবেন? এই সাধনের উপায় কেশবচন্দ্র কি নির্দ্দেশ করিয়াছেন? "তুমি বাঁশী বাজাও, আর আনন্দে সেই বাঁশীর রবে সকলে নৃত্য করুক," ইহাই এই একাত্মতা সাধনের উপায়। এক সময়ে ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করিয়া না চলিলে 'এক রুচি' 'এক ইচ্ছা' 'এক প্রাণ' কখন কেহ হইতে পারে না। বাহিরে মতাদির মিলে কোন কালে একাত্মতা হয় না, অন্তরে পবিত্রাত্মার যোগে এই মিলন

সম্পাদিত হয়। এই উদ্দেশেই তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন, "পবিত্রাত্মা কপোত আসুন, শরীর ধর, ধূ ধূ করে পুড়ুক। নূতন অগ্নি, অগ্নি যিনি তিনিই জল হয়ে ভক্তদের বাঁচান। তাঁর ভিতর ভগবান্ ও তাঁর সন্তানেরা সকলেই এয়েচেন—একে তিন তিনে এক।"

কেশবচন্দ্রের একাত্মতা, এবং অপরকেও একাত্মা করিবার জন্য একত্র উপাসনাসাধনপ্রতিষ্ঠা, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ তিষ্ঠিতে পারে না; কিন্তু তিনি যে এই একাত্মতাসাধনবিষয়ে আপনাকে মধ্যবিন্দু করিয়াছেন, তাহাতে কি তাঁহার আত্মপ্রাধান্য রক্ষা করিবার যত্ন প্রকাশ পাইতেছে না? এ মধ্যবিন্দুত্বের অভিপ্রায় কি? "যেখানে দশ জন শত জন তোমাতে এক হইবে, সেখানে একটা অবলম্বন চাই। একখানি প্রতিমাতে দশ খানি মূর্ত্তি যদি থাকে তাহা হলে বিসর্জ্জনের সময় দেখিতে ভাল।" দশ জনকে এক জন হইতে গেলে একের সঙ্গে দশ জনের ভাবে ভাবে মিলন চাই। সে এক জন সেই ব্যক্তি, যাহাতে বিবিধ ভাব আসিয়া মিলিত হইয়াছে। শাক্য ঈশা চৈতন্য প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি প্রেরিতবর্গকে বলিয়াছেন, "তাঁহাদিগের ভাবে আমরা দ্বিজাত্মা"। কেশবচন্দ্রে সকল ভাব সম্মিলিত হইয়াছিল। যাঁহারা এক এক ভাবের প্রতিনিধি, তাঁহারা সকল ভাবের প্রতিনিধিতে মিলিত হইলে সহজে এক অখণ্ড মানুষ হন। এক এক জন প্রেরিত যে এক এক ভাবের প্রতিনিধি, তৎসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "এক এক ভিন্ন ভাবের প্রতিনিধি এক এক জন বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হউন। এক এক জন এক এক ধর্ম্মের সমস্ত ভাব গ্রহণ ও বিতরণের ভারপ্রাপ্ত হউন।

দেখাইতে হইবে আমাদের বাড়ীতে সমস্ত দেব দেবীরই আদর, সমস্ত মিলিয়া একটি দেহ। এক এক প্রেরিত দ্বারা একটি একটি অঙ্গের পূর্ণতা হইল, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মিলনে নববিধানে পূর্ণ ধর্ম্ম প্রকাশিত।" এই অঙ্গ গুলি যে অবয়বে মিলিত হইয়া একটি দেহ হইল, উহা কেশবচন্দ্র। কেশবচন্দ্র যে একাত্মতার ভাব আপনাতে প্রদর্শন করিলেন, সেই একাত্মতার ভাবে যাঁহারা দ্বিজত্ব লাভ করিবেন, তাঁহারাই সকলে একাত্মা হইবেন। যখন ভগবানের এবার এই বিশেষ লীলা, তখন এরূপ কথা কেশবচন্দ্র অকুতোভয়ে ব্যক্ত করিয়া বলিবেন তাহাতে আর শঙ্কার বিষয় কি?

কেশবচন্দ্র বিধানসম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করিলে নরক নিশ্চয়, ইহা বলিয়া তিনি কি অভ্রান্ত গুরুপদে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই? 'গুরুর কাছে পড়ে থাকা, গুরুর সঙ্গে ঘুরে বেড়ান, কাণার মত গুরুর পথ ধরা' এ সকলের প্রতিবাদ করিয়া আবার সেই দোষে লোকে দোষী হইবে, তাহার পথ কি তিনি স্বয়ংই উন্মুক্ত করেন নাই? যে ব্যক্তি ঠিক তাঁহার অনুসরণ করিবে তাহার সম্বন্ধে এরূপ দোষ ঘটিবার কোন কালে সম্ভাবনা নাই, কেন না সে ব্যক্তি কেশবচন্দ্রের এই কথা দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছে, "এবারকার গুরু সে, যে বলে আমার কথা কিছু শুনিও না, আমার শিক্ষা মানিও না, যদি না পবিত্রাত্মার সহিত মিলে বুঝিতে পার।" তিনি কি একথা বলেন নাই, "একমত হইলে বা এক পাড়ায় দশ বিশ বছর আছি বলিয়া, একত্র খাই এক বাড়ীতে থাকি বলিয়া, বা খুব দোসামোদ করে, গুরু বলে, ইঁহাদিগকেও প্রেরি

পরীবার বলিয়া মানি না।" তিনি তাঁহাদিগকে আপনার বলে তাঁহারা 'হরিতে অভিন্নহৃদয়' হইয়াছেন 'আপনার' হইয়াছেন 'একপ্রাণ' হইয়াছেন। তিনি প্রার্থনায় স্পষ্ট বলিয়াছেন, "তোমা হইলেই আমার, আমার হইলেই তোমার, আর আমাদের সকলের। ঠাকুর, কেহ আপনার নয়, তুমি যাদের এক কর তারাই আপনার। সব মুখ একমুখ হবে। যেখানে থাকুক সকলে নাড়ী এক নাড়ী হবে, সকলের প্রাণ এক হবে।" কেশবচন্দ্র বিধানসম্বন্ধে যাহা বলিতেন, তাহা কখন আপনার কথা মনে করিতেন না, "আমি যাহা বলি সমুদায় তোমার কথা। এ জিহ্বা মিথ্যা বলে না।" কেশবচন্দ্রের সহিত একাত্মা হইয়া এক সময়ে এক কথা ভগবানের নিকট হইতে শুনিয়া তদনুসরণ করা যাঁহাদের নিয়তি, অবৈরাগ্য, সংসারাসক্তি বা গূঢ় পাপের জন্য সে নিয়তি হইতে যদি তাঁহারা স্খলিত হন তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে নরক নিশ্চয়, এ কথা বলিতে কেশবচন্দ্র কেন কুণ্ঠিত হইবেন? আমি এ কথা প্রকাশ্যে সকলের সমক্ষে বলিতেছি, কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইয়া যে বিধি আনয়ন করিয়াছেন, এবং যে বিধির সঙ্গে আমি নিত্য কালের জন্য গ্রথিত হইয়া রহিয়াছি, তাহার একটি বিধিকে যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক খণ্ডন করি, তাহা হইলে আমার পক্ষে নরক। আমরা যখন আদেশবাদী, তখন অবতীর্ণ আদেশনিচয়কে উপেক্ষা করিয়া নরকস্থ হইব না, ইহা কখন বিশ্বাস করি না। কেহ যদি কেশবচন্দ্রের বিধানসম্বন্ধে দৃঢ় কথা শ্রবণ করিয়া মনে করেন যে, তিনি অপরের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছেন, অপরের আদেশশ্রবণের পথ অবরুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। যিনি

তাঁহার মত প্রত্যেক বিষয়ে ঈশ্বরের আদেশ গ্রহণ করিয়া চলেন, তিনি তাঁহাকে আপনার বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, আপনার দলস্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কেশবচন্দ্র নিজে স্বাধীন পুরুষ ছিলেন, যাঁহারা সর্ব্বপ্রকারবন্ধনবিমুক্ত হইয়া স্বাধীন ভাবে ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে আপনার লোক বলিতেন। সকলে এক বার জীবনবেদ পাঠ করিয়া দেখুন, তিনি কি এ কথা বলেন নাই, "অধীনতা প্রিয় কেহ যদি ঠক্ হইয়া এখানে ঢুকিয়া থাকে, সে ঠক্‌কে বাহির করিয়া দিব; দিবই দিব। অধীনের দল এখানে নয়। যার উপরে দলের ভার আছে সে নিজেই যখন অধীন নয়, সে নিজেই যখন অধীনতাকে ঘৃণা করে, তখন এ দলের কেহই অধীন হইবে না।" কেহ ঈশ্বরের সঙ্গে একতা লাভ না করিলে, কেশবচন্দ্র বা তাঁহার প্রচারিত বিধিনিচয় আয়ত্ত হইয়া সহজে অনুসর্ত্তব্য বিষয় হইবে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। কেশবচন্দ্রের ভিতর দিয়া যে বিধান অবতরণ করিয়াছে, তাহাকে কেহ কৈশব বিধান বলিবে, এ পন্থা তিনি চির দিনের নিমিত্ত অবরুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। "এবার ব্রহ্ম ব্রহ্ম হাজার বার বলিলেও কিছু হবে না, আর সাধুদের জুতো নিয়ে টানাটানি কল্লেও কিছু হবে না" এবার পবিত্রাত্মার রাজ্য।

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে আমাদিগের সহোপাসকত্বসম্বন্ধ আচার্য্য-সম্বন্ধ আমরা প্রধানরূপে গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহার সহিত আরও বিবিধ সম্বন্ধ এই দুই সম্বন্ধমূলক। তিনি অন্তিমে হিমালয়ের প্রার্থনায় বলিয়াছিলেন, "আমাকে যে বলে এ নূতন নূতন সমাচার স্বর্গ হইতে আনে, সেই সত্য বলে। আর যারা

বলে এ দলপতি বড় লোক, এ কথা আমি শুনিতে চাই না
ভগবান্, তুমি আমাকে যে পদ দিয়াছ আমি তাই চাই। আ
কি দশটা জায়গায় গিয়ে প্রচার করিতে হয় কি করে, তা
শেখাতে এসেছি? আমি কি ধূর্ত্ত? দয়াল প্রভু, আ
তোমার পায়ের রেণু, যাহাতে সকলে মজার মজার খবর পা
সেই সকল আমার কাছে। আমাদের দেশের খবর এ
শুনতে চায় না। এরা যা নিয়েছে তাহাতে সুখী হও
যায় না। যার কাছে যে মজার কথা [illegible]খিয়াছি তা নি
চায় না। এই হতেই তো দুঃখ। [illegible]র বুকের ভিত
আসুক মজার মজার অরগ্যান সে[illegible] পাইয়াছি শোনাই
তিনি কোন্ পদ আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন? আচা
বা সেবক। সে পদের কার্য্য কি? ঈশ্বরের সহিত এ
হইয়া স্বর্গের নূতন নূতন সংবাদ আনয়ন করা। এ নূতন সংবা
দের গ্রহীতা কাহারা? যাঁহারা আচার্য্য সহ একহৃদয়; তাঁহা
হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট। "আমার বুকের ভিতর আসুক মজা
মজার অরগ্যান সেতার পাইয়াছি শোনাই" এই তাঁহার বিশে
কার্য্য। যাঁহারা তাঁহার সহিত সহোপাসক না হন, ঈশ্বরে
একহৃদয় একপ্রাণ না হন, তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার আচার্য
সম্বন্ধ চিরদিনের জন্য অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। যাঁহা
এরূপে তাঁহার সহিত সংযুক্ত নহেন, তাঁহারা অবতীর্ণ বি
বিধান রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবেন তাহারও কোন সম্ভাব
নাই।

কেশবচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছেন, "ধন্য সে যে বলিতে পা
আমার প্রাণ পেয়েছি যাঁ হতে, তাঁকে প্রাণের রক্তের চেয়ে

ভাল বাসি। প্রাণনাথ, যাঁর কাছে তোমাকে ডাকিতে শিখেছি যাঁর দ্বারা তোমাকে চিনেছি, তাঁকে চিনুক বন্ধুগণ। সে যে হউক না কেন, সে যে অমৃত খাইয়েছে, সে যে সোণার রাজ্য চিনিয়েছে তাকে চিনিতে পারে যেন ভক্তেরা এই ভিক্ষা টুকু বৃদ্ধবয়সে চাই। উপদেষ্টা বলিবার প্রয়োজন নাই, সেবা দরকার নাই, কেবল এই কথাটী যেন বন্ধুদের মনে থাকে, একটা আসল কথা এক জনের কাছে শিখেছি, যাহা মান সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠা ধর্ম্ম শান্তি সংসারে সব সুখের মূল। সে আমাদের প্রিয়। এ সকলের মূলে এক জনের ইসারা। যার হাসির রহস্য এক জনের কাছে আগে আমদানী হয়েছিল, এখন সব জায়গায় আমদানি হয়েছে।" এ সকল কথায় তাঁহার সহিত কোন্ সম্বন্ধ দেখাইয়া দেয়? আচার্য্যসম্বন্ধ। "সে এক সময় ছেলে হয়ে কাছে এয়েছে, মা হয়ে কাছে এয়েছে, বিপদের সময় বন্ধু হয়ে এয়েছে। সে বিশ্বাসঘাতক নয়;" আচার্য্যসম্বন্ধমধ্যে বিবিধ সম্বন্ধ আছে, এ সকল কথা তাহারই দ্যোতক। যিনি সহোপাসক নহেন, তিনি কি প্রকারে আচার্য্য হইবেন? আচার্য্য এবং উপদেষ্টা এ দুইয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য। এক জন উপদেশ দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু যাঁহাদিগকে উপদেশ দিলেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে তাঁহাকে এক হইতে হইবে, সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। নববিধানের নব আচার্য্য, প্রাচীন বিধানের আচার্য্য নহেন। তিনি যাঁহাদিগের আচার্য্য, তাঁহাদিগের সঙ্গে এক অভিন্নহৃদয় হইয়া ঈশ্বরের নিকটস্থ হইলে তবে স্বর্গ হইতে নূতন নূতন সামগ্রী আসিয়া উপস্থিত হয়। আচার্য্য যাঁহাদিগের সহিত উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের

অযোগ্যতা থাকিল, তাহাতে কি আসে যায়। তিনি যদি ঈশ্বরেতে এক প্রাণ হইয়া তাঁহাদিগকে আপনার ভিতরে টানিয়া লইতে পারেন, স্বর্গের সামগ্রী অবতরণ করিবেই করিবে। এ কথা আমাদের মনে রাখা উচিত, আমরা যখন বেদীতে বসিয়া কার্য্য করি, তখন যদি আমরা মনে করি আমরা উপদেষ্টা, তাহা হইলে আমরা নরকের পথ পরিষ্কার করিলাম। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে এক হইয়া যাঁহারা আচার্য্যের কার্য্য করিবেন, তাঁহারা সকলের সঙ্গে একীভূত হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন এবং সকলের সহিত একপ্রাণ হইয়া তাঁহার কৃপার ভিখারী হইবেন, তাহা হইলে ঈশ্বরের আলোক ও কৃপা লাভ করিয়া তাঁহারা কৃতার্থ হইবেন।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে একাত্মতাসাধন পবিত্রাত্মার যোগে নিষ্পন্ন হয়, অন্য কোন উপায়ে নহে। মানবীয় দিকে কেশবচন্দ্রকে মধ্যবিন্দু করিয়া সকলের তাঁহার সঙ্গে একাত্মতাসাধন, ইহাতে এক পবিত্রাত্মার অন্তঃপ্রবেশ ভিন্ন কিছুই সিদ্ধ হইবার নহে। সম্মুখে কেশবচন্দ্রকে রাখিয়া সহস্র বার ভক্তি শ্রদ্ধা কর, ইহাতে কোন ফলোদয় হইবার নহে। যাঁহার সহিত একাত্মা হইতে হইবে তাঁহাকে সম্মুখে রাখিলে চলে না, কেন না দুই পদার্থ মিশিয়া গিয়া এস্থলে এক পদার্থ হইবে। এই জন্য কেশবচন্দ্র নববিধানজননীর সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধের ব্যবধায়ক নহেন। কেশবচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা এই, যেখানে যতটি আত্মা ঈশ্বরেতে এক হইয়াছে, সেখানে তিনি তাহাদিগের সহিত অভিন্ন ভাবে অবস্থিত। সুতরাং তাঁহার সহিত যাঁহারা একাত্মা হইতে চান, তাঁহাদিগের সহোপাসকত্ব সহসাধকত্ব সম্বন্ধ

না আর কোন গত্যন্তর নাই। কেশবচন্দ্র আর কোন সম্প্রদায়ের ধারী নহেন, তিনি উপাসনায় সকলের সঙ্গে এক হইতে চান। শবচন্দ্রের উপাসনা অন্নপান ছিল, উপাসনা সর্ব্বস্ব ছিল। ব্রজীবনব্যাপী উপাসনা তাঁহার মহাযোগ ছিল। এই উপাসনা তিনি বন্ধুগণের মধ্যে এরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন , তিনি চির দিন তাঁহাদিগের সঙ্গে ঈশ্বরেতে এক অভিন্ন ইয়া স্থিতি করিতে পারিবেন। সহোপাসক, সহ সাধক, আচার্য্য, সম্বন্ধ তাঁহার নিকটেও মধুর, আমাদিগের নিকটেও মধুর।

কেশবচন্দ্র শেষ পর্য্যন্ত একটি অন্তর্ব্যবস্থান বিষয়ে অত্যন্ত বহিত ছিলেন, সেটি শ্রীদরবার। যতই তাঁহার স্বর্গারোহণের ন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই শ্রীদরবারের প্রতি বিশেষ রূপাত প্রদর্শন করিতে তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। দূরতর হিমালয়ে বস্থান করিয়াও কোন একটি মণ্ডলীঘটিত কার্য্য করিতে হইলে সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ করিবার জন্য শ্রীদরবারকে তিনি অনুরোধ রিয়া পাঠাইতেন। শেষ সময় পর্য্যন্ত তিনি এ ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীদরবারের প্রতি তাঁহার ঈদৃশ আদর কেন? কায়ত্ত সাধনের নিমিত্ত ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট অন্তর্ব্যবস্থান, এই য। এখানে ঐকমত্য বিনা কোন কার্য্য হইতে পারে না। আপন আপন রুচি মত সংস্কার পবিত্রাত্মার নিঃশ্বাসবায়ুতে উড়িয়া গিয়া এখানে বিরুদ্ধ ভাবাপন্নগণও এক ভাবাপন্ন হইয়া ঐকমত্যে উপস্থিত হন, এজন্য নববিধানে ইহার এত সমাদর। আমাদের পাপ অপরাধের জন্য দুএক দিন কার্য্য বিশৃঙ্খল হইতে পারে; কিন্তু ইহার বলের নিকটে কাহারও বৈমত্য দীর্ঘকাল থাকিতে পারে না। পবিত্রাত্মার প্রভাবে ব্যাভ্রও অল্পকালের

তাহা যেন মধুর হইয়া যায়। তিনি যে বলিয়াছেন, "প্রত্যেক এক জন মানুষ মরিবার পূর্ব্বে আবার অখণ্ড হইবে," তাহা এই অমর জীবনে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

সম্পূর্ণ।

কেশবচন্দ্রের উপাস্য *।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে মাতা তাহার মুখ দর্শন করিয়া অপার আনন্দ লাভ করেন। সন্তান দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, আর তাহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাতার আনন্দের সীমা থাকে না। শিশু যখন রোদন করে, তখন মাতা ব্যস্তে ব্যস্তে যাইয়া তাহার সেবায় ব্যাপৃত হন। সন্তানের সেবা ব্যতীত জননীর ভোজনে সুখ নাই, শয়নে সুখ নাই। পূর্ব্বে যে জননী একান্ত ভোগবিলাসপরায়ণা ছিলেন, সর্ব্বদা নিদ্রা আলস্যে দিনাতিপাত করিতেন, দেখা যায়, সন্তান জন্মিবার পর তিনি সমুদায় ভোগ-বিলাসে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে মার আনন্দ, তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে আরও তাঁহার কত আনন্দ। মার কথা দূরে, যদি আমরা শিশুজীবনের সমুদায় বৃত্তান্ত অধ্যয়ন, ও লিপিবদ্ধ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকে না। পৃথিবীর কল্যাণের জন্য অনেক মহাত্মা আগমন করিয়া পৃথিবীকে কৃতার্থ করিয়াছেন। তাঁহাদের বাল্যজীবনের বিবরণ এরূপ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন যে তাহা আমাদের নিকট অজ্ঞাত। এই সকল মহাত্মা যখন জন্মিয়াছিলেন, যখন নবজাত শিশু ছিলেন, সেই হইতে যদি তাঁহাদের সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণিত থাকিত, তাহা হইলে আমরা উহা পাঠ করিয়া ধন্য হইতাম, কত সুখী হইতাম; কিন্তু আমাদের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। মহাত্মা-

---

* পঞ্চবিংশতিতম মাঘোৎসবোপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা।

দিগের বাল্যজীবন ঘোর অন্ধকারের ভিতর প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, ধর্ম্মের ইতিহাস এই জন্য অসম্পূর্ণ।

মহর্ষি ঈশা যখন লোকসমাজে আগমন করিলেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর। তিনি লোকসমাজে সমাগত হইয়া যখন হইতে প্রকাশ্যে কার্য্য আরম্ভ করিলেন, তখন হইতেই তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ তাঁহার জীবন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বাল্যজীবনের বিষয় তাঁহার শিষ্যবর্গ কিছু বর্ণন করেন নাই, সুতরাং উহা লোকসমাজে অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। মহর্ষি ঈশা পুণ্যের অবতার ছিলেন। তিনি যখন জনের নিকট জলাভিষিক্ত হইতে আসেন, তখন মহাত্মা জন বলিয়াছিলেন, তোমরা ঐ পুণ্যের অবতার মেষশিশুকে অবলোকন কর। কিন্তু তাঁহার চিরশত্রু য়িহুদিগণ—যে বাল্যজীবন, যে যৌবনের প্রথমোদ্যম অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল—সেই সময় অবলম্বন করিয়া যাহা বর্ণনা করিয়াছে, তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। উহা এমনি ভাবে বর্ণিত, যেন কোন কালে মহর্ষি ঈশার চরিত্র বিশুদ্ধ ছিল না। য়িহুদিদিগের সে গ্রন্থ যদিও আমি নিজে পাঠ করি নাই এবং সেরূপ গ্রন্থ পাঠ করিবার প্রবৃত্তিই বা কেন হইবে? কিন্তু আমাদের একজন বন্ধু—যিনি কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, তিনি একজন খ্রীষ্টবিরোধী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া উহার কিয়দংশ পাঠ করিয়াই ঘৃণার সহিত দূরে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। মহর্ষি ঈশাকে অপদস্থ করিবার জন্য তাঁহার শত্রুগণ কত যত্নই না করিয়াছে। ভগবান্ যাঁহাকে গৌরবান্বিত করিবেন, মনুষ্যের শত চেষ্টাতেও তাহার কিছুই অনিষ্ট সাধিত হয় না। মহর্ষি ঈশা স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ চরিত্র, কখনও তাঁহার হৃদয়ে পাপ অনুভূত

না হওয়া সম্ভব। লোকে তাঁহার চরিত্রের যে দিক্ দেখুক না কেন, সেই দিকেই পবিত্রতা। স্বর্গের দেব শিশুগণের মধ্যে তাঁহার নাম লিখিত। তাঁহার জীবনবৃত্তে তাঁহার জন্মসম্বন্ধে অলৌকিক বৃত্তান্ত লিখিত আছে। উহার অলৌকিকাংশের সার কথা এই—তিনি পবিত্রাত্মজাত, জননীগর্ভে ভগবান্ তাঁহাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তিনি জন্ম হইতে ভগবদ্‌গুণসম্পন্ন। আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকে তাঁহার চরিত্র ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না। তাঁহার জীবনবৃত্তে লিখিত আছে, জলাভিষেকের পর কপোতের আকার ধারণ করিয়া পবিত্রাত্মা তাঁহার মস্তকোপরি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং সেই পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া তিনি ঘোর অরণ্যের দিকে ছুটিয়া গেলেন। ঈশা ঘোর অরণ্যানীতে প্রবেশ করিয়া তথায় ৪০ দিন পর্য্যন্ত অনাহারে বাস করিয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বরেতে মগ্নচিত্ত হইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের নিকট ইহা অসম্ভব; কেন না আমরা এমনই শরীরের অধীন যে, একটি দিনও ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া ভগবানেতে নিবিষ্টচিত্ত হইতে পারি না। বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহারা চেষ্টাশীল নহে, জড়ভাবাপন্ন তাহারা অধিক দিন অনাহারে জীবনধারণ করিতে পারে। কচ্ছপ কুম্ভীর, ভেক প্রভৃতি দীর্ঘকাল নিদ্রায় অতিবাহিত করে, সেই দীর্ঘকালের মধ্যে এক বারও আহার অন্বেষণ করে না, উহার কারণ এই জড়ভাবাপন্নতা। যোগশাস্ত্রে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে, কচ্ছপাদির অবস্থা দর্শন করিয়া সমাধিতে অনাহারে অবস্থিতির উপায় এ দেশে উদ্ভাবিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে যোগিগণ এই উপায়ে অনাহারে নিশ্চেষ্টভাবে স্থিতি করিতেন। এক্ষণে

কেন থাকিতে পারা যায়, যোগবাশিষ্ঠ তাহার এই কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সমাধির অবস্থায় সমুদায় ধাতু সাম্যাবস্থা লাভ করে, উহার ক্রিয়া অবরুদ্ধ অবস্থায় স্থিতি করে, সুতরাং ধাতুসকল ক্ষয় না পাইয়া একই অবস্থায় থাকে। নিশ্চেষ্ট ও সচেষ্ট স্বভাবাপন্ন উভয়বিধ জীবকে অনাহারে রাখিয়া বিজ্ঞান পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, নিশ্চেষ্ট জীব দীর্ঘকাল অনাহারে জীবনধারণ করে, সচেষ্ট জীব অল্পকাল অনাহারে বাঁচিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা এই প্রমাণ হয়—নিশ্চেষ্টতা ক্ষয়ের অবরোধক, সচেষ্টতায় ক্ষয় উপস্থিত হয়। পুরাণে বর্ণিত আছে, রাজা পরিক্ষিৎ সপ্তাহকাল ভগবানের গুণকীর্ত্তন শ্রবণে এমনই নিমগ্নচিত্ত ছিলেন যে, কুশাগ্রে বিন্দুমাত্র জল গ্রহণ করিয়াও ক্ষুধা তৃষ্ণায় অণুমাত্র নিপীড়িত হন নাই। আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক, এ সকল দৃষ্টান্ত আমাদের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। আমরা শরীর লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত। মহাত্মা শাক্যসিংহ ৬ ছয় মাস কাল অনাহারে থাকিয়া তীব্র তপশ্চরণ করিয়াছিলেন।* তিনি বলিয়াছিলেন,

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ং প্রযাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্ল্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতি॥

"এই আসনে আমার শরীর শুকাইয়া যাউক, ত্বক্, অস্থি, মাংস বিনষ্ট হউক, বহু জন্মে অপ্রাপ্য যে বোধি তাহা প্রাপ্ত না হইয়া এই আসন হইতে আমার দেহ বিচলিত হইবে না।" তাঁহার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিল, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া রাখাল বালকেরা পিশাচ বলিয়া তাঁহার গাত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিত। তিনি এরূপ কঠোরধ্যানে মগ্ন হইয়াছিলেন, আপনার শরীর নির্জ্জিত করিয়াছিলেন যে, শত শত দণ্ডদ্বারা আঘাত করিলে

যেরূপ যন্ত্রণা হয় সেইরূপ যন্ত্রণা তাঁহার মস্তিষ্কের ভিতরে উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং এ দৃষ্টান্ত বা ঈদৃশ জীবন আমরা অনুসরণ করিতে পারি না। চৈতন্যের প্রথম জীবনকাহিনী এই দেখাইয়া দেয় যে, লোকের উপরে বিবিধ প্রকারে তিনি উৎপাত করিতেন, বিদ্যাভিমানে স্ফীত ছিলেন, সুতরাং এ জীবনও আমাদের সমগ্র জীবনসাধনের পক্ষে উপযোগী নহে। পূর্ব্বতন কালের জীবন-গুলি অসমগ্রভাবে বর্ণিত বলিয়া দৃষ্টান্তস্থলে আনয়ন করিতে না পারিলেও এক জনের জীবন আমাদের নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে, নাট্যশালার অভিনেতার ন্যায় যাঁহার জীবন আমাদের সকলের নয়নগোচরে অভিনীত হইয়াছে। সুতরাং এই ব্যক্তির জীবন আমরা গ্রহণ করিতে পারি। এক্ষণে এই ব্যক্তির জীবনের প্রধান বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

কেশবচন্দ্রের উপাস্যবিষয়ে বলিবার জন্য আমি উপস্থিত। কেশব-চন্দ্রের জীবন লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগে কোন প্রকার অলৌকিক ব্যাপার লিখিত হয় নাই। সত্য বটে, শৈশবকাল হইতে তাঁহাতে বিশেষ ভাব লক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু উহা স্বভাবের অতীত নহে। তাঁহার জীবন ধর্ম্মজীবন। আমরা এই দেখিতে চাই, কি লইয়া কেশবচন্দ্র ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস, বৈরাগ্য এবং বিবেক লইয়া তাঁহার জীবন আরম্ভ করেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, বিশ্বাস ঈশ্বরের কোন্ স্বরূপ সাধকের নিকট উপস্থিত করে? প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলিতে হয়, বিশ্বাসের নিকটে সকল স্বরূপই প্রকাশিত হয়। তবে বিবেক যখন জীবনের মূলে রহিয়াছেন, তখন কেশবচন্দ্রের নিকট তাঁহার সেই স্বরূপ প্রতিভাত হইল, যে স্বরূপের জন্য ঈশ

রাজা, উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহাভয়ানক। ঈশ্বরের এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি ভীত হইলেন, কম্পিত হইলেন। এই রাজাধিরাজ যখন শাস্তা, নেতা, গুরু ও পরিত্রাতা হইয়া একটু কোমল ভাব ধারণ করেন, তখনই তিনি পিতা হন। যিনি পাপ দেখাইয়া দেন তিনি উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভীষণ, তিনি রাজা ও বিধাতা। রাজাধিরাজ বিচারপতি হইয়া ঈশ্বর যাঁহার নিকটে প্রকাশিত হন, তাঁহার নিকটে জীবনের সমুদায় পাপ প্রতিভাত হয়। আমরা জানি না কেশবচন্দ্রের জীবনে এমন কি পাপ ঘটিয়াছিল যে, তাঁহার এত অনুতাপের প্রয়োজন হইয়াছিল। বিবেকের ঈশ্বর কেশবচন্দ্রের নিকট সর্ব্বদা জাগ্রৎ ভাবে প্রকাশিত থাকিতেন, তাই পাপ স্মরণ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা অস্থির থাকিতে হইত। আমরা আজ ৩০ বৎসর ঈশ্বরের রাজ্যে আসিয়াছি, অথচ আমাদিগের নিকট তিনি কখন তাদৃশ ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন বলিতে পারি না। এই জন্য আমাদিগের বিবেক সহ সম্বন্ধ স্বাভাবিক কি না তৎপক্ষে সন্দেহ আছে। আমরা আজও বলিতে পারি না, আমাদের ঈশ্বর আমাদিগের নিকট উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রকাশিত হন। ঈশা প্রভৃতির জীবন যেমন আমাদের জীবনের পক্ষে কার্য্যকর নয়, তেমনি কেশবচন্দ্রের জীবনও, মনে হয়, এই জন্য আমাদের কোন কার্য্যে আসে না। আমাদের চিত্ত অসাড়, তাই বিবেকের বাণী আমরা শুনিতে পাই না। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, পাপীর নিকটে ঈশ্বর নিয়ত উদ্যতবজ্র, অন্য কোন ভাবে তিনি প্রকাশিত হন না, এ কথা যদি সত্য হয় তবে ঈশ্বর পাপীকে ক্ষমা করেন, ইহার অর্থ কি?

ঈশ্বরের ক্ষমার অর্থ পাপ পোষণ করিতে উৎসাহ দান নহে,পাপকে দগ্ধ করা বিনষ্ট করা ক্ষমার প্রকৃত অর্থ জানিতে হইবে। সুতরাং কেশবচন্দ্রের জীবন আমাদের পক্ষে ব্যর্থ নহে।

আমাদিগের প্রত্যেককে কেশবচন্দ্রের ন্যায় প্রথমে বিবেকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। মহাত্মা থিয়োডোর পার্কারের জীবনের সহিত এ জীবনের স্পষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার লিখিত গ্রন্থে ও প্রার্থনাদিতে পাপের উল্লেখ অতি বিরল। তাঁহার জীবনে পাপবোধের অভাব কেন হইল তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে; তিনি সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে এক দিন তাঁহার পিতার ক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। আমেরিকার সরোবরে অতি বৃহৎ পদ্ম উৎপন্ন হয়। তিনি পথিস্থিত একটি সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্ম তুলিবার জন্য যাইয়া দেখেন, তদুপরি একটি কচ্ছপশাবক বসিয়া রহিয়াছে। তিনি তাহাকে প্রহার করিবার জন্য যাই তাঁহার হস্তস্থিত লগুড় উত্তোলন করিলেন, অমনি শুনিতে পাইলেন, কে যেন তাঁহাকে বলিল, "পার্কার পার্কার ঈদৃশ দুষ্কর্ম্ম করিও না।" এই নিষেধ বাণী শুনিয়া পার্কার প্রহার হইতে বিরত হইয়া তাঁহার জননীর নিকট যাইয়া সমস্ত কথা তাঁহাকে নিবেদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মা কে আমাকে নিষেধ করিলেন? তাঁহার জননী ঈশ্বর পরায়ণা সাধ্বী রমণী ছিলেন। সন্তানকে কোলে লইয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে তিনি বলিলেন, "বৎস, লোকে এই বাণীকে বিবেক বলে, কিন্তু আমি বলি ইহা সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বাণী। তুমি যদি ইঁহার কথা শুনিয়া চল, তোমার জীবন চিরবিশুদ্ধ হইবে।" থিয়োডোর পার্কার বলিয়াছেন, তাঁহার জননীর

বাক্য তাঁহার হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল। বাল্যকালের সেই ঘটনা হইতে আর কখন তাঁহার জীবনে বিবেকের সহিত বিরোধ তিনি অনুভব করেন নাই, তাই তাঁহার জীবনে পাপবোধের অভাব। কেশবচন্দ্রের জীবনবেদের পাপবোধ অধ্যায়টি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা বলিতে পারেন, কেশবচন্দ্রের কিরূপ তীব্র পাপবোধ ছিল। সে অধ্যায় পাঠ করিলে মনে হয়, যেন তিনি কত প্রকার পাপে ব্যাপৃত। নরকের অনলে তিনি দিন রাত জ্বলিতেন। তাঁহার মনে হইত, যেন কোন মানুষকে তিনি হত্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যদি আমি মনে মনে ভাবি অমুক ব্যক্তি আমার সম্মুখে না আসে; তাহা হইলেই আমি তাহার সম্বন্ধে হত্যা অপরাধে অপরাধী হইলাম। যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আসিয়াছিলেন, তাহার নীতি অতি উচ্চ নীতি। এই উচ্চনীতিতে বিবেকীর জন্ম হইল। তাঁহার অন্তরের ভিতরে অতি সামান্য কোন বিসদৃশ ব্যাপার উপস্থিত হইলেই অমনি ভীষণ পাপবোধ উপস্থিত হইত। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, যদি কোন নারীর প্রতি তুমি কুদৃষ্টিতে তাকাও, তবে তুমি ব্যাভিচার পাপে লিপ্ত হইলে। কিন্তু কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, যদি কেহ কর্ত্তব্যোপলক্ষে কোন নারীর নিকট ৫ মিনিট থাকা সমুচিত, সে স্থলে আর দুই মিনিট অধিক বসিয়া থাকে তবে সে ব্যাভিচারী হয়। যে স্থলে ৫ মিনিট থাকা প্রয়োজন, সে স্থলে ৬ মিনিট কিংবা ৭ মিনিট থাকিলে অবশ্যই ভিতরে ভিতরে তাহার প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তির একটি সুন্দর বস্তু দেখিয়া মনে হয় যে ঐ বস্তুটি আমার হয়, আমি অমনি চৌর্য্য অপরাধে অপরাধী হইলাম। ফলতঃ কোন পাপের সম্ভাবনা কিঞ্চিৎ

তাহা কেশবচন্দ্রের নিকটে ভীষণ আকার ধারণ করিত। তাঁহার সহিত অনেককাল একত্র বাস করিয়াছি। দেখিয়াছি, তাঁহার সেবাকারী দাসদিগকে স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিতেন। যদি দিন দাসের বেতন দিতে বিলম্ব হইত, অমনি আর তিনি থাকিতে পারিতেন না। বিবেক তাঁহাকে বলিত, "তুই স্বার্থপর র সুখের জন্য ব্যস্ত, আর তোর ঐ দাস বেতন পাইল না, র পুত্র কন্যা অনাহারে মরিতেছে, তাহার বেতন না দিয়া কিরূপে নিশ্চন্ত আছিস্।"

একটি দৃষ্টান্ত দিলেই ভৃত্যগণের প্রতি তাঁহার সুকোমল বহার সকলে বুঝিতে পারিবেন। এক সময় তাঁহার একটি লক ভৃত্য চুরি করিয়াছিল। তাঁহার বন্ধুগণ নিতান্ত চলচিত্ত, কলেই তাহাকে পুলিষের হস্তে অর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। কন্তু তিনি সেই বালককে ডাকিলেন এবং তাহাকে লইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া তাহার কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। বালক অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। শেষ নময়ে সেই বালক তাঁহার রোগশয্যায় প্রাণপণে সেবা করিয়াছিল। আমরা মনে করিতে পারি, তিনি 'পেনাল কোডের' বরুদ্ধে কার্য্য করিলেন। তিনি বিবেকী ছিলেন, তাঁহার হৃদয়ে বিবেকের সাম্রাজ্য ছিল। তিনি শাস্ত্র ব্যবস্থার দিকে দৃক্পাত না করিয়া বিবেকের অনুরোধে দাসকে ক্ষমা করিলেন। তাহার কার্য্য আমরা অনুমোদন করিতে পারি না। সেই বালককে প্রথমাপরাধে ক্ষমা না করিয়া দণ্ডিত করিলে সে চির নের জন্য মন্দচরিত্র হইয়া যাইত। অল্পবয়স্ক অপরাধীরা অপরাধে দণ্ডিত হইয়া কারাবাসে গেলে সেখান হইতে তাহারা

যাহাতে পরিণত হইয়া আইসে। আমি গোপনে কার্য্য করিয়া ইহার দৃষ্টান্ত বিলক্ষণ অবগত আছি। আবার বাল্যকালে, একটী অল্পবয়স্ক চোর ধরা পড়ে। সে আপনা হইতেই ৪। ৫ টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুরির অপরাধ স্বীকার করিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, তুমি সে গুলি কেন প্রকাশ করিলে ? সে বলিল, মহাশয়, কবুল করিয়া একণে শীঘ্র শীঘ্র কারাগারে যাইতে পরিলে তথায় আমাদের অনেক ওস্তাদ আছেন, তাঁহাদের নিকট এবার এমন শিক্ষা করিয়া আসিব যে, আর ধরা পড়িব না। কেশবচন্দ্র নিজের স্বাভাবিক প্রতিভায় অন্তরাত্মার প্রেরণায় এ সকল বিষয় অবগত ছিলেন ; সুতরাং নিজ ভৃত্যকে ক্ষমা করিয়া কিছু অন্যায় করিয়াছেন, ইহা আমরা বলিতে পারি না।

কেশবচন্দ্রের জীবনে প্রথমতঃ বিবেকের সাম্রাজ্য বশতঃ রাজাধিরাজের মূর্ত্তি প্রকাশ পাইল। এই রাজাধিরাজ যিহুদিগণের যিহোবা। যিহুদিজাতিকে যিনি শাসন করিতেন, সেই যিহোবা কেশবচন্দ্রের নিকটে রাজাধিরাজ হইয়া প্রকাশিত। যদিও এ দেশে উদ্যতবজ্র প্রভৃতি শব্দ ঈশ্বরের সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে, তথাপি বলিতে হইবে ভূমা মহান্ ঈশ্বরের সে ভাব এদেশের সাধকগণ অতি অল্পই বুঝিয়াছেন। যাঁহারা যোগিকুলসম্ভূত বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করেন, পাপের জন্য তীব্র যাতনা ভোগ করিতে তাঁহাদিগকে দেখা যায় না। পাপের প্রতি কটাক্ষ না থাকায় আমাদের জীবনের সঙ্গে তাঁহার জীবনের বিশেষ পার্থক্য। প্রথমে রাজা নেতা পরিত্রাতা, তৎপরে পিতার বেশে ঈশ্বর তাঁহার নিকটে প্রকাশিত হইলেন। এইরূপে ক্রমে যখন

বেকজনিত কঠোরতা বশীভূত হইয়া আসিল, তখন ঈশ্বর
াবস্বরূপ হইয়া কেশবচন্দ্রের নিকট প্রকাশিত হইলেন। এখন
তার সুকোমল হস্তে তিনি লালিত পালিত হইতে লাগিলেন।
শবচন্দ্রের অন্তরে ভক্তির সমাগম হওয়াতে ঈশ্বরের মাতৃমূর্ত্তি
কাশ পাইল। তিনি বলিয়াছেন, "বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায়
ধনে প্রথম হইতে বুঝিয়াছিলাম। এত কঠোর যে জীবনের
রম্ভ সেখানে ভক্তিরস কিরূপে দেখা যাইবে? তাহার প্রত্যা-
ও তখন করিতে পারা যায় নাই। ভক্তি অতিশয় আবশ্যক,
়াও তখন মনে হয় নাই, মাতৃচরণকমল কি, তাহা বুঝিতাম
। বিবেকের রাজার কাছে প্রার্থনা করিতাম। অপরাধী বন্দী
ারাগী, তপস্বীদের ঈশ্বরের কাছে থাকিব এই অভিপ্রায় ছিল।
ঃ জন বিশ্বাসী পরব্রহ্মের উপর নির্ভর স্থাপন করিল, এই
লাই দেখিতাম, ভক্তের খেলা দেখি নাই।" বিশ্বাস, বিবেক
রাগ্য, এই তিন হইতে জীবনের আরম্ভ হইয়া তাঁহার জীবন
়্যপ্রধান হইল; পুণ্যভূমির উপরে ভক্তি সঞ্চারিত হইল।
শবচন্দ্র এই জন্য ভক্তির উপদেশকালে বলিয়াছেন, ভক্তির
়দেশে পুণ্যের কথা আসিতে পারে না; কেন না ভক্তি পুণ্য-
মর উপরে স্থাপিত। পুণ্য অগ্রে জীবনে সঞ্চারিত না হইলে
ক্ত আসিতেই পারে না। এদেশের ভক্তিশাস্ত্রে যদিও
লিখিত আছে,

ন হ্যপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্।
ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্ত্তনং শ্রবণং তথা॥

পুণ্য বিনা ভক্তি হওয়া দূরে, শ্রবণ কীর্ত্তন পর্য্যন্ত সিদ্ধ হয়
; তথাপি ভক্তিসম্বন্ধে যাঁহারা মীমাংসা করিয়াছেন, তাঁহাদের

মত এই যে, ভক্তেতে কিঞ্চিৎ দোষের সংস্রব থাকিলে তাহা নিন্দনীয় নহে, চন্দ্রে কলঙ্কের রেখা আছে বলিয়া কি চন্দ্র চিত্তহর নহে ? এ মীমাংসা করিবার কারণও আছে, কেন না গীতাতে উল্লিখিত হইয়াছে,

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্‌।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্‌ ব্যবসিতো হি সঃ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং প্রযাস্থতি।

"অতি দুরাচার হইয়া যদি অনন্যমনা হইয়া আমার ভজনা করে, তাহা হইলে তাহাকে সাধুই মনে করিবে, কেননা তাহার সম্যক্‌ অধ্যবসায় হইয়াছে। সে শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইবে, নিত্য শান্তিলাভ করিবে।" শ্রদ্ধা ভক্তির প্রথম উন্মেষ। এই শ্রদ্ধা হইতে ভজনা উপস্থিত হয়। এস্থলে ভজনাই ভক্তি বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। ঈশ্বরের ভজনা করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্ত-শুদ্ধির পর ভক্তির উদয় হয়, ইহাই যথার্থ ভক্তির উদয়ের প্রক্রম।

এক্ষণে যাহা বলা হইল তাহাতে এই প্রতিপন্ন হইল, কেশব-চন্দ্রের প্রথম জীবনে মুষার আরাধ্য দেবতা যিহোবা—যিনি রাজাধিরাজ তাঁহার সহিত, তৎপরে মহর্ষি ঈশার পিতার সহিত, অবশেষে চৈতন্যের প্রেমময় হরির সহিত সাক্ষাৎকার। তাঁহার জীবনে প্রথমে মুষা, তৎপরে ঈশা, পরিশেষে চৈতন্যের সহিত মিলন হইয়াছিল। বিবেক যে হৃদয়কে শাসনের দ্বারা খুব কঠোর করিয়া-ছিলেন সেই কঠোর হৃদয় পুষ্পোদ্যান হইল, সেই শূন্য ভূমিতে ভক্তির কুসুম ফুটিল। হৃদয় পবিত্র না হইলে যথার্থ ভক্তি হয় না। ভক্তাবতার শ্রীচৈতন্য যাহা বলিয়াছেন তাহাতেও ইহাই প্রতীত হয়। তিনি বলিয়াছেন,

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

"তৃণ হইতে অতীব নীচ, তরু হইতেও সহিষ্ণু, আপনি
মানী অথচ অন্যকে মানদান করে, ঈদৃশ ব্যক্তিই হরিনাম-
র্ত্তনে অধিকারী।" তিনি এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই।
নি বৈরাগ্যশূন্য পুণ্যশূন্য ভাবুকতার নিন্দা করিয়াছেন। তিনি
দৃশ ভাবুকতাকে ভাবকালি বলিয়া তাহা হইতে তাঁহার শিষ্য-
ণকে সাবধান করিয়াছেন। যদি আমরা হরিনামে নৃত্য করি,
র যদি আমাদের অন্তরে পাপ থাকে, তবে আমরা নিশ্চয়ই
বকালি দেখাইয়া অপরাধী হইব। যে ব্যক্তি কীর্ত্তনে
চিতেছে আর পরক্ষণে ক্রোধ করিতেছে, তাহার সম্বন্ধে আমরা
শ্চয়ই বলিতে পারি, এ ব্যক্তির ভাবুকতা স্নায়ুবিকারজনিত।
ক্তিশাস্ত্রকারগণ বিবিধ প্রকারের হৃদয়ের লক্ষণ নির্ণয় করিয়া-
ন। তন্মধ্যে এক প্রকারের হৃদয়কে বজ্রকল্প বলিয়া নির্দ্দেশ
রিয়াছেন। এই বজ্রকল্প হৃদয়ে ভাবের অতীব গাঢ়তা হয়, অথচ
হিরে তাহা প্রস্ফুটাকার ধারণ করে না। আমার পিতৃব্য অতি
গাঢ় অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। কীর্ত্তনশ্রবণে তাঁহার চক্ষু
রক্ত হইত, ভিতরে প্রগাঢ় প্রেমোদয় হইত, অথচ চক্ষু দিয়া
ক বিন্দু অশ্রু নিপতিত হইত না। ইঁহার হৃদয়কে বজ্রকল্প
া যাইতে পারে। কেশবচন্দ্রের বিবেকবিশোধিত হৃদয়ে যখন
ক্তি আসিয়া দেখা দিল, তখন ঈশ্বর রাজবেশ পিতৃবেশ পরিত্যাগ
রিয়া মাতৃবেশে তাঁহার নিকটে প্রকাশিত হইলেন। সুতরাং
নিতে হইবে, কেশবচন্দ্রের ভক্তি পুণ্যভূমির উপর সংস্থাপিত
য়াছিল। কেশবচন্দ্রের নিকট ঈশ্বর যখন মা হইয়া আসিলেন

তখন তাঁহার ভাব ভিন্নবেশ ধারণ করিল। তাঁহার সমুদায় ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যথার্থ বালকের ন্যায় ভাব হইল ; বালকের ভাষার ন্যায় ভাষা হইল। বহুদিন পূর্ব্বে ভক্তিভাজন প্রধানাচার্য্য তাঁহাকে ব্রহ্মানন্দ নাম দিয়াছিলেন। ভক্তিসমাগমের পূর্ব্বে সে নামের যথার্থ পাত্র বলিয়া তিনি আপনাকে কখন মনে করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "যদিও কোন কোন স্থলে মাননীয় বন্ধুদিগের নিকটে 'ব্রহ্মানন্দ' নাম পাইয়াছিলাম, কিন্তু অন্তর তাহাতে সায় দিত না, বলিত তুমি ইহার উপযুক্ত নও।" "এখন এমনই ভক্তি আসিয়াছে আর বলিতে পারি না, এখন ভক্তি অধিক কি বিবেক অধিক ; আনন্দ অধিক কি তপস্যা অধিক ; সুখ অধিক কি কষ্টের ধর্ম্মসাধন অধিক।" আমাদের ধর্ম্ম প্রথমে সত্যের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আনন্দে পরিসমাপ্তি হয়, এই জন্যই ঈশ্বরের কোন্ কোন্ স্বরূপের পর কোন্ কোন্ স্বরূপের আরাধনা করিলে এবং স্বরূপনিচয়ের সহিত সাক্ষাৎকার হইলে সাধকের জীবন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় তাহা বলা যায়। কেশবচন্দ্রের জীবনে সকলে দেখিবেন, সত্যেতে জীবন আরম্ভ করিয়া তাঁহার জীবন আনন্দে পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। ব্রহ্মসং-স্পর্শে জীব কি প্রকার আনন্দ লাভ করে কেশবচন্দ্র তাহাই নিজ জীবনে দেখাইয়াছিলেন। ভক্তিসঞ্চারে যখন তাঁহার ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজনিত গভীর আনন্দের উদয় হইল, তখন আনন্দে ব্রহ্মারাধনা পর্য্যবসন্ন হইল। এক মহান্ অনন্ত ঈশ্বর উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভীষণ, তাঁহারই প্রভাবে চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি পরিচালিত হইতেছে, তিনিই রাজাধিরাজ, তিনিই সাধকের চিত্তে প্রবিষ্ট হইয়া আনন্দ প্রদান করেন। অনন্তে

আনন্দ,পুণ্যে আনন্দ, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ভিন্ন আনন্দ কখন সমুদ্রিক্ত হয় না ; আনন্দে এই জন্য সাধনের পরিসমাপ্তি।

কেশবচন্দ্রের নিকট ঈশ্বর রাজা, পরিত্রাতা, পিতা, মাতা,হইয়া প্রকাশিত হইলেন, এই পর্য্যন্তই কি শেষ হইল ? সর্ব্বশেষে তিনি বন্ধুরূপে অবতীর্ণ হইলেন, পরম সুহৃদের সৌহৃদ্যে তিনি আকৃষ্ট হইলেন। তিনি বলিতেন আমার প্রাণের সুহৃদ আমার জন্য সর্ব্বদাই কাতর ; তিনি কষ্ট অনুভব করিলেই ঈশ্বর কষ্ট অনুভব করেন। মানুষ কষ্ট অনুভব করিলে ঈশ্বর কষ্ট অনুভব করিবেন, ইহা অতি অদ্ভুত কথা। তিনি প্রার্থনায় বলিয়াছেন, "বিশ্বাসীর চক্ষে, পৃথিবীতে যত ভক্তের বাড়ী আছে, তাতে তুমি কেবল দৌড়িতেছ। কোমল তোমার প্রাণ, বন্ধুর দুঃখে তুমি বড় কাতর হও। লক্ষ লক্ষ ক্রোশ দূরে একটি ভক্ত তোমার পড়ে আছে, বন্ধু নাই, যাহারা ছিল ক্রমে ক্রমে ছাড়িল। তুমি গেলে তাঁহার সেবা করিতে। অবিশ্রান্ত সেবা কর, কাছে এসে বসে কত রকমে প্রাণ পরিতোষ কর। লোকে তোমাকে পিতা মাতা মুক্তিদাতা বলিয়া পূজা করিল। এই যে বন্ধুভাবটি ইহার ভিতরে অমৃত রহিয়াছে। আমার মুখ শুকাইলে তোমার মুখ শুকোয়, আমার ব্যারাম হইলে যেন তোমারও ব্যারাম হইয়াছে। জগদীশ, পৃথিবীতে আত্মীয় স্বজন আছে তাহারা সেবা করে, কিন্তু তাদের মুখ শুকোয় না। তারা নিজেরা আলগা হয়ে সেবা করে। হরির প্রাণে ভক্তের প্রাণ এক হয়ে গেছে। ভক্ত বলেছে মাবার কাছে যে দিনের বেলায় কেহ থাকে না। ঈশ্বরায় তখন হরি বুঝিলেম এবং তখন হইতে নিজে কাছে গিয়া দিলেম।" এ সকল কথা অনন্ত ঈশ্বরের সম্বন্ধে কি খাটে ?

এ যেন এক জন মানুষ আর এক জন মানুষের কথা বলিতেছেন। তিনি এক বার উপাসনার সময়ে বলিয়াছিলেন, মা আমার অবিরল ধারে অশ্রুবর্ষণ করিয়া কাঁদিতেছেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, মহাশয়, আপনি এ কি বলিলেন? ঈশ্বর কি কাঁদেন? তাঁহার আবার অশ্রুপাত কি? তিনি উত্তর দিলেন, অনন্তে যাহা আছে, চিরদিনই আছে; অনন্তের অনন্ত সহানুভূতি, বল, আর কোন্ ভাষায় প্রকাশ কর যাইতে পারে? তিনি তখন যে অর্থে অবিরল অশ্রুবর্ষণ বর্ণন করিয়াছিলেন, ইদানীন্তন ঈশ্বরের অনন্ত বন্ধুতা প্রদর্শনের জন্য 'আমার মুখ শুকাইলে তোমার মুখ শুকোয়' ইত্যাদি বলিয়াছেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি?

একটি বিষয়ে কেশবচন্দ্রের জীবনের বিশেষত্ব। তাঁহার নিকটে ঈশ্বর যখন যে ভাবে কেন আত্মপ্রকাশ করুন না, তৎসহ অনন্তত্বের যোগ ছিল, এ জন্য অতি প্রথম হইতে অনন্ত তাঁহার চিত্তে অনন্তজ্ঞান, অনন্তপ্রেম, অনন্তসৌন্দর্য্যরূপে বিদ্যমান ছিলেন অনন্তকে তিনি প্রথম হইতে ধারণ করিয়াছিলেন। অনন্ত তাঁহার জীবনের নিয়ামক ছিল, অনন্তের সহিত যোগই তাঁহার যোগের উচ্চতম অবস্থা। যখন ঈশ্বরের সহিত সৌহৃদ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তখনও ঈশ্বরের অনন্তত্ব তাঁহার নিকটে তিরোহিত হয় নাই। তিনি যোগ ও ভক্তিশিক্ষার্থীদিগকে প্রথমে সত্যসাধন করিতে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, অনন্তসত্তা সর্ব্বদা জ্ঞানে বিদ্যমান রাখিও। অতএব স্মরণে রাখিতে হইবে, অনন্ত তাঁহার সর্ব্বস্ব ছিল। এমন কি তিনি তাঁহার সমুদায় শক্তিকে অনন্তের আনন্ত্যে সংযুক্ত করিয়াছিলেন। "যত শক্তি অন্তরে এরাত সকলে তোমার

সন্তান। তা আমার দৃষ্টিশক্তি, চিন্তাশক্তি, বিবেচনাশক্তি, এ সমুদায় শক্তি তোমারই কন্যা। এরা কেন তবে অনন্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, অনলস হয়ে, দিবানিশি হরিনাম করিবে না?" নববিধান পূর্ণধর্ম্ম, ইহা অনন্ত বিনা কখন সন্তুষ্ট হইতে পারে না, তাই তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন, "কবে আমরা নববিধানকে বুক জুড়িয়া আলিঙ্গন করিব? সমস্ত গুণ কোটি কোটি সূর্য্যের ন্যায় হৃদয়ে প্রকাশিত হউক; দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া যাই। অনন্তে লীন হই, আর ব্রহ্মকে খণ্ড খণ্ড লইয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া থাকিব না। পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণব্রহ্ম এই শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে পূর্ণতা পাইব।"

এই অনন্তের সঙ্গে যোগে কি হয় তাহা তিনি আপনি এইরূপ বলিয়াছেন;—"অন্তরাত্মার সঙ্গে এমনই সংযোগ যে, প্রতিবস্তু দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তৎসঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মের দর্শনলাভ। কাঠ আর কাঠ মনে হইবে না; আকাশ আর আকাশ মনে থাকিবে না। আকাশে চিদাকাশ দেখা যাইবে। সর্ব্বত্র এক জ্ঞান ঝক্ ঝক্ করিতেছে, এক শক্তি টন্ টন্ করিতেছে, এই অনুভব হইবে। জ্ঞানের উজ্জ্বল প্রভা আকাশময় বিস্তৃত রহিয়াছে; আনন্দ প্রেম ব্যাপ্ত হইয়া চারিদিক্ শীতল করিতেছে, জীবকে শান্তি দিতেছে।" প্রার্থনায় অনন্তের সঙ্গে যোগের সবভাব আরও সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়াছে। "ব্রহ্মধন এখন যে আমার ভাণ্ডারে; আমার পুস্তকালয়ে, আমার বক্ষের ভিতরে। জমীদার অপেক্ষা বড়, রাজা অপেক্ষা আমি বড় হইলাম। তোমার সন্তান হইয়া আমি ব্রহ্মাণ্ডের উত্তরাধিকারী হইলাম। যোগেতে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র সমস্ত বুকের মধ্যে করিয়াছি। মাকড়সা যেমন

জালে পোকাকে ধরে, তেমনই ধরিয়াছি। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্ম আমার মধ্যে করিয়াছি।" এই বিচিত্র যোগে নববিধানের মূলমন্ত্র। সমুদায় জগৎ ও জীব যোগীর জ্ঞানসূত্রে বদ্ধ। এক বার তিনি যাহা দর্শন করিয়াছেন, অনুভব করিয়াছেন, আর তাহা তাঁহার জ্ঞান হইতে কখন অপসৃত হয় না। কেশব-চন্দ্র বলিয়াছেন, যদি এ চক্ষু এক বার জগৎ দর্শন করিয়া লয়, তাহার পর চক্ষু অন্ধ হয়, যোগীর পক্ষে তাহাতে কিছু ক্ষতি হয় না। জগৎ দর্শন করিবার যে প্রয়োজন ছিল তাহা তাঁহার সম্বন্ধে সিদ্ধ হইয়াছে। জগতে জগতের অধীশ্বরকে দেখা জীবের পক্ষে প্রয়োজন, যখন যোগী তাঁহাকে জগতে দেখিলেন, আর তাঁহার জগতে প্রয়োজন কি? জগৎ হইতে যোগী জগতের সার আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন, এখন যদি যোগী অন্ধ হন, তিনি জগৎপতিতে জগৎ দর্শন করিবেন, অসংখ্য কোটি জীব তাঁহার আত্মার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে, তাহারা আর তাঁহা হইতে কোথায় দূরে পলায়ন করিবে। যোগীর সঙ্গে একাত্মতায় সকলে বদ্ধ। এক ব্রহ্মেতে তিনি সকল এবং সকলকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ। যাহা দেখিলেন তাহাতেই তাঁহার দেখা শেষ হইল না। তিনি আরো দেখিবেন, আরো জানিবেন, অনন্তকাল অনন্তেতে বাস করিয়া তাঁহার অনন্ত লীলা দর্শন ও সম্ভোগে কৃতকৃত্য হইবেন।

ঈশ্বরই কেবল অনন্ত, আর সমুদায়ই অন্তবিশিষ্ট। কেশবচন্দ্র যখন ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইলেন, তখন অনন্ত তাঁহার জীবনের নিয়ামক হইবেন, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? তিনি এই অনন্তে সমুদায় কাল দেশের ব্যবধান উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

ান ও সাইনাগিরি, ইয়ুরোপ ও এমেরিকা, জর্ডান ও জেরু-
লামকে তিনি তাঁহার কমলকুটীরে আনিয়াছেন। এ সকল
াশপাখি তাঁহারা কোথা হইতে আসিল? অনন্তের মধ্যে বাস
ইতে। তিনি ইংলণ্ডে অবস্থানকালে বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,
খানে আমি ও ভারতবর্ষে আমার বন্ধুগণ, আমরা সকলেই
ক ঈশ্বরেতে অধিবাস করিতেছি। এই অনন্তের সহিত যোগে
িনি ঋষিগণের সঙ্গে বুদ্ধের সঙ্গে একত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

জগৎ ও জীব এক অনন্তশক্তিদ্বারা অনুবিদ্ধ। তিনি উপরে
েমন এক ঈশ্বর মানিতেন, পৃথিবীতে তেমনি একটি মানুষ মানি-
েন। সকল মনুষ্যই এক মহান্ মানবদেহের অন্তর্গত, বা অঙ্গ-
্ত্যঙ্গ। এই জন্য তিনি তাঁহার বন্ধুবর্গকে এক বলিয়া মনে করি-
েন। সমুদায় জগৎ অনন্তের মধ্যে বিরাজ করিতেছে, ভগবান্ ভিন্ন
ার তিনি কিছু দেখিতেন না। তিনি পাগল ও যোগী বলিয়া কয়ে-
টি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি আপনি সেই যোগী ও পাগল। সূর্য্য,
্র, পশু, পক্ষী, মানুষ, সকলের [illegible] ঈশ্বর তাঁহাকে দর্শন
তেন, তাঁহার সহিত কথা বলিতেন। [illegible] তাঁহার দৃষ্টি
ইত না। তিনি [illegible] আদেশবাদী হইলেন [illegible] কারণ এই
িনি বলিতেন, [illegible] ঈশ্বর নিরন্তর আমাদের সহিত কথা বলেন;
াহার বাণী আর কিছুতেই থামে না। [illegible] সহিত যোগ-
তঃ সকল বিষয়েই তাঁহার [illegible] বিচ্ছিন্ন ছিল। তাঁহার
কটে মুহূর্ত্তের জন্য ভগবানের বাণী নিবৃত্ত হয় নাই। ঈশ্বর অনন্ত,
িনি যাহা করেন চিরদিনই করেন, এই তাঁহার মত। তিনি
ই অনন্তসহানুভূতিপূর্ণ ঈশ্বরকে প্রাণের বন্ধুরূপে বরণ
রিয়াছিলেন। অনন্ত যিনি তাঁহাতে সহস্র সহস্র নর নারী বাস

করিতেছে। তিনি বলিতেন, উপরে একমেবদ্বিতী
ব্রহ্ম, নিম্নে একমেবাদ্বিতীয়ম্ মনুষ্য। আমরা সকলে এক হই
অনন্তে স্থিতি করিতেছি, আমাদের সকলেরই দেহমধ্যে সে
এক অনন্ত মহাপ্রাণশক্তি কার্য্য করিতেছেন। কেশবচন্দ্র এ
অন্য বন্ধুগণের সহিত, সমুদায় নর নারীর সহিত আপনাকে এ
করিয়াছেন। সংক্ষেপে এই কথা বলা যাইতে পারে অন
কেশবচন্দ্রের ধর্ম্ম, অনন্ত কেশবচন্দ্রের উপাস্য; অনন্তের বিবি
প্রকাশ তাঁহারনিকটে অনন্তকে তিরোহিত করিতে সমর্থ হয়নাই

কেশবচন্দ্র অগ্রজন্মা।

কেশবচন্দ্র অগ্রজন্মা। *

হে সারাৎসার পরম সত্য, তুমি আসিয়া আমাদের হৃদয় মন আচ্ছাদিত কর। সত্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, সত্যের জন্য লজ্জা-ভয়-পরিত্যাগ, সত্যের জন্য প্রাণদান ভিন্ন তুমি কাহাকেও দেখা দেও না। তোমার নিকট এই জন্য ভিক্ষা করি, তুমি আমাদের লজ্জা, ভয়, আশঙ্কা, ভীরুতা, সমুদায় অপসারিত কর। তুমি আসিয়া সকলকে তোমার দ্বারা এমনই উদ্দীপিত কর যে কাহারও মন অণুমাত্র ভীত ও কুণ্ঠিত না হয়। হে সত্য, সত্যপ্রকাশ করিতে যেন কোন কারণে ভীত না হই। ভয়ে ভয়ে জীবনযাপনাপেক্ষা জীবনের ক্লেশযন্ত্রণা বল আর কি হইতে পারে? সে দুঃখ তুমি স্বয়ং অপসারিত কর। তোমার নিজের গৌরব এবং যাহা সত্য তাহা প্রকাশ করিতে যেন কখন কুণ্ঠিত না হই, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

কেশবের জন্মদিনে বৎসরান্তে কিছু বলা এক প্রকার নিয়ম হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে যাহা বলা যায়, তাহা সমুদায় বৎসরের আন্দোলনের ফল। ইতঃপূর্ব্বে এখানে পঠিত 'Keshub—the Reconciler of pure Hinduisn and pure Christianity' বিষয়টির চরমাংশের বিবৃতি এই বক্তৃতা। একটি বিষয় বহুবর্ষ যাবৎ কথঞ্চিৎ অপ্রকাশ্যে ছিল, আজ তাহা প্রকাশ করিয়া বলিব মনে করিয়াছি। যাহা বলিব, এমন হইতে পারে যে তজ্জন্য অব্যবহিত ভাবী বংশীয়গণমধ্যে অনেকের আমি বিরাগভাজন হইব।

---

* বাৎসরিক জন্মোৎসবোপলক্ষে উপাধ্যায় প্রদত্ত বক্তৃতার সার।

অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, আমাদের নিজের লোকমধ্যেও অনেকে আমায় গোঁড়া বলিয়া মনে করেন, এবং অন্য সকল অপেক্ষা সেই গোঁড়াম হইতে মণ্ডলীর অনেক অনিষ্ট হইতেছে, এ কথা বলিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন। আমার প্রতি কে কি বলিতেছেন, কোন্ অপযশ আমার প্রতি কে আরোপ করিতেছেন, তাহা ভাবিয়া আমি কুণ্ঠিত নই। গোঁড়াম বা এ ব্যক্তি মণ্ডলীর ঘোর অনিষ্টকারী, এ দোষারোপ কেহ করিবেন বলিয়া সত্য বলিতে কেন ভয় করিব? সত্য বলিব, ফলাফল কি হইবে, তাহা জানি না। সত্য বলিতে লজ্জা কি? যদি সত্যবিরোধী কোন কথা আমি বলি তজ্জন্য মস্তক অবনত করিব। আমি যাহা বলিতেছি, তাহাতে বিজ্ঞান ও দর্শন আমার সহায়। বিজ্ঞান ও দর্শন আমার সহায়, এই সাহসেই আমি অদ্যকার বক্তব্য বিষয় বলিতে অগ্রসর।

আমি এ কথা অনেক বার বলিয়াছি, আমার জন্ম সংশয়বাদিগণের মধ্যে। যখন আমি প্রচারকজীবন গ্রহণ করি, তখনও ইহাদের সঙ্গ আমি পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। প্রচারে প্রথম বাহির হইয়াই লুইসকৃত গ্রন্থ সহ আমার পরিচয় হয়। তাঁহার গ্রন্থগুলি পড়িয়া আমার বিশ্বাস কোথায় আন্দোলিত হইবে, না আরও দৃঢ়মূল হইল, এজন্য আমি তাঁহার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। তাঁহার একখানি গ্রন্থের একটী কথা আমার জীবনের উপরে এমনই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, সেই এক কথায় আমি চির জীবনের জন্য বিজ্ঞানের পক্ষপাতী হইয়াছি। কথাটী এই :—

"প্রকৃতিমধ্যে বিরোধ নাই। একটী অবিচাল্য ঘটনা, আর কুড়িটী অবিচাল্য ঘটনা দ্বারা নিরাকৃত করিতে হইবে না; নিরাকৃত

করিতে হইবে না, কিন্তু যদি সম্ভবপর হয়, সেটীকে সেগুলির সঙ্গে কোন একটী সাধারণ ঘটনাধীনে এক শ্রেণীতে নিবদ্ধ করা হইবে * ।” একথা তিনি বলিলেন কোন্ উপলক্ষে? তিনি লিখিয়াছিলেন, আমাদের নাসিকাপুটস্থ সূক্ষ্ম রোমরাজি বাহিরের ধূলি প্রভৃতিকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় না। ধূলি প্রভৃতি প্রবেশ করিতে গেলেই উহারা সে গুলির অভিমুখীন হইয়া তাহাদের ভিতরের দিকে প্রবেশের গতি অবরোধ করে। যদি এরূপ না হইত তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি কয়লার খনিতে,মিলে, লোহার কারখানায় কাজ করে, তাহারা কিরূপে বাঁচিত? † এই

* "In Nature there is no contradiction. One positive fact is not to be set aside by twenty other positive facts; not to be set aside, but if possible to be ranged with them under some more general fact."—STUDIES IN ANIMAL LIFE, BY G. H. LEWES.

† "It is an interesting fact, that while the direction in which the cilia propel fluids and particles is generally towards the interior of the organism, it is sometimes reversed; and instead of beating the particles inwards, the cilia energetically beat them back, if they attempt to enter. Fatal results would ensue if this were not so. Our air-passages would no longer protect the lungs from particles of sand, coal-dust, and filings, flying about the atmosphere; on the contrary, the lashing hairs which cover the surface of these passages would catch up every particle, and drive it onward into the lungs. Fortunately for us the direction of the cilia is reversed and they act as vigilant janitors, driving back all vagrant particles with a stern—'No admittance—*even* on business!' In vain does the whirlwind dash a column of

কথার প্রতিবাদ করিয়া কেহ লিখিয়াছিলেন, সূক্ষ্ম রোমরাজির গতি যদি ভিতরের দিকে না গিয়া এইরূপে বাহিরের দিকে ফিরিত, তাহা হইলে কয়লার খনি প্রভৃতিতে যাহারা কাজ করে তাহাদের কখন ক্ষয়রোগে মৃত্যু ঘটিত না; মৃত্যুর অন্তে দেহচ্ছেদে তাহাদের ফুস্‌ফুস হইতে কয়লার গুঁড়া প্রভৃতি পাওয়া যাইত না। এই প্রতিবাদের প্রতিবাদজন্য লুইস এই পর্যাবেক্ষণটির উল্লেখ করেন;—একটি খরগোশের মুখ একটি সূক্ষ্ম চর্ম্মাবরণে আবৃত করিয়া তন্মধ্যে সূক্ষ্ম কয়লার গুঁড়া স্থাপিত করা হয়। সেই খরগোশটি যখনই নিঃশ্বাস ফেলিত, তখনই সেগুলি চর্ম্মাবরণের মধ্যে চারি দিকে উড়িত। কয়েক মাস পরে ঐ খরগোশটির দেহচ্ছেদ করিয়া দেখা হয়, তাহার ফুস্‌ফুসে কিছুমাত্র কয়লার গুঁড়া প্রবেশ করে নাই। তিনি এই পর্যাবেক্ষণটির বলে এই নির্দ্ধারণ করেন যে, সহস্র সহস্র লোক কয়লার খনি প্রভৃতিতে কার্য্য করে, তাহাদের মধ্যে অত্যল্পসংখ্যকের ক্ষয়রোগে মৃত্যু হয়। ইহাতে এই সপ্রমাণ হয় যে, যে সকল লোকের কারণান্তরে শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদেরই সূক্ষ্ম রোমরাজির ধূলি প্রভৃতি প্রতিরোধে সামর্থ্য চলিয়া গিয়াছিল, অন্যথা কয়লার খনি প্রভৃতিতে কার্য্যকারী প্রতিব্যক্তিরই ক্ষয়রোগে মৃত্যু হইত।

---

dust in our faces—in vain does the air darkened with coal-dust, impetuously rush up the nostrils: the air is allowed to pass on, but the dust is inexorably driven back. Were it not so, how coal-miners, millers, iron-workers, and all the modern Subal Cains contrive to live in their loaded atmosphere? In a week their lungs would be choked up."—STUDIES IN ANIMAL LIFE, BY G. H. LEWES.

একটী অবিচাল্য ঘটনাকে যদি বিংশতিটী ঘটনা দ্বারা নিরাকৃত করা বিজ্ঞানসঙ্গত না হয়; অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞানগোচর হইলেও অবিচাল্য ঘটনাযোগে প্রমাণিত না হইলে উহা যদি প্রমাণ বলিয়া গৃহীত না হয়, * তাহা হইলে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতেছে, ধর্ম্মরাজ্যে কেশবচন্দ্রের জীবন একটী অবিচাল্য ঘটনা কি না? একালে ক্রমবিকাশের (Evolution) মত বিজ্ঞান ও দর্শনে সাদরে গৃহীত হইয়াছে। ইহাকে কেহ অপ্রমাণ বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন না। ক্রমবিকাশ এখন প্রমাণমধ্যে গণ্য হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এ ক্রমবিকাশ কি? ইহা প্রাচীন ঐতিহ্য প্রমাণের † বিস্তৃতনিয়োগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐতিহ্য প্রমাণকে প্রত্যক্ষ- ও অনুমান-মধ্যে অন্তর্ভূত করিয়া উহার স্বতন্ত্রত্ব সেকালে অনেকে স্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু প্রাচীন বেদাদি অবলম্বন করিয়া কোন একটি বিষয় স্থাপন করিবার যত্নমধ্যে উহার প্রাধান্য যে বিলক্ষণ ছিল সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। ইতিহাসে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, তাহার একটীকেও আমরা

---

* "The profoundest minds know best that Nature's ways are not all times their ways, and that the brightest flashes in the world of thought are incomplete until they have been proved to have their counterparts in the world of fact. Thus the vocation of the true experimentalist may be defined as the continued exercise of spiritual insight, and its incessant correction and realisation. His experiments constitute a body, of which his purified intuitions are, as it were, the soul."—SCOPE AND LIMIT OF SCIENTIFIC MATERIALISM, BY J. TYNDALL

† প্রাচীন ঐতিহ্যপ্রমাণের যে লক্ষণ আছে, সে লক্ষণ ভুল হইলেও লক্ষণশোধনে অধিকার আছে জানিয়া আমরা উহাএস্থলে গ্রহণ করিয়াছি।

অগ্রাহ্য করিতে পারি না। এ ইতিহাস কেবল মানবজীবনের ইতিহাস নহে, সমগ্র পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ উদ্ভিদ-প্রাণী- প্রভৃতি সকলেরই ইতিহাস ঐতিহ্য প্রমাণ বা ক্রমবিকাশের অন্তর্ভূত। ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাসমধ্যে কেশবচন্দ্রের জীবন যখন একটী বিশেষ ঘটনা, তখন উহা অধ্যয়ন করিতে আমরা বাধ্য, কখন আমরা উহাকে অবহেলা করিতে বা উড়াইয়া দিতে পারি না। কেশব-জীবন এখন ইতিহাসের বিষয়। উহা পাঠ করিতে গেলে তাঁহার কথা ও কার্য্যগুলি যথাযথ আলোচনা করা প্রয়োজন। কি জানি বা সেগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে এমন কথায় বিশ্বাস করিতে হয় যাহাতে দশ জনের নিকট নিন্দাভাজন হইতে হয় বা তাঁহাকে নিন্দাভাজন করা হয়, এ ভয়ে আমরা তাহার আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি না। যখন ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, আর রূপান্তর হইতে পারে না, তখন সত্যালোকে উহাকে অধ্যয়ন করিতেই হইবে। ইহাতে নিন্দা আসুক, অযশ আসুক, অবমাননা আসুক, ভাবী বংশীয়গণের নিকটে অপদস্থ হইতে হউক, ক্ষতি নাই। সত্যই আপনি সকল ক্ষতি পূরণ করিবেন।

কেশবের জীবন অধ্যয়ন করিতে গিয়া তিনি ঘোর অহঙ্কারী এইটিই সর্ব্বপ্রথমে চক্ষে পড়ে। কেশব এক জন বড় লোক। বড় লোকের জীবন যত চরম ভাগে উপস্থিত হয়, ততই তাঁহার মস্তিষ্ক উষ্ণ হইতে থাকে ; পরিশেষে উহা উন্মত্ততাতে পর্য্যবসন্ন হয়। ঈশা এবং অন্যান্য সকল বড় লোকেরই জীবনের চরমভাগে এই দশা ঘটিয়াছিল। রেনান প্রভৃতি এই মত প্রচার করিয়াছেন, আজ পর্য্যন্তও অনেকে এই মতের পক্ষপাতী। পণ্ডিতবর মোক্ষমূলরের নিকটে আমি ঋণী, তাঁহার প্রতি আমি অকৃতজ্ঞ হইতে

পারি না, কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হয়, তিনিও এই মতের বাওয়ায় পড়িয়া কেশবচন্দ্রকে শেষ সময়ে মস্তিষ্কের বিকার-গ্রস্ত বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন *। আজ যদি তিনি কেশব-চন্দ্রের এই কথাগুলি পড়িতেন না জানি তিনি আরও কি বলিতেন? "স্বর্গেতে তুমি এক জন মানুষ প্রস্তুত করিয়াছিলে সেই মানুষ আমি। যখন আমি হইলাম, আমার হস্ত পদ নাসিকা কর্ণ সমুদায় হইল। যখন তুমি পৃথিবীতে আমাকে আনিলে তখন আমি ছিলাম সদল অখণ্ড। গোড়ার কথা বলিতেছি ভগবান্, নববিধানের প্রথম অক্ষর ওঁকার।......আমি বিনয় ও অহঙ্কারের সহিত বলিতেছি, আমি আসিলাম অঙ্গ লইয়া, আমাকে ছাড়ুক শুকাইবে।......হে ঈশ্বর, ইহারা আমার যোগেতে আশ্রিত, এঁদের বসিবার পাহাড় আমি, যোগ করিবার গহ্বর আমি। দয়াল হরি, নববিধান একটা। এঁরাও যা আমিও তা, আমিও যা, এঁরাও তা। আমি আর এঁরা একটা।......আমার

---

* "The most objectionable doctrine put forward by the liberal reformer of Hinduism was, no doubt, the *Adesh*, the claim of being directed by an inward voice which admitted no gainsaying.........It is the old story over again. Nothing is so difficult for a reformer, particularly a religious reformer, as not to allow the incense offered by his followers to darken his mental vision and not to mistake the Divine accents of truth for a voice wafted from the clouds. In this respect, no doubt, Keshub Chunder Sen has shared in the weakness of older prophets; but let us not forget that he possesses also a large share of their strength and virtue." —CORRESPONDENCE IN 'TIMES' OF G. MAX MULLER.

শরীরে বিশটা প্রচারক, যিনি যেখানে যান আমি যাই। এঁরা এক শরীরের অঙ্গ। যিনি যেখানে যান, যিনি যেখানে প্রচার করেন, সেই এক পুরুষ করেন।......এই ঘরে তুমি দয়া করিয়া নববিধানের লক্ষণ বিবৃত কর, আমরা সেইগুলি চরিত্রের সঙ্গে মিশাইয়া লই।" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, তিনি আরও স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছেন :—"এক ঈশ্বর উপরে, এক সন্তান নীচে। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রাহ্মসমাজ বলিয়াছিলেন উপরে, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' নববিধান বলিতেছেন পৃথিবীতে। সমুদায় মনুষ্যসমাজ এক। নব দুর্গার সন্তান নব মানুষ। শত শত হস্ত, শত শত কর্ণ, শত শত নাসিকা, শত শত চক্ষু, এই প্রকাণ্ড নবাকৃতি মানুষ সেই আমি।" (১৯ নবেম্বর, ১৮৮২)। কি ঘোর অহঙ্কারের কথা! আজ উনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ বলিতে সাহস! একথা শুনিতেও গা কাঁপে! ইনি কি না বলেন আমি স্বর্গে অখণ্ড ছিলাম; আমার শত শত বাহু, শত শত কর্ণ, শত শত চক্ষু, আমি নবদুর্গার নব সন্তান। এ যে অখণ্ড বিরাট্ পুরুষের বর্ণনা। এতদপেক্ষা আরও সাহসিকতার কথা সকলে শুনুন :—

"প্রাণনাথ, যার কাছে তোমাকে ডাকিতে শিখিয়াছি, যাঁর দ্বারা তোমাকে চিনেছি তাঁকে চিনে রাখুক মন। সে যে হউক না কেন, সে যে অমৃত খাইয়েছে, সে যে সোণার রাজ্য চিনিয়েছে, তাকে চিনিতে পারে যেন ভক্তেরা এই ভিক্ষাটুকু বৃদ্ধ বয়সে চাই। উপদেষ্টা বলিবার দরকার নাই, সেবা করিবার দরকার নাই, কেবল এই কথাটী যেন বন্ধুদের মনে থাকে, একটা আসল কথা এক জনের কাছে শিখেছি, যাহা মান সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠা ধর্ম্ম শান্তি সংসারে সব সুখের মূলে। সে আমাদের প্রিয়। এ সকলের মূলে

এক জনের ইসারা। মার হাসির রহস্য এক জনের কাছে আগে আমদানি হয়েছিল, এখন সব জায়গায় আমদানি হয়েছে।" (১৫ মার্চ্চ, ১৮৮৩)। এ কি ঘোরতর গুরুবাদ নহে? হাঁ গুরুবাদ বটে, কিন্তু এ গুরুবাদ অন্য প্রকারের। 'এ আগেকার গুরু আচার্য্য নয়, এ ভাই বলে পরস্পরকে খুব ভালবাসা দেওয়া, কোলাকুলি করা, বিশ্বাস দেওয়া।' গুরু হলেন ইনি কোন্ ভাবে? 'এক শরীরের সকলে অঙ্গ' এই ভাবে। (২০ নবেম্বর, ১৮৮২) । ইনি সেই গুরু যিনি বলেন, "আমার কথা কিছু শুনিও না, আমার শিক্ষা মানিও না, যদি না পবিত্র আত্মার সহিত মিলে বুঝিতে পার।" (২১ নবেম্বর, ১৮৮২)

কেশবচন্দ্র অতি নির্ভীক ছিলেন। তিনি যাহা সত্য জানিতেন তাহা বলিতে কোন কালে ভয় করিতেন না। তাঁহার মস্তকের কেশ হইতে পাদপর্য্যন্ত সত্যের তেজে পূর্ণ ছিল। তিনি তাঁহার এই সত্যপরতার বিষয় আপনি প্রকাশ্যে বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি যদি আপনাকে Prophet বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহা হইলে তাহা স্বয়ংই বলিতেন। তিনি আপনাকে Prophet বলেন নাই, কিন্তু ভাই প্রতাপচন্দ্র তাঁহাকে 'Prophet of harmony' আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন *। যেমন Religion of harmony, God of hamony বলা হইয়া থাকে, তেমনি Prophet of harmony বলা কিছু অসঙ্গত মনে হয় না, তবে

---

* "How many of the great, good, wise, holy, I see! Among them all Keshub, my friend, my guide, my master. Thou prophet of harmony and unity universal, thy glorious countenance draws me as thy own. Oh, forgive all, and accept me! I will daily frequent the courts of heaven."—HEART-BEATS. P. 82

কেশবচন্দ্র আপনি যখন আপনাকে prophet বলেন নাই অথচ বন্ধুগণকে এক শরীরের অঙ্গ বলিয়াছেন, তখন তাঁহার আপনাকে prophet না বলার গভীর অর্থ আছে। যিনি prophet তিনি আপনি একা ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হন, আর সকলের ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ কোন সংস্রব থাকে না, prophet তাঁহাদের নিকট ঈশ্বরের স্থলবর্ত্তী। বন্ধুগণের সহিত কেশব চন্দ্রের এরূপ সম্বন্ধ নহে। ইঁহাদের সহিত তাঁহার অখণ্ডভাব, ইঁহারা তাঁহার হস্ত পদ, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, এক আলোকে আলোকিত। যদি ইঁহারা তাঁহার অঙ্গ হইলেন, এক আলোকে আলোকিত হইলেন, তবে তিনি আপনি কি, ইহাই নির্দ্ধারণ করা অদ্যকার বক্তৃতার উদ্দেশ্য।

'কেশবচন্দ্র অগ্রজন্মা' অদ্যকার বক্তৃতার বিষয়। 'অগ্রজন্মা' এ শব্দের অর্থ ব্রহ্মা বা বেদপ্রবক্তা। এই অর্থে আমি 'অগ্রজন্মা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। 'অগ্রজন্মা' শব্দে ব্রাহ্মণও বুঝায়। ব্রাহ্মণ পুরুষের মুখ; 'ব্রহ্মচারী জনয়তি বেদম্' ব্রহ্মচারী বেদ উৎপাদন করেন, এ ভাবে ব্রাহ্মণের বেদপ্রবক্তৃত্ব সিদ্ধ পাইলে তাদৃশ অর্থে এখানে 'অগ্রজন্মা' শব্দ গ্রহণ করিতে আমার কোন আপত্তি নাই। কেশবের বন্ধুগণ যদি তাঁহার হস্ত, পদ, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ হইলেন, তবে তিনি আপনি ব্রহ্মা বা মুখ। কেশবচন্দ্রের বেদপ্রবক্তৃত্ব তাঁহার বন্ধুগণনিরপেক্ষ নহে, এজন্য তিনি তাঁহাদের সহিত আপনাকে এক শরীরের অঙ্গ বলিয়াছেন, এবং আপনাকে লক্ষ্য করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, 'একটি অঙ্গের সম্মাননা করিও না কিন্তু সমুদায় দেহের সম্মাননা কর' (Honor not a limb but the whole body.)। বন্ধুগণ সহ তিনি

যখন ভগবানের নিকটবর্ত্তী হইতেন, তখন তাঁহাতে সত্য অবতরণ করিত, এবং সেই সত্য যুগপৎ সকলের হৃদয়ে প্রতিভাত ও গৃহীত হইত। এ দেশের আগমশাস্ত্রে সত্যাবতরণের এইরূপ প্রণালীই নিবদ্ধ আছে। 'আগতঃ শিববক্তেভ্যো গতশ্চ গিরিজাননে। মগ্নশ্চ হৃদয়াম্ভোজে তস্মাদাগম উচ্যতে।" ঈশ্বর হইতে ভক্তে সত্য অবতরণ করিল, সহসাধকগণের হৃদয়ে তাহা মুদ্রিত হইল, ইহাই এ মতে সত্যাগমের প্রণালী। 'মগ্নশ্চ হৃদয়াম্ভোজে' এস্থলে আগমান্তরে 'মতং শ্রীবাসুদেবস্য' এই পাঠ আছে। তাহাতে অপরের হৃদয়স্থ পরমাত্মা বা পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক অবতীর্ণ সত্যের অনুমোদন বুঝাইতেছে। এ দুই কথাই সত্য। যুগপৎ সত্য হৃদয়ে প্রতিভাত ও গৃহীত হওয়ার অর্থ ইহাই। আমরা যখন তাঁহার সহিত এক হইয়া ঈশ্বরসন্নিধানে উপনীত হই, তখন সত্য অবতরণ করে, এইটি প্রকাশ করিবার জন্য ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্যের আসন শূন্য রহিয়াছে। যখন সাধু অঘোর নাথ স্বর্গগত হন, তখন তাঁহার সহিত আমরা সকলে স্বর্গগত হইয়াছি, এখানে আর আমরা নাই, কেশবচন্দ্র এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। এ মতের অর্থ— উপাসনা, কার্য্য ও সংপ্রসঙ্গসময়ে সকলে মিলিয়া ঈশ্বরেতে স্থিতি। অনেকের ধারণা এই, বেদীসম্পর্কীয় নির্দ্ধারণ আমাদের মণ্ডলীর উচ্ছেদের মূল। বেদীসম্পর্কীয় নির্দ্ধারণের মূলে কি আছে তৎপ্রতি যাঁহাদের দৃষ্টি নাই, তাঁহাদেরই এইরূপ ধারণা। আজ যদি বেদী সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায়, তথাপি আমি কুণ্ঠিত নই; কেন না আমরা যখন উপাসনা করি, ভগবানে নিবিষ্ট থাকি, তখন আমরা কেশবের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া ভগবানের উপাসনা করি ও তাঁহাতে নিবিষ্ট থাকি। যদি এরূপে কেশব সহ

যোগযুক্ত না হই, তাহা হইলে মণ্ডলীর সহিত যোগ হয় না, বিচ্ছি সাধকের যে দুর্গতি সেই দুর্গতির আমরা অধীন হই। উপাসন কালে হৃদয়ের ভিন্নতা দূর হয়, সত্যাবতারণার সুসময় হয়। সময়ে পূর্ব্বসংস্কার বিলুপ্ত, মন সর্ব্বথা পরিষ্কৃত, বুদ্ধি বিষয়ান্তে অনাবিষ্ট, সুতরাং সত্যাবতারণার অবসর উপস্থিত। হৃদয় নির্ম্ম না হইলে সত্য অবতরণ করেন না, সত্যের আবিষ্কার হয় না এ কথা টিণ্ডাল প্রভৃতি বিজ্ঞানবিদ্‌গণও বলেন। পূর্ব্বমতাদি সংস্কার হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া মনকে সাদা কাগজের মত করিলে নূতন সত্যের স্বতঃ সমাগম হয়, এ কথা বলিয়া তাঁহারা যোগের অনুকূল কথাই বলিয়াছেন। কেশব আমাদের সঙ্গে যখন উপাসন করিতেন, সংপ্রসঙ্গ করিতেন, তখন সত্য প্রকাশিত হইত, এজন্য তিনি একলা এক জন লোককে প্রায় কিছু বলেন নাই, সকলে একত্র হইলে তবে বলিতেন। তিনি টাউনহল প্রভৃতি স্থানে যাহা বলিতেন, সে সকল অগ্রে এই প্রণালীতে তাঁহাতে অবতরণ করিত, বক্তৃতাকালে সেই গুলি যথাযথ একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়া সমগ্র বৎসরের সাধনের ফল প্রদর্শন করিত।

কেশবচন্দ্র আপনাকে কখন একা মনে করিতেন না। একাকী জীবনধারণ করা তাঁহার প্রকৃতিসঙ্গত ছিল না। যদি কেবল তাঁহাকে সম্মান করিয়া তাঁহার বন্ধুবর্গের সামান্য এক জনকেও কেহ তুচ্ছ করিতেন, তাহা হইলে তিনি মনে করিতেন, তাঁহাকেই তুচ্ছ করা হইল, তাঁহাকে গ্রহণ করা হইল না। তাঁহার এই ভাব ছিল বলিয়াই তিনি ঈশ্বরকে বলিয়াছেন 'যখন তুমি পৃথিবীতে আমাকে আনিলে তখন আমি ছিলাম সদল অখণ্ড।' তাঁহার এ ভাব বিজ্ঞান ও দর্শন সঙ্গত। একালে বিজ্ঞান

ও দর্শন মানবের এই একত্বেরই পক্ষপাতী *। যাঁহারা এই বিজ্ঞান ও দর্শন সঙ্গত সত্যটি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম না করিয়া কেশবচন্দ্রকে অহঙ্কারী বলিয়া নিন্দা করিবেন, তাঁহারা বিজ্ঞান ও দর্শনে অনভিজ্ঞ। বিজ্ঞান ও দর্শন যাহা সত্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করে, কেশবচন্দ্রের তাহা জীবনসিদ্ধব্যাপার ছিল এবং আমরাও তাহা জীবনে সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, আমরা যখন বন্ধুগণ সহ মিলিত হইয়া উপাসনা বা প্রসঙ্গ করি, তখন নূতন নূতন সত্য হৃদয়ে প্রকাশ পায়, সংশয় অন্ধকার সহজে ঘুচিয়া যায়। আজ বহু বর্ষ এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের যে ধারণা হইয়াছে, তাহা আর বিচলিত হইবার

"* Is not the doctrine I and my brother are one, new ?" কেশব চন্দ্র একথা বলিয়া ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন যে, সকল সাধককেই ভ্রাতৃসম্বন্ধে 'আমি ও তুমি এক' এইরূপ সাধন করিতে হইবে। আমি অন্যত্র এইজন্যই বলিয়াছি, যিনি দশজনকে লইয়া উপাসনা করিবেন, তিনি আপনাতে সেই দশজনকে এক করিয়া লইবেন, দশ জনও তাঁহার সহিত এক হইয়া যাইবেন।

"......,the forces which are sometimes represented as struggling with each other on the field of man's life, are no longer independent ; still less completely separable forces. They are the inner division by which the spirit re-establishes and makes secure its unity ; their antagonisms are the breath of life. They form a certain hierarchy of organisation, in which however the higher or more developed does not merely supervene upon the crude, but in a manner supercedes it, and yet contrives to retain its worth and its real truth."—PROLOGOMENA TO THE STUDY OF HEGEL'S PHILOSOPHY, BY W. WALLACE M. A., L. L. D.

নহে। ঈশা তাঁহার শিষ্যবর্গকে বলিয়াছিলেন, যখন তোম
বিচারাসনের নিকট নীত হইবে, তখন সেখানে যাইবার পূর্ব্বে
বলিবে তাহা ভাবিও না, কেন না কি বলিতে হইবে পবিত্রা
তাহা বলিয়া দিবেন। প্রকাশ্যে কোথাও কিছু বলিতে হইবে
আমরা এই নিয়মের অনুসরণ করিয়া থাকি, এবং আজ পর্য্য
এরূপ নিয়মানুসরণ করিয়া আমাদিগকে অভাবগ্রস্ত হইতে হ
নাই। আরও যদি পাঁচিশ বৎসর জীবনের কার্য্য চলে তাহ
হইলে অভাবগ্রস্ত হইতে হইবে, এরূপ কখন আশঙ্কা হয় না
যখন আমাদিগকে নিতান্ত অজ্ঞান বলিয়া জানি, তখন ঈশ্ব
হইতে অন্তরে সত্যের অবতরণের কোন বাধা ঘটিবে কেন? নূত
নূতন সত্য, নূতন নূতন কথা অন্তরে অবতরণ করিবেই করিবে।

কেশব যে আপনার সম্বন্ধে বলিলেন 'তাঁহার শত শত হস্ত
শত শত পদ, শত শত চক্ষু, শত শত নাসিকা, শত শত কর্ণ
এ কথা আমরা সত্য বলিয়া কি প্রকারে গ্রহণ করিব? গ্রহ
করিব এই জন্য যে, 'ঈশা তাঁহার ইচ্ছা, সক্রেটীস তাঁহার মস্তক
চৈতন্য তাঁহার হৃদয়, হিন্দু ঋষি তাঁহার আত্মা, জনহিতৈষী হাওয়া
তাঁহার দক্ষিণ হস্ত।' এক ঈশা শত শত ঈশা, এক সক্রেটিস শ
শত সক্রেটিস, এক চৈতন্য শত শত চৈতন্য, এক ঋষি শত শ
ঋষি, এক হাওয়ার্ড শত শত হাওয়ার্ড হইয়া তদ্রূপ [illegible] নরনারীতে
পৃথিবীমধ্যে বিচরণ করিতেছেন; সেই সকলের সঙ্গে একাত্মা হই
তিনি 'এক প্রকাণ্ড নবাকৃতি মানুষ।' তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে
কেহ ঈশার ভাবাপন্ন, কেহ সক্রেটিসের ভাবাপন্ন, কেহ চৈতন্যে
ভাবাপন্ন, কেহ ঋষিভাবাপন্ন, কেহ হাওয়ার্ডের ভাবাপন্ন, সুতরা
তিনি তাঁহাদের সহিত অভিন্ন ও এক ছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণে

যিনি যে ভাবাপন্ন সে ভাবাপন্ন থাকিয়াও অপরাপরের ভাব আত্মস্থ করিয়া নববিধানের লোক হইবেন, এই তাঁহার সমগ্র জীবনের যত্ন ছিল। তাঁহার শেষজীবনের আক্ষেপসূচক প্রার্থনাগুলি তাঁহার এই যত্নের বিফলতা হইতে সমুথিত।

এখন দেখা যাউক, কেশব যে 'এই প্রকাণ্ড নবাকৃতি মানুষ সেই আমি' বলিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিলেন, সে অহঙ্কার সত্যমূলক অথবা অভিমানমূলক। কেশবের বন্ধুগণের জীবন এখন সাধারণের চক্ষুর সন্নিধানে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইঁহারা সকলেই বিচার করিয়া দেখিতে পারেন, কেশব তাঁহাদের অগ্রজন্মা কি না? প্রথমতঃ তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে আপনার সমান বলিয়া জানিতেন। তিনি কোন কোন বন্ধুর বাড়ীতে স্বয়ং যাইতেন, তাঁহারা কখন শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিবেন তজ্জন্য বাহিরে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন, অথবা শয্যাপার্শ্বে গিয়া বসিতেন। এ সময়ে তিনি যে তাঁহাদের সমকক্ষ লোক, ইহাতো সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। দেখিতে দেখিতে তিনি এমন উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিলেন যে, আর তাঁহাকে লাগাইল পাওয়া তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। পার্শ্বস্থ এই তাঁহার বন্ধু (ভাই অমৃতলাল বসু) একথার আপনি প্রমাণ দিবেন। তিনি অত্যল্প দিন মধ্যে এরূপ উচ্চ হইলেন কেন? বিবেক, বৈরাগ্য ও বিশ্বাস, এ তিন তাঁহাকে শীঘ্র শীঘ্র উচ্চ হইতে উচ্চ ভূমিতে তুলিয়াছিল। সকল বন্ধু হইতে উচ্চ ভূমিতে আরোহণই তাঁহার অগ্রজন্মা হইবার হেতু। তিনি যখন প্রবক্তা হইলেন, আর তাঁহার বন্ধুসকল একই শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইলেন, তখন তিনি হইলেন মুখ আর তাঁহারা হইলেন হস্ত, পদ, চক্ষু, নাসা, কর্ণ। তিনি প্রবক্তা, এই জন্য আমাদের মধ্যে তাঁহার

আসন শূন্য রহিয়াছে। বাহিরের শূন্য আসন নিদর্শনমাত্র, কি
বাস্তবিক তাঁহার আসন কোথায়? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাধু অঘোর
নাথের স্বর্গারোহণের সময় কেশব বলিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে
আমরা সকলেই পরলোকবাসী হইয়াছি। বস্তুতঃ আমাদের বসি
বার স্থান এখন পরলোক। পরলোক চিদাকাশ। চিদাকাশে
আরোহণ ভিন্ন যোগ হয় না। যে ব্যক্তি পৃথিবীর ভূমি স্পর্শ
করিয়া থাকে তাহার পক্ষে যোগ অসম্ভব। * যোগী কেশবের

* "Gradually it (the soul) attains to the rank of a consciousness before which is unrolled the spectacle of a world of objects set over against it, and even of a world within it, itself as the object deposed to the rank of something to be surveyed. As such it seems to have left all immersion in corporiety completely behind, and to have completely divested itself of any limitation. It floats freely above the real psychical life out of which it emerged—a detached but somewhat shadowy self, not burdened by any restrictions of nature or circumstance." —PROLOGOMENA TO THE STUDY OF HEGEL'S PHILOSOPHY BY W. WALLACE M. A., L. L. D.

"Whatever may be the charm of emotion, I do not know whether it equals the sweetness of those hours of silent meditation in which we have a glimpse and foretaste of the contemplative joys of Paradise. Desire and fear sadness and care are done away. Existence is reduced to the simplest form, the most ethereal mode of being that is to pure self-consciousness. It is a state of harmony, without tension and without disturbance, the dominical state of the soul, perhaps the state which awaits it beyond the grave."—AMIEL.

আসন পৃথিবীতে নহে চিদাকাশে। তাঁহার সহিত এক হইতে গেলে এখন চিদাকাশে আসন পাতিতে হইবে। চিদাকাশে যিনি যোগের আসন স্থাপন করিবেন না, তাঁহার কেশবের সহিত এক হইবার সম্ভাবনা নাই। মন চিদাকাশে স্থিতি করিবে, হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয়গণ বাহিরের কাজ করিবে। মুখ বক্তৃতা করিতেছে, কিন্তু যোগী আত্মা সেই আকাশে অবস্থিত। যে ব্যক্তির চিন্তা ভাবনা পৃথিবীর বিষয়ে আবদ্ধ, সে কখন যোগী হইতে পারে না। আমরা কে কত দূর এ যোগে সিদ্ধ হইয়াছি তাহা বলিবার বিষয় নহে, কিন্তু একথা বলিতে কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই যে, কেশবচন্দ্র এই যোগে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। কেশব চিদাকাশে অর্থাৎ ঈশ্বরে স্থিতি করিতেন, তাই তিনি ঈশ্বর হইতে কেবল নব নব সত্য, নব নব ভাব, নব নব আলোক পাইতেন তাহা নহে, তিনি সকল বন্ধু সকল নরনারী সহ ঈশ্বরেতে এক হইয়া একাত্মতার ধর্ম্ম ঘোষণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি যে ঈশা মুষা প্রভৃতি সহ এক হইয়াছিলেন, তাহারও মূল এই যোগ।

কেশব বলিয়াছেন, বিধানের সকল জিনিষের আমদানি আগে তাঁহার নিকটে হইয়াছে,তাহার পর আর সকলে উহা পাইয়াছেন। এ কথা বলা কত দূর সত্য, এখন তাহাই দেখা কর্ত্তব্য। সঙ্গতের নীতি, মুঙ্গেরের ভক্তি, নববিধানের ধর্ম্ম, এই তিনটি তাঁহার বন্ধুগণের জীবনে মিলিত হয়, সর্ব্বদা তিনি এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন। কেশবের প্রথম জীবন নীতিপ্রধান ; সুতরাং সঙ্গতও নীতিপ্রধান হইল। কঠোর নীতিতে আকৃষ্ট হইয়া যুবকগণ কি প্রকারে একত্র মিলিত হইলেন, ইহা অতি আশ্চর্য্য। আমরা দেখিয়াছি সঙ্গতের সময়ে পরস্পরের প্রতি এমনই একটি আকর্ষণ ছিল

যে, রাত্রি দুপ্রহর হইত, অথচ কেহ সভা ভাঙ্গিয়া উঠিতে চাহি
না। সভাভঙ্গের পর পথে বাহির হইয়াও এক এক স্থলে তিন চ
জন বন্ধু মিলিত হইয়া কথা বলিতে বলিতে রাত্রি প্রভাত হ
যাইত। এরূপ মধুর আকর্ষণ কোথা হইতে উপস্থিত হইল?
কেশবচন্দ্রের আকর্ষণে সকলে আকৃষ্ট ছিলেন; তাই পরস্পর
স্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। কেশবচন্দ্রের এই আকর্ষক গুণ
বাল্য কাল হইতে তাঁহাতে ছিল। বাল্যসঙ্গিগণ তৎপ্রতি আ
হইয়া তাঁহাকে নেতৃত্বপদে বরণ করিয়া চলিত। তাঁহার বাল্য
ভাই প্রতাপচন্দ্র স্বয়ং ইহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। তাঁহার
আকর্ষণশক্তিতে যেমন বন্ধুগণ তাঁহার সহিত মিলিত না হ
থাকিতে পারিতেন না, তেমনি তাঁহার ভাবে তাঁহারা পরিচা
হইতেন। কেশবের বিবেকপ্রধান জীবন হইতে সঙ্গতের স্থ
এ সময়ে ব্রাহ্মসমাজে বিবেকের সাম্রাজ্য। ব্রাহ্মগণের সত্যবাদিত্ব
চরিত্রশুদ্ধি সে সময়ে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়ি
ছিল। 'বোধ হয়' 'হইতে পারে' ইত্যাদি কথা ব্রাহ্মগণের মু
তখন সর্ব্বদা শুনা যাইত। বিষয় কর্ম্মের স্থলেও—যেখা
নিশ্চয়াত্মক কথা না বলিলে কাজ চলে না সেখানেও—তাঁহা
এই সকল কথা ব্যবহার করিয়া সকলকে বিস্মিত করিতেন
তাঁহাদের চরিত্রের উপরে এত দূর লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল
ব্রাহ্মগণকে আফিসের কার্য্যে গ্রহণ করিবার জন্য আফিসর
নিরতিশয় ব্যগ্র ছিলেন।

বিবেকের প্রাধান্য যত বাড়িতে লাগিল, ততই সকলের আত্মা
অবস্থার উপরে দৃষ্টি পড়িল। কেশবচন্দ্রের পাপবোধ কি প্রকা
তীক্ষ্ণ তাঁহার 'জীবনবেদ' যিনি পড়িয়াছেন তিনিই তাহা অবগ

াছেন। তাঁহার পাপবোধের তীক্ষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে পাপবোধ প্রবল হইয়া উঠিল। অনুতাপ ও ক্রন্দনের রোলে ব্রাহ্মসমাজ পূর্ণ হইল। কলিকাতায় যে ভাব প্রবল হইয়া উঠিত, মফঃসলে সর্ব্বত্র তাহাই ছড়াইয়া পড়িত। ঢাকা প্রভৃতি স্থলে ব্রাহ্মগণ উপাসনা বা প্রার্থনা করিতে করিতে এমনই আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দন করিতেন ও চিৎকার করিতেন যে, পার্শ্ববর্ত্তী লোকসকল মদ্যপান করিয়া তাঁহারা এরূপ চিৎকার করিতেছেন, এরূপ মনে করিত। এই অনুতাপ ও ক্রন্দনের সময়ে কাহারও কাহারও মনে নিরাশা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। অনুতাপ দ্বারা যখন ব্রাহ্মগণের হৃদয় শোধিত হইল, তখন ভক্তি আসিলেন। নীতি ও বিবেকের সাম্রাজ্যসময়ে যেমন অগ্রে কেশবচন্দ্রে তৎপরে তাঁহা হইতে যুবকগণের মধ্যে নীতি ও বিবেক বিস্তৃত হইয়াছিল, ভক্তিও তেমনি প্রথমতঃ তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়া পরে তাহা তাঁহার বন্ধুবর্গে প্রকাশ পাইল। গোস্বামিকুলজাত বিজয়কৃষ্ণ তখন ছিলেন। আশ্চর্য্য এই যে, ভক্তির প্রবর্ত্তন তাঁহা হইতে হয় নাই। যখন কেশবচন্দ্রে ভক্তি প্রকাশ পাইল, তখন তিনি খোল কিনিয়া আনিলেন, লুক্কায়িতভাবে এক জন কীর্ত্তনীয়া বৈষ্ণবকে আনিয়া তাহার মুখে দুএকটি কীর্ত্তন শুনিলেন। কলুটোলার ত্রিতলগৃহে উপাসনার সময়ে খোল ব্যবহারের যখন প্রস্তাব হইল, তখন অধিকাংশ উপাসক তাহার প্রতিবাদ করিলেন। উপাসনা শেষ হইয়া গেলে যাঁহারা চলিয়া যাইবার চলিয়া গেলে তবে খোল বাজাইয়া দুএকটি কীর্ত্তন হইত। খোলের বাজনা কর্ণে প্রবেশ না করে এ জন্য অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও অগ্রে চলিয়া যাইতেন। অল্পদিন মধ্যে যাঁহারা খোলের বিরোধী ছিলেন, তাঁহারা উহার

পক্ষপাতী হইলেন, এমন কি খ্রীষ্টানসমাজে পর্য্যন্ত উহা প্রবেশ করিল। দিন দিন ব্রাহ্মসমাজে ভক্তি এমনই বাড়িয়া উঠিল যে, অত্যধিক ভক্তির উচ্ছ্বাসে শেষে উন্মত্ততা উপস্থিত হইল। মুঙ্গের এই বিষয়ে সর্ব্বপ্রধান হইলেন। কেশবের পদধারণ করিয়া ক্রন্দন ইত্যাদি দেখিয়া কেশবের দুইটি বন্ধু নরপূজার আন্দোলন উপস্থিত করিলেন, কিন্তু তাঁহারা জানিতেন না যে, কেবল কেশবচন্দ্রসম্বন্ধে নহে, তাঁহার অন্যান্য বন্ধুগণসম্বন্ধেও কোন কোন ব্যক্তি এত দূর ভক্তির আতিশয্য দেখাইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের পদধৌত করিয়া দিয়া পত্নীর কেশে তাহা পুঁছাইয়া দিতেন। যখন ভক্তির আতিশয্যে এই সকল ব্যাপার উপস্থিত, তখন আমি কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এ কিরূপ হইতেছে, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, যেরূপ ভাব উপস্থিত, ইহাতে শীঘ্র একটি সম্প্রদায় হইতে পারে।

আধ্যাত্মিকতার আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুগণের মধ্যে নীতির প্রতি দৃষ্টি যে প্রকার হ্রাস পাইল, প্রতিবাদের আঘাতে তেমনি তাঁহাদিগের মধ্যে ভক্তিও সঙ্কুচিত হইল। বন্ধুগণের এই প্রকার পশ্চাদ্গমনের ফল এই হইল যে, কেশবচন্দ্রে ভক্তির পর যখন যোগ উপস্থিত হইল, তখন সে যোগ তাঁহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল না। যোগের ভূমিতে বন্ধুগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারিলেন না, সুতরাং তাঁহার সঙ্গে তাঁহাদের বিচ্ছেদ ঘটিল। যোগের সময়ে বন্ধুগণ তাঁহার সঙ্গী হইলেন না, ইহা বলিয়া তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। যোগে কেশবে সংযোগ উপস্থিত। কেশবের জীবনে প্রথমতঃ বিয়োগের প্রাধান্য ছিল, 'প্রত্যেক বিষয় সূক্ষ্মরূপে বিচ্ছিন্ন ভাবে বুঝিবারই চেষ্টা ছিল।' সাধনসম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সাধন করিতেন। ভক্তি ও যোগ যখন

তাঁহার জীবনে মিশিয়া একাকার ধারণ করিল, তখন পূর্ব্বে যাহা খণ্ড খণ্ড ছিল তাহার সেই খণ্ডগুলি একটির পর একটি আসিয়া 'নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে' সংযুক্ত হইল। এই সংযোগের সময়ে নববিধান আসিলেন। এক জন এক জন করিয়া সকল মহাজন আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিলেন। এরূপে তাঁহাতে সংযোগ হইল কেন? এই জন্য হইল যে, 'স্বর্গে তিনি সদলে ছিলেন'। স্বর্গে সদলে ছিলেন ইহার অর্থ কি? অর্থ এই যে, তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে সংযোগস্পৃহা ছিল। এজন্যই তিনি বলিয়াছেন 'প্রথমে ইচ্ছা জন্মে নাই নববিধানে সমস্ত একত্র গাঁথিব, পরে দেখি প্রকৃতির মধ্যে কে তাহাই করিতেছেন।' যোগভূমিতে বন্ধুগণ সঙ্গী হইলেন না বটে, কিন্তু সেখানে স্বর্গের মহাজনগণের সঙ্গ তিনি পাইলেন। এক দিকের বিচ্ছেদের ক্ষতি আর এক দিকের মিলনে পূরণ হইল। তিনি বাহিরের গ্রন্থ প্রায় পড়িতেন না, পড়িতেন মানবপ্রকৃতি। তাঁহার বন্ধুগণের প্রকৃতি এইরূপে তাঁহার করতলস্থ ছিল। তিনি তাঁহাদের এক এক জনের প্রকৃতির কত ভিন্নতা তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। তাই এত বিভিন্ন প্রকৃতির লোক এক হইলে লোকে একাত্মতার মর্ম্ম বুঝিবে, তিনি আশা ও বিশ্বাস করিতেন। যোগ ও সংযোগের সময়ে যদিও তাঁহার বন্ধুগণ পশ্চাৎপদ হইলেন দেখিয়া তিনি একান্ত ব্যথিত হইলেন, তথাপি তিনি কদাপি নিরাশ হন নাই। বন্ধুগণের সহিত তাঁহার আন্তরিক বিচ্ছেদ দর্শন করিয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'অন্তরে পার্থক্য উপস্থিত হওয়াতে আপনি আদি সমাজের সহিত যোগ বিচ্ছিন্ন করিলেন, আমাদের সহিত আপনার যে আন্তরিক পার্থক্য উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে আপনি আমাদের

কাঁহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন কি না?' এ কথার উত্তরে তিনি বলিলেন, 'I cannot afford to lose any one of you', আমি তোমাদের মধ্যে এক জনকেও হারাইতে পারি না। তাঁহার বন্ধুগণের সঙ্গে তিনি যে নিত্যযোগে যুক্ত তৎসম্বন্ধে আর একটী কথা বলিতেছি। তিনি যখন ইংলণ্ডে সর্ব্বজনকর্তৃক, এমন কি স্বয়ং মহারাজ্ঞী কর্ত্তৃক সম্মানিত হইলেন, তখন এক জন বন্ধু এক দিন আমায় বলিলেন, 'তিনি কি আর এখন এই ছেঁড়ানেকড়ার লোকদিগকে আদর করিবেন?' আমি ইহার উত্তরে বলিয়াছিলাম, 'যদি ইহাদিগকে আদর করিতে না পারেন তিনি সে কেশবচন্দ্রই থাকিবেন না।' ফলতঃ বন্ধুগণ সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিচ্ছেদসত্ত্বেও তিনি কোন দিন তাঁহাদিগের এক জনকেও ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কাহাকেও ত্যাগকরাকে তিনি হত্যাকরা মনে করিতেন। নবসংহিতামতে স্বামী ও পত্নী কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন না, কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণের পরস্পরসম্বন্ধে সেই ব্যবস্থা। ত্যাগ ও হত্যা যখন নবধর্ম্মে এক, তখন কে কাহাকে পরিত্যাগ করিয়া হত্যাপরাধে অপরাধী হইবে? অপরকে হত্যা করা আত্ম-হত্যা, হেগেলের এ মত অতি সত্য; কেন না অপরকে হনন করিতে গিয়া আপনাকেই হনন করা হয়; আপনি আপনার বিনাশের কারণ হইতে হয়।

কেশবচন্দ্রে যে সংযোগের ব্যাপার উপস্থিত তাহার মূলে তাঁহার শিষ্যপ্রকৃতি রহিয়াছে। তিনি এই শিষ্যপ্রকৃতির বলে কেবল ঈশা চৈতন্য প্রভৃতিকে আত্মস্থ করিয়াছিলেন তাহা নহে, পথের এক জন ছিন্নকন্থাপরিধায়ী সভাজনবিদ্বিষ্ট ভিখারী তাঁহার নিকটে আসিলেও তিনি তাহার দেবাংশ আত্মস্থ না করিয়া তাহাকে

যাইতে দিতেন না। এই শিষ্যপ্রকৃতি তাঁহাতে না থাকিলে তিনি জ্ঞানী মূর্খ, ধনী নির্দ্ধন, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, সকল লোকের সঙ্গে একাত্মা হইয়া বিস্তৃত মানবমণ্ডলীকে আত্মস্থ করিতে পারিতেন না। এই শিষ্যপ্রকৃতির বিকাশ মিলিত উপাসনা ভিন্ন কখন হইতে পারে না। মিলিত উপাসনায় যেমন ঈশ্বরের সহিত যোগ হয়, তেমনি তাঁহার সন্তানগণের সঙ্গেও যোগ হইয়া থাকে। ঈশ্বর ও তাঁহার সন্তান, এ উভয়ের সঙ্গে যোগ যত গাঢ় হইতে থাকে, তত ঈশ্বর ও তাঁহার সন্তানগণের জ্ঞানপ্রেমাদি আত্মস্থ করিবার সামর্থ্য বাড়িতে থাকে। অগ্নি না থাকিলে যেমন পরিপাক হয় না, তেমনি পবিত্রাত্মার প্রভাব বিনা জ্ঞানপ্রেমাদি আত্মস্থ হয় না, এমন কি সে সকল প্রত্যক্ষ করিবারও সামর্থ্য জন্মায় না। সে কথা যাউক, কেশবচন্দ্রে যোগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে সংযোগ উপস্থিত হইল, সে সংযোগ শিষ্যপ্রকৃতির সহায়তায় নিষ্পন্ন হইয়াছিল। শিষ্যপ্রকৃতিবশতঃ তিনি ঈশা চৈতন্য প্রভৃতিকে চিনিলেন, চিনিয়া তাঁহাদিগকে একত্র সংযুক্ত করিলেন। এই সংযোগে ধর্ম্মসমন্বয়ের ব্যাপার উপস্থিত হইল। তাঁহাতে কিরূপে সমুদায় ধর্ম্ম এক হইল তৎসম্বন্ধে আমি যাহা জানি তাহা বলিতেছি।

কেশবচন্দ্রের নিজের কথায় আমি এই জানিয়াছি যে, হিন্দু ও খ্রীষ্ট এই দুই ধর্ম্ম হইতে সমুদায় ধর্ম্ম তাঁহাতে এক হইয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং খ্রীষ্টধর্ম্মমধ্যে য়িহুদী ও মুসলমান ধর্ম্ম অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকা সহজ। হিন্দু ও খ্রীষ্ট এ দুই ধর্ম্ম এক হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই, কেন না হিন্দুধর্ম্মের ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্, এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্মের পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা এ দুইয়ের ঐক্য আছে। শঙ্করাচার্য্য হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারক; তাঁহাকে গ্রহণ

করিলে বৌদ্ধধর্ম্মও গ্রহণ করা হয়। শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধধর্ম্মকে এ দেশ হইতে অন্তরিত করিতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সার আত্মস্থ করিলেন। 'মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমেবচ।' একথা বলিয়া বৈষ্ণবগণ শঙ্করকে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বলিয়া নিন্দা করিলেন, কিন্তু ইহা তাঁহার পক্ষে নিন্দা নহে। তিনি অত বড় ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মে অন্তর্ভূত করিয়া লইলেন, ইহাতে তাঁহার মহত্ত্বই প্রকাশ পাইল। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মকে কি প্রকারে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভূত করিলেন দেখা যাউক। বৌদ্ধধর্ম্ম ঈশ্বর মানেন না, শঙ্কর ঈশ্বর মানিলেন বটে, কিন্তু মায়িক বলিয়া তাঁহাকে ব্রহ্ম হইতে অধঃকরণ করিলেন, মায়ার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার তিরোধানও নির্দ্ধারণ করিলেন। বুদ্ধ জীবকে অস্বীকার করিলেন, শঙ্করও মায়া উপাধি চলিয়া গেলে জীব আর থাকে না, কেবল ব্রহ্মই থাকেন, এ কথা বলিয়া বুদ্ধের সহিত এক হইলেন। শঙ্করের ব্রহ্ম অনন্ত জ্ঞান, ইনিই নিত্য সত্য। বৌদ্ধগণও অনন্ত জ্ঞানকেই নিত্য বলিয়া মানেন। শঙ্কর এ দেশের সকল সম্প্রদায়কে এক করিতে যত্ন করিয়া তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন না, কিন্তু তিনি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বে সমুদায়কে এক করিয়া সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই ভাব প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। কেশবচন্দ্র শঙ্করের এই সমন্বয়ের ভাবের প্রতি বড়ই আদর প্রকাশ করিয়াছেন। শঙ্করের মধ্য দিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে একতা উপস্থিত হইয়াছিল তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া ব্রাহ্মসমাজ প্রথমে শঙ্করের নিকট হইতে ব্রহ্মজ্ঞানমাত্র লইতে গিয়া অজ্ঞাতসারে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মকে অভিন্নভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র যখন নিবৃত্তিযোগের উপদেশ দিলেন, তখন তাঁহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম পরিস্ফুটাকার ধারণ করিয়াছে।

নিবৃত্তিযোগ হইতে প্রবৃত্তিযোগে প্রবেশ যখন তিনি শিক্ষা দিলেন, তখন হিন্দুধর্ম্মের ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতা এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের একতা সম্বন্ধে ভিন্নতা তাঁহাতে সিদ্ধ হইয়াছে। হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম্মের মিলনে য়িহুদী ও মুসলমানধর্ম্মেরও যে মিলন হইল, ইহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না; কেন না য়িহুদীধর্ম্মের উন্নতাবস্থাতে খ্রীষ্টধর্ম্মের উদয়, মুসলমানধর্ম্ম এব্রাহিমের ধর্ম্মের নবীন সংস্করণ।

শঙ্করাচার্য্য যে ব্রহ্মজ্ঞান ও অভিন্নভাব প্রচার করিয়াছেন, বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত তাহার একতাদর্শন সহজ। খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের একতা, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিত্বের উপরে নির্ভর করে। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা এ দুই সম্বন্ধে শঙ্করের সহিত পৌরাণিক ভক্তগণের বিরোধ নাই বলিলে হয়, কিন্তু ভগবানের সম্বন্ধে তাঁহার সহিত তাঁহাদিগের বিরোধ সামান্য নহে। প্রাচীন ভক্তগণ জীবকে ভগবানের দাস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এ দাসভাব শঙ্কর অস্বীকার করিয়াছেন ইহা বলা যাইতে পারে না, কিন্তু ভগবানের ঐশ্বর্য্য মায়িক, মায়া চলিয়া গেলে ভগবানের ভগবত্ত্ব থাকে না, এ কথা কহিয়া শঙ্কর ভক্তগণের কঠোর আক্রমণের পাত্র হইয়াছেন। প্রাচীন ভক্তগণ জীবকে ভগবানের দাস বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেও পরবর্ত্তী ভক্তগণ তৎসহ বিবিধ সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়াছেন। খ্রীষ্টের পুত্রত্ব যেমন সুস্পষ্ট, আধুনিক ভক্তগণের পুত্রত্বসম্বন্ধ তেমন সুস্পষ্ট নহে, তথাপি ভক্তগণের ভাবের সহিত খ্রীষ্টের পুত্রভাবকে মিলিত করিয়া লওয়া কঠিন নহে। এ অংশে বৈষ্ণবধর্ম্ম যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বেদের ব্রহ্ম, বেদান্তের পরমাত্মা ও পুরাণের

ভগবান্, এ তিনের যথাযথ সমাবেশে হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম্মের সম্মিলন এবং এ দুইয়ের সম্মিলনে নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি যোগের অভ্যুদয়ে হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম্মে বৌদ্ধ য়িহুদী ও মুসলমানধর্ম্মের অনুপ্রবেশ, এইটি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলে কেশবচন্দ্র সমন্বয়ের ব্যাপার যে কি সহজভাবে নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় *।

সমুদায় প্রবৃত্তি ও বাসনার নিবৃত্তি না হইলে হিন্দু ঋষি পরমাত্মার সহিত আপনার অভিন্নতা কি প্রকারে উপলব্ধ করিবেন? যে সকল বিষয় লইয়া প্রবৃত্তি ও বাসনার উদয় হয়, সেই সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য শঙ্কর যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের উপায়। বিষয় সকল কিছুই নয় মায়িক ও মিথ্যা, এই জ্ঞানে মিথ্যার সহিত সকল সম্বন্ধ উচ্ছেদ করিয়া দেওয়া বুদ্ধানুগামী শঙ্করের পথ। বিষয় সহ সম্বন্ধবশতঃ

---

* In as much as Christ is incorporated with our creed, we find in it such elements of religion as faith, repentance, moral discipline, stern justice and truthfulness, prayer and craving for universal redemption. And because our natural Hindu traditions, teachings and examples have largely entered into the composition of our religious life, we are able to recognise among our spiritual possessions such treasures as asceticism, meditation, meekness, forgiveness, and communion. The former group of virtues we have borrowed, the latter we have inherited. The union of these two is the historical Brahmoism of to-day. The future of our church we see in a full and harmonious development of these united elements in life and character.—THE HINDU SIDE OF OUR FAITH.—'INDIAN MIRROR' SEPT. 26, 1875.

চক্ষুরাদির যে ক্রিয়া উপস্থিত হয়, সে সকল প্রাকৃতিক, উহার সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই, এই জ্ঞানে ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া হইতে সাধকের নির্লিপ্ত ভাবে স্থিতি প্রাচীন পথ। এ উভয় পথের যে কোনটি অবলম্বন করিয়া সম্বন্ধজনিত প্রবৃত্তিবাসনার নিবৃত্তিপূর্ব্বক প্রবৃত্তিযোগে প্রবেশ হইয়া থাকে। বিষয়বাসনা নিবৃত্ত না হইলে ঈশ্বরের প্রেরণানুসরণ সম্ভবপর নহে। ঈশ্বরের প্রেরণানুসরণ প্রবৃত্তিযোগ। এই প্রবৃত্তিযোগে হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম্মের যে একত্ব হয়, ইহা বুঝা আর কিছু কঠিন নহে। ঈশ্বরের প্রেরণানুসরণ ও ইচ্ছানুবর্ত্তন, এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নাই বলিতে পারা যায়। মুষার ধর্ম্মে বিবেকের প্রাধান্য। বিবেক যে ঈশ্বরের প্রেরণা ও ইচ্ছার সহিত এক, ইহা আর কে না জানেন? একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের নিদেশপালনে অদম্য উৎসাহ মুসলমান ধর্ম্মের প্রাণ। ঈশ্বরের প্রেরণা ও ইচ্ছানুবর্ত্তনে তাদৃশ উৎসাহ হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত মুসলমানধর্ম্মকে এক করিতেছে। মুষার সময়ে ভয়ের প্রাধান্য ছিল, খ্রীষ্টের সময়ে প্রেমের প্রাধান্য হইয়াছে। ধর্ম্মভয় পরিশেষে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে পর্য্যবসন্ন হইয়া থাকে। খ্রীষ্টধর্ম্মে যেমন এই প্রেমের প্রাধান্য, হিন্দুগণের ভক্তিপথে সেইরূপ এই প্রেমেরই আধিক্য, সুতরাং খ্রীষ্ট ও হিন্দুধর্ম্ম এখানেও এক হইতেছে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি, হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম্ম এক হইয়া কেমন বৌদ্ধ, য়িহুদী ও মুসলমান ধর্ম্মকে অন্তর্ভূত করিয়া লইতেছে।

হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম্মের একটি বিষয়ে যে পার্থক্য আছে, তাহা কি প্রকারে এক হইল, ইহা জানিবার বিষয়। হিন্দুগণের অদ্বৈত ও খ্রীষ্টিয়ানগণের দ্বৈত ভাব, এ দুই পরস্পর বিরোধী। মনে হয় এ

দুইয়ের বিরোধ খ্রীষ্টধর্ম্মে অন্তর্হিত হইয়াছে। ঈশা যখন বলিলেন 'আমি এবং আমার পিতা এক' তখন কি আর যিহুদিগণের দ্বৈত ভাব হিন্দুগণের অদ্বৈত ভাবে পরিণত হয় নাই? না হয় নাই। ঈশা ঈশ্বরের সহিত একত্ব অনুভব করিয়াও দ্বৈতভাববিলোপ করেন নাই। তিনি ঈশ্বরকে যাহা করিতে দেখিতেন তাহাই করিতেন, ঈশ্বর তাঁহাকে যাহা শিখাইতেন, তিনি তাহাই অপরকে শিক্ষা দিতেন, তিনি ঈশ্বরের নিকটে যাহা শুনিতেন তাহাই বলিতেন, ঈশ্বর তাঁহাকে যাহা করিতে বলিতেন, তিনি তাহাই করিতেন। এখানে একত্বসত্ত্বেও দ্বৈতভাব কেমন সুস্পষ্ট। এই দ্বৈতভাব স্পষ্ট আছে বলিয়াই তিনি বলিয়াছেন 'আমি পিতাতে, পিতা আমাতে।' হিন্দুগণের অদ্বৈত এবং খ্রীষ্টানুবর্ত্তিগণের দ্বৈতভাব কেশবচন্দ্রে কিরূপে এক হইল ইহা দেখা প্রয়োজন। ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া পার্থক্য ঘুচিল না, পিতা চিরদিন পুত্র হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র থাকেনই। কেশবচন্দ্র যে দিন হইতে ঈশ্বরকে মা বলিয়া প্রত্যক্ষ করিলেন, সেই দিন হইতে দ্বৈত ও অদ্বৈত ভাবের বিরোধ ঘুচিয়া গেল। কেশবচন্দ্রের পূর্ব্বে কি আর কেহ ঈশ্বরকে মা বলিয়া ডাকেন নাই? মা বলিয়া ডাকিলেই কি আর দ্বৈতভাব বিলুপ্ত হয়? মা স্বতন্ত্র, সন্তান স্বতন্ত্র, এতো নিত্য প্রত্যক্ষ। এরূপ স্থলে মাতে দ্বৈতভাবের বিলোপ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? অদ্বৈত বা দ্বৈত এ দুইয়ের অতীত * মাতৃসম্বন্ধ।

* ১৮৮২ সনের ১৮ই সেপ্টেম্বরের প্রার্থনায় কেশবচন্দ্র যে স্থূল ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া ব্রহ্মেতে মিশিয়া যাওয়ারূপ লয়বাদ উপস্থাপন করিয়াছেন তাহাতে 'দ্বৈতবাদ নয় অদ্বৈতবাদ নয়' একথা বলা ঠিকই হইয়াছে। কারণ ব্রহ্মে বিলীন হইয়া স্থিতি দ্বৈতাদ্বৈতবাদের অতীত। বিলীনাবস্থায় দ্বৈতভাব থাকে না, অথচ শক্তিমাত্রে বিলীনভাবে স্থিতি হয় বলিয়া উহাকে অদ্বৈত

মাতার জরায়ুশয্যায় অজাত শিশু যেমন তাঁহার সহিত অভিন্ন ও এক হইয়া থাকে, মাতার জীবনে সে যেমন জীবনযুক্ত, জীবনধারণে যেমন তাহার কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, সেইরূপ সাধক যখন ঈশ্বরের সহিত মাতৃসম্বন্ধানুভব করিয়া তাঁহার সহিত এক হইয়া থাকেন, তখন তাঁহার দ্বৈত ও অদ্বৈত ভাবের অতীত হইবার সময় উপস্থিত। কেশবচন্দ্র মাতৃসম্বন্ধের কথা বলিতে গিয়া মাতার ক্রোড় ও মাতৃস্তন্য এই দুইটি প্রধান ভাবে গ্রহণ করিলেন। আমরা সর্ব্বদা তাঁহার ক্রোড়ে স্থিতি করিতেছি, নিরন্তর তাঁহার স্তন্য পান করিতেছি, ইহা যখন প্রত্যক্ষবিষয় হইল, তখন আর দ্বৈতাদ্বৈতের কথা উঠিবে কি প্রকারে? মাতার স্তন্য শিশু পান করিয়া পুষ্টিলাভ করে, সুতরাং সেখানে ভিন্নতা আছে। মাতার মাতা হইতে শক্তি জ্ঞান প্রেম পুণ্যরূপ স্তন্য স্বয়ং আমাদের অন্তরস্থ হইয়া আত্মাকে পুষ্ট করিতেছে, এ অবস্থায় আর ভিন্নতা বোধ থাকে না। যেখানে প্রয়াস প্রযত্ন চাই, সেখানে ভিন্নতা বোধ অপরিহার্য্য, কিন্তু যেখানে প্রয়াস ও প্রযত্ন নাই আপনা হইতে সমুদায় আইসে, সেখানে আর ভিন্নতা বোধ থাকিবে কি প্রকারে? কেশবচন্দ্র প্রার্থনায় এই জন্যই বলিলেন, 'যখন যোগেতে এই তনু বিনাশ করি, তখন এই তনু তোমার হয়, তোমার হাসি আমার হাসিতে মিশাইয়া যায়।' 'সোণা আর আবশ্যক নাই, কেন না সোণা হইয়া গেলাম।' জীব এখানে ব্রহ্মে বিলীন ভাবে অবস্থিত।

শঙ্কর ঘোর অদ্বৈতবাদী। তিনি জীব ও জগৎকে মিথ্যা বলিয়া

তাহাও বলা যায় না। প্রকৃতি ও জীবকে মিথ্যা বলিয়াও শক্তিমাত্রে ব্রহ্মেতে উহাদের স্থিতি স্বীকার করাতে শঙ্কর প্রকৃতপক্ষে লয়বাদীই হইতেছেন। লয়বাদ তিনি স্পষ্টবাক্যে নিবদ্ধও করিয়াছেন।

উড়াইয়া দিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজে তিনি কেন গৃহীত হইলেন, এ প্রশ্ন বৃথা। তিনি জীব ও জগৎকে মিথ্যা বলিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে আত্মস্থ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ মিথ্যাত্ব তাহাদের স্থূলত্বসম্বন্ধে তাহাদের সূক্ষ্মত্ব বা শক্তিমাত্রত্বে নহে। যখন জ্ঞানযোগে জগৎ ও জীবের স্থূলত্ব উড়িয়া যায়, তখন উহারা শক্তিমাত্রে পর্য্যবসন্ন হইয়া ব্রহ্মে বিলীনভাবে স্থিতি করে। এই প্রকার বিলীনভাবে স্থিতি কোন হিন্দুসম্প্রদায়ের লোকেই অস্বীকার করিতে পারেন না, এবং যোগের স্থলে এই অভিন্নতা বা ব্রহ্মে বিলীন হইয়া স্থিতি আমাদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে *। কেশবচন্দ্রে ব্রহ্মেতে বিলীন ভাবে স্থিতি যখন আরম্ভ হইল, তখন ঈশ্বরের মাতৃভাব তাঁহাতে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিল। 'ব্রহ্মকল চালাইতে লাগিলেন, পরমাত্মা বন্ধু হইলেন। দুই বন্ধু পরস্পর সংযুক্ত হইলেন, যোগ খেলার স্থান। পরমাত্মা খেলা করেন জীবাত্মার ভিতর দিয়া, জীবাত্মা খেলা করে পরমাত্মার ভিতরে।' এখানে কেশবচন্দ্র সখ্য ভাবের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এ সখ্য ভাবের মধ্যেও মাতৃভাব বিদ্যমান। 'এমন অবস্থা আসে যখন দুর্ব্বল হওয়া অত্যন্ত কঠিন, পাপ করা অসম্ভব, ব্রহ্মকে ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব, সৌন্দর্য্যশ্রেষ্ঠ নারীশ্রেষ্ঠ ভুবনমোহিনী জননীকে না দেখা অসম্ভব।'

---

* নরের সাধ্য নাই যে জীবাত্মা পরমাত্মাকে ভেদ করে।......হে ভূমা, তুমি একত্র আছ। এই যে শেষভাগ ঈশ্বর শক্তি আমি বুঝি, কিন্তু দুইয়ের যোগ বুঝি না। ওহে সাধক, তুমি যোগ কি দেখ। বল পুত্রের শেষ এই, পিতার শেষ ঐ। বল পাপী নরাধমের এইখানে শেষ, পুণ্যাত্মা পুরুষোত্তমের ঐখানে শেষ। যদি সাধ্য থাকে বল, আমি দেখিলাম যোগ-স্থলে এই পর্য্যন্ত লৌহ, এই পর্য্যন্ত স্বর্ণ। যোগশাস্ত্র মিথ্যা হইবে যদি বিযুক্ত করিতে পার।—ব্রহ্মযোগোপনিষৎ।

এই দ্বৈতাদ্বৈতের অতীত ভূমিতে বিজ্ঞানের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের যোগ হইল। যত দিন বিজ্ঞান স্থূল বিষয় সকল লইয়া ব্যস্ত, তত দিন কেবলই বিয়োগের ব্যাপার, যোগ নাই। কিন্তু যখনই বিজ্ঞান স্থূল বিষয়সমূহকে সূক্ষ্ম করিতে করিতে তাহার অন্তরালে এক মহতী শক্তি দর্শন করিল, এবং সেই শক্তিরই ক্রীড়াভূমি বলিয়া সংসারকে গ্রহণ করিল, অমনি ধর্ম্মের সহিত তাহার বিয়োগ বিলুপ্ত হইল এবং প্রত্যেক পদার্থে ঈশ্বর অতি নিকটস্থ ভাবে অনুভূত হইলেন *। এখানে মুষার বিবেক ও বিজ্ঞান এক হইয়া গেল †। কেশবচন্দ্রের জীবনে বিজ্ঞান ও বিবেকের যখন মিলন হইল, তখন নববিধান বলিয়া তিনি তাহার আখ্যা দিলেন। এইরূপে কেশব-চন্দ্রে যখন সমুদায় ধর্ম্ম ও মহাজন এবং বিজ্ঞান সংযুক্ত হইলেন,

* A long ladder of many steps led to God's sanctuary in days gone by. Science has cut it short. Instead of many steps there is but one step from earth to heaven. One step from mind and matter to God ; one step now from the muscles and the nerves, from the eye and the ear to God.........You see a thousand earthly forces ; immediately beneath them and directly connected with them is the central causative power or God-force—GOD-VISION IN THE NINETEENTH CENTURY.

† We are the fulfilment of Moses. He was simply the incarnation of Divine conscience. But there was no science in his teachings, that science which in modern times is so greatly honored. Let Moses grow into modern science, and you have the New Dispensation, which may be characterized as the union of conscience and science.—WE APOSTLES OF THE NEW DISPENSATION.

তখন ঈশা হইলেন তাঁহার ইচ্ছা, সক্রেটিস হইলেন তাঁহার মস্তক, চৈতন্য হইলেন তাঁহার হৃদয়, হিন্দুঋষি হইলেন তাঁহার আত্মা, হাওয়ার্ড হইলেন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। * তিনি নবাকৃতি এই নবীন মানুষ হইয়া মানবজাতির সহিত এক হইয়া গেলেন। শত শত তাঁহার হস্ত, শত শত তাঁহার আত্মা, শত শত তাঁহার হৃদয়, শত শত তাঁহার মস্তক, শত শত তাঁহার ইচ্ছা হইল। কেন হইল, না যে সকল ব্যক্তির হস্ত পরসেবায় ব্যাপৃত, যে সকল আত্মা যোগে ব্রহ্ম সহ অভিন্ন হইবার জন্ম মননশীল, যে সকল হৃদয় ব্রহ্মা-নুরাগে প্রদীপ্ত, যে সকল ব্যক্তি ভগবদিচ্ছাপালনের জন্ম নিত্য ক্রিয়াশীল, তাঁহাদের সহিত তিনি যোগে এক হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বন্ধুগণের মধ্যে এই সকলের একএকটি প্রধান বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার আপনার একএকটি অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ; অন্যদিকে তাঁহার বন্ধুগণের তাঁহার সহিত এক হই-বার জন্ম এই নবাকৃতি মানব হওয়া প্রয়োজন। কেবল বন্ধু-গণ কেন, সমুদায় বিধানবিশ্বাসী এই নবাকৃতি মানব হইবেন, ইহাই কেশবচন্দ্রের অনুরোধ।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহাতে কি কেশবচন্দ্র যে অগ্রজন্মা

---

* In blessed eucharist let us eat and assimilate all the saints and prophets of the world. Thus shall we put on the new man, and each of us will say, the Lord Jesus is my will, Socrates my head, Chaitanya my heart, the Hindu Rishi my soul, and the philanthropic Howard my right hand. And thus transformed we shall bear witness unto the New Gospel.—WE APOSTLES OF THE NEW DISPENSATION.

তাহা প্রমাণিত হইল না ? তাঁহাতে যাহা অগ্রে অবতরণ করিয়াছে তাহাই তাঁহার বন্ধুগণে, বিশ্বাসিবর্গে, এমন কি সমুদায় মানব-জাতিতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এক জনে সত্যাদি অবতরণ করিয়া সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, এ ব্যাপার আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কেশবচন্দ্র স্বয়ংও উহা প্রকাশ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন *। তাঁহাতে বর্ত্তমান বিধানের সত্য প্রথম অবতরণ করিয়াছে, তাঁহা হইতে প্রকাশ পাইয়াছে এজন্য তাঁহাকে অগ্রজন্মা বলিতেছি। তিনি প্রবক্তা, তিনি মুখ, ইহা বলিতে কেন কুণ্ঠিত হইব ? যাহা সত্য তাহা বলিতে লজ্জা কি ? সত্য আচ্ছাদন

* শিক্ষক হই নাই বলিয়া কি চিরকাল স্বার্থপরের ন্যায় থাকিব ? জ্ঞানলাভ করিয়া কি কাহাকেও দিব না ? কৃপণের ন্যায় আমার ধন কি আধারে চিরবদ্ধ থাকিবে ? 'গ্রহণমন্ত্র' সাধন করিলাম 'প্রদানমন্ত্র' আমি কখনও লই নাই। 'দান' আমার মূলমন্ত্র নয়। সত্য আসিলেই বাহির হইবে, এই স্বভাবের নিয়ম। আমাদের দেশের লোকের স্বভাব এমনই যে সত্য আসিলেই প্রকাশিত হয়। যাঁহারা আমাদের দেশ হইতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের ঘরের দুইটি দ্বার আছে। এক দ্বার দিয়া আমদানি আর এক দ্বার দিয়া রপ্তানি হয়। আসে এক পথ দিয়া; যায় এক পথে। সত্য আসিয়া জগতে যায়; জগতে দ্বিগুণ হইয়া অন্তরে প্রবেশ করে; চারি গুণ হইয়া আবার বাহিরে যায়, শত গুণ হইয়া আবার আসে। মনে আসিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, খরচ হইলে আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সত্য যখন লাভ হয়, তখন মনে আনন্দ জন্মে; সত্য প্রকাশ হইলে সেই আনন্দ আরও অধিক হয়। সত্যলাভ করিতেই আমার আশা ও আগ্রহ; কিরূপে সত্য দিব একবারও ভাবিলাম না। মুখ খুলিয়া কি বলিব, কখনই চিন্তা করিলাম না। যখনই বলিতে হইল, সত্য আপনা আপনি সতেজে প্রকাশিত হয়। গুরুগিরি অসার, তাহা কখনও অবলম্বন করি নাই, পুরাতন কথা বলি নাই।—জীবনবেদ—শিষ্য প্রকৃতি।

করিয়া রাখার তুল্য তীব্র অপরাধ আর কি হইতে পারে? আমি যাহা বলিলাম, তাহাতে রেখাপাতমাত্র হইল। ইহার পরে যাঁহারা আসিবেন, সমগ্র বিধানের ইতিহাস যাঁহারা দেবালোকে পাঠ করিবেন, তাঁহারা আরও পরিষ্কার করিয়া এই বিষয়টি সকলের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবেন। কেশবের সঙ্গে এক হইবার জন্য যে সাধনের প্রয়োজন, সেই সাধনের পথ পরিষ্কৃত করিবার জন্য সামান্য কিছু আমি বলিলাম। যাহা বলা হইল তন্মধ্যে কোন ভ্রম যদি কেহ দেখিতে পান, তিনি সে ভ্রম শোধন করিলে সুখেরই বিষয় হইবে। সাধন সত্যের উপরে স্থাপিত না হইলে উহা হইতে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, অতএব যাহা বলা হইল তাহা সত্য কি না, সকলেরই তাহা পরীক্ষা করিয়া পরে গ্রহণ করা উচিত। আমার ধ্রুব বিশ্বাস এই, আমাদের মধ্যে সকল বিরোধের মূল কেশবের সঙ্গে বিরোধ, সে বিরোধ কখন তাঁহার সহিত এক না হইলে তিরোহিত হইতে পারে না। অতএব বক্তৃতার অন্তে ভগবানের নিকটে এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি যে, সকলে নবীন মানুষ হইয়া কেশবের সহিত যেন এক হয়েন।
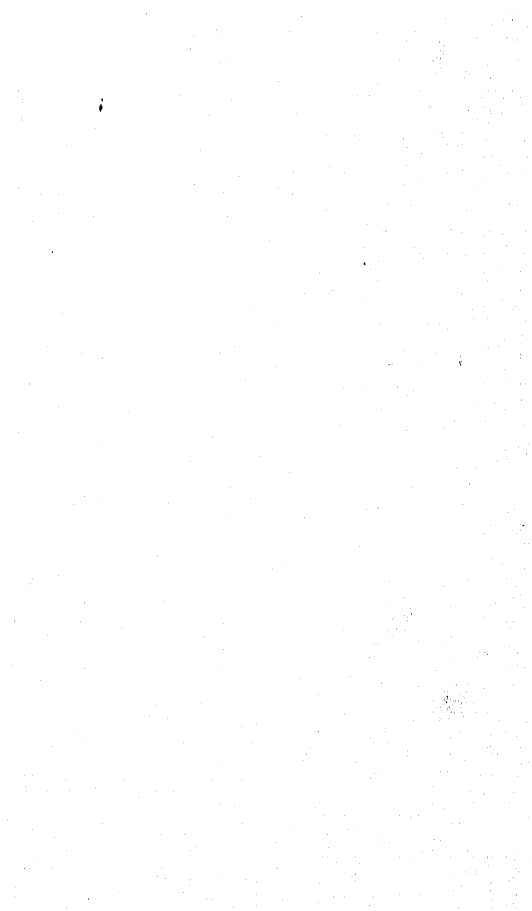
কলিকাতা।

৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট।

মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে

কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দ ১৮২২। ব্রাহ্মসম্বৎ ৭২।

ঈশার নিকট কেশবের ঋণ।

কলিকাতা।

৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, মঙ্গলগঞ্জ মিসন যন্ত্রে

কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ঈশার নিকট কেশবের ঋণ * ।

হে অনন্ত সত্যের প্রস্রবণ, তোমার শরণাপন্ন না হইলে প্রাণের অন্ধকার দূর হয় না। আমাদের সংশয় অন্ধকারতো তুমি জান। তুমি যদি আলোক হইয়া আমাদিগকে পরিচালিত না কর, তবে সে সংশয় দূর হইবে কি প্রকারে? তোমারই কৃপায় অনেক বার অসত্য অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, তাই সাহস আছে যে তুমি এবারও সমুদায় সংশয় দূর করিবে। রসনাকে তোমার ভাবে উদ্দীপ্ত কর, হৃদয়ের বিরুদ্ধ সংস্কার অবরুদ্ধ কর। যাহা সত্য রসনা তাহাই বলুক, মন তাহাই চিন্তা করুক। হে ঈশ্বর, তুমি হৃদয়ে থাকিয়া আলোক দান কর, সত্য প্রকাশ কর, এই তব পাদপদ্মে বিনীত ভিক্ষা।

অদ্য যদিও শরীর অসুস্থ তথাপি পূর্ব্বে যখন বলা হইয়াছে যে "ঈশার নিকটে কেশবের ঋণ" এই বিষয়ে কিছু বলিব, তখন আর তাহা উপেক্ষা করা উচিত নহে। সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে হইতেছে, কেশব যাঁহাকে ধর্ম্মপিতা বলিয়া সম্ভ্রম করিতেন তাঁহার সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হইল কেন? এবং সেই বিচ্ছেদ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়াছিল কি না? কেশব যাঁহাকে এত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, যাঁহার সহিত তাঁহার এত প্রগাঢ় প্রীতিবন্ধন ছিল, যাঁহাকে তিনি ধর্ম্মপিতা বলিয়া চিরদিন হৃদয়ে স্থান দিয়া-ছিলেন, তাঁহার সহিত কেশবের বিচ্ছেদের মূল কারণ কি? সকলেই

---

* সপ্তত্রিংশ মাঘোৎসবোপলক্ষে উপাধ্যায়প্রবর বক্তৃতামূলক।

জানেন আদিসমাজ খ্রীষ্টের অনুকূল নহেন। এমন কি কেশব যখন বিচ্ছেদের পর খ্রীষ্টের বিষয়ে বক্তৃতা দেন তত্ত্ববোধিনী তখন বলিয়াছিলেন, ঈশা মূর্খ ছিলেন; শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতদের কাছে তিনি দাঁড়াইতেই পারেন না; এমন কি আমাদের সমাজের প্রচারক কেশবচন্দ্রও তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ফলতঃ ঈশার প্রতি কেশবের এত শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল যে, যে সমাজে ঈশার এত অনাদর সে সমাজে তিনি থাকিতে পারিলেন না। ঈশার প্রতি এই অনুরাগনিবন্ধন আদিসমাজের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিল। কেশবের যদি খ্রীষ্টের প্রতি এতই আদর তবে তিনি খ্রীষ্টসমাজে না গিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন কেন? কেবল ঈশ্বরের সহিত যোগযুক্ত হইবেন যদি তাঁহার এই ইচ্ছা ছিল, তবেই বা কেন তিনি ব্রাহ্মসমাজে আসিলেন? যদি আসিলেনই তবে কেন তিনি তাঁহার পরম ধর্ম্মবন্ধু ধর্ম্মপিতাকে ত্যাগ করিলেন? অনেকে মনে করেন তিনি প্রচ্ছন্ন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; খ্রীষ্টেতেই তাঁহার চিত্ত নিমগ্ন ছিল। তিনি খ্রীষ্টের জন্য অনেক করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কি তাঁহার অত্যধিক যত্ন প্রকাশ পায় নাই? ধর্ম্মপিতা বলেন, "রাজা রামমোহন রায় যাহা করিয়াছেন আমিও তাহাই করিতেছি;" ইহার অর্থ—রাজার ধর্ম্ম বেদান্তমূলক ধর্ম্ম ছিল। রাজার ধর্ম্ম বেদান্তমূলক তাহা আর কে না জানে, কিন্তু তাঁহার খ্রীষ্টের প্রতি অনুরাগই বা অল্প কিসে? রাজা খ্রীষ্টের মধ্যবর্ত্তির উদ্ধারকর্ত্তৃত্ব ইত্যাদি মত পোষণ করিতেন, খ্রীষ্টের শোণিতে উদ্ধার হওয়া যায় যদিও ইহা বিশ্বাস করিতেন না, তথাপি তিনি যাঁহাদের মধ্যবর্ত্তী হইলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি উপযুক্ত বলি হইলেন, জীবিতসময়ে শিক্ষা দিয়া মৃত্যু দ্বারা অপরের

পাপক্ষমার জন্ত প্রার্থনা করিবার অধিকারী হইলেন, অপরে তদনুসরণে অনুতাপ, প্রার্থনা এবং বাধ্যতার দ্বারা উদ্ধার হইতে পারে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। খ্রীষ্টের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে রাজার দ্বৈধমত ছিল না। তিনি খ্রীষ্টের সম্বন্ধে যে সকল মীমাংসা করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিত Martineau প্রভৃতি তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব রাজা খ্রীষ্টের প্রতি অনুরাগী ছিলেন তাহার প্রমাণ অনেক আছে। ফলতঃ রাজার খ্রীষ্টসম্পর্কীয় মতগুলির আলোচনা করিলে মনে হয় না যে, কেশব সর্ব্বথা তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। কেশব প্রার্থনাতে জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন; ক্রমে ক্রমে অনুতাপ, পাপবোধ ইত্যাদি যখন তীক্ষ্ণ হইল, তখন তাঁহার প্রকৃতিতে নিহিত বিশ্বাস, বিবেক ও বৈরাগ্য জীবনের মূল উপাদান হইল। বিশ্বাস ও বিবেক খ্রীষ্টধর্ম্মের মূল উপাদান। হিন্দুধর্ম্মে যে বিবেক শব্দ আছে, উহা খ্রীষ্টধর্ম্মের বিবেক সহ এক নহে; অথচ আমরা হিন্দুধর্ম্মের বিবেকশব্দ গ্রহণ করিয়া তাহাকে খ্রীষ্টধর্ম্মের বিবেকের সঙ্গে এক করিয়া লইয়াছি। এরূপ করিবার মূলে কেশবচন্দ্র রহিয়াছেন। বিশ্বাস ও বিবেক খ্রীষ্টধর্ম্মের হইলেও বৈরাগ্য খ্রীষ্ট ও হিন্দু উভয়ধর্ম্মসাধারণ। কেশবের জীবনে বৈরাগ্য যদিও হিন্দুধর্ম্মের সহিত যোগ দেখাইয়া দেয়, তথাপি প্রথম জীবনে যে খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় যোগ তাহাতে সন্দেহ নাই। 'Am I an inspired prophet' বক্তৃতায় তিনি জন, খ্রীষ্ট এবং পলের সহিত আপনার জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়াছেন। ধর্ম্মজীবনের প্রথম অভ্যুদয়ে প্রথমবয়সে তিন জনের সহিত তাঁহার

সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই তিন জন সমধিক পরিমাণে তাঁহার জীবনের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। সর্ব্বাগ্রে জনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তিনি বলেন 'অনুতাপ কর', সেই কথা শুনিয়া তিনি অনুতপ্ত হইলেন, তাঁহার জীবনে পাপবোধ প্রবুদ্ধ হইল। জনের কার্য্য শেষ হইলে খ্রীষ্টের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, তিনি বলিলেন 'কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না,' সেই কথার সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্য তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিল। খ্রীষ্টের পর বৈবাহিক জীবনের প্রারম্ভে পল বলিলেন, "যাহার পত্নী আছে সে যেন এইরূপ ভাবে জীবন যাপন করে যে পত্নী নাই।" তাই আবার বলিতেছি, খ্রীষ্টের সঙ্গে যোগে যদি আদিসমাজের সঙ্গে তাঁহার বিচ্ছেদ হইয়া থাকে, তবে তিনি প্রথমে কেন ব্রাহ্মসমাজে আসিলেন। তিনি মণ্ডলীর শীর্ষস্থানে খ্রীষ্টকে স্থাপন করিলেন এই কথা যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের ভুল বিশ্বাস। তিনি মণ্ডলীর শীর্ষস্থানে খ্রীষ্টকে বসান নাই, পবিত্রাত্মাকে বসাইয়াছেন। মণ্ডলীর শীর্ষস্থানে পবিত্রাত্মাকে বসাইয়া তিনি কি খ্রীষ্টের সহিত বিচ্ছিন্ন হইলেন ? কখনই নহে। ঈশা আপনি বলিয়াছেন, আমি সব কথা বলিতে পারিলাম না, পবিত্রাত্মা আসিয়া সব বলিবেন। খ্রীষ্ট তাঁহার স্থলাভিষিক্ত আর কাহাকেও করেন নাই, পবিত্রাত্মাকেই করিয়াছেন। পবিত্রাত্মাই তাঁহার মণ্ডলীর নেতা হইলেন, পথপ্রদর্শক হইলেন, সহায় হইলেন, শীর্ষস্থান হইলেন। সুতরাং কেশবচন্দ্র পবিত্রাত্মাকে আপনার জীবনের নেতা ও মণ্ডলীর শীর্ষস্থান করিয়া খৃষ্টেরই প্রকৃত ভাবের অনুসরণ করিলেন। * বর্ত্তমান

* "... I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now." Who then was to reveal

খ্রীষ্টসমাজ তাহা করে নাই, সুতরাং সে সমাজ তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারিল না। পবিত্রাত্মার অনুসরণের অর্থ ঈশ্বরের মতে ঈশ্বরের আজ্ঞার কাজ করা, সুতরাং তাহাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজে যখন তিনি তাঁহার আপনার জীবনের মূলমন্ত্র নিহিত দেখিলেন, তখন তাহাতে যোগ দিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? কেশব ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ দিলেন বলিয়া তাঁহার খ্রীষ্টের সহিত বিচ্ছেদ হইল না। কেন না খ্রীষ্টের প্রকৃত মণ্ডলীর মূল পবিত্রাত্মা, ব্রাহ্মসমাজের মূলও পবিত্রাত্মা বা পরমাত্মা। সেই পবিত্রাত্মাই আমাদের ও প্রকৃত খ্রীষ্টশিষ্যগণের নেতা, পরিচালক এবং গুরু। কেশবের জীবনের ভিত্তিও যা, ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তিও তাই। ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করিয়া তদনু-

---

to an anxious and sinful world these 'many things?' The Holy Ghost, said Christ. Let us reverently bow, and say, Amen. The Living Spirit, coming down from the Father Himself, and speaking in His name, was to guide the disciples and the world 'into all truths.' To no earthly teacher, to no written record, are we referred for a fuller message of salvation. No apostle, however pure, no disciple, however wise, was named by Christ as his successor. In clear and unmistakable language he named the Holy Spirit as the future minister of his Church......" "......Let no Christian think it unchristian to believe that the Holy Spirit of God is the true and living head of Christ's Church, the source of all inspiration now and for ever, and thus from Him a fuller revelation of saving truth is yet to come than what has been vouchsafed to the world through Christ and recorded by the Evangelists."—'Our Faith and Experiences.'

সারে কাজ করাই কেশবের জীবনের মূল মন্ত্র; ঈশারও জীবনের মূল মন্ত্র 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক'। ব্রাহ্মসমাজের মূলমন্ত্র এ ছাড়া আর কি হইতে পারে? অতএব কেশব যে ব্রাহ্মসমাজে নাম শিখাইবেন, আবার বলি, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? যতই তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে লাগিল, ততই তিনি ঈশার নৈকট্য অনুভব করিতে লাগিলেন; কাজেই আদিসমাজের সঙ্গে তাঁহার বিচ্ছেদ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

আদিসমাজ ত্যাগ করিয়া কিছু দিন পরেই তিনি 'Jesus Christ: Europe and Asia' বক্তৃতা দিলেন। আমি তখন কলিকাতায় ছিলাম না, বিদেশে ছিলাম। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল "তাই তো কেশব বাবু এত দিনে খ্রীষ্টান হইতে চলিলেন।" অনেকে জানিতে উৎসুক হইয়াছিলেন, "কেশব বাবু কবে বাপ্তাইজ হইবেন?" এসময়ে আমি যেখানে ছিলাম, সাধু অঘোরনাথ সেখানে প্রচারার্থ গিয়াছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ব্যাপার কি? জনসাধারণের মতামতও তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি বলিলেন "লোকে কত কি বলে বলুক। আর কেশব বাবু যদি খ্রীষ্টানই হন, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের কি?" কেশবচন্দ্র ঈশাকে একা দেখিতেন না, তাঁহার সঙ্গে সকল মহাজনকে গ্রথিত দেখিতেন। তাই ঈশার বিষয়ে বক্তৃতার পরই 'Great Men' এর সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তিনি তখন ঈশার সঙ্গে আরও অনেক মহাজনকে আনিয়া ফেলিলেন এবং ঈশার সঙ্গে তাঁহাদের যে ঘনিষ্ঠ যোগ তাহাও বুঝাইয়া দিলেন; মহাজনগণের মধ্যে তাঁহার স্থান কোথায় তাহাও তিনি স্পষ্ট বলিলেন। মহাজনগণের কথা বলিতে গিয়া তিনি পবিত্রাত্মার কথা বলিতে ভুলেন নাই। মহাজনগণের সঙ্গে যে আমাদের

গৌণ সম্বন্ধ, আর পবিত্রাত্মার সঙ্গে আমাদের মুখ্য সম্বন্ধ, ইহা তিনি সেখানে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। পর সময়ে তিনি যে পবিত্রাত্মাকে মণ্ডলীর শীর্ষস্থান দিয়াছিলেন তাহার মূল এখানেই দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশাকে তিনি মধ্যবিন্দু বলিয়াছেন বটে, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে শীর্ষস্থান প্রদান করেন নাই।

এখন দেখিতে হইতেছে, কোন্ বিষয়ে ঈশার সহিত তাঁহার যোগ ছিল। 'নববিধানের প্রেরিতদলের প্রতি নিবেদনে' তিনি বলিয়াছেন "মহর্ষি ঈশা যেমন তাঁহার শিষ্যদিগকে নানা দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি তোমাদিগকে তাঁহার ন্যায় প্রেরণ করিতেছি না। তোমাদিগের সঙ্গে আমার সে সম্পর্ক নাই। আমি তোমাদের দলের একজন। তোমরা প্রেরিত মহাপুরুষদিগের প্রেরিত। তোমরা এবং আমি শাক্যপ্রেরিত, ঈশাপ্রেরিত, শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেরিত, এবং পৃথিবীর অন্যান্য মহাজনদিগের প্রেরিত।...তাঁহারা আমাদের পিতা পিতামহ। তাঁহাদের বংশে আমাদের জন্ম। তাঁহাদিগের ভাবে আমরা দ্বিজাত্মা। শাক্য, মুষা, ঈশা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি সাধুদিগের বংশে তোমাদের জন্ম।...আমি তোমাদিগকে প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিবার আগে সেই স্বর্গস্থ মহাপুরুষেরা তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন।" আমাদের নিয়োগপত্রের ভিতরে যখন এই সকল কথা লিখিত আছে, তখন আমরা সাধুমহাজনগণের অবমাননা করিতে পারি না। প্রাচীন ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে নববিধানের বিচ্ছেদ ঈশ্বরকে লইয়া নহে, সাধু মহাজনগণকে লইয়া। ক্রমে ক্রমে সকল সাধুমহাজন আসিয়া যখন কেশবের হৃদয়কে অধিকার করিলেন, তখন নববিধানের

উদয় হইল। কিন্তু একথা মানিতে হইবে, কেশবের জীবন ঈশাতে আরম্ভ হইয়াছে। ঈশার সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগের পূর্ব্বে জন ব্যাপ্টিষ্টের সঙ্গে তাঁহার যোগ হয়, সেই যোগ তাঁহার পাপবোধ তীক্ষ্ণ করিয়া দেয়। এই পাপবোধের সঙ্গে সঙ্গে যখন 'কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না' ঈশার এই উপদেশ সংযুক্ত হইল, তখন তাঁহাতে বৈরাগ্য বিশেষ আকার ধারণ করিল। এ সকল হইল কিরূপে? বাইবেলপাঠে। তিনি যেরূপ ভাবে বাইবেল পাঠ করিতেন অন্য কেহ সেরূপ ভাবে উহা পাঠ করেন না। বাইবেল তাঁহার নিকটে মৃত গ্রন্থ ছিল না, তিনি উহাতে কেবল জীবন্ত বাক্য সকল পাঠ করিতেন না, যাঁহাদের মুখের সেই সকল বাক্য পাঠকালে তিনি তাঁহাদিগের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতেন। যিনি এরূপ ভাবে বাইবেল পাঠ করিতেন তাঁহার জীবনে জন, ঈশা ও পল প্রভাব বিস্তার করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? ঈশার নিকট তাঁহার ঋণ কি 'Asia's message to Europe' নামক বক্তৃতায় তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। সেই বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন "নূতন আত্মা, নূতন দেহ, খ্রীষ্টোপরি নির্ম্মিত হইয়াছে। আমার সকল দেহে, আমার সকল অন্তরে আমি ঈশাকে দর্শন করি। আমার নিকটে তিনি আর মৃত নহেন, আমি পলের সঙ্গে বলি, 'আমার পক্ষে ঈশাও যা জীবনধারণও তা।" এই বক্তৃতার পর আমি এ কথার অর্থ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি আর কিছু না বলিয়া নিজ হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিলেন, এ হাত আমার নহে ঈশার হাত। ফলতঃ তিনি ঈশার সহিত একাত্মা হইয়াছিলেন। যখন তিনি ঈশার সহিত একাত্মা হইলেন তখন তিনি আপনাকে ধন্য মনে করিলেন।

ঈশার কথায় কেশবের কত দূর বিশ্বাস, একটী কথায় সকলে বুঝিবেন। পিটরকে সম্বোধন করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "তোমার হাতে স্বর্গের চাবি; আমরা খ্রীষ্টাননামধারী নয় বলিয়া কি তুমি আমাদের দুয়ার খুলিয়া দিবে না?" তিনি জানিতেন ঈশার সঙ্গে সম্বন্ধ না হইলে বিধানে যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা হইবে না। কেন না ঈশাকে না মানিলে সমুদায় লোককে এক করা কঠিন হইবে। সকল সাধু মহাজন সকল নরনারীকে এক করিতে হইলে ঈশা যে অবতারবাদ মানিতেন তাহাই মানা আবশ্যক, কেশব ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন।* তিনি হিন্দুগণের অবতারবাদের স্থলে ঈশার অবতারবাদ, ঈশ্বর ও মানবে, মানব ও মানবে যোগসাধনের জন্য, গ্রহণ করিলেন। হিন্দুর অবতারবাদে স্বয়ং ঈশ্বর অবতরণ করেন মানুষ আর মানুষ

---

* "......হিন্দুদিগের মধ্যে ভক্তপালন এবং দুষ্টদমন করিবার জন্য ঈশ্বর স্বয়ং মনুষ্যের আকারে অবতার হন; খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপখণ্ডের মতে, ঋষি খ্রীষ্ট মধ্যে ঈশ্বর পুত্ররূপে অবতীর্ণ।... মনুষ্যই কেবল ঈশ্বরের সন্তান; কেন না মনুষ্যের স্বভাবে ঈশ্বরের স্বভাব প্রতিবিম্বিত। পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরতনয় মহর্ষি ঈশা এই তনয়ত্বমত প্রকাশ করেন। প্রত্যেক মনুষ্য ঈশ্বরের তনয় এই স্বর্গীয় সত্য ঈশা আপনার রক্ত ও প্রাণ দিয়া জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।......পুত্রকে পিতা বলিও না, জীবকে ভগবান্ বলিও না, অথবা জীবকে ভগবানের অবতারও বলিও না, কিন্তু জীবাত্মাকে ভগবানের পুত্র বল। পিতা পুত্র নহেন, ভগবান্ ভক্ত নহেন, অথচ পিতা পুত্রে ভগবান্ ভক্তে ঐক্য এবং স্বভাব ও প্রেমের অভেদ আছে, ইহা মানিলেই প্রকৃত অবতারবাদ মানা হইল। এই পিতাপুত্রের ঐক্যবাদ অবতারবাদের যথার্থ অর্থ।" —সে, নি, অবতারবাদ; ১৩ই আষাঢ় ১৮০৩ শক।

থাকে না। ঈশার অবতারবাদে ঈশ্বর ও মানুষে একত্ব হয়, ঈশ্বর ঈশ্বর থাকেন, মানুষ মানুষ থাকে। মানুষ মানুষ থাকিয়া একত্ব হয় কিরূপে? পুত্রত্বে। ঈশ্বর পিতা, মানুষ ঈশ্বরের পুত্র, মানুষ যখন পবিত্রাত্মার প্রভাবে সকল বিরোধী ভাব পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্ত্তী হয়, তখন সে পুত্র হইয়া পিতা ঈশ্বরের সহিত এক হয়। বাইবেলে পবিত্রাত্মা হইতে ঈশার জন্ম কেন লিখিত হইল? পবিত্রাত্মার প্রভাবে আজন্ম ঈশাতে ঈশ্বরের বিরোধী ভাব ছিল না, তিনি জন্ম হইতে ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন ইহাই দেখাইবার জন্য। জলাভিষেকের পর ঈশা পবিত্রাত্মা কর্তৃক অরণ্যানীতে নীত হইলেন, সেখানে পবিত্রাত্মার প্রভাবে পাপাসুরকে পরাভব করিলেন, ইহা আর কে না জানে? সেই পবিত্রাত্মার প্রভাবে তিনি জীবনে বিচিত্র অদ্ভুত কার্য্য সকল সম্পাদন করিলেন, ইহা তিনি আপনার মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। যখন য়িহুদিগণ তাঁহাকে বলিল, তিনি ভূত দিয়া ভূত ছাড়াইতেছেন, তখন তিনি কি বলিলেন? পুত্রের বিরোধে অপরাধ করিলে তাহার ক্ষমা আছে, পবিত্রাত্মার বিরোধে অপরাধ করিলে তাহার ক্ষমা নাই। তিনি পবিত্রাত্মার প্রভাবে যে সকল কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে পবিত্রাত্মার প্রভাব না দেখিয়া ভূতের ক্রিয়া বিশ্বাস করাতে য়িহুদিগণের পবিত্রাত্মার বিরোধে অপরাধ করা হইয়াছে।

ঈশা পবিত্রাত্মা ও পিতাতে কোন ভেদ করিতেন না। আপনার ভিতরে পবিত্রাত্মার কার্য্যকে পিতারই কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন। ব্রাহ্মসমাজও, পবিত্রাত্মা বা পরমাত্মা ও ব্রহ্ম ভিন্ন নহেন, ইহা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা অন্তরে পবিত্রাত্মার প্রভাব প্রত্যক্ষ করিলেন, তাঁহারা আপনাদিগকে

পুত্র বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। 'যে সকল লোক পবিত্রাত্মা কর্তৃক পরিচালিত হয় তাহারা ঈশ্বরের পুত্র' এ কথার অর্থ কি, ব্রাহ্মসমাজ তখন বুঝিতে সমর্থ হইলেন। কেবল বুঝিতে পারিলেন তাহা নহে, পুত্রত্বে ঈশ্বরের সহিত, সকল মানবজাতির সহিত যোগ হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

এখন দেখিতে হইতেছে, কেশব এই পুত্রত্বের প্রকাশ কোথায় দেখিতে পাইলেন? তিনি ঈশাতে উঁহার প্রকাশ দেখিলেন। ঈশার পূর্ব্বে এবং পরে অনেক সাধু মহাজন আসিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ আপনাকে ঈশ্বরপুত্র বলিয়া জনসন্নিধানে উপস্থিত করেন নাই। হিন্দুগণেরতো কথাই নাই, যিহুদিগণের মধ্যেও 'আমি এবং পিতা এক' ঈশা ভিন্ন অপর আর কেহ এ কথা বলেন নাই, যদি বলিতেন যিহুদিগণ কখন তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইত না। 'আমি এবং পিতা এক' এ কথার অর্থ 'আমি ঈশ্বরের পুত্র' যিহুদিগণকে তিনি বুঝাইলেন, অথচ তাহাদের চৈতন্য হইল না। তিনি ক্রুশে জীবন নিহত হইতে দিয়া তাঁহার পুত্রত্ব ও পিতার সহিত একত্ব সপ্রমাণ করিলেন্। ক্রুশে শোণিতদানের অর্থ নিজের ইচ্ছাকে বলি দিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন হওয়া। এই অধীনতাতেই পুত্রত্ব। যখন কেশব ঈশাকে মধ্যবিন্দু (Certral figure) বলিলেন, তখন তিনি পুত্রত্বে সকলের মিলন, ইহাই ঘোষণা করিলেন। তিনি এই বিষয়টি নানাস্থানে নানাভাবে বলিয়াছেন। ইহা স্বীকার করিতে হইবে, ঈশা সকলের সংযোগস্থল। আমি যে পথে যাই না কেন, অন্তে যখন আমার নিজের ইচ্ছা কিছুই থাকিবে না সমুদয় ঈশ্বরের ইচ্ছাতে মিলিত হইবে, তখন আমার ঈশ্বরের সঙ্গে তনয়ত্বে মিলন হইবে। এ যোগ আর হিন্দুযোগ, এক নহে। পাপী তাপী

[illegible] আধ্যাত্মিকতাবিহীন [illegible] সঙ্গে একেবারে যোগ ছিন্ন [illegible]; ঈশার যোগ পিতা ও পুত্রের যোগ। পাপ বাসনা ছাড়িয়া যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছাপালনে প্রবৃত্ত, তাহারাই কেবল এ যোগে অধিকারী। তিনি বলিয়াছিলেন, 'কে আমার মাতা, কে আমার ভ্রাতা, কে আমার ভগিনী? যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছামতে কাজ করে তাহারাই আমার মাতা ভ্রাতা ভগিনী।' কেবল ঈশাকে প্রভু প্রভু বলিলেও হইবে না; ঈশ্বরের ইচ্ছামত কাজ করিতে হইবে। সাধুতে ও অসাধুতে ব্রহ্মদর্শন হইতে পারে, কিন্তু সাধুতে অসাধুতে মিলন হয় কি? অধর্ম্ম অনীতিতে মানুষ মিলিতে পারে না। ঈশা জানিতেন, মানুষ এক হতে পারে না, যদি পুণ্যভূমিতে মিলন না হয়। সমস্ত নরনারীর একাত্মা হওয়া পুণ্যভূমি ছাড়া হইতে পারে না। সমুদয় মনুষ্যের জন্য ঈশা প্রাণ দিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে অন্যরূপ লোক হইতে পারিতেন; দল বল লইয়া পৃথিবীর রাজ্য স্থাপন করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল পুত্র হইয়া পিতার ইচ্ছা পালন করা। পুত্র হইয়া পিতার সঙ্গে যোগ তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই যোগ সকলের প্রাপ্য; কিন্তু [illegible] করিয়া হয়? ঈশা আমার ভিতরে বাস করিতেছেন ইহা যদি না বুঝিতে পারি, তবে কখনও উহা লাভ করিতে পারি না, একত্র সাধন হয় না। ঈশা মধ্যবর্ত্তী ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; কেন না পুত্র বিনা ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায় না। পিতার ইচ্ছাপালনার্থ জীবনবিসর্জ্জনরূপ ঈশার শোণিত যদি আমার ভিতরে প্রবেশ করে, পরিত্রাণ পাইবই পাইব, ইহা নিশ্চয়। ঈশার সে শোণিত বিনা পাপ ধৌত হইবে কি প্রকারে, পুত্রের সঙ্গে এক হইয়া পিতার

সকল এক হইল কি প্রকারে? তাই বলি পুত্রকে মধ্যবর্ত্তী করাতে কোন ক্ষতি হয় না। জ্ঞানী, ভক্ত, সাধক, যোগী সকলেরই যোগ-সিদ্ধি পুত্রকে? পুত্র বিনা আর কিছুতেই ঈশ্বর সহ একত্বের সম্ভাবনা নাই। যিনি জ্ঞানী তিনি অজ্ঞানতা গুলিকে পরিহার করিয়া সত্যধন ধারণ করেন, সেই সত্যের অনুসরণ করিয়া কার্য্য করেন, অবিদ্যাঘটিত বিষয়গুলিকে বলিদান করেন। এ সকল করিয়া কি হইল? ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করা হইল। তাই জ্ঞানীর এইরূপে নিজ ইচ্ছা তিরোহিত হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীনতা উপস্থিত হইল, অমনি তাঁহার পুত্রত্ব সিদ্ধ হইল, সুতরাং ঈশার সঙ্গে এক হইয়া তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইলেন। সিদ্ধ, সাধক, ভক্ত, যোগী, সকলেই এইরূপে একত্ব লাভ করেন। দূর হইতে ব্রহ্মদর্শন, অথবা ব্রহ্মের মহত্ব দর্শন করিয়া আত্মবিস্মৃতি, ইহা কিছু অভিন্ন যোগ নহে। অভিন্ন ব্রহ্মযোগ কেবল পুত্রের সঙ্গে একাত্মা হইলে হয়, পুত্র হইলে হয়। আমাদের দেশে ধর্ম্মোপদেষ্টা যতগুলি অবতার আছেন, তাঁহাদিগকে পুত্র বলিতে পারি, কেন না তাঁহারা আপন ইচ্ছা হারাইয়া তবে ঈশ্বর সহ অভিন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সকলের একত্ব পুত্রত্বের ভূমিতে, সুতরাং ঈশা মধ্যবিন্দু (Central figure) হইলেন, এবং কেশব তাহাই বলিয়াছেন। বাস্তবিক এই পুত্রত্বে সকলেরই একত্ব। নানক, চৈতন্য প্রভৃতি সকলেই ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন ছিলেন, সুতরাং ঈশ্বরের সহিত পরস্পরের সহিত তাঁহাদিগের পুত্রত্বে একত্ব ছিল, ইহা কে আর অস্বীকার করিবে? বস্তুতঃ ঈশাতেই সকলের মিলন। ঈশাকে ছাড়িলে—পুত্রকে ছাড়িলে মহাত্মাদের সহিত যোগ হয় না। ঈশাই সকল মহাজনদিগের

প্রধান মিলনের ভূমি। কেশব মহাজনগণের মধ্যে ঈশাকে প্রধান স্থান এই জন্যই দিয়াছেন।

যখন ঈশার সঙ্গে কেশবের যোগ হইল, তখন ক্রমে ক্রমে অন্যান্য মহাজনগণও আসিলেন। চৈতন্য আসিলেন কোন্ সময়ে? বিশ্বাস এবং বিবেক লইয়া কেশবচন্দ্র প্রথমে জীবন আরম্ভ করিলেন। ক্রমে যখন ভক্তির উদয় হইল, তখন খোল আনিলেন, কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, চৈতন্যের সমাগম হইল; ভক্তির স্রোতে দেশ ভাসিয়া গেল। তিনি বিশ্বাস এবং বিবেক লইয়া জীবনারম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু যাই দেখিলেন ক্রমে ক্রমে হৃদয় কঠোর হইয়া যাইতেছে, অমনি ভক্তির দিকে তাঁহার মনের টান পড়িল। যখন ভক্তি আসিল তখন আর তিনি কঠিনহৃদয়ে থাকিতে পারিলেন না, ক্রমে ক্রমে সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয় কোমল হইতে লাগিল। এই জন্য কেশব বলিয়াছিলেন, "আমার জীবন খুব আশাপ্রদ, কারণ শুষ্কতায় আরম্ভ হইয়া ক্রমে উহা সরস হইয়া গেল।" এই ভক্তি আবার যোগ না হইলে স্থায়ী হইতে পারে না; সুতরাং যোগে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল। যখন যোগে তিনি সিদ্ধকাম হইলেন, তখন তাঁহার এই দুঃখ হইল যে, ভক্তি যেমন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, যোগ তেমন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল না। যোগ ও ভক্তি তাঁহাতে কোথা হইতে আসিল, তৎসম্বন্ধে তিনি আপনি বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের প্রতি যে বিশ্বাস ছিল তাহারই অঙ্কুর হইতে যোগ হইল; যে অল্প প্রেমের ভাব জীবনে ছিল, তাহাই প্রগল্‌ভা ভক্তির আকার ধারণ করিল।" ভক্তি ও যোগ যখন তাঁহাতে উপস্থিত হইল তখন তাঁহার কি অবস্থা হইল তৎসম্বন্ধে আপনি তিনি বলিয়াছেন,

"আমি ছিলাম খুব কর্ম্মী, ক্রমে যোগের পাহাড়ে উঠে বাগানে বেড়াইতেছি। এখন আর বুঝিতে পারি না, আমার জীবনে যোগ অধিক কি কর্ম্ম অধিক, বিবেকের প্রভাব অধিক না মৃদঙ্গ বাজাইয়া ভক্তিতে আনন্দ অধিক।" এই যোগ ও ভক্তি কলুটোলায় গৃহে অবস্থান কালে তাঁহাতে উপস্থিত হয়। যখন তিনি যোগ ও ভক্তির উপদেশ দিতে আদেশ পান, তখন তাঁহার প্রাণ কম্পিত হয়, কিন্তু ঈশ্বর এ বিষয়ে তাঁহার সহায় হইবেন, এই আশাবচন শুনিয়া তিনি যোগভক্তির উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হন। তখন কলুটোলায় গৃহে কুটীরে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন করিতেন। রন্ধনের সময় ভাগবতের ১১শ স্কন্ধ স্বয়ং পাঠ করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে যোগভক্তিবিষয়ক উপদেশ দিতেন। সেই সময়ে যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারি নাই। এক দিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঈশা চৈতন্য প্রভৃতি সকলকেইত আনিলেন, কৃষ্ণকে আনিলেন না কেন ?" তিনি বলিলেন "কৃষ্ণকে সকলে চেনে না ; তাঁহাকে যেরূপ চরিত্রের লোক লোকে মনে করে, তিনি সেরূপ নহেন। এসময়ে কৃষ্ণকে আনিলে ব্রাহ্মসমাজ ডুবিবে।" * আমি আগে কো। মহাজনকে চিনিতাম না। আমার মহাজন চেনা

* "... চৈতন্য বৈষ্ণবধর্ম্মের স্রষ্টা নহেন, চৈতন্য প্রেমধর্ম্মের আদি প্রচারক নহেন, তিনি প্রেমধর্ম্মের একজন প্রধান সংস্কারক। তিনি প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া প্রেমধর্ম্ম পূর্ণ করিলেন। যখন ভারতবর্ষে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের নামে অত্যন্ত ঘৃণিত ও কদর্য্য ভাব ও ব্যবহারসকল বৈষ্ণবসমাজে প্রকাশিত হইল, সেই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। চৈতন্যদেব প্রেমধর্ম্মের ভিতরে বৈরাগ্য স্থাপন করিলেন। নরের প্রতি নারীর প্রেম এবং নারীর
•

কেশবের দ্বারাই হইয়াছিল। আমি প্রথমে ঈশার বিদ্বেষী ছিলাম; তাঁহাকে কুৎসিত চরিত্রের লোক বলিয়াই জানিতাম। True Faith পাঠ করিয়া আমার পরিবর্ত্তন হইল। True Faith পড়িয়াই ঈশাকে বুঝিলাম, বাইবেল বুঝিতে পারিলাম। সুতরাং আমার ঈশাকে চেনা কেশবের মধ্য দিয়া। ঈশা বুদ্ধের কথা, গৌরাঙ্গ ইত্যাদি যাঁহারা বঙ্গের লোক তাঁহাদের প্রতিও আমার তত ভক্তি ছিল না। যদিও আমি ইতঃপূর্ব্বে ভাগবত পড়িয়াছিলাম, বাল্যকালে গীতা অধ্যয়নে যদিও আমার বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তথাপি কৃষ্ণরাধার প্রতি আমার ঘৃণা ছিল, কৃষ্ণের বিশুদ্ধ চরিত্রতার উপরে আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই। কেশবচন্দ্র কৃষ্ণের কথা বলায় পরে, তবে ভাগবত দ্বিতীয় বার পড়িয়া আমি তাঁহার চরিত্রের শুদ্ধতা বুঝিয়াছি। সুতরাং এখানেও কেশবের সহায়তা কার্য্য করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-

---

প্রতি নরের প্রেমকে তিনি বিশুদ্ধ করিলেন। *—সে, দি, এক আধারে নরনারীপ্রকৃতি, ১৮ই আশ্বিন, ১৮০২ শক।

* Chaitanya upreared his system of reformed Vaishnavism upon the already existing basis laid by Krishna many centuries back. Yet there is some difference between the two systems which is noteworthy. Krishna figured as a lover in the sphere of religion and was often in the midst of female devotees who were fond of him. Chaitanya on the contrary, kept himself and his disciples clear of female company and influence. Krishna preached the religion of the world, of the politician and warrior; while Chaitanya inculcated and practised asceticism and went about as a missionary Vairagi.—The Indian Mirror, January 28, 1877.

যেন তিনি বলিয়াছেন, "খ্রীষ্টান হিন্দুতে পরস্পর আসক্ত হই-তেছে, বুদ্ধে খৃষ্টে মিলন হইতেছে।" তিনি যে বলিয়াছেন, "প্রথমে ইচ্ছা হয়ে নাই, নববিধানের সমস্ত একত্র গাঁথিব, পরে দেখি প্রকৃতির মধ্যে কে তাহাই করিতেছেন। কে জানিত ঈশাকে মানা উচিত? যখন দেখিলাম শ্রীগৌরাঙ্গকে আদর না করিলে আমার চলিতেছে না, তখনই নবদ্বীপে গেলাম; নবদ্বীপ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গকে আনিয়া হৃদয়ে বসাইলাম। বুদ্ধের আবশ্যক হইল, অমনই বৃক্ষতল হইতে বুদ্ধকে প্রাণের মধ্যে আনিলাম। কে জানিত তিন জনকে একত্র আনিতে হইবে? কে জানিত, ভগবান্ এইরূপে এক এক করিয়া আনিয়া ভক্তমণ্ডলী রচনা করিবেন?" এস্থলেও ঈশার সহিত তাঁহার বিরোধ নাই, তাঁহারই ভাবে পরিচালিত হইয়া তিনি পূর্ণতার দিকে গমন করিয়াছেন, কেন না তিনি আপনি বলিয়াছেন, "স্বদেশে মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য ঈশ্বর যে নববিধান দিয়াছেন, ইহার অর্থ কেবল পূর্ণতা। এই পূর্ণতা মনের মধ্যে ছিল। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, ঈশ্বরের মত পূর্ণ হও। বহুদিন হইতে স্বর্ণাক্ষরে এই উপদেশ মনে লেখা ছিল। মনে হইত, খণ্ড খণ্ড ভাব লইয়া থাকিব না।"

সকলে বলিবেন, কেশব যদি সকলের মধ্যে একজনাকেও গুরু ঈশাকে বলিয়া থাকেন, তবে ঈশাকেই তিনি সর্বেসর্বা করিতেন; অন্যান্য সাধুগণকে তিনি নিম্ন স্থান দিতেন। তিনি এ সম্বন্ধে বাস্তবিক কি মত করিতেন, প্রেরিতবর্গের জন্য তিনি যে চারিটি ব্রতের ব্যবস্থা করেন, তন্মধ্যে 'বৈরাগ্যব্রত' তাহা প্রবর্তন করিয়া ;—"......বুদ্ধ মহর্ষি ভাব গ্রহণ কর। এই বার ঈশা, মূসা, শাক্য, গৌরাঙ্গের সমান থাকিবে, এই বেশ দেখা যায়।

[illegible] পরিতোষণ কর ; তাঁহার ধ্যানেতে পরিত্রাণ [illegible] অভিলাষ কর। মোটকথা, কোন সত্য ছাড়িও না। এই উদ্দেশ্যে এক এক বিষয়ের বিশেষ ভাব গ্রহণ করিয়া আলোচনা করিবার জন্য বলা যাইতেছে। সকল দেবদেবীর ভাব প্রকাশিত হইবে বিশেষ বিশেষ যুবকের দ্বারা। এক এক যুবকের হাতে এক একটি যন্ত্র অর্পণ কর ; এক এক ধর্মরাজ্য এক এক দেবকুমারের হস্তে ন্যস্ত কর। এক এক ভিন্ন অঙ্গের প্রতিনিধি এক এক জন বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হইল। এক এক জন এক এক ধর্ম্মের সমস্ত ভাব গ্রহণ ও বিতরণের ভার-প্রাপ্ত হউন। দেখাইতে হইবে আমাদের বাড়ীতে সমস্ত দেবদেবীর আলয়, সমস্ত মিলিয়া একটি দেহ। এক এক প্রেরিত দ্বারা এক একটি অঙ্গের পূর্ণতা হইল, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মিলনে নববিধানে পূর্ণ ধর্ম্ম প্রকাশিত।" এই ব্রতটি যখন প্রথম প্রচারিত হয়, তখনই স্বর্গগত কালীশঙ্কর দাস "গৌতম ও গৌরাঙ্গ" নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে থাকেন। তাঁহার এরূপ করিবার অভিপ্রায় এই যে, তিনি আপনার জীবনের মূলে গৌতম ও গৌরাঙ্গকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের সহিত একতা সাধন করিয়া অন্য সাধু মহাজন-গণের সঙ্গে ঈশ্বরেতে এক হইবেন। ফলতঃ কেশব যেমন ঈশাকে আপনার জীবনের মূলে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি আমাদের ভিতরে সকলেই নিজ নিজ জীবনের মূলে যাঁহার যে মহাজনের সহিত ভাবের একতা আছে, তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া পুত্ররূপে ঈশ্বর ও অন্যান্য সাধুজন সহ একত্ব লাভ করিবেন, উদারতা ব্রতের ইহাই উদ্দেশ্য। আমাদের ধর্ম্ম অনন্ত উন্নতির ধর্ম্ম ; কোথাও আবদ্ধ হইয়া থাকা আমাদের পক্ষে মৃত্যু। কেশব একমাত্র এক ঈশাতে

বদ্ধ থাকিতে পারিলেন না, ঈশার পুত্রত্বে সকল সাধু মহাজন-গণকে বাঁধিলেন। এরূপে বাঁধিয়া তিনি কি সেই সেই সাধু মহাজন-গণের বিশেষ বিশেষ ভাবগুলিকে বিলোপ করিয়া ফেলিলেন? না। সে সকল ভাব পুত্রোচিত বলিয়া পুত্রত্বমধ্যে সেগুলির সন্নিবেশ করিয়া লইলেন। উদারতার ব্রত প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন :—সকলেই নিজ নিজ ভাবানুসারে—চিত্তের গতি অনুসারে জীবন আরম্ভ করিবেন, কিন্তু তাহাতে আবদ্ধ থাকিতে পারিবেন না; সেই সকল ভাবমধ্যে পুত্রত্ব আছে দেখিয়া পুত্রত্বে ঈশ্বরের সহিত এক হইবেন। পুত্রত্বে এক হইলেই ঈশার সহিতও এক হওয়া হইল। কেশব আপনার জীবনে ঈশাতে অর্থাৎ পুত্রত্বে সকল সাধু মহাজনগণকে এবং তাঁহাদের অনুগামি-গণকে এক করিয়াছিলেন, সুতরাং এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ন্যায় এক অদ্বিতীয় মানব তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক এক জন সাধুর ভাবে ভাবান্বিত তাঁহার বন্ধুগণ যখন অপর সকল সাধুকে আত্মস্থ করিবেন, তখন কেশবের সহিত এক হইবেন, এই ভাবে কেশব আপনাকে মধ্যবিন্দু বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই, * কেন না এ ভাব তাঁহারই বিশেষ ভাব। 'আমাদের বাড়ীতে সমস্ত দেব-দেবীরই আদর, সমস্ত মিলিয়া একটি দেহ। এক এক প্রেরিত দ্বারা এক একটি অঙ্গের পূর্ণতা হইল, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মিলনে নববিধানে পূর্ণ ধর্ম্ম প্রকাশিত।'—এ কথায় কেশব নিরহ-ঙ্কার ও ব্যক্তিত্বের অভিমানের বিলোপই স্থাপন করিয়াছেন, কেন

---

* 'তোমরা আমাতে, আমি তোমাদিগেতে' 'সকলে আমাতে আমি সকলেতে' এই খ্রীষ্ট ও হিন্দুযোগের মিলন এখানে পাঠকবর্গ প্রত্যক্ষ করিবেন।

[illegible] অভিযান থাকিতে পারে [illegible] হইবে [illegible] হয়। কেশব আপনাকে [illegible] সাধু [illegible] প্রতিনিধি করিলা কি তাঁহা-[illegible] করিলেন না, তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন না? এই যোগের অর্থেক ভাব, ইহাতে তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইল না, পৃথিবীতে তাঁহাদিগের সাম্রাজ্য স্থাপন করা হইল। হউক, এখানে তো কেশবের বিশেষ ভাবই প্রতিষ্ঠিত হইল; ঈশাতে সকলের মিলন সিদ্ধ হইল কোথায়? কেশবচন্দ্র তবে ঈশাকে দূর করিয়া দিয়া সেখানে আপনাকে বসাইলেন? না, তিনি ঈশাকে বিদায় করিয়া দেন নাই, এক পিতা এক ভ্রাতৃ তিনি এইরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। হাঁ, খ্রীষ্ট এরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন বটে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের বিলোপ হইল, হিন্দুযোগের বিলোপ হইল। না; তাহাও হয় নাই। সাধুতে যেমন অসাধুতে তেমনি ব্রহ্মদর্শন হিন্দুযোগ, খ্রীষ্টধর্ম্মে কেবল সাধুতে ব্রহ্মদর্শন। কেশব হিন্দু ও খ্রীষ্ট যোগের বিরোধ এক পুত্রত্বেই বিলোপ করিয়াছেন। কেশব বলিলেন, সাধু অসাধু সকলেতে ব্রহ্ম আছেন, ইহা যেমন সত্য, তেমনি সাধু অসাধুতে পুত্র আছেন, ইহাও সত্য। সাধুতে পুত্র প্রকাশিত, অসাধুতে পুত্র প্রচ্ছন্ন। সাধু অসাধু উভয়েই ঈশ্বরের তনয়, সুতরাং আমরা বলিতে পারি, প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশিত পুত্রত্বে তিনি হিন্দু ও খ্রীষ্ট উভয় যোগকে এক করিলেন। এখন সকলে দেখুন কেশব কেমন খ্রীষ্টের ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন। খ্রীষ্টের নিকটে এখন কেবল কেশবের নহে, সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের ঋণ। আমরা যদি এ ঋণ স্বীকার না করি তবে কেশবের প্রতি অত্যাচার করা হয়, ধর্ম্মের প্রতিও অত্যাচরণ করা হয়। আমরাও

[illegible]নার কাছে ঋণী। আমি নিজের কথা বলি, আমি হয়ত ঈশাকে না পাইলে কঠোরহৃদয় হইয়া থাকিতাম। শুধু ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলিতাম যদি কেশব আমার সহায় না হইতেন। 'আমি পিতাতে পিতা আমাতে, তোমরা আমাতে আমি তোমাদিগেতে' খ্রীষ্টের এই যোগমন্ত্রের সঙ্গে যখন 'আমরা সকলে ঈশ্বরেতে, ঈশ্বর আমাদিগের সকলেতে' 'সকলে আমাতে, আমি সকলেতে' এই মন্ত্র সংযুক্ত হইল, তখন খ্রীষ্ট ও হিন্দু যোগের একত্বে নববিধানের নবযোগ পূর্ণাকার ধারণ করিল। • এই যোগমন্ত্রে যে আমি শব্দ আছে উহা পুত্রের অর্থে, সুতরাং জীবের পুত্রত্বে হিন্দু ও খ্রীষ্ট যোগের একত্ব সাধিত হইল। তিনি এজন্য বারংবার বলিয়াছেন পুত্রত্বের ভূমিতে না মিলিলে আমরা মিলিতে পারিব না। তাঁহার সে অনুরোধ আমাদের রক্ষা করা উচিত। যদি আমরা ঈশ্বরের কৃপায় এবার মিলিত হইয়াছি, তবে সকলের ভিন্ন ভিন্ন ভাব পুত্রত্বে এক করিয়া এক এক জীবনে যেন সকলের ভাব দেখাইতে পারি। যদি এ কার্য্যে আমরা উদাসীন থাকি, আলস্য প্রকাশ করি, আমাদের ঘোর কলঙ্ক হইবে, আমাদের [illegible]। অতএব যখন সকলে মিলিয়াছি, তখন যাহার [illegible] ভাব আছে সেই ভাবের পরিণতি পুত্রত্বে সমস্ত সাধুগণের সহিত মিলিত হইয়া, ঈশ্বরে স্থিতি করিয়া আমরা যেন জীবন সার্থক করি, জীবনের পূর্ণতা সাধন করি।

• প্রতিদিনের উপাসনামধ্যে এ সম্বন্ধের সাধন আছে, আমরা ইহা অন্যত্র দেখাইয়াছি। আরাধনা, ধ্যান ও সাধারণ প্রার্থনামধ্যে প্রধানতঃ হিন্দুযোগ ; স্তোত্র, প্রবচনপাঠ ও বিশেষ প্রার্থনামধ্যে খ্রীষ্টযোগ সহ হিন্দুযোগের মিলন সাধিত হয়।

নবযুগের নবসংন্যাস।

নবযুগের নবসংন্যাস।

'নবযুগের নবসংন্যাস' অদ্যকার বলিবার বিষয়। প্রথমেই জিজ্ঞাসা উপস্থিত, বক্তৃতার বিষয়ের মধ্যে 'নবযুগ' এ শব্দ কেন উল্লিখিত হইল? 'নবযুগ' এ কি শাস্ত্রসিদ্ধ কথা? কখনও কি নবযুগ হয়, না এটি কাল্পনিক? শাস্ত্রে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারিযুগের উল্লেখ আছে, কোথাও তো নবযুগের উল্লেখ নাই। যুগের উল্লেখ হইল কেন, তাহার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া দেখি সত্ব, রজ, তম এই তিন গুণানুসারে যুগনির্ণয় হইয়াছে। সত্ত্ব গুণ হইতে সত্যযুগ, রজোগুণ হইতে ত্রেতাযুগ, রজোবিমিশ্র তমোগুণ হইতে দ্বাপরযুগ, * তমোগুণ হইতে কলিযুগ, সেই সেই গুণের লক্ষণানুসারে নাম পাইয়াছে। উপনিষদে সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের উল্লেখ নাই। শ্বেতাশ্বতরে সত্ত্বাদি নাম নাই, 'ত্রিগুণ' এই শব্দ আছে। যখন সাংখ্যদর্শনকর্ত্তা কপিলের নাম এই উপনিষদে দেখা যায়, তখন এ 'ত্রিগুণ' শব্দে সত্ত্ব রজ ও তম বুঝায়, ইহা বলা অযুক্ত নয়। মনুসংহিতায় এই তিন গুণের উল্লেখ ও উহার ক্রিয়া পরিষ্কাররূপে উল্লিখিত আছে। যেখানেই যেরূপ উল্লেখ থাকুক, কপিল ঋষি যে এই গুণত্রয়ের দার্শনিক আকার দিয়াছেন তাহাতে সংশয় নাই। তাঁহার মতে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি। যত ক্ষণ এই তিন

---

* বক্তৃতার সময়ে বিমিশ্র গুণ না ধরাতে একটি যুগের উল্লেখে ভুল হইয়া গুণানুসারে তিন যুগমাত্র উল্লিখিত হইয়াছিল।

গুণের সাম্যাবস্থা থাকে তত ক্ষণ সৃষ্টি হয় না। ইহাদের সাম্যাবস্থা ঘুচিয়া গিয়া বৈষম্য উপস্থিত হইলে সৃষ্টি হয়। গুণের বৈষম্য কি? পরিমাণের অল্লাধিক্য। কোনটির পরিমাণ অধিক কোনটির পরিমাণ অল্প হইলে তাহাদের যোগে সৃষ্টি ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমান কালের লোকেরা বলিবেন, এ সকল নিতান্ত অযুক্ত কল্পনা। তিন গুণ আবার কি? বৈদ্যশাস্ত্রে যেমন বায়ু পিত্ত কফ কল্পনা-প্রসূত, ইহাও তেমনি। অযুক্ত কল্পনা বলিয়া কি হইবে, সকল গুলি মূল ধাতুই এদেশের শাস্ত্র ও বিজ্ঞানে এই তিন গুণানুসারে ভিন্ন ভিন্ন নাম পাইয়াছে। এত বড় একটা অযুক্ত কল্পনা ক্রমান্বয়ে চলিয়া আসিল কেন, অবশ্য ইহার মধ্যে সত্য আছে, একটু গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিলে বুঝিতে পারা যায়। ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই, ইহার ভিতরে প্রগাঢ় বিজ্ঞান নিহিত আছে। সত্ত্ব—প্রকাশ, রজঃ—প্রকাশোন্মুখতা, তম—অপ্রকাশ। যখন সৃষ্টি হয় নাই, তখন সকলই অন্ধকারে আবৃত ছিল। মনু সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা এইরূপই বর্ণন করিয়াছেন। অন্ধকারে আবৃত ছিল ইহার অর্থ কি? সমুদায় প্রচ্ছন্ন ছিল তখন কিছুই প্রকাশ পায় নাই। এই প্রচ্ছন্ন থাকা প্রকাশ না পাওয়া, ইহারই নাম তম। তম আর অন্ধকার এই দুইই পর্য্যায় শব্দ। যাহা অপ্রকাশ ছিল, তাহা প্রকাশ পাইবার উন্মুখ হইল। এই যে প্রকাশের উন্মুখতা ইহাই রজ। রজোগুণের সঙ্গে উদ্যম সংযুক্ত। যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা প্রকাশ পাইবার জন্য যখন উদ্যম প্রকাশ করিল, তখন রজোগুণের ক্রিয়া উপস্থিত। এই উদ্যমে যখন প্রচ্ছন্ন প্রকাশ পাইল, তখন সেই প্রকাশ সত্ত্বগুণ নামে অভিহিত হইল। যাহা প্রকাশ পাইয়াছে,

তাহার মধ্যে এখনও কত কি প্রচ্ছন্ন রহিয়া গিয়াছে, এবং সেই প্রচ্ছন্ন বিষয়গুলি প্রকাশ পাইবার জন্য ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করিতেছে। জগতের মধ্যে যখন এইরূপ ক্রিয়া ক্রমান্বয়ে চলিতেছে, এবং জাগতিক শক্তির প্রক্রিয়াই যখন এইরূপ, তখন সত্ত্ব, রজ ও তম স্বতন্ত্র কল্পনা ইহা বলিব কি প্রকারে? এই তিন গুণ কখন স্বতন্ত্র থাকে না। সর্ব্বত্র এই তিনের সংমিশ্রণ। কেন না সর্ব্বত্রই কিছু প্রকাশ, কিছু অপ্রকাশ, কিছু প্রকাশোন্মুখ হইয়া আছে। ব্রাহ্মণেরা কেবলই সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, ক্ষত্রিয়েরা কেবলই রজোগুণ বিশিষ্ট, শূদ্রেরা কেবলই তমোগুণবিশিষ্ট একথা কিছুতেই বলিতে পারি না। যাঁহারা যথার্থ ব্রাহ্মণ তাঁহারা সত্ত্বগুণপ্রধান হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তাঁহাদের ধ্যানধারণাদিতে উদ্যম, ক্রমিক ধ্যানধারণায় জ্ঞানের প্রকাশ এবং তখনও জ্ঞানের কতক অংশের প্রচ্ছন্ন ভাবে স্থিতি, সত্ত্বের সহিত রজ ও তমের সংস্রব দেখাইয়া দেয়। ক্ষত্রিয়গণেতে কেবলই বলবীর্য্যপ্রকাশ, তাঁহাদিগেতে ব্রহ্মচিন্তনাদি বা ক্রমিক জ্ঞানলাভ নাই, একথা কে বলিবে? শূদ্রের যদি কেবলই তমোগুণ হইবে, তাহা হইলে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া সেবা করা এবং দিন দিন জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া কি কখন তাহার পক্ষে সম্ভব হইত? শাস্ত্রে এইজন্যই কোথাও কোন গুণ অবিমিশ্র নাই, এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ গুণসকল অবিমিশ্র ভাবে প্রকাশ পায় না, ইহা স্পষ্ট বাক্যে অনুগীতায় উল্লেখ করিয়াছেন। এই গুণত্রয়ের বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া প্রতিদিন মানবজীবনে এইরূপে প্রকাশ পায়:—আমি যখন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, তখন মাংসপিণ্ড ছিলাম, তখন আমাতে সমুদায় মনোবৃত্তিগুলি প্রচ্ছন্ন ছিল। ক্রমে সেই মনোবৃত্তিগুলি প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই প্রকাশ পাওয়া

নিরতিশয় প্রযত্নসাধ্য। যখন অত্যন্ত শিশু ছিলাম, তখন আমার ইচ্ছাশক্তি কেমন প্রবল ছিল। আমার ইচ্ছার নিকটে বৃদ্ধদেরও হার মানিতে হইত। ইচ্ছাশক্তি তখন বা কেন প্রবল ছিল, এখন বা কেন দুর্ব্বল হইয়াছে? প্রবল ছিল এই জন্ত যে আমার হস্তপদাদি আমার বশে ছিল না; তাহাদিগকে বশে আনিতে গিয়া আমার প্রভূত ভিতরের বল প্রকাশ করিতে হইয়াছে। এই ভিতরের বল প্রকাশই ইচ্ছাশক্তি। বৃদ্ধদের মতে চলিবার আমার তখন সময় হয় নাই। সর্ব্বাগ্রে আমার হাত পা গুলিকে আমার বশে আনিতে হইবে। সেই গুলির প্রতি আমার ভিতরের বল প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, সুতরাং হাত পা ছোড়া প্রভৃতি কেহ নিবৃত্ত করিতে আসিলে সে দিকে আমার কর্ণপাত করিলে চলিবে কেন? শারীরতত্ত্ববিদেরা বলিবেন বাহিরের আলোক বায়ু প্রভৃতি হইতে প্রতিঘাত ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ে পঁহুছিয়া স্নায়ুসকলকে উত্তেজিত করিল। স্নায়ুর ভিতরকার পথ এখনও ভাল করিয়া খুলিয়া যায় নাই, সুতরাং সেই প্রতিঘাতোৎপন্ন বল তাহার মধ্য দিয়া যাইতে কালগৌণ হইয়া পড়িতেছে। কালগৌণ হইতেছে বলিয়া মাংসপেশীসকলের ক্রিয়া তখন তখনই প্রকাশ পাইতেছে না। কেবল তখন তখনই প্রকাশ পাইতেছে না তাহা নহে, স্নায়ুর মধ্য দিয়া পথ খুলিতে গিয়া প্রতিঘাত দ্বারা যে সকল স্নায়বীয় পদার্থকে সরাইয়া দিতে হইতেছে, তাহাদিগেতে প্রতিঘাতের কতক বল ক্ষয় (absorb) পাইতেছে, যে অবশিষ্ট বল পেশীতে গিয়া পঁহুছাইল তাহা দুর্ব্বল বলিয়া হস্তপদাদি উত্তোলনে অতি অল্পই সাহায্য করিল। এ অবস্থায় প্রতিবারে আমার ভিতরকার বল অধিক পরিমাণে প্রয়োগ না করিয়া আর

কি উপায়ান্তর আছে ? কালে যখন স্নায়ুসকলের পথ খুলিয়া গেল, বাহির হইতে আগত বলসমূহ স্বচ্ছন্দে গতায়াত করিতে লাগিল, তখন আর হস্তপদাদি তুলিতে আমার প্রযত্নের প্রয়োজন হইল না। ইচ্ছাশক্তির এখন সে দিকে নয় অন্য দিকে প্রচ্ছন্নশক্তির প্রকাশের জন্য নিয়োগ করিবার অবসর হইল। যাউক, শরীর-তত্ত্বাদি কঠিন বিষয় লইয়া আর সময়ক্ষেপে প্রয়োজন নাই। যাহা বলা হইল ইহাতেই সত্ব, রজ ও তমোগুণ যে একটা অযুক্ত কল্পনা নয় তাহা প্রমাণিত হইল ; কেন না প্রচ্ছন্ন শক্তিগুলি তমোগুণের, ইচ্ছাশক্তি রজোগুণের, সহজে শক্তিপ্রকাশ সত্বগুণের ক্রিয়া দেখায়। আমাদের নিজের শরীর, মনোবৃত্তি এবং সমুদায় জগতে এই তিন গুণের ক্রিয়া যখন প্রকাশ, প্রকাশোন্মুখতার এবং অপ্রকাশের আকারে নিয়ত প্রকাশ পাইতেছে, তখন নাম লইয়া বিবাদ করিয়া কি ফল ? আমরা নয় বলিলাম প্রকাশ, প্রকাশোন্মুখতা, অপ্রকাশ, তাঁহারা বলিলেন সত্ব রজ ও তম, বস্তুতঃ তো একই হইল।

'নবযুগ' শব্দের প্রয়োগ সিদ্ধ করিতে গিয়া আমার এতগুলি কথা বলিতে হইল, অথচ এখনও মূল বিষয়ে পঁহুছায় নাই। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলি এই চারিযুগ সত্ব রজ ও তমোগুণের ক্রিয়া এই মাত্র আমি উল্লেখ করিয়াছি। এ যে আমার নিজের মনঃকল্পনা নয় শাস্ত্রসিদ্ধ ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধ তাহার প্রমাণ *।

---

* প্রভবন্তি যদা সত্বে মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ।
তদা কৃতযুগং বিদ্যাৎ জ্ঞানে তপসি যদ্রুচিঃ ॥
যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু ভক্তির্যশসি দেহিনাম্।
তদা ত্রেতা রজোবৃত্তিরিতি জানীহি বুদ্ধিমন্ ॥

সত্য ত্রেতাদি যুগ সত্ত্বাদিগুণের লক্ষণ দ্বারা নির্ণীত হয়। কাল এক অখণ্ড, তাহাতে কোন ভিন্নতা নাই। যে সময়ে যে গুণ নরনারীতে প্রকাশ পায়, সেই গুণের দ্বারা সে সময়কে সেই যুগ বলিয়া নির্ণয় করিতে হইবে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গুণসমূহ কোথাও অবিমিশ্র থাকিতে পারে না, সুতরাং সকল সময়েই সকল গুণের লক্ষণ থাকিবে। তবে যে সময়ে যে গুণের প্রাধান্য প্রধান ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রকাশ পায়, তদ্দ্বারা যুগনির্ণয় করিতে হইবে। প্রধান ব্যক্তিগণ বলিতেছি এই জন্য যে, তাঁহারাই যুগের প্রবর্ত্তক। মনে হইতে পারে, ইহা আমার নিজের কল্পনা। এ যে কল্পনা নয় তাহার প্রমাণ শাস্ত্র। দ্বাপরযুগের অন্তভাগে কলির প্রবেশ। দ্বাপরযুগে রজ ও তম এ দুই গুণের ক্রিয়া ছিল। দ্বাপরের শেষে তমোগুণ প্রাধান্য লাভ করিল, এজন্য তমোগুণপ্রধান কলি প্রবেশাধিকার লাভ করিল। যুগও জনসমাজের শীর্ষদেশে স্থিত রাজার শাসনাধীন তাহা ভাগবত একটী আখ্যায়িকা দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। রাজা যদ্গুণবিশিষ্ট প্রজাও যে তদ্গুণবিশিষ্ট হয়, ইহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের দেশে এখন আচার ব্যবহারের কি প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে ইহা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। ভাগবতের আখ্যায়িকাটী এই :—যুধিষ্ঠিরের সিংহা-

---

যদা লোভস্ত্বসন্তোষো মানো দম্ভোঽথ মৎসরঃ।
কর্ম্মণাং চাপি কাম্যানাং দ্বাপরং তদ্রজস্তমঃ॥
যদা মায়ানৃতং তন্দ্রা নিদ্রা হিংসা বিষাদনম্।
শোকো মোহো ভয়ং দৈন্যং স কলিস্তামসঃ স্মৃতঃ॥
ভাঃ ১২ স্ক, ৩ অ, ২৭—৩০ শ্লোক।

সনে উপবিষ্ট তৎপৌত্র পরিক্ষিৎ তাঁহার রাজ্যে কলির প্রবেশ হইয়াছে ইহা শ্রবণ করিয়া তন্নিগ্রহার্থ দিগ্বিজয়ে বাহির হন। নানাদেশ জয় করিয়া করগ্রহণ করিতেছেন, ইত্যবসরে পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন, একটী গাভী রোদন করিতেছেন, আর এক পদে বিচরণশীল বৃষভ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছেন। এক জন বৃষল (পতিতশূদ্র) এই গোমিথুনকে নিষ্ঠুররূপে তাড়না করিতেছে। পরিশেষ জানিতে পাইলেন, গাভী পৃথিবী, বৃষভ ধর্ম্ম, বৃষল কলি। তপ, শৌচ, দয়া, সত্য ধর্ম্মের চারি পাদ। তিন পাদ বিনষ্ট হইয়াছে, এক পাদ সত্য অবশিষ্ট আছে। এই এক পাদ যাহাতে বিনষ্ট হয় তাহারই জন্য কলি তাঁহার তাড়নায় প্রবৃত্ত। এতদ্দর্শনে পরিক্ষিৎ যখন খড়্গোত্তোলন করিয়া কলির বধে উদ্যত হইলেন, তখন সে তাঁহার শরণাপন্ন হইল, কোন্ কোন্ স্থানে সে তাঁহার রাজ্যে স্থিতি করিবে, তজ্জন্য স্থান যাচ্ঞা করিল। প্রথমতঃ তিনি দ্যূতক্রীড়া, মদ্যপান, অসতী, এবং পশুবধস্থান, তৎপর পুনরায় প্রার্থনা করাতে স্বর্ণ তাহার বাসস্থান নির্ণয় করিয়া দিলেন। পরিক্ষিতের সময়ে কেন কলি এই সকল স্থান অধিকার করিয়া চিরদিনই বাস করে। বৈদিক সময়ে দ্যূতক্রীড়াদির অধর্ম্মপ্রভাব ঋগ্বেদে পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। যে সকল ব্যক্তি এই সকল অধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া ভগবৎপরায়ণ হন, তাঁহারা কলির প্রভাবাধীন নহেন; তাঁহারাই জনসমাজের শীর্ষদেশে স্থিত। উন্নতিকাঙ্ক্ষী বিশেষতঃ নরপালকে ভাগবৎ এই সকল অধর্ম্ম হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। একই সময়ে সাত্ত্বিকাদি ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণকে আশ্রয় করিয়া যুগসকল অবস্থান করে, ইহাই শাস্ত্রের ভাবার্থ।

সত্ত্বগুণাদির অনুসারে যুগনির্ণয় হয় ইহা বুঝা গেল, কিন্তু নবযুগ কাহাকে বলে এবং তাহার অভ্যুদয় কাল কোন্ সময়ে হয়, ইহা দেখা নিতান্ত প্রয়োজন। শাস্ত্রে কালকে যুগ ও কল্পে বিভক্ত করা হইয়াছে। সত্ত্বাদি গুণানুসারে যেরূপ যুগ নির্ণীত হয়, কল্পও সেই প্রকার নির্ণীত হইয়া থাকে। সুতরাং এ দুই ভিন্ন নামে উক্ত হইলেও বস্তুতঃ এক। ভিন্ন ভিন্ন কল্পের ভিন্ন ভিন্ন দেবতাদিনির্ণয় করিতে গিয়া উল্লিখিত হইয়াছে—

সঙ্কীর্ণে তু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে।

এক কল্প গিয়া আর এক কল্প যখন প্রবৃত্ত হইবে তাহার মধ্যবর্ত্তী কালে (যুগসন্ধি, কল্পসন্ধিতে) সরস্বতী ও পিতৃগণের প্রস্তাব উপস্থিত হয়। এই মধ্যবর্ত্তী কালে সন্ধিকালকে অতিক্রম করিয়া কল্পান্তরে বা যুগান্তরে প্রবেশ করিবার উপযোগী যে সকল নবভাবের অভ্যুদয় হয়, সেই নবভাব লক্ষ্য করিয়া বক্তৃতার বিষয়-মধ্যে 'নবযুগ' শব্দ নিবিষ্ট হইয়াছে। এই নবযুগের অভ্যুদয় সরস্বতী অর্থাৎ জ্ঞানচর্চ্চা এবং পিতৃগণ অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে যে অধ্যাত্মসম্পদ্ লাভ হইয়াছে তাহা অবলম্বন করিয়া হইয়া থাকে। আমরা যে সময়ে বাস করিতেছি, এ সময়ে সরস্বতী অর্থাৎ বিদ্যাচর্চ্চা এবং পিতৃগণের যে প্রাদুর্ভাব ইহা আমরা সকলেই দেখিতে পাইতেছি। বিদেশ হইতে জ্ঞানচর্চ্চা এদেশে প্রবেশ করিয়া কি যে সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে এবং সে বিপ্লবে প্রাচীন সমাজ যে যায় যায় হইয়াছে তাহা আর আমরা কে না জানি? পাশ্চাত্য অজ্ঞেয়বাদ (Agnosticism) এদেশে আসিয়া লোকের মনকে ভগবদর্চ্চনাবন্দনা হইতে বিরত করিয়াছে। যাঁহাকে জানিতে পারা যায় না, তাঁহার আবার পূজা বন্দনা কি?

তিনি কোথায় আছেন, কিরূপ তিনি, কে জানে ? আমরা তাঁহার স্তবস্তুতি করিলে তিনি কি আমাদের খোঁজ লন ? ঈশ্বরে বিশ্বাস টলিয়া গিয়া আবার নূতনভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপিত না হইলে দেশের দুর্গতিবারণ হইবে তাহার সম্ভাবনা নাই। এটি সঙ্কীর্ণ কাল (Transitory Period), একাল অতি ভয়ানক। ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে নীতির বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষিত যুবকগণ গোপনে সমাজবিরোধী অনেক প্রকার অসদাচরণ করিতেছে, অথচ বাহিরে তাহারা সমাজের সুহৃদ্ বলিয়া পরিচয় দিতেছে। তাহাদের কপটাচারে নীতি সঙ্কটাপন্ন, সমগ্র জাতি মিথ্যাবাদী এই অপবাদ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। এক জন প্রধান ইংরেজ (Macaulay) অনেক দিন পূর্ব্বে এদেশীয়গণকে মিথ্যাবাদী অপবাদে অপবাদগ্রস্ত করিয়াছেন, আর এক দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান পদারূঢ় ব্যক্তি (Tawney) এজাতিকে মিথ্যাবাদীর চূড়ামণি (Monumental liar) আখ্যা অর্পণ করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃতানুরাগী উদারচেতা হইয়াও সমগ্র জাতিকে এরূপ অপবাদগ্রস্ত করিলেন কেন ? তাঁহার সংস্কৃতাধ্যাপক কোন কালে মিথ্যা বলেন না, এই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি যখন একটী পারিবারিক দুর্ঘটনাসম্বন্ধে মিথ্যা বলিয়া উহা গোপন করিলেন তখন সেই উদারচেতা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত স্থির করিলেন, যখন আমার পণ্ডিত মহাশয় মিথ্যা বলিতে পারেন, তখন এদেশে এমন ব্যক্তি কেহ থাকিতে পারে না, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে না। বিদ্যাচর্চ্চায় তো এইরূপ ধর্ম্ম ও নীতির বিপ্লব উপস্থিত, অন্য দিকে কালমাহাত্ম্যে বাপপিতামহের দোহাই দেওয়া শিক্ষিতগণের মধ্যে বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশের বেদবেদান্ত, ব্রহ্মজ্ঞান

অতুল্য তাহাতে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ শতমুখে উহার প্রশংসা করিতেছেন। কিন্তু এদেশের কোন্ শিক্ষিত যুবক বেদ-বেদান্ত অধ্যয়ন করেন, ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন করেন, পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় প্রবৃত্তিবাসনাজয়পূর্ব্বক প্রতিদিন ব্রহ্মে চিত্তসমাধান করিয়া থাকেন? মুখের প্রশংসায় পিতৃপুরুষগণ তুষ্ট হইবেন, না তাঁহারা যাহা ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন। আমরা তাঁহাদের কুপুত্র হইয়া কুলে কলঙ্ক আনিয়া তাঁহাদের প্রিয়পাত্র হইব, ইহা কি সম্ভব? মুখে তাঁহাদের নাম লইয়া যদি তাঁহাদের মত না হই, তাহা হইলে বিদেশীয়গণই বা কেন আমাদিগকে ধিক্কারদান করিবেন না? বিদ্যাচর্চ্চা হউক, আরও বিদ্যাচর্চ্চা হউক, পিতৃপুরুষগণের গুণবাদ বাড়ুক আরও বাড়ুক, কিন্তু বিদ্যাচর্চ্চা অবিদ্যায় পরিণত না হয়, পিতৃপুরুষগণের গুণবাদ মৌখিক না হয়, এদিকে দৃষ্টি রাখা তো দেশীয় সকল ব্যক্তির পক্ষেই কর্ত্তব্য। বিদ্যাচর্চ্চা ও পিতৃপুরুষগণের গুণবাদ কি প্রকারে ভারতের গৌরবের হেতু হইতে পারে, এখন তাহারই আলোচনা করা যাউক।

'নবযুগে' সমাজের অগ্রণীগণমধ্যে এমন কি নবভাব প্রবেশ করিয়াছে যদ্দ্বারা ভারতের গৌরবের পুনরুদ্ধার হইতে পারে, এখন তাহাই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই। এ 'নবযুগের' নব ভাব 'নব সন্ন্যাস।' শ্রীমচ্ছঙ্কর একজন যুগপ্রবর্ত্তক (epoch-makin) মহাত্মা। বিলুপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানের পুনরুদ্ধার তাঁহা কর্ত্তৃক সাধিত হইল। তিনি পরিষ্কার করিয়া সকলকে বুঝাইলেন সন্ন্যাস বিনা ব্রহ্মসংস্থা অর্থাৎ ব্রহ্মে স্থিতি কখন হয় না। তিনি যে সন্ন্যাসের প্রবর্ত্তন করিলেন, তাহাতে গৃহে থাকিয়া কেহ সন্ন্যাসী হইবেন

তাহার সম্ভাবনা নাই, কেন না তাঁহার মত এই, গৃহে থাকিলেই কর্ম্মানুষ্ঠান অপরিহার্য্য, কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে গেলেই ব্যস্ততা চাঞ্চল্য অবশ্যম্ভাবী। এরূপ অবস্থায় নিরত ব্রহ্মচিন্তা ব্রহ্মে স্থিতি কি প্রকারে সম্ভব? তাঁহার মতে জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য বিদ্বৎসন্ন্যাসী ছিলেন না বিবিদিষাসন্ন্যাসী ছিলেন। যাঁহারা বিদ্বৎসন্ন্যাসী তাঁহাদের ব্রহ্মে স্থিতি হইয়াছে, তাঁহারা গৃহত্যাগী ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা, যাঁহারা বিবিদিষাসন্ন্যাসী তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনপরায়ণ, গৃহে বা বনে সদাচারে বাস করিয়া অপরিত্যক্তকর্ম্মা। শ্রীমচ্ছঙ্করের সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ ও সন্ন্যাসের মত তাঁহাকে কোন কোন আচার্য্যের কটাক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিয়াছে। শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য তাঁহাকে 'সন্ন্যাস পাষণ্ডের' প্রবর্ত্তয়িতা বলিয়া অত্যন্ত ধিক্কার করিয়াছেন। এরূপ কঠোর বাক্যে তাঁহাকে আক্রমণ করার আমি অনুমোদন করি না, এজন্য গীতাভাষ্যে আমায় বলিতে হইয়াছে শ্রীমচ্ছঙ্করকে এরূপে নিন্দা করিয়া শ্রীমদ্বল্লভ আপনাকে পণ্ডিতমণ্ডলীতে নির্ব্বল্লভ করিয়াছেন। সে কথা যাউক, সমস্ত কর্ম্মত্যাগকখন হইতে পারে না। সন্ন্যাসীর ভিক্ষাচর্য্যা, অজগরব্রতাবলম্বীর অশন-চর্ব্বণ গলাধঃকরণ, এমন কি মানসিক চিন্তা ও অনুধ্যান এ সকলই কর্ম্মমধ্যে গণ্য। যোগাচার্য্য এজন্যই অনুগীতায় বলিয়াছেন বাহিরের কর্ম্মত্যাগ করিয়া যিনি নিষ্ক্রিয়, তিনিও ক্রিয়াবান্। কেন না মন বুদ্ধি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলে নিরত তাঁহাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত রাখিয়াছে। কর্ম্মের অপরিহার্য্যত্বদর্শন করিয়াই তিনি বলিলেন 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্' কর্ম্মেতে কৌশলই যোগ। এ কৌশল কি? কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম না করা। কর্ম্ম না করা কি? কর্ম্মের কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখা। ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিলে কর্ম্ম

করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? প্রবৃত্তি হইবে ঈশ্বরানুরাগে। ঈশ্বরানুরাগ নিরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তিকে তাঁহার আদেশপালনে নিয়ত প্রবৃত্ত রাখিবে, সুতরাং আদেশপালনভিন্ন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার আর কোন কারণ বিদ্যমান থাকিবে না। এইরূপে এই ভূমির উপরে 'নবযুগের নবসন্ন্যাস' নিরাপদে অবস্থিত। 'নব' এই শব্দদ্বারা শ্রীমচ্ছঙ্কর প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাস হইতে ইহা পৃথক্ হইতেছে, অথচ যোগাচার্য্যপ্রদিষ্ট পথে এই সন্ন্যাস স্থাপিত হওয়াতে প্রাচীন ভূমির সহিত ইহার সম্বন্ধ রক্ষা পাইতেছে। যোগাচার্য্যের নিগূঢ় হৃদয়ের ভাব অনুবর্ত্তন করাতেও এ সন্ন্যাস 'নবসন্ন্যাস' নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।

'নবসন্ন্যাসে' শ্রীমচ্ছঙ্করপ্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসের সহিত দৃশ্যতঃ আর একটি বিরোধ সকলের দৃষ্টিতে পড়িবে। জ্ঞানে সমুদায় জগৎ মিথ্যা হইয়া উড়িয়া না গেলে ব্রহ্মে স্থিতি হয় না, জগৎ ব্রহ্মে স্থিতির বাধা জন্মায়। সুতরাং তিনি জগৎ মিথ্যা স্বপ্নবৎ কিছুই নয়, ইহাই প্রতিপাদন করিয়া ছন। এখানেও অন্যান্য আচার্য্যগণের সহিত শ্রীমচ্ছঙ্করের বিরোধ। জগৎ ও জীবের সত্যত্ব বিষয়ে আমরা আংশিক ভাবে শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রভৃতির অনুসরণ করি বটে কিন্তু সাধনের প্রথমাবস্থায় শ্রীমচ্ছঙ্করের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই। বরং আমরা বলি সংশ্রবের প্রথম ভূমিতে তাঁহার অনুবর্ত্তন না করিলে দ্বিতীয় ভূমিতে আরোহণ ও তথায় নিরাপদে বাস কখন সম্ভবে না। কি বলিতেছি একবার স্পষ্ট করিয়া বলা ভাল। যখন ব্রহ্মের সহিত আত্মার যোগসাধন করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন দেখি সংসার উহার প্রতিকূল। এ সংসারকে বিদায় করিয়া দিতে না পারিলে ব্রহ্মযোগে যুক্ত হওয়া

কিছুতেই সম্ভব নহে। ভাগবত ভগবদনুরাগজনিত প্রবৃত্তি-যোগের প্রকাশক হইলেও তাঁহাকেও বলিতে হইয়াছে, 'সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং নিরীহম্।' ব্রহ্ম সত্তামাত্র, সত্তা ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ লক্ষণশূন্য ও নিষ্ক্রিয়। ব্রহ্মকে সত্তামাত্রে ধারণ করা আমরা ব্রহ্মযোগের প্রথম সোপান বলিয়া গ্রহণ করি। ব্রহ্মসত্তাতে মন দৃঢ়রূপে স্থিতি না করিলে যোগ কখন নিরাপদ হয় না। ব্রহ্মের সহিত জীবের কি সম্বন্ধ, জগতের কি সম্বন্ধ, এ সকল চিন্তা করিলে সত্তামাত্রে তাঁহাকে ধারণ করা হয় না। স্রষ্টা পাতা পিতা মাতা ইত্যাদি সম্বন্ধ, দয়াময় প্রেমময় ইত্যাদি গুণ মনে উপস্থিত হইয়া সত্তা হইতে মন বিচলিত হইয়া যায়, সেই সকল সম্বন্ধ ও গুণে উহা আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, ইহাতে বস্তুতে চিত্ত নিশ্চল হইয়া স্থিতি করে না। শ্রীমচ্ছঙ্কর ব্রহ্মবস্তুতে নিশ্চলভাবে স্থিতির জন্য ব্রহ্মকে জগজ্জীবসম্বন্ধবর্জ্জিত সত্তামাত্রে আমাদিগের নিকট উপস্থিত করিলেন; এইরূপে উপস্থিত করিয়া নিবৃত্তিযোগের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। আমরা যদি প্রারম্ভে তাঁহার এই পথে না চলি, ব্রহ্মবস্তু আমাদের জ্ঞানগোচর হওয়া অসম্ভব হয়। অতএব বর্ত্তমান যুগের সাধকমাত্রেরই সাধনারম্ভে শঙ্করের অনুবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। পতঞ্জলি সমুদায় চিত্তবৃত্তিনিরোধ করিয়া আত্মার আত্মাতে স্থিতি শিক্ষা দিয়াছেন, শ্রীমচ্ছঙ্কর সেই স্থলে ব্রহ্মেতে স্থিতি শিক্ষা দিয়া মহাপরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছেন। ব্রহ্মসত্তাতে ডুবিয়া গিয়া আর সমুদায় বিস্মৃত হওয়া স্বপ্নবৎ উড়িয়া যাওয়া শঙ্করপ্রতিষ্ঠিত। এ নিবৃত্তিযোগ কিছু সামান্য নহে।

সত্তার ভিতরে ডুবিয়া গিয়া সমুদায় ভুলিয়া যাওয়া, এই অবস্থায় কি সাধকের চিরদিন স্থিতি হয়? ব্যাসপুত্র শুক তো নিবৃত্তি-

যোগের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তিনি কি চিরদিন এইরূপে ছিলেন? তিনি প্রব্রজ্যাবলম্বন করিয়া গৃহসংসারপরিত্যাগ করিলেন, হিমালয় অতিক্রম করিয়া মেরুপ্রদেশে গেলেন, আর কখন পিতার নিকটে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন তাহার কোন আশা ছিল না, অথচ সেই নির্জ্জনপ্রদেশে যখন তাঁহার যোগ গভীর হইতে গভীর হইল, তখন সেই ব্রহ্মসত্তার ভিতর হইতে যে স্বরূপসৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইল, তাহাতে তাঁহার চিত্ত ভগবদনুরাগে বিক্ষিপ্ত হইল, অনন্ত ঐশ্বর্য্যদর্শনে ব্যাকুল হইল, ভক্তি আসিয়া তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিল। যিনি সকল ক্রিয়া হইতে বিরত হইয়াছিলেন, এখন ভগবদ্‌গুণকীর্ত্তনে তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইল। এ অবস্থায় আর তিনি নির্জ্জনবাসী হইয়া থাকিতে পারিলেন না, পিতার নিকটে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, ভগবল্লীলাপ্রধান ভাগবতাধ্যয়ন করিলেন, পরিক্ষিৎ সন্নিধানে ঋষিগণের সভায় ভগবানের লীলাবর্ণনে প্রমত্ত হইলেন। এখানেই নিবৃত্তিযোগের পরিপাকে প্রবৃত্তিযোগের আরম্ভ। নিবৃত্তিযোগকে মূলে রাখিয়া প্রবৃত্তিযোগে সম্পন্ন হওয়া 'নবযুগের নবসন্ন্যাস'। নিবৃত্তিযোগ দ্বারা যাহার চিত্তনির্ব্বিকার হয় নাই, বাসনাশূন্য হয় নাই, ব্রহ্ম বিনা যাহার অন্য বিষয়ে রতি আছে, সে ব্যক্তি এই প্রবৃত্তিযোগে কখন অধিকারী হইতে পারে না। এই নবসন্ন্যাসের অর্থ প্রথমে সমস্ত ত্যাগ করিয়া আপনি নির্ব্বিকার হইবে, ব্রহ্মে চিত্ত স্থাপন করিবে; বিষয়ের মধ্যে বাস করিয়া চারিদিকে সংসার দ্বারা আবৃত থাকিয়াও তন্মধ্যে এমনই ভাবে স্থিতি করিবে যেন সংসার নাই, বিষয় নাই সমুদায় উড়িয়া গিয়াছে, এক ব্রহ্মই আছেন। যখন এই ভাব সিদ্ধ হইল, আমার বলিবার

কিছুই থাকিল না, তখন ব্রহ্মের আদেশ হইল, এখন যাও সংসারে স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতিকে এই পথে আন, তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া আমার সংসারনির্ম্মাণ কর। সন্ন্যাসশব্দের অর্থ কি? সম্পূর্ণরূপে ন্যাস, সমুদায় ভগবানে সম্যক্‌প্রকারে অর্পণ। আমি নিবৃত্ত হইয়াছি, সংসারের অতীত হইয়াছি, আমার আবার সংসার কি? ইত্যাদি ভাবও আর এক্ষণে রক্ষা করিবার অবকাশ ভগবান্ তাঁহায় রাখিলেন না, দশ জন সংসারীর ন্যায় সংসারের মধ্যে বাস করিতে তিনি তাঁহাকে আদেশ করিলেন। ভগবান্ যখন তাঁহাকে সংসারে যাইতে আদেশ করিলেন, তখন তাহার বিরুদ্ধে চিরদিন নিবৃত্তিপথে থাকিবার নির্ব্বন্ধপ্রকাশকরা তাঁহার পক্ষে আত্মাভি-মান, সুতরাং সে অভিমান পরিত্যাগ করিয়া তিনি সংসারে ফিরিলেন। একালে যে সকল সাধক বাহিরে একদিনের জন্যও সংসারত্যাগ করেন নাই, চির দিন সংসারমধ্যেই আছেন, তাঁহারাও প্রথমাবস্থায় সংসারকে বন করিয়া লইয়াছিলেন, তন্মধ্যে নির্লিপ্ত-ভাবে স্থিতি করিতেছিলেন।

বসন্ বিষয়মধ্যেঽপি ন বসত্যেব বুদ্ধিমান্।
সংবসত্যেব দুর্ব্বুদ্ধিরসৎসু বিষয়েষ্বপি ॥

"বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিষয়মধ্যে বাস করিয়াও বিষয়েতে বাস করেন না। দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি বিষয়সকলমধ্যে কেবল অসৎ বিষয়-সমূহেতেই বাস করে।" এই ন্যায়ানুসারে তাঁহারা অন্য দশজন সংসারীর ন্যায় অসদ্বিষয়ে স্থিতি না করিয়া বিষয়মধ্যে থাকিয়াও বিষয়েতে বাস করেন নাই, ব্রহ্মকে লইয়াই সংসারারণ্যে বাস করিয়াছেন। এ বিষয় আমি এবারই অন্য বক্তৃতায় বিস্তৃত বর্ণন করিয়াছি, এখানে সে বিষয়ের আর পুনরুল্লেখ না করিয়া অন্যকার বিষয়টি ভাল করিয়া পরিস্ফুট করিতে যত্ন করিব।

নিবৃত্তিযোগ দ্বারা অন্য বাসনা নিবৃত্ত হইয়া ভগবদ্ভক্তিরূপ প্রবৃত্তিযোগে যাঁহার প্রবেশ হইয়াছে তাঁহার আর বিপৎ-ক্লেশ-দুঃখ-রাশির প্রতি কিছুমাত্র দৃক্‌পাত থাকে না, তিনি এমনই ভাবে ঈশ্বরের হইয়া গিয়াছেন যে, ভগবান্ তাঁহাকে কষ্ট পরীক্ষার ভিতরেই ফেলুন, দুঃখযন্ত্রণাই দিন, কিছুতেই তাঁহার মন বিচলিত হয় না। বরং তিনি বলেন, "আমার প্রতি, প্রভো, তোমার কি দয়া! আমার সব গিয়াছে তাহাতে আমার কি? তুমিই তো আমার সব হইয়াছ।" ভক্তের মুখের কথা এই—

দিশতু স্বারাজ্যং বা বিতরতু তাপত্রয়ং বাপি।
সুখিতং দুঃখিতমপি মাং ন বিমঞ্চতু কেশবঃ স্বামী॥

"তিনি আমায় স্বারাজ্যই দিন, বা তাপত্রয়ই দিন, সুখেই রাখুন, বা দুঃখেই রাখুন, কালভয়বারণ প্রভু যেন আমায় পরিত্যাগ না করেন।"

ক্ষোণীপতিত্বমথবৈকমকিঞ্চনত্বং
নিত্যং দদাসি বহুমানমথাপমানম্।
বৈকুণ্ঠবাসমথবা নরকে নিবাসং
হা বাসুদেব মম নাস্তি গতিস্ত্বদন্যা॥

"আমায় পৃথিবীপতিই কর, বা একমাত্র অকিঞ্চন কর, প্রতিদিন বহু মানই দাও বা অপমানই দাও, বৈকুণ্ঠে রাখ বা নরকে রাখ, হা সর্ব্বান্তরাত্মা, তোমা বিনা আমার অন্য গতি নাই।" যাঁহার চিত্ত এইরূপ ভাবাপন্ন হইয়াছে, তাঁহার আর কিছুতেই বিকার হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি সংসারে সাধারণ সংসারীর ন্যায় বিচরণ করেন, তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারে না। ভগবদ্ভক্তি-ধন অতি সাবধানে তিনি লুকাইয়া রাখেন। কি জানি বা পৃথিবীর চক্ষু তাহার উপরে পড়ে এ জন্য তিনি অতি সাবধান।

মহাত্মা কবিরের সম্বন্ধে আখ্যায়িকা আছে, যখন তিনি মহাসাধু বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করিলেন, লোকে তাঁহাকে সম্মান দিতে লাগিল, তখন তিনি তাঁহার সেই খ্যাতি লুকাইবার জন্য একটী বেশ্যার হাত ধরিয়া প্রকাশ্য পথে বেড়াইতে লাগিলেন। মাধবেন্দ্র পুরী যে সময়ে বৃন্দাবনে যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে এক দেববিগ্রহের সন্নিধানে ক্ষীরভোগ দেখিয়া বাসনা করিয়াছিলেন, এই ক্ষীরের স্বাদ পাইলে এইরূপ ক্ষীর আমার সেবিত বিগ্রহকে দিতাম। পরক্ষণে তাঁহার মনে এই বলিয়া ধিক্কার আসিল ক্ষীরের স্বাদগ্রহণে তাঁহার লোভ হইয়াছে। তিনি এক বৃক্ষতলে গিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। রজনীতে পূজারী স্বপ্ন দেখিয়া উঠিয়া বিগ্রহের ধড়ার নিম্নে একখানি ক্ষীর পাইলেন। তখন চিৎকার করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "কোথায় রইলে মাধবেন্দ্র পুরী, তোমার জন্য গোপীনাথ ক্ষীর করেছেন চুরী।" তিনি ক্ষীর ভোজন করিলেন বটে, কিন্তু রজনী থাকিতে থাকিতেই তথা হইতে পলায়ন করিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের রচয়িতা ইহার এই কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "অভিমানভয়ে পুরী যায় পলাইয়া।" বাস্তবিক এ সকল আখ্যায়িকা এই দেখাইয়া দেয়, ভক্তগণ আপনাদের ভক্তিসম্পদ্ জনচক্ষুর অগোচর করিয়া রাখিতে সর্ব্বদা যত্নবান্। এ দেশে অনেক সাধক এই জন্য অবধূত-বেশধারণ করেন, অর্থাৎ বাহিরে এমন বেশে থাকেন, যাহাতে লোকে তাঁহাদিগকে পাগল মনে করিয়া থাকে। শুকদেবসম্বন্ধে ভাগবতে বর্ণিত আছে যে, স্ত্রী ও বালকেরা পাগল মনে করিয়া তাঁহার গায়ে ধূলা দিতেছে, নিষ্ঠীবননিক্ষেপ করিতেছে। একালে অত দূর করিবার কিছু প্রয়োজন নাই। সংসারীর বেশে সংসারে

বাস করিলেই যথেষ্ট। অন্যত্র কপটাচরণ নিষিদ্ধ, কিন্তু এখানে কপটাচরণ নিষিদ্ধ নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও এ বিষয়ে সম্মতি দেন। কম্‌ট বলেন, আপনার উদরপূর্ত্তি যাহাতে হয়, তন্মাত্র আপনার জন্য রাখিয়া পরার্থ সমুদায় দিতে হইবে। ভাগবতও সেই কথা বলেন,

যাবদ্ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি॥

"যে পরিমাণে জঠরভরণ হয়, দেহিগণের তৎপরিমাণে অধিকার। এতদপেক্ষা অধিক যে আপনার বলিয়া অভিমান করে, সে ব্যক্তি চোর,দণ্ডের যোগ্য।" মিল কম্‌টের এ মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সর্ব্বস্ব পরের জন্য দিতে হইবে, আপনি কিছু ভোগ করিবে না, ইহা ন্যায়সিদ্ধ নহে। প্রত্যেক ব্যক্তি সংসারে সৈনিক পুরুষের ন্যায় বাস করিবে। যুদ্ধ হইতে অবসরকালে যথেচ্ছ সম্পদ্ ভোগ করিবে, কিন্তু যাই রণভেরী বাজিয়া উঠিবে, কোথায় থাকিবে স্ত্রী পুত্র পরিবার, কোথায় থাকিবে সম্পদ্, তখনই সে সকল ছাড়িয়া যুদ্ধে নির্লিপ্ত পুরুষের ন্যায় চলিয়া যাইবে। স্পেন্সার বলেন, পরার্থ সমুদায় দিয়া যে ব্যক্তি এ সংসারে সর্ব্বত্যাগী হইতে চায়, তাহার সে সর্ব্বত্যাগিত্ব কিছুতেই রক্ষা পাইবে না। কেন না সংসারি সর্ব্বত্যাগী দেখিতে পাইলে তাহাকে এমনই করিয়া সকল যোগাইবে যে, তাহার সর্ব্বত্যাগিত্ব কিছুতেই দাঁড়াইবে না। কি জানি বা সন্ন্যাসভঙ্গ হয়, এজন্য সন্ন্যাসীর পক্ষে অতি কঠিন নিয়ম। দুজন সংন্যাসী একত্র বাস করিলে কি জানি বা প্রতিযোগিতা উপস্থিত হয়, শিষ্যসংগ্রহে প্রবৃত্তি জন্মে, এ কারণ দুজন সংন্যাসীরও

একত্র বাস নিষিদ্ধ। নবযুগে নবসন্ন্যাসী নবীন অবধূতবেশ-ধারণ করিয়া সংসারীর ন্যায় সংসারে বাস করিবেন; অথচ অন্তরে সর্ব্বদা ব্রহ্মে স্থিতি করিবেন। ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহা এক বার দেখা যাউক।

পূর্ব্বকালে জনক প্রহ্লাদ প্রভৃতি ঈশ্বরসাক্ষাৎকারের পর তাঁহার আদেশে সংসারে থাকিয়া রাজ্যপালনাদি গুরুভারের কার্য্য-নির্ব্বাহ করিয়াছেন। রাজ্যাদিতে তাঁহাদের আপনাদের কোন প্রয়োজন ছিল না, ঈশ্বরের আদেশপালন কেবল উহার উদ্দেশ্য ছিল। যেখানে আপনার বলিবার জন্য কিছুই নাই, কেবল প্রভুর আদেশপালনের জন্য সকল, সেখানে বিষয় দ্বারা মনের বিকার কিছুতেই হয় না, নির্ব্বিকার চিত্তে সাধক সংসারে বিচরণ করেন। এই আদেশপালনজন্য সংসারে স্থিতি, সংসারের সকল প্রকারের কর্ত্তব্যনির্ব্বাহ, ইহা প্রবৃত্তিযোগের অন্তর্গত। সন্ন্যাসের পর প্রবৃত্তিযোগের আরম্ভ। সন্ন্যাস দুই প্রকার। এক কার্য্য করিয়া তাহা ঈশ্বরেতে সমর্পণ; আর এক দেহ মন প্রাণ চিন্তাদি সমুদায় অগ্রে ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করিয়া তাঁহার আদেশে তাঁহার ইচ্ছামত সেই সকলের ব্যবহার। দ্বিতীয় সন্ন্যাসের অবস্থা ভক্তগণ এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন :—গোবিক্রয় করিলে গোস্বামী যেমন তাহার তৃণজলাদির বিষয়ে নিশ্চিন্ত হন, তেমনি ভক্ত আপনার দেহাদি ভগবচ্চরণে বিক্রয় করিয়া তাহার অন্নপানাদি সকল বিষয়ে নিশ্চিন্ত হন। নব সন্ন্যাসী ঈশ্বরের আদেশে সংসারে বাস করিতেছেন, তাঁহার সকলই ঈশ্বরের চরণে সমর্পিত, তিনি আর কিসের জন্য চিন্তা করিবেন। অন্য দশ জন সংসারীর নিকটে সংসার যেরূপ তাঁহার নিকটে সংসার সেরূপ নহে। তিনি

সর্ব্বত্র নিরন্ত তাঁহার ইষ্টদেবতার লীলা দেখিতেছেন। সংসার যে তাঁহারই লীলাক্ষেত্র। স্ত্রী পুত্র পরিবার বন্ধু বান্ধব সকলের মধ্যে তিনি শ্রীহরির লীলা দেখিতে পান। ইহারা তাঁহার চিত্ত কোথায় ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে, না ইহারা প্রতিমুহূর্ত্ত তাঁহাতেই চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া দিতে সহায় হয়। অন্তরে বাহিরে তাঁহার হরি, তিনি আর কিছু দেখেন না, তাঁহারই বিচিত্র লীলা দেখেন। তিনি বৈকুণ্ঠও জানেন না, স্বর্গধামও জানেন না, জানেন কেবল ভক্তবৎসলকে। যেখানে তিনি সেখানেই তাঁহার বৈকুণ্ঠধাম, সেখানেই তাঁহার স্বর্গনিকেতন, সেখানেই স্বর্গের যোগী সাধু ভক্তবৃন্দ। অবধূত নিত্যানন্দকে শ্রীচৈতন্য যে বাহিরের সন্ন্যাসত্যাগ করিয়া গৃহী হইতে অনুমতি দিয়াছিলেন, উহা কেবল এই দেখাইবার জন্য যে, অন্তরে সন্ন্যাসরক্ষা করিয়া তিনি বাহিরে গৃহধর্ম্মপালন করিবেন। 'নবযুগের নবসন্ন্যাসের' বিধি এই,—নরনারী সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী হইয়া ঈশ্বরের আদেশে গৃহের সমুদায় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন, আপনারা নির্ব্বিকারচিত্ত থাকিয়া ঈশ্বরের প্রভুত্বাধীনে সংসারে বাস করিবেন। সংসার তাঁহাদিগের যোগের বিঘ্ন কিছুতেই উৎপাদন করিতে পারে না। স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাদিগকে পরিবারবন্ধনে সংসারে বাস করিতে আজ্ঞা করিলেন, তাঁহার আজ্ঞাপ্রতিপালন করিতে গিয়া তাঁহারা বিঘ্নদ্বারা উপদ্রুত হইবেন কেন? "ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি" আমার কথা যদি না শোন বিনাশ পাইবে, পরমাত্মার এ কথা তাঁহারা কি কখন অগ্রাহ্য করিতে পারেন? তাঁহারা বলেন, আমরা যোগ ভক্তি কি কিছুই জানি না, আমরা জানি কেবল ভগবান্‌কে। আমি ভক্ত, এ অভিমান একদাই তাঁহাদের হয় না। তাঁহারা

ঈশ্বরের প্রেমে প্রেমিক, তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ, সুতরাং তাঁহাদের এরূপ ভাব হইবে না তো কি হইবে? ঈশা নানক চৈতন্য প্রভৃতি এই ভাবে ভাবুক হইয়া ঈশ্বরে তাঁহাদের সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। অতএব এইভাবে ভাবুক হইয়া সকলে নবসন্ন্যাসী হউন, তাঁহাদের জীবনের মূল একমাত্র ভগবান্ হউন, তাঁহাদের কৃতার্থতার আর অবধি থাকিবে না।

৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট কলিকাতা, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও নববিধান প্রচারকার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান।

মূল্য ৷০ আনা।

অশুদ্ধ শোধন ।

৯ পৃষ্ঠা — টিপ্পনীস্থ 'পুন্নাকল্পেষু' শ্লোক মূলে সন্নিবেষ্টব্য ।

হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান *।

হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া রাজর্ষি রামমোহন ব্রহ্মজ্ঞান যখন এ দেশে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিলেন, তখন শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। ইহাঁরা তাঁহার সহিত কত বাগ্বিতণ্ডা করিলেন, কিন্তু শাস্ত্রবিচারে সকলকেই তাঁহার নিকটে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। তিনি আপনার তীক্ষ্ণ মনীষাবলে বাদিমাত্রের বাদ খণ্ডন করিলেন বটে, কিন্তু সেই যে তাঁহার সময়ে বিবাদানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, আজ পর্য্যন্তও তাহার নির্ব্বাণ হয় নাই। কোন এক জন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক যদি হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে সকল লোকের মনে ধ্রুববিশ্বাস এই উপস্থিত হয় যে, ইনি অবশ্য হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে বলিতে আসিয়াছেন। বর্ত্তমানে আমরা যে ভূমিতে দণ্ডায়মান, সেখানে লোকের মনে এ প্রকার বিরুদ্ধ সংস্কার থাকা কখন উচিত নয়। সকলেরই জানা প্রয়োজন যে, যে দিন হইতে নববিধানে ব্রাহ্মধর্ম্ম নবীন আকার ধারণ করিয়াছে, সেই দিন হইতে বিবাদানল নির্ব্বাণ হইয়াছে, শান্তির রাজ্য সমাগত হইয়াছে। যে ধর্ম্ম বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান, জৈন, পারসিক, সমুদায় ধর্ম্মকে আদরের সহিত আলিঙ্গন করে, যে ধর্ম্মের মূলে হিন্দুভাব প্রোথিত, সে ধর্ম্ম হিন্দু-ধর্ম্মের বিরোধে দণ্ডায়মান হইবে, ইহা কি কখন সম্ভব? পৃথিবীর

---

* এই চৈত্র আলবার্ট হলে প্রদত্ত বক্তৃতামূলক।

চারিদিকে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এক ধর্ম্মসম্প্রদায় আর এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত; এক দল আর এক দলকে কি প্রকারে পরাস্ত করিবে, তাহারই জন্য ব্যস্ত; কিন্তু আমরা যে বিধানের রাজ্যে বাস করিতেছি, সেখানে এরূপ কলহ বিবাদের অবকাশ নাই। আমরা চিরশান্তির রাজ্যে বাস করিতেছি। স্বদেশ বিদেশ কোথাও কাহারও সঙ্গে আমাদের বিবাদের বিষয় নাই। ইউরোপ আমেরিকা সর্ব্বত্র আমাদের ধর্ম্মের গৌরব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, এবং ইহা যে সকল জাতির মধ্যে শান্তি সংস্থাপন করিয়া দিবে, তাহার আশা সকলেরই মনে উদ্দীপন করিয়াছে।

"হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান" বিষয়ে কিছু বলিব বলিয়া আমি এখানে উপস্থিত। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত অনুপস্থিত ব্যক্তিগণের মন হইতে বিরুদ্ধ সংস্কার দূর করিবার জন্য আরম্ভে আমায় এতগুলি কথা বলিতে হইল। সকলের জানা উচিত, নিন্দার পক্ষ অবলম্বন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান বলিতে আসা হয় নাই, কোন্ দিকে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের গতি হইলে কল্যাণ হইবে, ইহাই প্রদর্শন করা এই বক্তৃতার উদ্দেশ্য। কালের প্রভাবে এখন হিন্দুসমাজের মধ্যে সুমহৎ পরিবর্ত্তন উপস্থিত। এ পরিবর্ত্তন পরিবর্ত্তিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। এই ক্রমিক পরিবর্ত্তনে হিন্দুধর্ম্মের বিনাশ হইবে, ইহা অনেকের ধারণা। যখন ধর্ম্ম থাকা আর না থাকা শাস্ত্রের উপরে নির্ভর করে হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন, অথচ শাস্ত্রের স্পষ্ট বিধিসকল দেশের অগ্রগামী ব্যক্তিগণ প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে ভঙ্গ করিতেছেন, তখন হিন্দুধর্ম্ম মৃত্যুমুখে নিপতিত, ইহা আর কেন তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন না? তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, শাস্ত্রে

যাহা নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা চিরদিন একইপ্রকার আছে ও থাকিবে, উহা অণুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না, পরিবর্ত্তন করিলেই ধর্ম্ম বিপদ্‌গ্রস্ত, নাস্তিক্য অপরিহার্য্য। ইহাদের এই বিশ্বাস যদি সত্য হয়, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্ম আর দাঁড়াইতে পারিতেছেন না, কেন না শিক্ষাপ্রভাবে হিন্দুসমাজের সর্ব্বত্র যেরূপ আহার ব্যবহারাদির পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে, তাহাতে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম বিপদ্‌গ্রস্ত কেন, নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ কথা বলা কিছু অত্যুক্তি নহে যে, এমন হিন্দুগৃহ অতি বিরল, যেখানে প্রকাশ্যে না হউক, অপ্রকাশ্যে পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি দ্বারা পরিবর্ত্তনবিমুখ ব্যক্তিগণের বিচারে উহার হিন্দুত্ব বিনষ্ট হয় নাই। এরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া যাঁহারা ভয় পাইতেছেন, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের বলাবল ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করেন নাই। তাঁহারা মনে করিতেছেন, হিন্দুধর্ম্ম চিরকাল একই প্রকার আছে, একই প্রকার ছিল। এই ভ্রম তাঁহাদিগের এরূপ ভয়ের কারণ। হিন্দুধর্ম্ম ক্রমিক উন্নতি প্রদর্শন করিয়াছে, সুতরাং নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আসিয়াছে, ইহা যদি প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে ভয়ের যে কোন কারণ নাই সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

প্রথমতঃ দেখা উচিত যে, স্বয়ং শাস্ত্রকারেরা উন্নতির পর উন্নতি স্বীকার করিয়াছেন কি না? স্কন্দ পুরাণের প্রভাসখণ্ডে লিখিত আছে,

> যন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্ দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ।
> উভয়োর্যন্ন দৃষ্টস্তু তৎপুরাণৈঃ প্রগীয়তে॥

বেদে যাহা দৃষ্ট হয় না, স্মৃতিতে তাহা দৃষ্ট হয়, বেদ ও স্মৃতিতে যাহা দৃষ্ট হয় না, পুরাণ তাহা বর্ণন করিয়া থাকেন। এ কথা বলাতে

এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পর পর নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কৃত ও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যে সময়ে বিদেশীয়গণের সংস্রবে আসিয়া বিদেশীয় শিক্ষাপ্রভাবে হিন্দুগণের আচার ব্যবহারাদির পরিবর্ত্তন করিতে হয় নাই, সেই সময়ে যদি ক্রমিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে এখন যখন আমাদের দেশে বিদেশীয় শিক্ষা বিদেশীয় সভ্যতা প্রবেশ করিয়াছে, তখন যে অতি সত্বর বহু পরিবর্ত্তন ঘটিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার বিষয় কি আছে? ঋষিগণ তাঁহাদের সময়ে জনসমাজের যখন যে প্রকার পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়াছেন সেই পরিবর্ত্তনানুযায়ী ব্যবস্থা সকল নিবদ্ধ করিয়াছেন, ইহা আর কে না স্বীকার করিবেন? তাঁহারা জনসমাজের পরিবর্ত্তনের মূলে বিধাতার হস্তদর্শন করিতেন, সুতরাং তাঁহারা তাঁহারই ইচ্ছানুবর্ত্তন করিয়া সেই সমুদায় পরিবর্ত্তনকে শাস্ত্রে নিবদ্ধ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। এক এক জন অসাধারণ প্রজ্ঞানেত্র ঋষি নূতন জ্ঞানালোক বিস্তার করিয়া অনেকগুলি নিন্দনীয় রীতির উচ্ছেদ করিয়াছেন, বা উচ্ছেদের পন্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, মহাভারতাদি পাঠ করিয়া ইহা আর কে না স্পষ্ট দেখিতে পান? বহু দিনের বদ্ধমূল এক একটি রীতির উচ্ছেদ অতীব কঠিন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু জনসমাজের মন যখন পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া আইসে, তখন সে রীতির উচ্ছেদ এক জন প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ অবহেলায় সাধিত করেন। এইরূপে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটে, সে সকল অবনতি নহে উন্নতি। যদি কখন অবনতি ঘটে, আবার উন্নতির সোপানে আরূঢ় করিবার জন্য যত্ন হয়। হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাসে ইহাও হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত না দিলে, সাধারণের এ সম্বন্ধে সংশয়

বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা নাই, এজন্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। বৈদিক ও তৎপর সময়ে* এই রীতি ছিল যে, কোন এক জন বিশিষ্ট লোক গৃহে আসিলে তাঁহার উদ্দেশে একটি গো হনন করা হইত। এই রীতি হইতে অতিথি 'গোঘ্ন' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায়, আমাদের দেশীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ গোশব্দ সামান্য পশুবাচকরূপে গ্রহণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, মধুপর্কে বা যজ্ঞে কখন গো হনন করা হয় নাই, অপরজাতীয় পশুচ্ছেদন করা হইত। এরূপ প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করা বিফল, কেননা মধুপর্কে নির্দ্দিষ্ট "মহোক্ষ" শব্দ গো ভিন্ন আর কিছু বুঝায় না। গোমেধযজ্ঞে গো হনন করিয়া তাহাকে ছত্রিশ ভাগ করা হইত এবং এক এক ভাগ যজ্ঞের সহায়ক ব্যক্তিগণকে, যজমানপত্নী ও যজমানকে প্রদত্ত হইত। এই ভাগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, "কণ্ঠঃ সকাকুদঃ প্রতিহর্ত্তুঃ" কাকুদ সহকারে কণ্ঠ প্রতিহর্ত্তার প্রাপ্যাংশ। গোমেধে নিহিত পশু গো ভিন্ন যদি অন্য কিছু হইত, তাহা হইলে 'কাকুদ' শব্দ ব্যবহার করিবার কোন কারণ ছিল না। ককুৎ বা ঝুঁটি গোজাতীয়ের লক্ষণ, এজন্য ককুদ্মান্ বলিতে বৃষ ভিন্ন অন্য কোন পশু বুঝায়

---

* সংজ্ঞাপাতে বৎসতরী সর্পিষান্নক পচাতে।
শ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিগৃহানাগতোঽপি জুষস্ব নঃ॥

মহবীর চরিতের এই লেখা দেখাইয়া দেয় যে, বৈদিক ও বৈদিক সময়ের পর এ রীতি প্রচলিত ছিল। যখন লোকের মনে এ রীতির প্রতি বিদ্বেষ উপস্থিত হয় তখনই উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই জন্যই নির্ণয়সিন্ধুকার লিখিয়াছেন, "মহোক্ষং বা মহাজং বা শ্রোত্রিয়ায় প্রকল্পয়েৎ" ইতি বিধানেঽপি লোকবিদ্বিষ্টত্বাদননুষ্ঠানম্।

না। "মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ"—মধুপর্কে পশুবধ পরসময়ে নিষেধ হইলেও আজপর্য্যন্ত বৈদিকানুষ্ঠানে এ রীতি যে প্রচলিত আছে, তাহা আমাদিগের দেশের বিবাহপদ্ধতি দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। বর বিবাহার্থ আগমন করিলে সম্প্রদাতা বরণ করিয়াই একটি গোকে তাঁহার সম্মুখে আনিয়া বন্ধন করেন। এ গোটি ভোজনের আয়োজন। কিন্তু পূর্ব্বকালে এই রীতি ছিল যে, অভ্যাগত ব্যক্তি অনুমতি করিলে আবদ্ধ গোর বন্ধন মোচন করিয়া লওয়া হইত, আর অপর কোন মাংসে অভ্যাগত ব্যক্তির ভোজনকার্য্য সম্পন্ন করাইতে হইত। বিবাহপদ্ধতিতে এই রীতি অনুবর্ত্তন করা হইয়াছে। কেন না সম্প্রদানানন্তর নাপিত আসিয়া বলিতেছেন, 'গৌর্গৌঃ'। নাপিত এস্থলে সেকালের অধ্বর্য্যু শ্রেণীর মধ্যেগণ্য। সে সেই বদ্ধ গরুকে ছেদন করিবে কি মুক্ত করিয়া দিবে, বরের নিকটে অনুমতি চাহিতেছে। বর তাহাকে মুক্ত করিয়া দিতে * বলিলেন, সুতরাং গোর জীবন রক্ষা পাইল। কবিগণ এই ব্যাপারটিকে একটি উপহাসের বিষয় করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা উপহাস করিয়া বলিয়াছেন, 'গৌর্গৌরিতি ব্যাহৃতম্' নাপিত গো গো শব্দ উচ্চারণ করিল কেন জান? তুমি আজ হইতে মনুষ্যত্ব ছাড়িয়া গোত্ব লাভ করিলে এই অভিপ্রায়ে।

---

* বর বলিলেন "ওঁ মুঞ্চ গাং বরুণ পাশাদ্‌দ্বিষন্তং মে ভিধেহি তং জহ-মুষ্য চোভয়োরুৎসৃজ গামত্তু তৃণানি পিবত্তোদকম্।" এই কথা শুনিয়া যখন নাপিত গরুর বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল, ইহাকে বধ না করা হয় এই উদ্দেশ্যে বর এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন "ওঁ মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসা হংদিত্যানামমৃতস্ত নাভিঃ। প্রণুবোচং চিকিতুষে জনায় মা গামনাগা মুদিতিং বধিষ্ঠ।"

কেবল অভ্যাগত ব্যক্তির আগমনে গোহনন করা হইত তাহা নহে, গৃহস্থের মৃত্যু হইলে তাঁহার সঙ্গে একটী গাভী বধ করা হইত। এই গাভীটী অনুস্তরণী শব্দে অভিহিত। গো অভাবে ছাগী অনুস্তরণী করা বিধেয় *। এই অনুস্তরণী ছেদন পূর্ব্বক এক একটি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শবের মস্তক ও মুখ উহার মেদ দ্বারা আচ্ছাদন এবং উহার এক এক অঙ্গ শবের তত্তদঙ্গে স্থাপন করিবে; তদনন্তর সমগ্র শরীর চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দিবে ‡। এই ব্যবহারটি কাত্যায়ন ঋষি এই বলিয়া অনিত্য করিলেন যে, "নবাস্থি সন্দেহাৎ।" দাহান্তে যখন যজমানের অস্থিগুলি সঞ্চয়ন করিতে হয়, তখন কোন্‌গুলি যজমানের অস্থি, কোন্‌গুলি অনুস্তরণীর অস্থি এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়; সুতরাং অনুস্তরণী না দেওয়াই শ্রেয়স্কর। মৃত ব্যক্তির অস্থি সঞ্চয়ন করিয়া সমাহিত করা সেকালে রীতি ছিল। অস্থি সমাহিত না করিলে মৃত ব্যক্তির স্বর্গগমন প্রতিরুদ্ধ হইত। যদি ভুলক্রমে যজমানের অস্থি সঞ্চয়ন না করিয়া অনুস্তরণীর অস্থি সঞ্চয়ন করিয়া সমাহিত হয়, তাহা হইলে যজমানের স্বর্গে গমন ঘটিল না। যখন এরূপ ঘোর সন্দেহের বিষয় আছে তখন সে স্থলে অনুস্তরণী না দেওয়াই ভাল, কাত্যায়ন এই

* অনুস্তরণীম্ ।৪।২।৪ (আশ্বলায়ন সূত্র); গাম্ ।৪।২।৫।; অজাং বৈকবর্ণাম্ ।৪।২।৬। কৃষ্ণামেকে ।৪।২।৭।; সব্যে বাহৌ বদ্ধ্বানু সঙ্কালয়ন্তি ।৪।২।৮।

† অনুস্তরণ্যা বপামুৎখিদ্য শিরোমুখং প্রচ্ছাদয়েৎ "অগ্নের্ব্বর্ম্ম পরিগোভির্ব্যয়স্ব ইতি ।৪।৩।১১। বৃক্কৌ উদ্ধৃত্য পাণ্যোরাদধ্যাৎ "অতিদ্রব সারমেয়ৌ শ্বানৌ" ইতি দক্ষিণে দক্ষিণম্ সব্যে সব্যম্ ।২০। হৃদয়ে হৃদয়ম্ ।২১। ইত্যাদি।

যুক্তিতে অনুস্তরণীর ব্যবস্থাকে অনিত্য করিয়া দিলেন। ইহার ফল এই হইল যে, কালে মৃত ব্যক্তির সহিত গো দগ্ধ করার প্রথা একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল।

এ সমুদায় অপেক্ষা "পুরুষমেধ" অতি ভীষণ জুগুপ্সিত বৈদিক যজ্ঞপ্রণালী। এই যজ্ঞে নর ও নারী উভয়কেই ছেদন করিয়া বলিদান করা হইত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, তস্কর, যজ্ঞাগ্নি-নির্ব্বাপক, ক্লীব, বিধিভঙ্গকারী, পুংশ্চলী প্রভৃতি কোন জাতি বা কোন পদের নর নারী ইহাতে পরিত্যক্ত হইত না। ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া কুমারী পর্য্যন্ত এক শত আশিটি এই যজ্ঞে বলি-সংখ্যা *। এই যজ্ঞ কোন্ সময় এদেশ হইতে প্রথমতঃ তিরোহিত হইল বলা বড় সুকঠিন। কেন না শ্রীকৃষ্ণ যখন জরাসন্ধকে ভৎর্সনা করেন, তখন মানুষ বধ করিয়া শঙ্করের অর্চ্চনা কোথাও দৃষ্ট হয় না, এই কথা বলেন। তাঁহার বিশেষ আপত্তি এই যে, সবর্ণ ব্যক্তি সবর্ণ জনগণকে যজ্ঞার্থ পশু করিয়াছে। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ভগীরথের উক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি আটটি সর্ব্বমেধ ও সাতটি নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন †। শঙ্করের উদ্দেশ্যে নরবলিদান দৃষ্ট হয় না শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, ইহাতে এই প্রতীত হয় যে,শঙ্করের অর্চ্চনায় নরবলি ছিল না, কেন না যে সকল বৈদিক দেবতার উদ্দেশে নরবলি দেওয়া হইত, তাহাদের মধ্যে শঙ্করের কোন নামোল্লেখ নাই। শ্রীকৃষ্ণের সময়ে যে নরমেধ উঠিয়া গিয়াছে

---

* ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণমালভেত, ক্ষত্রায়, রাজন্যম্ মরুদ্ভ্যো বৈশ্যম্ ইত্যাদি। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও বাজসনেয় সংহিতা।

† ত্রিংশদ্বর্ষসহং ব্রহ্মরথঞ্চ যজ্ঞ নিতাদ্য। অষ্টাভিঃ সর্ব্বমেধৈশ্চ নরমেধৈশ্চ সপ্তভিঃ॥ অনুশাসন পর্ব্ব ১০৩ অ, ৩৬ শ্লোক।

তাহা প্রতীত হয় না। কেন না শ্রীকৃষ্ণের সমসময়ে ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে তপস্যা, দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা পাপ মোচন করিতে উপদেশ দেন। এই উপদেশ মধ্যে রাজসূয় ও অশ্বমেধের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বমেধ ও নরমেধ অনুষ্ঠান করিবারও উপদেশ আছে *। ইদানীন্তন কাল পর্য্যন্তও যে নরবলিদানের প্রথা ছিল, তাহা যজ্ঞমধ্যে গণ্য নহে। মহাভারতের সময়ে গোমেধ ছিল কি না, ইহা জিজ্ঞাস্য বটে। এ সময়ে গোমেধ উঠিয়া গিয়াছে, ইহাই অনুমান করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে। কারণ শান্তিপর্ব্বের ২৬৪ অধ্যায়ে লিখিত আছে বিচখ্নুনামা রাজা হইতে গোহিংসা নিবৃত্ত হয়। এই বিচখ্নু নৃপতি কোন্ বংশে কোন্ সময়ে উৎপন্ন, ইহা বলিতে পারা যায় না। মধুপর্কে গোবধ বহুকাল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, ঠিক কোন্ সময়ে অপ্রচলিত হইল ইহা নির্ণয় সহজ নহে।

নারীগণের বেদাধ্যয়নাদিবিষয়ে বৈদিক ও তৎপরবর্ত্তী সময়ও অনুকূল ছিল। মনু নারীগণসম্বন্ধে বিবাহকেই উপনয়নসংস্কারের তুল্য করিয়া সেবাধর্ম্মকেই তাঁহাদিগের সম্বন্ধে বেদাধ্যায়নাদিসদৃশ অনুষ্ঠেয় বিষয় করিয়াছেন, কিন্তু স্মার্ত্তসময়েও যে কোন কোন নারী ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নে জীবনাতিপাত করিতেন না, ইহা মনে হয় না। যত দিন বৈদিক যজ্ঞ প্রচলিত ছিল, তত দিন পত্নীর যজ্ঞাধিকার ছিল, এবং তিনি যজ্ঞোপবীতিনী হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে যোগ দিতেন ইহা বিশ্বাস করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে §।

---

* রাজসূয়াশ্বমেধৌ চ সর্ব্বমেধঞ্চ ভারত। নরমেধঞ্চ নৃপতে ত্বমাহর যুধিষ্ঠির॥ অশ্বমেধপর্ব্ব ৩অ, ৮ শ্লোক।

† প্রাবৃতাং যজ্ঞোপবীতিনীম্। গোভিল সূত্র।

পুরাকল্পেষু নারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা॥

স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত এই প্রমাণে নারীগণের বেদাধ্যয়নে অধিকার স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। বৈদিক সময়ে নারীগণের পাণ্ডিত্যের পরিচয় আমরা বিশেষরূপে দেখিতে পাই। যাঁহারা ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন, তাঁহারা শাস্ত্রচিন্তায় তত্ত্বচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিতেন। পরসময়বর্ত্তী নারীগণ যে বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। বেদাধ্যয়নে তাঁহারা অনধিকারিণী হইয়াও অন্যান্য শাস্ত্রে তাঁহাদের অধিকার অবশ্য অক্ষুণ্ণ ছিল।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে সময়ে সময়ে যে হিন্দুধর্ম্মে ঘোর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না। তবে এই সকল পরিবর্ত্তন সর্ব্বসময়ে উন্নতির জ্ঞাপক বলিতে পারা যায় না। এক সময়ে ঋষিগণের মধ্যে ঘোরতর ব্যভিচার উপস্থিত হয়। মদ্যপান অগম্যাগমনাদিতে ঋষিকুল একেবারে কলঙ্কিত হইয়া উঠে। এই উপলক্ষ করিয়া কুমারিকাতন্ত্রে লিখিত হইয়াছে,

পুরা দারুবনে কেচিৎ ঋষয়ঃ কামমোহিতাঃ।
পরস্ত্রিয়ং ধর্ষয়ন্তি মদ্যং পাবন্তি নিত্যশঃ॥ ইত্যাদি।

ঋষিগণের ঈদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া বিষ্ণু নিতান্ত ভীত হইলেন তিনি শিবের নিকট গিয়া আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বিষয় বর্ণন করিলেন। শিব অতি তেজস্বী পুরুষ, তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, আমি কালীতারাময় উৎপাদন করিয়া এই মতে এই সকল ব্যক্তিকে দীক্ষিত করিব এবং তদ্দ্বারা ভোগের ভিতর দিয়া তাহাদিগকে পুনরায় সৎপথে আনয়ন করিব। সমাজে ঘোর পতনের অবস্থায় যে তন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে কো

ন্দেহ নাই; কেন না স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য তাঁহার গ্রন্থে শাম্বপুরাণোক্ত র একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ইহাই স্পষ্ট প্রকাশ পায়।

বেদাদ্‌ভ্রষ্টঃ স্মৃতিপ্রোক্তপ্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখঃ।
ক্রমেণ শ্রৌতসিদ্ধ্যর্থং ব্রাহ্মণস্তন্ত্রমাশ্রয়েৎ॥

"বেদ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে, স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত অবলম্বন করিতেও একান্ত বিমুখ, এরূপ স্থলে পুনরায় বৈদিক আচরণে প্রত্যাবর্ত্তন জন্য ব্রাহ্মণ তন্ত্র আশ্রয় করিবে।" ঘোর ব্যভিচারী পতিত ভ্রষ্ট লোকদিগকে বৈদিকাচারে প্রত্যাবর্ত্তন জন্য যে ধর্ম্মে উপায় উদ্ভাবন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, যে ধর্ম্ম সময়োচিত বিবিধ পরিবর্ত্তনের মধ্যদিয়া নিয়তকাল অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে প্রবেশ করিয়াছে, যে ধর্ম্মে সকল প্রকারের অবস্থোপযোগী বিধি নিয়ম আচরণ রীতি দৃষ্ট হয়, সে ধর্ম্ম বর্ত্তমান কালের পরিবর্ত্তিত অবস্থোপযোগী অনুশাসন প্রদর্শন করিতে অক্ষম হইবে, ইহা কেবল আলস্যবচন নহে, স্বজাতীয় ধর্ম্মের প্রতি একান্ত অনাস্থা।

বর্ত্তমান সময়ে কি কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সে সকল পরিবর্ত্তন শাস্ত্রবিরোধী কি না, সে সকল পরিবর্ত্তনে হিন্দুধর্ম্মের উচ্ছেদ হইল কি না, এ সকল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। সকল পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে একটি পরিবর্ত্তন প্রথম আলোচ্য। এ পরিবর্ত্তন ব্রাহ্মসমাজস্থাপন। ব্রাহ্মসমাজের নামে আজও অনেকের মনে ঘৃণা আছে, কিন্তু এ ঘৃণা নিতান্ত অমূলক। এদেশের ঋষিগণের আরাধ্য ব্রহ্মকে গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ ঘৃণিত হইলেন, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। বেদ উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রকে যাঁহারা এত সমাদর করেন, তাঁহারা ব্রহ্মের আরাধনা

[illegible] প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন, ইহা নিতান্ত অন্যায় ব্যবহার। তাঁহারা মনে করেন, ব্রাহ্মদিগের দ্বারা তাঁহাদের ধর্ম্মের মহাবিপ্লব সমুপস্থিত, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের মহাশত্রু, কিন্তু তাঁহারা নিশ্চয় জানিবেন, তাঁহারা যাঁহাদিগকে শত্রু মনে করিতেছেন, তাঁহাদিগের মাননীয় পূর্ব্বপুরুষ আর্য্য ঋষিগণ তাঁহাদিগকে শত্রু মনে করিতেছেন না, বরং তাঁহারা মনে করিতেছেন, যে ব্রহ্মজ্ঞান বহুযত্নে তাঁহারা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, বংশানুক্রমে যে জ্ঞান উজ্জ্বল রাখিবার জন্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞান এদেশে পুনরুদ্দীপন জন্য ব্রাহ্মগণ প্রাণগত যত্ন করিতেছেন। যদি হিন্দু বলিয়া কাহারও অভিমান করিবার বিষয় থাকে, তাহা হইলে আমাকে বলিতে হয়. আমরা হিন্দুর হিন্দু, কেন না আমাদিগের প্রচারিত ধর্ম্মে এমন কিছু নাই, যাহা উচ্চতম হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। আর্য্যধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই অনুরোধে হিন্দুর হিন্দু বলিলাম। ফলতঃ হিন্দুশব্দ অশাস্ত্রীয়, কোন শাস্ত্রে হিন্দু নাম নাই। হিন্দুনাম মুসলমানগণের প্রদত্ত। মুসলমান ভাষায় হিন্দুশব্দের অর্থ দাস, দস্যু ও চোর। হিন্দুশব্দে কৃষ্ণবর্ণও বুঝায়। হিন্দু নাম পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যনাম গ্রহণ করিলে হৃদয় উদার হয়, পৃথিবীস্থ সকল আর্য্যের সহিত নিকটসম্বন্ধ অনুভূত হয়, ভিতরকার শোণিত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এত পরিবর্ত্তনের মধ্যে যদি হিন্দুনাম পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহা হইলে কল্যাণ ভিন্ন অকল্যাণের সম্ভাবনা কিছুই নাই।

হিন্দুসমাজের ভিতর হইতে ব্রাহ্মসমাজের উত্থান, ইহা যতই কেন অসামাজ্ঞ বলিয়া মনে হউক না, একদপেক্ষা অসামাজ্ঞ

বর্ত্তন হিন্দুসমাজে ঘটিয়াছে। বেদ, উপনিষৎ, স্মৃতি, পুরাণ, সকলই ব্রহ্মজ্ঞানের অনুকূল, সকলেই এই জ্ঞানকে সর্ব্বোচ্চ ন অর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং শাস্ত্রের ভূমিতে দাঁড়াইয়া কেহ হ্মসমাজের প্রতিবাদ করিবেন, তাহার অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই, ন্তু যে সকল পরিবর্ত্তনের পক্ষে স্মৃত্যাদি শাস্ত্র স্পষ্ট বিরোধী তাহা আসিয়া হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিল কি প্রকারে, কেনই বা তাহার প্রতিরোধ করিবার জন্ত সকলে বদ্ধপরিকর নন, ইহার গূঢ় হেতুই বা কি, এ সকল এ দেশের অল্প লোকেই ভাবিয়া থাকেন। যদি তাঁহারা এ বিষয় ভাল করিয়া ভাবিতেন তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, পূর্ব্বকালে যাঁহার প্রভাবে বৈদিক সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এখনও তাঁহারই প্রভাবে এ সমুদায় পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। অনেকে বলিবেন, বহুকাল হইল ভারতবর্ষ ম্লেচ্ছ রাজগণের অধীন হইয়াছে, সুতরাং রাজপ্রভাবে ঈদৃশ পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। যদি তাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্ত করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত, এ রাজপ্রভাবের মূল কোথায়? রাজগণের মধ্যে ঈশ্বরের বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য অবস্থান করিতেছে, ঈশ্বরের শক্তি তাঁহাদিগের ভিতর দিয়া জনসমাজের উপরে কার্য্য করিতেছে, ঈশ্বর স্বয়ং সিংহাসনে না বসাইলে কাহারও সামর্থ্য নাই যে, আপনি রাজপ্রভাব লোকদিগের উপরে বিস্তৃত করেন এ চিন্তা প্রতি হিন্দুর মনে স্থান পাইলে উহা শাস্ত্রানুযায়ী হইবে এবং দেশের প্রকৃত কল্যাণের হেতু হইবে। এই রাজপ্রভাব প্রথমতঃ রাজভাষা শিক্ষার দিকে লোককে নিয়োগ করে। মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দুগণ পার্সি ও আরব্য ভাষা অকাতরে শিক্ষা করিতেন, সময়ে সময়ে এই ভাষা শিক্ষার ফল এই হইত যে, কেহ

কেহ প্রকাশ্যে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন, কেহ বা অন্তরে মুসলমান হইয়া সমাজের সহিত মিলিত হইয়া থাকিতেন, গোপনে মুসলমানগণের রীতিতে উপাসনা করিতেন। তবে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, পারস্য বা আরব্য ভাষাতে নিতান্ত নিপুণ হইয়াও, সে ভাষা পাঠকালে বিজাতীয় ঈশ্বরবাচক শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ও বিজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াও, অপরের মুখে কোরাণের বাক্য শ্রবণে তাঁহাদিগের অপ্রবৃত্তি। এখন মুসলমান রাজ্যের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে আরব্য পারস্য ভাষার তিরোধান হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজী ভাষা এখন তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে।

ন ম্লেচ্ছভাষাং শিক্ষেত।

কূর্ম্ম পুরাণের এ অনুশাসন আজ ছয় শত বৎসরের অধিককাল হইতে এ দেশে অনাদৃত হইয়া আসিতেছে। ম্লেচ্ছগণ অনার্য্যজাতি নহেন, তাঁহারা পতিত আর্য্য এ কথা বলিয়াও রক্ষা পাইবার উপায় নাই, কেন না পতিতের সহিত অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি কার্য্যের সম্বন্ধ রাখা সর্ব্বথা নিষিদ্ধ, উহাতে পতিত হইতে হয় *।

শাস্ত্রে যাহা স্পষ্ট নিষিদ্ধ হইয়াছে, সমুদায় ভারতবর্ষের উচ্চ বংশীয় লোকেরা নিরন্তর তাহার অনুষ্ঠান করিতেছেন, ইহাতে শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা পাইল কোথায়? আর হিন্দুত্বই বা অক্ষুণ্ণ রহিল কি প্রকারে? মহাভারতের সময়ে যুধিষ্ঠিরাদি যবনভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন, এ কথা বলিলে এ সময়ে তাহা চলিবে কেন? উহা যে পরবর্ত্তী শাস্ত্রকর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে। এখন কেবল ম্লেচ্ছভাষা

---

* যাজনং যোনিসম্বন্ধং তথৈবাধ্যাপনং দ্বিজঃ। কৃত্বা সদ্যঃ পতেৎ[illegible] সহভোজনমেব চ॥ অজ্ঞানাদথবা মোহাৎ কুর্য্যাদধ্যাপনং দ্বিজঃ। সংবৎসরেণ পততি সহাধ্যয়নমেব চ॥ কূর্ম্মপুরাণ।

শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহা নহে, যেখানে ম্লেচ্ছেরা অধ্যাপক অথবা ম্লেচ্ছগণের সঙ্গে অধ্যয়ন করিয়া তদ্ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মে, সেই স্থানে অধ্যয়ন করিবার জন্য দেশীয় যুবকেরা নিতান্ত ব্যাকুল। এই অশাস্ত্রীয় পাতিত্যসাধক ব্যবহার একেবারে দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে, সহস্র যত্ন করিয়াও আর এই পাতিত্যসাধক ব্যবহার হইতে কেহ দেশ রক্ষা করিবেন তাহার উপায় নাই। এখন উচ্চতম শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিম্নতর শাস্ত্রের নিষেধ অকর্ম্মণ্য করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেই নিষ্কৃতি।

মনু যাহা বলেন, তাহার নিকটে সকল শাস্ত্রকারের মস্তক অবনত করিতে হয়, তাঁহার সাহায্য বিনা বর্ত্তমান ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত কিছুতেই নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। এখনকার অগ্রগামী অনেক লোক মনুর প্রতি নিতান্ত বিরক্ত। তাঁহার Criminal Law (দণ্ডবিধি) অত্যন্ত কঠোর, পক্ষপাতদোষে দূষিত, এজন্য তাঁহার প্রতি অনেকে কটাক্ষপাত করেন। ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্র তর্ক করিলে তাহার মুখে উষ্ণ তৈল ঢালিয়া দেওয়া হইবে, এ সকল ব্যবস্থা শুনিলে এখন শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠে; কিন্তু মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের ব্যবহার এ সময়ের সঙ্গে তুলনা করা কিছুতেই উচিত নয়। সে সময়ে এরূপ রাজবিধি নিবদ্ধ করিবার কি প্রয়োজন ছিল, এখন কি প্রকারে বুঝা যাইবে? সুতরাং এই সকল কঠোর ও ন্যায়বিধির বিরোধী দণ্ডাজ্ঞা সকল আলোচনা করিয়া মনু যে সকল উচ্চ ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, তৎপ্রতি অনাদর কিছুতেই শোভা পায় না। আমাদের নিয়ম এই যে, আমরা সকল শাস্ত্রের উচ্চতমাংশ গ্রহণ করি, নিম্নতমাংশের দোষগুণবিচারে প্রবৃত্ত হই না, কেন না তাহাতে ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা। এই নিয়মাবলম্বনে মনুর সাহায্যে বর্ত্তমান

ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত কি প্রকারে সিদ্ধ হয় তাহাই দেখা যাউক। মনু বলিয়াছেন,

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥

কল্যাণকরী বিদ্যা যদি ইতরজাতি হইতে গ্রহণ করা যাইতে পারে, অন্ত্যজ জাতি হইতেও পরম ধর্ম্ম গ্রহণ যদি ব্যবস্থাসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে এখনকার ব্যবহার মনুর অভিপ্রায়সম্মত, ইহা কে আর অস্বীকার করিবেন? কল্লুক ভট্ট এই শ্লোকের অর্থ সুস্পষ্ট করিবার জন্য মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্মের এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন,

প্রাপ্য জ্ঞানং ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়াদ্বা বৈশ্যাৎ শূদ্রাদপি নীচাদভীক্ষ্ণম্।
শ্রদ্ধাতব্যং শ্রদ্দধানেন নিত্যং ন শ্রদ্ধিনং জন্মমৃত্যু বিশেতাম্॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং শূদ্র হইতেও * যাঁহারা নীচ তাঁহাদিগের হইতে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করা যাইতে পারে, ইহা যদি শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে এখনকার পরিবর্ত্তিত আচরণ শাস্ত্রবিরোধী কি প্রকারে নির্ণীত হইতে পারে? বরং এই কথা বলা যাইতে পারে, যাঁহারা বিদ্বেষপরবশ হইয়া উৎকৃষ্টতর জ্ঞান ম্লেচ্ছের নিকট হইতে শিক্ষা করিতে ঘৃণা বা পাতিত্যসাধক মনে

---

* শ্লোকস্থ 'নীচ' শব্দ শূদ্রশব্দের বিশেষণ করিয়া অর্থ করিলেও কিছু ক্ষতি হয় না। কারণ পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে চারিবর্ণমাত্রের উল্লেখ না থাকিলেও পৃথিবীতে যত বর্ণ আছে সকলই এই চারি বর্ণের অন্তর্গত, ইহা যখন শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা, তখন ম্লেচ্ছগণ ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইয়া শূদ্রমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। উপরে 'নীচ' শব্দ স্বতন্ত্র করিয়া ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন এই যে, শাস্ত্রমতে ম্লেচ্ছগণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেও সৎশূদ্রাদির শূদ্র হইতে নীচ এবং দস্যুমধ্যে গণ্য।

রেন, তাঁহারা শাস্ত্রের উচ্চতম আদেশের প্রতি অবহেলা করেন। সুতরাং কেবল অর্থের জন্য শিক্ষা করিলে শাস্ত্রমতে নিন্দনীয় হইতে পারে, কিন্তু যেখানে উচ্চতম জ্ঞানলাভের জন্য সেই ভাষা অবলম্বন করিতে হয়, সেখানে এ কালে বা কোন কালে শাস্ত্রমতে সে ভাষা শিক্ষা অবৈধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

ম্লেচ্ছগণের নিকটেও শ্রদ্ধার সহিত তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করিলে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জন্ম মৃত্যু অতিক্রম করিবে, শাস্ত্র যখন স্পষ্ট বাক্যে এই কথা বলিতেছেন, তখন যাঁহাদের শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা বিদেশীয় সাধু মহাজনগণের প্রতি কোন প্রকার বিদ্বেষ হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন না। ম্লেচ্ছগণের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া যাঁহারা বাইবেল কোরাণ প্রভৃতিকে ঘৃণা করেন, তাঁহারা শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতেছেন। মহাভারতের মোক্ষধর্ম্মে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে,

সর্ব্বে বর্ণা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মজাশ্চ সর্ব্বে নিত্যং ব্যাহরন্তে চ ব্রহ্ম।
তত্ত্বং শাস্ত্রং ব্রহ্মবুদ্ধ্যা ব্রবীমি সর্ব্বং বিশ্বং ব্রহ্ম চৈতৎ সমস্তম্॥

"সকল বর্ণ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, অতএব ব্রাহ্মণ; সকল বর্ণই নিত্যকাল বেদ প্রচার করিয়া থাকে, ব্রহ্মবুদ্ধিতে তত্ত্ব ও শাস্ত্র বলিতেছি, সকল বিশ্ব ব্রহ্মময়, সমস্তই ব্রহ্মে পরিব্যাপ্ত।" এ অনুশাসন অনুসারে যিনি যেখানে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি যে কোন দেশ কাল বা জাতির লোক হউন না কেন, তৎপ্রতি শ্রদ্ধা করিয়া তাঁহার নিকটে সেই তত্ত্ব শিক্ষা করিতে হইবে। এ স্থলে ম্লেচ্ছজ্ঞানে কাহাকেও ঘৃণা করিলে মুক্তির পথ অবরুদ্ধ হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাঁহারা মনে করেন, ম্লেচ্ছগণের নিকটে ব্যবহারিক শাস্ত্র শিক্ষা করা যাইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করা যাইতে পারে না, তাঁহারা শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্মজ্ঞ নহেন, অথবা

উচ্চতম শাস্ত্রের প্রতি একান্তদৃষ্টিশূন্য। এ সকল ব্যক্তির ঈশ্বরে বিশ্বাসও নিতান্ত দুর্ব্বল, অন্যথা যিনি হিন্দুসমাজের যে সকল লোকের শাস্ত্রজ্ঞান নাই তাঁহাদিগকেও ঠিক প্রাচীন শাস্ত্রের বিধি অনুসারে সর্ব্ববিষয়ে পরিবর্ত্তিত করিয়া তুলিয়াছেন, তৎকৃত পরিবর্ত্তন অবশ্য শাস্ত্রসম্মত ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিয়া লইতেন। ব্রাহ্মগণ ম্লেচ্ছাদি ভেদ না করিয়া সকল দেশের সাধু মহাজনগণের নিকট হইতে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করেন, ইহাতে যে তাঁহারা ঠিক শাস্ত্রের অনুবর্ত্তন করিতেছেন, তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যাঁহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দান করেন, তাঁহাদের এ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের অনুশাসন অনুবর্ত্তন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ম্লেচ্ছের নিকটে জ্ঞানশিক্ষা অশাস্ত্রীয় নহে, ইহা অনেকে মানিতে পারেন, কিন্তু এ সময়ে জাতিভেদের প্রথার যে উচ্ছেদ হইতেছে, ইহাতে হিন্দুধর্ম্ম একান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত সকলেই মনে করিতেছেন। হিন্দুধর্ম্ম যেন আর কিছুই নহে কেবল জাতিভেদবিচার, ইহাই অনেকের ধারণা। এরূপ ধারণা থাকিয়া কি লাভ? সকল হিন্দুর গৃহেই জাতিভেদ উচ্ছেদের প্রচুর পরিমাণ আয়োজন বিদ্যমান। ফলতঃ এখন সকলেই জানিতেছেন, জাতিভেদপ্রথা কল্পিত, বাস্তবিক সত্য নয়। শাস্ত্রকারেরা যে মূলের উপরে বর্ণাশ্রমভেদ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, ইহা বলা দুঃসাধ্য। তবে ইহা বলা যাইতে পারে, ব্রাহ্মণের সন্তান হইলেই ব্রাহ্মণ হইবে, শূদ্রের সন্তান হইলেই শূদ্র হইবে, ইহা কল্পনা ও অত্যাচার। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

"পুরুষের বর্ণাভিব্যঞ্জক (শমদমাদি) যে সকল লক্ষণ বলা হইয়াছে, যদি অন্যত্রও সেই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই লক্ষণ দ্বারাই বর্ণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে।" এ ব্যবস্থা অনুসারে, যিনি যে কোন জাতীয় লোক হউন না কেন, লক্ষণানুসারে তিনি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র বলিয়া গণ্য হইবেন। ফলতঃ লক্ষণ বা চরিত্রানুসারে বর্ণভেদ, ইহার প্রমাণ শাস্ত্রে ভূরি ভূরি আছে। একই ব্যক্তির পুত্রগণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র হইলেন, তাঁহাদিগের চরিত্র অনুসারে বর্ণ বিভাগ হইল, ইহা আর কে না অবগত আছেন *? ঋগ্বেদের সময়ে বর্ণভেদপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। আর্য্য ও দস্যু এই মাত্র প্রভেদ উহার সর্ব্বত্র উল্লিখিত আছে। তবে ঋগ্বেদের অন্তিমভাগে দশম মণ্ডলে পুরুষ সূক্তে পুরুষের রূপকল্পনামধ্যে এই ঋক্‌টি দেখিতে পাওয়া যায়,

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যকৃতো।
উরূ তদস্য বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

ব্রাহ্মণ ইঁহার মুখ, ক্ষত্রিয় ইঁহার বাহু, বৈশ্য ইঁহার উরু, ইহা সুস্পষ্ট পুরুষের রূপ কল্পনা। 'পা হইতে শূদ্র জন্মিল' এরূপ অর্থ করিলে এই ঋক্‌টি বর্ণভেদের ব্যবস্থাপক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু পূর্ব্বের বর্ণনাগুলির সহিত একতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত 'পদের

---

* পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রা স্তথৈবচ॥ হরিবংশ ২৯ অ।

এ সকল প্রভেদের কারণ যে কর্ম্মের বিচিত্রতা বায়ুপুরাণ তাহা স্পষ্ট বাক্যে উল্লেখ করিয়াছেন। "এতস্য বংশে সম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ।" বিষ্ণুপুরাণ গৃৎসমদের পুত্র শুনককে চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রবর্ত্তয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অন্ত শূদ্র হইল' এরূপ অর্থ করাই শোভা পায়। কিন্তু যখন এই শ্রুতিটি অবলম্বন করিয়া পরসময়ে বর্ণভেদপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং এক ব্রহ্ম হইতেই সকল বর্ণের উৎপত্তি সমুদায় শাস্ত্র স্বীকার করিয়াছেন, তখন "সর্ব্বে বর্ণা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মজাশ্চ" মহাভারতের এই কথা আশ্রয় করিয়া সকল বর্ণকেই উচ্চ অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা শ্রেয়স্কর। ইহারা পতিত, ইহারা ভ্রষ্টাচার, এই সকল কথা মুখে তুলিয়া স্বজাতির শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিবার যত্ন একালে বৃথা, কেন না পাতিত্যদোষ ঘটে নাই, হিন্দুসমাজে এরূপ এক জন লোকও পাওয়া বিরল। যদি কেহ বলেন, আমি নিতান্ত শুদ্ধাচার, তবে তিনি সংস্রবদোষে পতিত হইয়াছেন ইহা তাঁহাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে *। ফলতঃ আপনাকে শূদ্রবৎ জ্ঞান করিয়া অপর সকলকে ব্রাহ্মণজ্ঞানে সম্মান দান, ইহা শাস্ত্রসম্মত সমীচীন পন্থা †।

এ সময়ে সকল বর্ণের বিমিশ্রভাব উপস্থিত। গোপনে বা প্রকাশ্যে সকলেই সকলের অন্নপান ভোজনে প্রবৃত্ত। ম্লেচ্ছান্ন এখন অনেকের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরে বৈষ্ণব বেশ, গোপনে ম্লেচ্ছপাচিত মাংসাদিতে উদরের তৃপ্তিসাধন, ইহা আর এখন বিরল ব্যবহার নহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুশ্রূষাপরায়ণ শূদ্রের অন্নভোজনে ব্যবস্থা দিয়া শাস্ত্রকারেরা বর্ত্তমান

---

* কলিকালে সংস্রব দোষ নাই এ কথা বলা বৃথা। দেবল বলিয়াছেন, "পতিতেন সহোষিত্বা জানন্ সংবৎসরং নরঃ। মিশ্রিতস্তেন সোঽব্দান্তে স্বয়ং পতিতো ভবেৎ॥

† সম্মানাদ্ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব। অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষে-দবমানস্য সর্ব্বদা॥ মনু।

সময়ের ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং এ ব্যবহার শাস্ত্রের একান্ত বিরোধী, ইহাই বা বর্ত্তমান হিন্দুগণ কি প্রকারে সিদ্ধান্ত করিবেন *। ম্লেচ্ছগণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, এখন তাঁহারা ম্লেচ্ছাচার পরিত্যাগ করিয়া উচ্চতম জ্ঞানের সোপানে আরোহণ করিয়াছেন; তাঁহাদের সহিত আহারব্যবহারে হিন্দুধর্ম্মের বিলোপ নির্দ্দিষ্ট করা অসঙ্গত বলপ্রকাশ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এ বল প্রকাশ আর কার্য্যকর হইতেছে না, কেন না ইংলণ্ড হইতে সমাগত ব্যক্তি-গণের সঙ্গে পান ভোজন সামাজিক ভোজেও চলিতেছে। ফলতঃ যাহা শাস্ত্রসম্মত নয়, কেবল বলপ্রকাশমাত্র তাহা কখন জনসমাজে বহু দিন দাঁড়াইতে পারে না। একটি বিষয়ে হিন্দুগণ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন, সে আপত্তিতে আমার সহানুভূতি নাই তাহা নহে, কেন না আমি নিজে নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতী। এ আপত্তি অভোজ্যভোজন। যাঁহারা এক বার ইংলণ্ডের গোমাংস ভোজন করিয়াছেন, শুনিতে পাই তাঁহারা উহার আস্বাদে এমনই মুগ্ধ যে, সকল মাংস ছাড়িয়া সেই মাংসভোজনে নিতান্ত লোলুপ হন। এটি হিন্দুর পক্ষে নিতান্ত ঘৃণাকর সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈদিক আচরণ স্মরণ করিয়া ইহা যে ক্ষমার যোগ্য তাহা সকলকেই মানিতে হইবে। রঘুনন্দনধৃত শাম্বপুরাণের বচনে যখন বৈদিক আচরণে প্রত্যাবৃত্তি উচ্চতম উদ্দেশ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন যাঁহারা সে মাংসের আস্বাদ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা বৈদিক আচরণ বলিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিবেন বিচিত্র কি? এ ঘোর পরিবর্ত্তনের সময়ে কিছু দিন এ সম্বন্ধে ক্ষমার দৃষ্টিতে যুবক ও

---

* দ্বিষু বর্ণেষু কর্ত্তব্যং পাকভোজনমেব চ। শুশ্রূষাভিগতানাং শূদ্রা-ণাঞ্চ মহামুনে॥ আদিত্যপুরাণ।

ধনিসন্তানগণের প্রতি দৃষ্টি করা হিন্দুসমাজের পক্ষে অকল্যাণকর নহে। প্রাচীন আর্য্যগণ যে কারণে ঈদৃশ আহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সে কারণ প্রত্যাবর্ত্তন করিবে এবং এ দূষিত ব্যবহার আপনা হইতে তিরোহিত হইয়া যাইবে।

বুদ্ধের আগমনে জাতিভেদ যখন এদেশে শিথিলবন্ধন হইল, অনুপযুক্ত পাত্রে উচ্চজাতিত্বের অভিমান কেবল অবিচার ও অত্যাচার ইহা যখন সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইল, তখন পৌরাণিকেরা সত্য ও ন্যায়ের ভূমিতে মানবীয় উচ্চতা ও নীচতার ব্যবস্থা করিলেন। ঈশ্বরের প্রতি একান্ত ভক্তিতে মানবের উচ্চতা লাভ হয়, সংসারের প্রতি আসক্তিতে উচ্চ বংশীয়েরাও হীন হইয়া যান, ইহা কে না আর প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছেন? এই প্রত্যক্ষ ব্যাপার দর্শন করিয়া পৌরাণিকেরা বলিলেন,

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনে তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

"হরিভক্তি পরায়ণ চণ্ডালও দ্বিজ হইতে শ্রেষ্ঠ। হরিভক্তি-বিহীন হইলে দ্বিজও চণ্ডালাপেক্ষা অধম।" এই নিয়ম অবলম্বন করিয়াই ভাগবত বলিলেন,

"যদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে"
"বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্‌গুণযুতাৎ শ্বপচোবরিষ্ঠঃ"।

হরিতে ভক্তিমান্ হইলে 'চণ্ডালও তৎক্ষণাৎ যজ্ঞ করিবার উপযুক্ত হয়' 'দ্বাদশগুণযুক্ত বিপ্র হইতেও চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ'। যবনাদি সকল নীচযোনি ঈশ্বরের কেন, ভক্তগণের অনুসরণ করিলে পবিত্র হইয়া যায়, শুকদেব একথা স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন,

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসা আভীরকঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

কেবল ভক্তিশাস্ত্রই এরূপ বলিয়াছেন, তাহা নহে, জ্ঞানপক্ষেও তাহাই সর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা। বাল্যকালে যখন অন্য কোন শাস্ত্র পাঠ করা হয় নাই, তখন এক গীতা পাঠ করিয়াই জাতিভেদপ্রথার অসারত্ব আমার হৃদয়ঙ্গম হয়। গীতা স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছেন,

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥
ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

ব্রহ্ম স্বয়ং নির্দ্দোষ, তিনি সকলকে সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন, তাঁহার অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মণ চণ্ডালাদিকে যাঁহারা সমদৃষ্টিতে দেখেন, তাঁহারা সংসারকে জয় করেন, ইহা বলিয়া গীতা জ্ঞান-পক্ষেও বর্ণভেদের অসারতা বিলক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলতঃ এ সকল ভেদবুদ্ধি অভিমানবিজৃম্ভিত, ইহাতে ঈশ্বর কখন পরিতুষ্ট হন না, ইহাতে কেবল আধ্যাত্মিক হীনতা প্রকাশ পায়, শাস্ত্র ভূয়োভূয়ঃ একথা বলিয়া জাতিভেদের অন্তঃসারশূন্যতা বিলক্ষণ প্রতিপাদন করিয়াছেন *। দেশে এ সময়ে শাস্ত্রপ্রচার বহুল পরিমাণে হই-তেছে, সেই সকল শাস্ত্র পাঠ করিয়া যদি বিনষ্টপ্রায় জাতিভেদ আরও বিনষ্ট হয়, তাহাতে আক্ষেপ করিবার কারণ নাই। যাহাতে স্বদেশীয়গণের মন তত্ত্বজ্ঞানের দিকে—ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমান সময়ের পরিবর্ত্তনসমূহের উপযোগী অবস্থা ধারণ করিতে পারে, প্রত্যেক দেশহিতৈষী হিন্দুর

* ন যস্য জন্মকর্ম্মাভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥
ভাগবত ১১ স্ক।

তৎপক্ষে যত্ন করা একান্ত কর্ত্তব্য। কমুটের শিষ্যগণের ন্যায় অন্তরে প্রচলিত ধর্ম্মাদির উপরে আস্থাশূন্য হইয়া বাহিরে লৌকিক ধর্ম্মাদি রক্ষা করিবার যত্ন, এ সময়ে দেশের ঘোর অনিষ্ট সাধন করিতেছে। কপটাচরণে দেশ যে অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িবে, অধর্ম্ম আসিয়া সর্ব্বথা উহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। যাহার অবাস্তবিকতা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, গোপনে তাহার উচ্ছেদসাধন করিয়া স্বার্থানুরোধে বা লোকভয়ে বাহিরে কপটাচরণ, এতদপেক্ষা নিন্দনীয় অকল্যাকর ব্যবহার আর কি হইতে পারে? ব্রাহ্মগণ এই কপটাচরণে প্রবৃত্ত নন, এজন্য তাঁহারা দেশীয়গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া থাকেন, ইহা কখন ধর্ম্মসঙ্গত নহে।

হিন্দুসমাজে গূঢ় ও প্রকাশ্য ভাবে যে সকল পরিবর্ত্তন উপস্থিত তাহার আলোচনা হইল, এবং এ সকল পরিবর্ত্তনের মূলে যে বিধাতার হস্ত আছে, ও এ সকল যে উচ্চতম শাস্ত্রসঙ্গত, তাহাও প্রদর্শিত হইল, এখন দেখা উচিত যে, হিন্দুসমাজের মধ্যে সেই উচ্চ ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রবেশ করিতেছে কি না, যাহাতে এই সকল পরিবর্ত্তিত আচার ব্যবহার হিন্দুসমাজের উচ্ছেদের কারণ না হইয়া, উহার উন্নতির কারণ হইবে। কিছু দিন পূর্ব্বে শিক্ষিত যুবকগণ এ দেশের শাস্ত্রাদি কিছুই নয়, এই বলিয়া যৎপরোনাস্তি শাস্ত্রসমূহকে ঘৃণা করিতেন, এখন আবার তাহার বিপরীত ভাব উপস্থিত। অল্প দিন হইল শিক্ষিতগণ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত এমন উন্নতির ব্যাপার হয় নাই, যাহা আমাদের দেশের শাস্ত্রে নাই। বর্ত্তমানকালের আবিষ্কৃত সমুদায় বিষয়গুলিই তাঁহারা শাস্ত্র-প্রমাণে প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিতেছেন। সংস্কৃত ভাষার যদৃচ্ছাক্রমে অর্থান্তর করা যাইতে পারে, বৈদিক ভাষা এমনই

অবোধ্য যে, যে কোন অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া লইতে পারা যায়। ভাষার অর্থান্তরতার সামর্থ্য অবলম্বন করিয়া আপনাদের দেশের গৌরববর্দ্ধন করিবার জন্য যত্নে মিথ্যা দেশানুরাগ ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায়না। দু একটি শব্দের অর্থান্তর সাধন ব্যতীত যে স্থলে আর কোন উপায় নাই, সে স্থলে তাদৃশ উপায় পরিহার করাই উচিত। শাস্ত্রে যে সকল বিষয়ের স্পষ্ট নির্দেশ আছে. এবং যে সকল নির্দ্দেশ ইতিহাস-সঙ্গত তাহা অবলম্বন করিলেই যথেষ্ট হইল। ইহা অতি সুখের বিষয় যে, এখন প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিতের হাতেই এক এক খানি গীতা দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুগণ যাহাই বলুন, ইহা যে ব্রাহ্মসমাজের যত্নের ফল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দেশের সর্ব্ব প্রকার উন্নতি ধর্ম্মোন্নতির উপরে নির্ভর করে। সে দিকে দেশীয় ব্যক্তিগণের চিন্তার গতি হইয়াছে, ইহা নিতান্ত আহ্লাদের বিষয়।

দেশের ভিতরে যে সকল পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হিন্দুধর্ম্মের নিম্নভাগের উপযোগী নহে, উচ্চতম ভাগের উপযোগী। অতএব হিন্দুধর্ম্মের উচ্চতম বিভাগের সংক্ষেপে আলোচনা না করিয়া বলা শেষ করা কিছুতেই উচিত নহে। হিন্দুগণের ধর্ম্ম কি? জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই উত্তর দেন, পৌত্তলিকতা। এরূপ উত্তর শাস্ত্রানুসারে হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা। হিন্দুধর্ম্ম আধ্যাত্মিকতার যে ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেখান হইতে তাহাকে অবতারণ করিয়া নিম্নভূমিতে আনিয়া নিক্ষেপ করা ইহা নিতান্ত অত্যাচার। সর্ব্বভূতে ও হৃদয়ে অবস্থিত ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিতে অসমর্থ মূঢ় ব্যক্তি তদনুকল্পে প্রতিমাদি অবলম্বন করিয়াছে, এখন ইহা-কেই হিন্দুধর্ম্মের চরম বলা, উহার নিন্দা ভিন্ন আর কি হইতে

পারে * ? হিন্দুধর্ম্মে আচার ব্যবহারের পর পর পরিবর্ত্তন যে প্রকার হইয়াছে, ধর্ম্মসম্বন্ধেও সেই প্রকার পর পর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ভাগবত এই পর পর পরিবর্ত্তন একটি শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছেন,

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

"তত্ত্ববিদেরা এক অদ্বয় জ্ঞানবস্তুকেই তত্ত্ব বলেন। এই তত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন।" ব্রহ্ম বৃহত্ত্বে সমুদায় বিশ্বব্যাপী, সুতরাং বিশ্বের সমুদায় বস্তুতে ব্রহ্ম দর্শন ইহা সর্ব্বপ্রথম সোপান। বেদ এই সোপান প্রদর্শন করে। প্রাকৃতিক পদার্থনিচয়ে ব্রহ্মদর্শন বেদের ইহাই মূলতত্ত্ব। বৈদিক সময়ে কর্ম্ম সর্ব্বপ্রধান। জগতে নিয়ত ব্রহ্মের ক্রিয়াশালিত্ব আর্য্যগণ অবলোকন করিয়া একান্ত ক্রিয়াশালী হইবেন, ইহা আর অস্বাভাবিক কি ? বেদান্ত বাহিরের বিষয় সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে অন্তরের দিকে অগ্রসর হইলেন। হঠাৎ বাহির ছাড়িয়া অন্তরে প্রবেশ হইতে পারে না, এজন্য অন্তর্ব্বাহ্য ইন্দ্রিয়গণ হইতে প্রাণে, প্রাণ হইতে পরমাত্মাতে বেদান্তের প্রবেশ হইল। বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠান একেবারে পরিত্যক্ত হইতে পারে না, এজন্য আহার পান ভোজনাদি সকল প্রকারের দৈহিক ক্রিয়াকে বেদান্তবাদিগণ যজ্ঞমধ্যে পরিগণিত করিয়া লইলেন। যজ্ ধাতুর অর্থ দেবপূজা ; সুতরাং স্বাভাবিক ক্রিয়মাত্রই দেবতার ইচ্ছাপালন, তাঁহার অর্চ্চনা, বিশেষ বিশেষ যজ্ঞ, ইহা স্থির করিয়া বেদান্তবাদিগণ উন্নতির ভূমিতে আরোহণ করিলেন।

---

* অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ। যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ॥ যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্। হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥ ভাগবত, ৩স্ক।

ব্রহ্মদৃষ্টৈকৎকর্ষাৎ।

এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি কলেতে তাঁহারা ব্রহ্মদর্শনপ্রণালী স্থাপন করিলেন। আত্মাতে রমাত্মাকে দর্শন করাই বেদান্তবাদিগণের চরমোন্নতি। এই ৃতীয় সোপান হইতে আবার তৃতীয় সোপানে আরোহণ হইল। ৎতি আত্মাতে পরমাত্মার প্রকাশ আছে সত্য, কিন্তু সকলেতেই াহার প্রকাশ সমান নয়। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিতে তাঁহার বিশেষ বশেষ প্রকাশ দর্শন করিয়া ঐশ্বর্য্যবত্তাবশতঃ সেই সেই ব্যক্তি গবান্ নামে অভিহিত হইলেন, এবং তাঁহাদিগেতে প্রকাশিত শ্বর বিশেষ ভাবে অর্চ্চিত হইতে লাগিলেন। আশঙ্কা হইতে ারে, এই সোপানে আরূঢ় ব্যক্তিগণ মনুষ্যপূজায় ব্যাপৃত হইলেন, কন্তু শাস্ত্রের অভ্যন্তরে গূঢ় দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে এ আশঙ্কা আর াকে না। যাঁহাতে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ অনুভূত হইল, সেই ্যক্তিতে ঈশ্বর আবদ্ধ নন, সর্ব্বত্র তিনি প্রকাশিত, এইরূপে সাধক-ণ ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। হইতে পারে, ঈদৃশ লোক ল্প ছিল, অন্যথা যোগাচার্য্য কেন বলিবেন,

বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ।

দুর্ল্লভ হউন, কিন্তু শাস্ত্র এইরূপ ব্যক্তির জন্যই ভগবদারাধনা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এই ভগবদারাধনায় সর্ব্বভূতে ও হৃদয়ে ঈশ্বর দর্শন বিহিত, সুতরাং বেদ ও বেদান্ত এখানে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। আচণ্ডাল সকলেতে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া সকলের প্রতি যথোচিত সম্ভ্রম প্রদর্শন ভগবদ্ভক্তগণের প্রধান লক্ষণ *। বৈদিক সময়োচিত কর্ম্মযোগ, বৈদান্তিক সময়োচিত

---

* বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্॥ ভাগবত ১১স্ক, ১৯ অ।

জ্ঞানযোগ, এবং পৌরাণিক সময়োচিত ভক্তিযোগ, এ তিনের মধ্যেই ধর্ম্মের উচ্চতম অংশ বিদ্যমান। বর্ত্তমান সময়ে গীতার প্রতি আদর বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু গীতা এই তিন যোগকে কি প্রকারে একীভূত করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া অনেকে অজ্ঞাতসারে গীতা ও তদ্বক্তার অবমাননা করিতেছেন। এই তিন যোগের একত্বে যে মহাযোগ উপস্থিত হয়, বর্ত্তমান সময় তাহারই জন্য প্রস্তুত। এই যোগের যে সকল অন্তরায় ছিল, তাহা আচার ব্যবহারাদির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইতেছে। এখন সকলে যথার্থ দৃষ্টিতে শাস্ত্র চিন্তা করিয়া যদি এই মহাযোগের পন্থা অবলম্বন করেন *, তাহা হইলে হিন্দুসমাজ কত দূর উচ্চভূমিতে আরূঢ়, তাহা পৃথিবীর সমুদায় জাতিকে দেখাইতে সমর্থ হইবেন।

উপসংহার কালে গুটি কয়েক কথা বলা নিতান্ত প্রয়োজন। এত ক্ষণ যাহা বলা হইল, শাস্ত্র অবলম্বন করিয়াই তাহা বলা হইয়াছে। শাস্ত্রের প্রাধান্য স্থাপন করিতে গিয়া একটি বিষয়ে বিপদ্ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে, কেন না শাস্ত্র এক প্রকার নহে, বহু প্রকার। দেশ কাল পাত্র অবস্থাদি ভেদে শাস্ত্রের বহুত্ব ঘটিয়াছে, ইহা মানিয়া লইলেও মানুষ স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে কোন না কোন শাস্ত্রের পক্ষপাতী হইয়া পড়ে। বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে বুদ্ধি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, কোন্‌টি গ্রহণীয় কোন্‌টি অগ্রহণীয় বুঝিয়া লওয়া সুকঠিন হয়, এজন্য শাস্ত্রপ্রণেতৃগণ ঈশ্বরারাধনাকে সর্ব্বাগ্রে স্থাপন করিয়া শাস্ত্রকে তদনুবর্ত্তী করিয়া লইতে উপদেশ দিয়াছেন।

---

* এ যোগে বর্ণাশ্রমাদির কোন বিচার নাই—"অপি বর্ণাবকৃষ্টস্তু নারী বা ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণী। তাবপ্যেতেন মার্গেণ গচ্ছেতাং পরমাং গতিম্॥

শান্তিপর্ব্ব ২৩৯ অ, ৩৪ শ্লোক।

ক্তি উপস্থিত হইলে অন্তরের বৃত্তি নির্ম্মল হয়, সেই নির্ম্মল
সাহায্যে শাস্ত্রালোচনা করিলে শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম সাধকের
ম হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহার বিপরীত পথ অবলম্বন
, তাঁহাকে ভ্রান্তিতে জড়িয়া পড়িতে হয়। ধর্ম্মার্থিগণ এবং
রা স্বদেশের হিতের জন্য জীবন সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহারা
রাধনা অবলম্বন করুন, এবং কোন এক শাস্ত্রের পক্ষপাতী না
। সকল শাস্ত্র আলোচনা করুন, দেখিতে পাইবেন, ধর্ম্ম কেমন
ানপরম্পরায় উন্নত ভূমিতে আরোহণ করিয়াছে, এবং সেই
ভূমিতে এখনকার সমুদায় পরিবর্ত্তন হিন্দুসমাজের কল্যাণের
কেমন সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম নিতান্ত উদার,
াহার মূলসূত্র এই,

ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মঃ ন স ধর্ম্মঃ কুধর্ম্ম তৎ।
অবিরোধাৎ তু যো ধর্ম্মঃ সধর্ম্মঃ সত্যবিক্রম।

যে ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের বিরোধী সে ধর্ম্ম নয় কুধর্ম্ম ; অবিরোধী
ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মই ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী ; কালে
হার ভিতরে সাম্প্রদায়িকতা উপস্থিত হইয়া আধুনিক বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ে 'বহুশাস্ত্র ও কলাভ্যাস' নিষেধের বিষয় হইয়াছে। সমুদায়
াস্ত্রের সামঞ্জস্য না করিয়া কোন সম্প্রদায় স্থাপন করিতে গেলেই
রূপ নিষেধ অনিবার্য্য, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এরূপ নিষেধের কেহ
নুবর্ত্তন করিবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্র পূর্ব্বে যোগের
হায় ছিল, এখন ব্যবসায়ের উপায় হইয়াছে, ইহাতেই ঘোর
াপদ উপস্থিত। আশা করা যাইতে পারে যে, যোগধর্ম্মের
নরভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রমর্য্যাদা পুনরায় স্থাপিত হইবে, এবং
াহারা শাস্ত্রজ্ঞ তাঁহারা স্বার্থদ্বারা প্রণোদিত হইয়া তাহার আধ্যাত্মি-

কতা বিনষ্ট করিয়া লোকসকলকে চির দিনের জন্য আর নিম্নভূমিতে আবদ্ধ রাখিতে যত্ন করিবেন না। ইহা আমার পক্ষে নিতান্ত আহ্লাদের সংবাদ যে, যেখানেই হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যাতৃগণ ব্যাখ্যা করেন, সেখানে বহুলোক সমবেত হন। তাঁহারা যদি উচ্চতম হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন, আমরা জানি, তাঁহারা আমাদেরই কার্য্য করিতেছেন। লোকে সংস্কারদোষে যে স্থলে আমাদের কথা শুনিয়া শ্রদ্ধাবান্ হইবেন না, সে স্থলে যদি তাঁহাদের কথায় প্রত্যয় স্থাপন করিয়া উচ্চভূমিতে আরূঢ় হইতে যত্ন করেন, আমাদেরই উদ্দেশ্য তদ্দ্বারা সাধিত হইল। তবে এ স্থলে এই একটী কথা বলা প্রয়োজন যে, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহারা যেন ভ্রান্তিবশতঃ আপনারা বিকৃত যোগ অবলম্বন না করেন এবং অপরকে উহা শিক্ষা দিতে গিয়া ভ্রান্তিজালে তাহাদিগকে জড়িত না করেন। যোগশাস্ত্রে এই বিকৃত পথের প্রতিকূলে যে সকল অনুশাসন আছে তাহা দেখিয়া যেন তাঁহারা সর্ব্বথা সাবধান হন *।

---

* ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ সমাধৌ বিঘ্নাঃ। পতঞ্জলি।

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতা যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্। ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ॥ ভাগবত, ১১ স্ক, ১৫ অ।

ন চ পদ্মাসনাদ্‌যোগো ন নাসাগ্রনিরীক্ষণাৎ। ন চ শাস্ত্রাতি-রিক্তেন শৌচেন চ ভবেৎ ক্বচিৎ॥ ন যৌগমন্ত্রমুদ্রৈকমনোবৈকৈঃ [illegible]॥

দক্ষ ৭ অ, ৪।৫।

প্রাণায়ামো হি সগুণো নির্গুণং ধারয়েন্মনঃ।
যদ্যদৃষ্যতি মুক্তন্ বৈ প্রাণান্ মৈথিলসত্তম।
বাতাধিক্যং ভবত্যেব তস্মাত্তন্ন সমাচরেৎ॥

শান্তিপর্ব্ব ৩১৬ অ।

উপাসনাপ্রণালীর ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

উপাসনাপ্রণালীর ব্যাখ্যা।*

উদ্বোধন।

ব্রহ্মোপাসনার প্রথম অঙ্গ উদ্বোধন। উদ্বোধন এবং বোধন
ইয়ের মধ্যে প্রভেদ কি সকলের আগে এইটি বোঝা প্রয়ো-
কেন না এদেশে পূজার পূর্ব্বে বোধন বলিয়া একটি পূজার
আছে, সেইটি বৎসর বৎসর হিন্দুর গৃহে অনুষ্ঠিত হয়।
ধন শব্দের অর্থ জাগাইয়া তোলা। দেবতা নিদ্রিত ছিলেন,
াকে জাগাইবার জন্য বোধন হইয়া থাকে। ছয়মাস উত্তরের
ক ছয়মাস দক্ষিণের দিকে হেলিয়া সূর্য্যের উদয়াস্ত হয়।
রের দিকে হেলিয়া যখন সূর্য্যের উদয়াস্ত হয় তখন তাহাকে
রায়ণ এবং দক্ষিণের দিকে হেলিয়া যখন উদয়াস্ত হয় তখন
াকে দক্ষিণায়ন বলে। দেবতাদের পক্ষে উত্তরায়ণের ছয়মাস
, দক্ষিণায়নের ছয়মাস রাত্রি। বসন্তকাল উত্তরায়ণের অন্তর্গত,
রাং দেবতাদের দিন। এ সময়ে যে দুর্গোৎসব হয় তাহাতে
ধনের প্রয়োজন নাই, কেন না দেবতা জাগিয়া আছেন। কিন্তু
ৎ কাল দক্ষিণায়নের অন্তর্গত, এসময়ে রাত্রি, দেবতা নিদ্রিত,
রাং এ সময়ে বোধনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ব্রহ্ম চির
গ্রৎ, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে বোধন নিষ্প্রয়োজন।

---

* মহিলাবিদ্যালয়ান্তর্গত "শাস্ত্র ও ধর্ম্মের ইতিহাসের পরীক্ষা"
াগে উপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশ। ১৮২৫ শক।

ব্রহ্ম চির জাগ্রৎ, তাঁহার সম্বন্ধে বোধনের প্রয়োজন নাই, এ কথা সত্য হইলেও পৌরাণিকেরা পরম দেবতাতেও জাগরণ ও নিদ্রার আরোপ করিয়াছেন। এ জাগরণ ও নিদ্রা অন্য প্রকার। যখন সমুদায় জগতের প্রলয় হয় অর্থাৎ ঈশ্বরেতে যেমন সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ বিলীন হইয়াছিল তেমনি তাঁহাতে বিলীন হইয়া যায়, তখন সকল শক্তি নিদ্রিত হইয়া ঈশ্বরেতে স্থিতি করে, ঈশ্বরের লীলার বিরাম হয়। যখন লীলার বিরাম হইল, পরম দেবতা আপনাতে আপনি স্থিতি করিতে লাগিলেন, তখন মহাসুষুপ্তি উপস্থিত, সুতরাং তিনি নিদ্রিত হইয়া অবস্থিত। আবার যখন তিনি সৃষ্টিপ্রকাশ করিতে উন্মুখ হইলেন, তখন নিদ্রিত শক্তিগুলি জাগিয়া উঠিল, পরম দেবতার লীলা প্রবৃত্ত হইল, তিনিও জাগ্রৎ হইয়া লীলায় প্রবৃত্ত হইলেন, সুতরাং এটি তাঁহার জাগরণ-কাল। নৈয়ায়িকেরা সমগ্র জগতের প্রলয় হয় মানেন না, খণ্ড প্রলয় মানিয়া থাকেন। আমাদের মত নৈয়ায়িকগণের অনুরূপ; কিন্তু স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিত প্রলয় মানিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, স্বয়ং ব্রহ্ম নিদ্রা ও জাগরণের অধীন না হইলেও পৌরাণিকেরা ব্রহ্মেতে সৃষ্টির লয়, এবং তাঁহা হইতে পুনরায় সৃষ্টির প্রকাশ, এই দুইটী অবস্থা লইয়া তাঁহার নিদ্রা ও জাগরণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যখন তাঁহার শক্তি তাঁহাতে অবরুদ্ধ থাকিল কোন কার্য্য করিল না, তখন নিদ্রা এই শব্দের সঙ্গে এই ব্যাপারের [illegible] সাদৃশ্য ঘটিল, কেন না আমরা যখন নিদ্রিত হই, তখন আমাদের শক্তি সকল আমাদিগেতে অবরুদ্ধ হইয়া থাকে। আমরা আবার যখন জাগিয়া উঠি, তখন আমাদের সেই সকল নিদ্রিত শক্তি জাগিয়া উঠিয়া কার্য্য করিতে থাকে; এই ব্যাপারের তুলনায় সৃষ্টিপ্রকাশের

সময়ে ব্রহ্মেতে জাগরণ আরোপিত হয়। বেদান্ত ব্রহ্মসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, পুরাণ তাহাই কবিত্বে ব্রহ্মের প্রসুপ্তি ও জাগরণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রহ্ম সর্ব্বাতীত (transcendental) সর্ব্বগত (immanent) উভয়ই। তিনি যদি সকলের অতীত না হন, তাহা হইলে সকলকে আপনার মধ্যে রাখিয়া তাহাদিগেতে বিবিধ পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারেন না, উহাদের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনিও পরিবর্ত্তিত হইয়া যান, আর তাঁহার পরিবর্ত্তয়িতত্ব থাকে না, এ সকল পরিবর্ত্তনের আর একজন পরিবর্ত্তয়িতার কল্পনা করিতে হয়। তিনিও যদি সকলের অতীত না হইয়া পরিবর্ত্তিত হন, তাহা হইলে ক্রমান্বয়ে পরিবর্ত্তয়িতার পরিবর্ত্তয়িতা, পরিবর্ত্ত-য়িতার পরিবর্ত্তয়িতা, এইরূপ কল্পনা করিতে করিতে আর কোথাও দাঁড়াইবার স্থান পাওয়া যায় না। ইহাকে ন্যায়শাস্ত্রে অনবস্থা দোষ বলে। সুতরাং ব্রহ্ম সর্ব্বদাই সর্ব্বাতীত। যিনি সর্ব্বাতীত তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন নাই। পরিবর্ত্তনদ্বারাই জাগরণ বুঝায়, সুতরাং ইনি প্রসুপ্ত। ব্রহ্ম যদি কেবল সর্ব্বাতীত হইয়া থাকেন, জগতের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে আপনি অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া যে অপরেতে পরিবর্ত্তন ঘটান ইহা সিদ্ধ হয় না, সৃষ্টিও হয় না। অতএব তিনি সর্ব্বাতীত হইয়াও সর্ব্বগত এইটি মানিতে হয়। যিনি অনন্ত তিনি সকলের অন্তরে বাহিরে না থাকিলে অনন্ত হইবেন কি প্রকারে? যদি তিনি কেবল বাহিরে থাকেন, অন্তরে না থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্যাপ্তি সর্ব্বত্র না থাকাতে তিনি অন্তবিশিষ্ট হইয়া পড়িলেন। অতএব ব্রহ্মের সর্ব্বাতীত ও সর্ব্বগত ভাব অবলম্বন করিয়া নিদ্রিত ও জাগ্রৎ উভয় ভাব তাঁহাতে আরোপিত হইয়া থাকে। যিনি

সর্ব্বাতীত, যিনি আপনাতে আপনি নিয়ত অবস্থিত, জীব বা জগতের দিকে তাঁহার দৃষ্টিক্ষেপ নাই ; যিনি সর্ব্বগত হইয়া জীব ও জগৎকে বিবিধ পরিবর্ত্তনের অধীন করিতেছেন, তিনিই তাহাদিগের শাসনাদি সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন. পূজা অর্চ্চনা ইঁহারই হইতে পারে, সর্ব্বাতীত ব্রহ্মের পূজা অর্চ্চনা হয় না, শঙ্করাচার্য্যের এই প্রকার মত এবং এই প্রকার মতের জন্য তিনি ব্রহ্ম ও ঈশ্বর এ দুইয়ের প্রভেদ করিয়াছেন। আমরা এ মতের পক্ষপাতী নই। সুতরাং একই ব্রহ্মকে আমরা সর্ব্বাতীত ও সর্ব্বগত বলি। আমাদের উপাসনা সেই একই অখণ্ড ব্রহ্মের, আর কাহারও নহে। সেই সর্ব্বাতীত ব্রহ্মের জাগরণ জন্য স্তবস্তুতির প্রয়োজন, ইহা মনে করিয়া হিন্দুগণ তাঁহার সম্বন্ধে বোধন স্বীকার করেন। অসুরগণের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া ব্রহ্মা দেবগণকে লইয়া প্রসুপ্ত পদ্মদেবতার নিকটে গমন করিলেন, এবং স্তুতিযোগে তাঁহাকে জাগাইলেন। তাঁহার প্রেরণা বিনা তাঁহার শক্তির কোন ব্যক্তিতে অবতরণ হয় না এইজন্য তাঁহাকে জাগরিত করা প্রয়োজন হয়, এ কথায় যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ব্রহ্মসম্বন্ধে নিত্য বোধন মানিয়া লন।

ব্রহ্ম চির জাগ্রৎ। তিনি নিদ্রিত হইলে আর জগৎ চলে না, কোথায় বা থাকেন ব্রহ্মা, কোথায় বা থাকেন দেবগণ, কোথায় বা থাকে অসুরগণ। সুতরাং আমাদের উপাসনায় বোধনের কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু উদ্বোধনের প্রয়োজন আছে। উদ্বোধন শব্দের অর্থ স্মৃতিপথে আনয়ন। যাহা বিস্মৃত হইয়া আছি, তাহা স্মৃতিপথে না আনিলে তৎসম্বন্ধে আমরা কিছুই করিতে পারি না। আমরা সংসারে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া ঈশ্বরকে বিস্মৃত

হইয়া থাকি, সুতরাং উপাসনার পূর্ব্বে আমাদিগের উদ্বোধনে প্রয়োজন হয়। যে সকল সাধক সর্ব্বদা উদ্বুদ্ধ আছেন, ঈশ্বরকে কার্য্য-কর্ম্মের ভিতরে ভুলিয়া যান নাই, তাঁহাদের সম্বন্ধে উদ্বোধনের প্রয়োজন নাই। উদ্বোধন এইজন্য উপাসনার নিত্য অঙ্গ নহে। তবে পারিবারিক ও সামাজিক উপাসনায় এ অঙ্গ নিত্য, কেন না সেখানে বহু অবস্থার ব্যক্তি সমবেত, কে উদ্বুদ্ধ কে উদ্বুদ্ধ নন, তাহার কোন স্থিরতা নাই। এস্থলে উদ্বোধন হইয়া উপাসনার আরম্ভ করাই সমুচিত।

জীবন্ত জাগ্রৎ নিত্য বিদ্যমান পরমেশ্বরকে দূর হইতে ডাকিয়া নিকটে আনিতে হয় না, সুতরাং উদ্বোধনে তেমন সকল কথা বলিলে উহা বিজ্ঞান-ও-দর্শন বিরুদ্ধ হয়। যাহাতে এইরূপ বুঝায় যে, ঈশ্বর যেন নিকটে নাই, তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, অথবা তিনি দূরস্থ কোন অলক্ষিত স্থানে আছেন, সেখান হইতে তাঁহাকে "ইহাগচ্ছ" বলিয়া নিকটবর্ত্তী করিয়া লইতে হইবে, সেরূপ কথা উদ্বোধনে পরিহার্য্য। রাজর্ষি রাজা রামমোহন রায় এইজন্যই তাঁহার সঙ্গীতে "ইহাগচ্ছ বল তাকে" বলিয়া ঈশ্বরের নিত্য সান্নিধ্য উপাসকগণের মনে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। আর এক দিকে দেখিতে হইবে, যত পরিবর্ত্তন আমাদিগেতে হইয়াছে, ঈশ্বরেতে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমরা তাঁহাকে ভুলিয়াছি, তিনি আমাদিগকে ভোলেন নাই; আমরা পাপে আমাদিগের চক্ষু অন্ধ করিয়া তাঁহাকে দেখিতেছি না, তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া কোথাও গিয়াছেন তাহা নহে; আমরা নিজের অপরাধে ক্লেশ ভোগ করিতেছি, তিনি কখন আমাদিগের প্রতি বাম হন নাই, নিষ্ঠুর হন নাই। অনেকে উদ্বোধনে এরূপ কথা সকল

প্রয়োগ করেন, যাহাতে নির্দোষ ঈশ্বরেতে এই সকল দোষ আরোপিত হয়। আচার্য্য-নিবদ্ধ এই "সংক্ষিপ্ত উপাসনা প্রণালীতে" যে উদ্বোধন লিপিবদ্ধ আছে, তন্মধ্যে এরূপ ভাবের কোন কথা নাই। সাংসারিক চিন্তা ও কামনায় আমরা তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়াছি, আমাদের মন নিতান্ত চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে, সেই চিন্তা ও কামনা পরিত্যাগ করিয়া মনকে প্রশান্ত করিবার জন্য যত্ন এই উদ্বোধনে নিবদ্ধ রহিয়াছে। সংসারের কামনা ও বাসনায় শত শত লোক ঘুরিতেছে, বাসনা কামনা পরিত্যাগের ইচ্ছাও তাহাদের কখন হয় না। বাসনা কামনা যদি আমাদিগেতে দুঃখোৎপাদন করিয়া থাকে, আমাদিগকে পাপে ফেলিয়া নরকযন্ত্রণার কারণ হইয়া থাকে, তবে সেই দুঃখযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার জন্য আমাদের মন ব্যাকুল হইয়াছে, এবং সেই ব্যাকুলতাই ঈশ্বরের সিংহাসনসমীপে যাইতে আমাদিগকে উৎসুক করিয়াছে। তাই এই উপাসনা প্রণালী মধ্যে "পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল হইয়া তাঁহার সিংহাসনের নিকটবর্ত্তী হই" এ কথাগুলি নিবদ্ধ রহিয়াছে। ঈশ্বর নিত্য সন্নিহিত, কোথা হইতেও তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতে হয় না; এজন্য ইহার মধ্যে এই কথাগুলি আছে, "এ গৃহ তাঁহার গম্ভীর আবির্ভাবে পরিপূর্ণ।" অন্য কামনায় অন্য বাসনায় আমাদের চিত্ত অন্যত্র গিয়াছে, অন্তশ্চক্ষু মলিন হইয়াছে, সে চিত্ত ঈশ্বরের দিকে না ফিরাইলে, ঈশ্বরকামনায় ঈশ্বরবাসনায় অন্তশ্চক্ষুর মলিনতা না ঘুচাইলে, এ আবির্ভাবদর্শন সম্ভবে না, এজন্য উদ্বোধনে লিখিত হইয়াছে, "বিশ্বাস ও ভক্তি নয়নে তাহা (আবির্ভাব) প্রত্যক্ষ করি।" বিশ্বাস অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণ; ইহাকে শ্রদ্ধা বলাও যাইতে পারে, কেন না শ্রদ্ধা তাহাকেই বলে যদ্দ্বারা সত্য

ধারণ করা যায়। কোন বস্তুর প্রতি অনুরাগ না জন্মিলে, তাহার স্বরূপ প্রকাশ পায় না। ভক্তি সেই অনুরাগ; সুতরাং উপাসনা প্রণালীতে বিশ্বাস ও ভক্তিকে ঈশ্বরাবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিবার পক্ষে নয়ন বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের জন্য এই প্রণালী যখন লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তখন উহার উদ্বোধনাঙ্গে যে সকল কথা নিবদ্ধ রহিয়াছে, সে সকল কথা সংক্ষিপ্ত হইলেও উদ্বোধন দর্শন-বিজ্ঞান-সঙ্গত হইলে কিরূপ হয়, তাহাই দেখাইয়া দিতেছে।

গীতায় চারি শ্রেণীর উপাসক নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং যোগী। পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরের নিকট গমন, ইহা আর্ত্ত উপাসকের লক্ষণ। আমরা পাপাদির নিপীড়নে যখন ক্লিষ্ট, তখন আর্ত্ত উপাসকের কথায় উদ্বোধনই শোভা পায়। আমরা অর্থার্থী উপাসক নই, কেন না ঈশ্বরের নিকটে সামান্য পার্থিব বিষয়ের আকাঙ্ক্ষী হইয়া গমন করা আমরা অসঙ্গত মনে করি। জিজ্ঞাসু এবং যোগী এই দুই শ্রেণীর উপাসক হইবার জন্য আমরা আকাঙ্ক্ষী, সুতরাং তদুপযোগী কথা উদ্বোধনে থাকা আমরা আবশ্যক মনে করি। "সেই অনন্ত দেব, সেই সত্য শিব সুন্দর পিতার চারিদিকে বসিয়া আমরা সকলে বিনম্রভাবে তাঁহার অর্চ্চনা করি;" এই কথা গুলির মধ্যে জিজ্ঞাসু ও যোগী উভয় শ্রেণীর উপাসক-সমুচিত বাক্য নিবদ্ধ রহিয়াছে। কিরূপে নিবদ্ধ রহিয়াছে তাহা বলিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। আজ সে সব কথায় প্রয়োজন নাই, আশা করি উপাসনার তত্ত্ব বলিতে গিয়া পরে সে সকল কথা আসিবে। উদ্বোধনে কোন্ ভাবের কথা পরিত্যাগ করিতে হইবে, কোন্ ভাবের কথা কি জন্য বলিতে

হইবে, তৎসম্বন্ধে যে কথা গুলি বলা হইল, মনে হয় উদ্বোধন-সম্বন্ধে তাহাই এখনকার মত যথেষ্ট।

ব্রহ্মস্বরূপ।

উদ্বোধনের পর আরাধনা। আরাধনার পূর্ব্বে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি যে শ্রুতিগুলি উচ্চারিত হয়, উহা নানা উপনিষৎ হইতে সংগৃহীত। প্রথমে রাজর্ষি রামমোহন রায় যখন ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা করেন, তখন এই সকল শ্রুতি অবলম্বিত হয় নাই। তাঁহার সময়ে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই শ্রুতি এবং "ওঁ তৎসৎ" এই বাক্য মন্ত্রের ন্যায় গৃহীত হইয়াছিল। উপনিষদে সর্ব্বত্র 'তৎ'শব্দ ব্রহ্মবাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, 'সৎ'শব্দ "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্' সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ ছিলেন এই শ্রুতি হইতে সংগৃহীত। ওঁ শব্দ ব্রহ্মবাচক। ওঁ এবং তৎ এবং সৎ এ তিনটি ভগবদ্গীতায় একত্র সংগৃহীত দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ 'ওঁ তৎ সৎ' এ মন্ত্র গীতা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। 'ওঁ তৎ সৎ' 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এ দুইটি একত্র বা স্বতন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া সাধনের তখন ব্যবস্থা ছিল। এখন যে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' আরাধনার পূর্ব্বে উচ্চারিত হইয়া থাকে, ইহা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত। কোন এক জন মানুষ কিছু প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, ইহা শুনিলেই মনে হয়, ইহার সঙ্গে ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ নাই। এরূপ মনে করা নিতান্ত ভুল। প্রকৃতির ভিতরে যে প্রকার ঈশ্বরের হস্ত বিদ্যমান,

সেইরূপ মানবসমাজের ইতিহাসের মধ্যেও তাঁহার হাত আছে। এক জন খেলা করিতে করিতে যাহা করে, ভবিষ্যতে তাহা হইতে কি না আশ্চর্য্য ব্যাপারই উপস্থিত হয়! যে মুদ্রাঙ্কনব্যাপারে এক দেশের জ্ঞানবিজ্ঞান সত্বরে অন্য দেশে যাইয়া আলোকবিস্তার করিতেছে, উহা কি এক ব্যক্তির খেলা হইতে উৎপন্ন হয় নাই? যাহা প্রথমতঃ দেখিতে অতি সামান্য, লোকে কিছুই নয় বলিয়া তুচ্ছ করে, সেই তুচ্ছ বিষয় হইতে পরে এমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত হইতে পারে, যাহা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ তিনি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বি-ভাতি" এই দুইটী শ্রুতি চিন্তন ও অনুধ্যানের জন্য গ্রহণ করেন। তৎপর তিন বৎসর পরে "শান্তং শিবমদ্বৈতম্" এই শ্রুতিটী ঐ দুইটী শ্রুতির সহিত তিনি সংযুক্ত করেন। মানবহৃদয়ে ঈশ্বর যে ভাবে প্রকাশ পান "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" এই তিনটি স্বরূপ তাহা প্রদর্শন করে। বাহিরের জগতে ব্রহ্মের প্রকাশ কিরূপ "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" এ শ্রুতি তাহাই দেখাইয়া দেয়। অন্তরে ও বাহিরে ঈশ্বরের প্রকাশ দুইটী শ্রুতিতে হৃদয়ঙ্গম হইল, কিন্তু ব্রহ্ম আপনি কি, এখনও তৎসম্বন্ধের শ্রুতি ঐ দুইটীর সঙ্গে মিলিত হয় নাই। "শান্তং শিবমদ্বৈতম্" এই শ্রুতিটী সে অভাবপূরণ করিল। প্রপ-ঞ্চের অতীত একমাত্র মঙ্গল, এ কথাতে জগৎ ও জীবেতে অধিষ্ঠিত ঈশ্বর বুঝায় না, কিন্তু আপনাতে যিনি আপনি বিদ্যমান তাঁহাকেই বুঝাইয়া থাকে। "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" এ শ্রুতিটী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত করেন নাই, আচার্য্য কেশবচন্দ্র তাঁহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত করাইয়া লইয়াছেন। এই শ্রুতিগুলি ভিন্ন ভিন্ন উপনিষৎ হইতে

গৃহীত অথচ স্বরূপসমূহ এমনই পরস্পরে পর পর সংযুক্ত যে, উহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্থানান্তরিত করিতে পারা যায় না।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

ইহার পূর্ণ শ্রুতিটী এই :—

ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাভ্যুক্তা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোহশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। ২।২

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে এই ঋক্ উক্ত হইয়াছে। সত্য জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্মকে যিনি পরমাকাশ পরব্রহ্মে হৃদয়গুহায় নিহিত জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সঙ্গে সমুদায় অভিলষিত বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন।

এখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি, ব্রহ্ম সাধকের হৃদয়ে উপলব্ধ হইয়া থাকেন। তিনি আমাদের হৃদয়ে সত্য, জ্ঞান ও অনন্তরূপে প্রকাশ পান। যদি তিনি আপনি এরূপে আমাদের হৃদয়ে প্রকাশ না পাইতেন, আমরা কখন তাঁহাকে জানিতে পাইতাম না। ব্রহ্ম আমাদের হৃদয়ে নিহিত, উপনিষৎ এ কথা বলিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান যে সহজে আমাদের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

ইহার পূর্ণ শ্রুতিটী এই :—

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্যৈষ মহিমা ভুবি
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।
মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা
প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়

তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ ২।২।৭।

যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, এই ভূলোকে যাঁহার মহিমা, যিনি মনোময়, প্রাণ এবং শরীরের নেতা, অন্নে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই এই পরমাত্মা হইয়া দিব্য ব্রহ্মপুরে অর্থাৎ মানসাকাশে বিদ্যমান আছেন। ধীরগণ হৃদয়কে সন্নিহিত করিয়া বিজ্ঞানযোগে তাঁহাকেই দর্শন করিয়া থাকেন যিনি স্বয়ং অমৃত হইয়া আনন্দরূপে প্রকাশ পান।

আমরা পূর্ব্ব শ্রুতিতে হৃদয়ে প্রকাশিত ব্রহ্মসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছি, এ শ্রুতিতে যিনি সমুদায় জগতে ও জীবে প্রকাশিত তৎসম্বন্ধে আমরা জ্ঞানলাভ করিতেছি। সকল জগতে ও জীবে তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়? আনন্দরূপে বা সৌন্দর্য্যরূপে। যে কোন বস্তুতে যে কোন ব্যক্তিতে তাঁহার আবির্ভাব অনুভূত হয় সেই বস্তু ও ব্যক্তি হইতে আনন্দলাভ হয়, সৌন্দর্য্যে প্রাণ মগ্ন হয়।

শান্তং শিবমদ্বৈতম্।

ইহার পূর্ণশ্রুতি এই :—

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞানং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ। ৭।

তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ নন, তিনি বহিঃপ্রজ্ঞ নন, তিনি উভয়প্রজ্ঞ নন, তিনি প্রজ্ঞানঘন নন, তিনি প্রজ্ঞ নন, তিনি অপ্রজ্ঞ নন,

তিনি অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, লক্ষণরহিত, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য, একাত্মপ্রত্যয়সার, প্রপঞ্চোপশম, শান্ত, শিব, অদ্বৈত ইঁহাকেই পণ্ডিতেরা চতুর্থ বলিয়া মনে করেন। তিনি আত্মা অর্থাৎ চৈতন্য-স্বরূপ, তিনি বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য।

যিনি স্বপ্নাবস্থায় অন্তরে প্রকাশ পান তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ, যিনি জাগ্রদবস্থায় বাহিরে প্রকাশ পান তিনি বহিঃপ্রজ্ঞ, স্বপ্ন ও জাগরণ এ উভয়ের অন্তরালাবস্থায় যিনি প্রকাশ পান তিনি উভয়প্রজ্ঞ, যিনি সুষুপ্তাবস্থায় প্রকাশ পান তিনি প্রজ্ঞানঘন, যুগপৎ যিনি সর্ব্ববিষয় জানেন তিনি প্রজ্ঞ, যিনি কিছু জানেন না তিনি অপ্রজ্ঞ। তিনি শান্ত শিব অদ্বৈত। তাঁহাতে ঐ সকলের কিছুই নাই বলিলে তিনি যে দর্শনপথের অতীত, তিনি যে আমাদের ব্যবহারের বিষয় নন, হস্তাদি দ্বারা যে তাঁহাকে ধরিতে পারা যায় না, কোন প্রকারের লক্ষণে তিনি লক্ষণাক্রান্ত নন, তিনি চিন্তার অতীত, কোন প্রকার শব্দাবলম্বন করিয়া যে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না, এ সকলই উহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়িতেছে। এরূপ পদার্থ কিছুই নয় মনে হইতে পারে, সুতরাং 'একাত্মপ্রত্যয়-সার' এই একটি বাক্যে তিনি যে বস্তু তিনি যে পদার্থ বেদান্ত তাহাই প্রতিপাদিত করিতেছেন। জাগ্রৎ স্বপ্নাদি সকল অবস্থার অনুভূতি উড়াইয়া দিলেও এক আত্মার অর্থাৎ চৈতন্যের সত্তা কিছুতেই বিলুপ্ত হয় না, উহা তখনও বিদ্যমান থাকে। সুতরাং এই যে তুরপনেয় চৈতন্যসত্তা ইহাই সেই সর্ব্বাতীত আত্মা। প্রপঞ্চ অর্থাৎ রূপরসাদি সমুদায় বিষয় মন হইতে উড়াইয়া দিলে যে চৈতন্যসত্তা তখনও বিদ্যমান, তিনি শান্ত—সর্ব্ববিধবিকারশূন্য, শিব - মঙ্গলস্বরূপ এবং অদ্বৈত—অখণ্ড।

সমুদায় বিষয় বিলোপ করিয়া যাঁহাকে বিলোপ করিতে পারা গেল না, তিনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, এখানে আর তাঁহাকে ব্যবহিত করিয়া রাখিবার কিছুই রহিল না।

শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

ইহার পূর্ব্ব শ্রুতিটী এই :—

সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু-
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥
ঈশোপনিষৎ।

সেই পরমাত্মা সর্ব্বতোবিসারি, দীপ্তিমান্, দেহহীন, অক্ষত, স্নায়ুরহিত, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্ব-নিরপেক্ষ! তিনি নিত্যকাল জীবের প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সকল বিধান করিতেছেন।

এখানে ব্রহ্মসম্বন্ধে যতগুলি বিশেষণ আছে সে সকলগুলিই শুদ্ধতার পোষক। যাহার শরীর আছে, শরীরের স্বভাবসিদ্ধ অপূর্ণতা আছে; যে কালদেশে বদ্ধ, অসর্ব্বজ্ঞ, পরাধীন, তাহাতে নিয়ত শুদ্ধতা থাকিবে, তাহাকে পাপ স্পর্শ করিতেও পারিবে না, ইহা কখনই সম্ভব নহে। যে ব্যক্তিতে শুদ্ধতা নাই সে কখন ঠিক যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দিতে পারে না; তাহার ব্যবহারে বৈষম্যপ্রকাশ পাইবেই পাইবে। ব্রহ্ম শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং তিনি সকল প্রকারের বৈষম্যবর্জ্জিত হইয়া নিত্যকাল যাহার যাহা প্রয়োজন তাহা যোগাইতেছেন।

আরাধনায় "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—এই বেদান্তবাক্যের পরই "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" এই বাক্যটি আছে; সুতরাং প্রথম প্রথম আরাধনায় সত্য জ্ঞান ও অনন্ত এই তিন স্বরূপের ব্যাখ্যার পরেই "আনন্দরূপমমৃতং" এইটি ধরিয়া আনন্দের ব্যাখ্যা করা হইত। অনন্তের আরাধনার সময়ে অনন্তকে ধরিতে না পারিয়া সাধকের ঈশ্বরবিচ্ছেদ ঘটিল, স্বয়ং ব্রহ্ম আনন্দ হইয়া আসিয়া বিচ্ছেদ ঘুচাইয়া দিলেন, এই ভাবে সে সময়ে আরাধনা হইত। সময়ে আনন্দস্বরূপ আরাধনার সর্ব্বশেষে আসিল, কিন্তু "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" এ বাক্যটি আরাধনাবাক্যের উচ্চারণকালে যেখানকার সেখানেই থাকিয়া গেল। এরূপ যেখানকার সেখানে বুদ্ধিপূর্ব্বক কেহ রাখেন নাই। বরং কাহারও কাহারও মনে হইয়াছিল, এ বাক্যটি উঠাইয়া শেষে আনাই উচিত, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এখন দেখা যাইতেছে, যেখানকার সেখানে এই বাক্যটি থাকাই ঠিক হইয়াছে। কেন না অনন্তের পর যে বিচ্ছেদানুভব হয়, উহার প্রতিবিধান বাক্যটি যথাস্থানে না থাকিলে কিছুতেই ঘটিতে পারিত না। আচার্য্য কেশবচন্দ্র যখন আরাধনাসম্বন্ধে উপদেশ দেন, সে সময়ে অনন্তের পর বিচ্ছেদ ঈশ্বরের লীলাদর্শনে ঘুচিয়া যায়, এই কথার উল্লেখমাত্র করিয়াছেন, ঈশ্বরলীলার সঙ্গে এ বাক্যটির সম্বন্ধ দেখাইয়া দেন নাই। সে সম্বন্ধ কি, তাহা বুঝিতে গেলে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই বাক্যটিতে যে ব্রহ্মশব্দ আছে তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়ে। সমুদায় নামরূপ অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব যাঁহার মধ্যে আছে (তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম) তিনি ব্রহ্ম, যাই এই ভাবটি ব্রহ্মশব্দে আমাদের অন্তরে প্রতিভাত হয়, অমনি ব্রহ্ম আপনার ভিতরে সকলকে রাখিয়া বহুর ভিতরে

পনাকে প্রকাশ করিতেছেন, এইটি উপলব্ধির বিষয় হয়। অনন্ত তখন ভূমা * মহান্ হইয়া 'ভূমাই সুখ' (ভূমৈব সুখম্) এই বোধ অন্তরে উৎপাদন করিলেন। তিনি আনন্দরূপে সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"—এই বাক্য ঈশ্বরের লীলা সাধকের সন্নিধানে ব্যক্ত করিল। লীলাদর্শন করিয়া যখন বিচ্ছেদ ঘুচিয়া গেল, তখন "শান্তং শিবমদ্বৈতম্" এ বাক্যের মঙ্গলময়েতে অবতরণ করা সহজ হইল।

এখন জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতেছে, "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" এ শ্রুতি যদি সাক্ষাৎসম্বন্ধে আনন্দের সঙ্গে যোগ না ঘটায়, জীবে জগতে ব্রহ্মের আবির্ভাব দর্শনে যে আনন্দ হয় এ বাক্য যদি সেই আনন্দের বা সৌন্দর্য্যের প্রকাশক, তাহা হইলে সাক্ষাৎসম্বন্ধে আনন্দের প্রকাশক বেদান্ত প্রবচন কি ? সে প্রবচন :—

রসোবৈ সঃ।

এ প্রবচনের পূর্ণাংশ এই :—

যদ্বৈতৎ সুকৃতম্। রসোবৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। তৈত্তিরীয়। ৭। ২

যিনি এই সুকৃত, তিনিই রসস্বরূপ। এই জীব রসস্বরূপকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়। এই আকাশ যদি আনন্দ না হইত, কে চেষ্টা করিত, কে প্রাণধারণ করিত। ইনিই আনন্দিত করেন।

অনেকে মনে করেন, যোগানন্দ ভূমানন্দের অর্থ নিশ্চেষ্ট

* বহু শব্দ হইতে 'ভূমন্' শব্দ ইমন্ প্রত্যয় করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে।

হইয়া ভোঁ হইয়া থাকা, বেদান্তবাদিগণ নিশ্চেষ্টতাকেই আনন্দ বলিয়া থাকেন ; ব্রহ্ম স্বয়ং নিষ্ক্রিয়, সেই প্রকার নিষ্ক্রিয় হওয়াই আনন্দের অবস্থা। সাক্ষাৎ আনন্দসম্বন্ধের এই প্রবচনটি যাঁহারা ভাল করিয়া অনুধাবন করিবেন, তাঁহাদের মনে কখন এরূপ ভ্রান্তি তিষ্ঠিতে পারে না। ঈশ্বরের নিত্যক্রিয়াশীলতা তাঁহার নিত্য আনন্দ। তিনি স্বক্রিয়ায় সমুদায় জগৎ ও জীব আপনার ভিতর হইতে বাহির করিলেন, এইজন্য বেদান্ত তাঁহাকে 'সুকৃত' এই আখ্যা দান করিল। তিনি স্বয়ং সুকৃত, এইজন্য তিনি আনন্দ। এই সুকৃতই পুণ্য। যখন তিনি জীবেতে আপনার আনন্দ সঞ্চারিত করেন, তখন তাহারা নিরতিশয় উদ্যমপূর্ণ হয়, তাহাদের নিদ্রিতবৃত্তিসমুদায় জাগিয়া উঠে। 'এই আকাশ যদি আনন্দ না হইত, কে চেষ্টা করিত কে প্রাণধারণ করিত,' বেদান্ত এ কথা বলিয়া এই দেখাইয়াছেন, জীবের যত উদ্যম ও উৎসাহ, সমুদায় জগৎ তাঁহার আনন্দে ভরা তাহারই জন্য। এই কারণেই বেদান্তের অন্যত্র লিখিত আছে, "যখন জীব সুখ পায় তখন করে। অসুখ পাইয়া কেহ কিছু করে না, সুখ পাইয়াই করে।"

এই সমুদায় স্বরূপের পর পর সন্নিবেশে সাধকের মনে কিরূপে ব্রহ্মস্বরূপ স্ফূর্তি পায়, এবং তাঁহাকে সোপান হইতে সোপানান্তরে আরূঢ় করে সে কথা পরে বলিব। "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" এই বাক্যটির মধ্যে 'অমৃত' এই শব্দটি কেন ব্যাখ্যার ভিতরে স্বরূপ মধ্যে আসে না, ইহাই জিজ্ঞাস্য। যদিও অনেকে 'তুমি আনন্দ তুমি অমৃত' এইরূপ ব্যাখ্যায় বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে ঠিক অমৃতস্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা হইল না। অমৃত শব্দে বিকারাতীততা বা মিষ্টত্ব, এই ভাব তাঁহাদের মনে তখন জাগ্রৎ হয়।

"মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও" এই প্রার্থনার ভিতরে মৃত্যুর বিপরীত অমৃত অর্থাৎ মৃত্যুর অতীতাবস্থা অমৃতশব্দে প্রকাশ করিতেছে। ঋষিগণ মৃত্যু ও অমৃত এই দুই ভাগে সমুদায় পদার্থ বিভক্ত করিয়াছেন। সমুদায় জগৎ মৃত্যু অর্থাৎ পরিবর্ত্তনের অধীন, সুতরাং উহা মর্ত্ত্যশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। কেবল এক ব্রহ্মেতে কোন পরিবর্ত্তন নাই, তিনি যেমন চিরদিন তেমনই আছেন, তেমনি থাকিবেন, সুতরাং তিনি অমৃতনামে বেদান্তে প্রসিদ্ধ। 'সমুদায় ভূতগণ তাঁহার এক পাদ, দিব্যধামে তাঁহার তিন পাদ অমৃত" (পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি) এই বৈদিকবচনটি সমুদায় মর্ত্ত্যজগতের যিনি অতীত তিনি অমৃত এই অর্থ প্রকাশ করিতেছে। 'অমৃত' শব্দে সুতরাং সর্ব্বাতীত (trancendental) ব্রহ্ম বুঝাইয়া থাকে। যিনি সর্ব্বাতীত তিনি আমাদের মানসে বিদ্যমান থাকিলেও তিনি বাক্যের বচনীয় নহেন। তাঁহাকে যতদূর জানিতেছি, ততদূর তিনি, তদপেক্ষা আর তাঁহার সম্বন্ধে জানিবার কিছু নাই, এ কথা মনে করিলে সাধকের অনন্ত উন্নতির দ্বার রুদ্ধ হইল, তাঁহার মৃত্যু উপস্থিত। এরূপ মৃত্যু উপস্থিত না হয়, নিত্যকাল ঈশ্বরের স্বরূপ আমাদের আত্মাতে প্রবিষ্ট হইয়া উন্নত হইতে উন্নত করিয়া তুলিতে পারে, এজন্য 'অমৃত' অর্থাৎ ঈশ্বরের সর্ব্বাতীত ভাব আমাদের মনে জাগাইয়া রাখা প্রয়োজন। যেখানে জগতে ও জীবে ব্রহ্মের আনন্দ বা সৌন্দর্য্য অনুভব করা যাইতেছে, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে 'অমৃত' এই শব্দের যোগ এই দেখাইয়া দেয় যে, জগতে ও জীবে যতদূর ঈশ্বরের আনন্দ বা সৌন্দর্য্য সম্ভোগ হইল, তাহাতেই যেন সাধকের তৃপ্তির পরিসমাপ্তি না হয়, আরও তাঁহার দেখিবার ও

ভোগ করিবার অনেক আছে, ইহা মনে করিয়া যেন সর্ব্বদা তাঁহার ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরের জন্য তৃষ্ণা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। 'অমৃত' এই শব্দটি আরাধনায় ব্যাখ্যার বিষয় না হইয়াও আমাদের মনের উপরে কি প্রকার প্রভাব বিস্তার করে এবং অনন্ত জীবনের আশা উদ্দীপন করে, উহা সকল সাধকেরই বিদিত থাকা প্রয়োজন।

ব্রহ্মস্বরূপ।

ভিন্ন ভিন্ন উপনিষৎ হইতে ব্রহ্মের স্বরূপগুলি গৃহীত হইয়াছে, এবং পর পর স্থাপিত হইয়াছে, এইরূপ স্থাপন বিজ্ঞানসিদ্ধ অথবা যাঁহারা পর পর স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা যেমন মনে করিয়াছেন, তেমনি করিয়া উহা করিয়াছেন। এই স্থাপনের ভিতরে এমন একটি যোগ আছে, যে যোগ এরূপে স্থাপন না করিলে কিছুতেই হইত না। যাঁহারা বচনগুলি পর পর স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মনে এরূপে স্থাপন করিবার কোন একটি হেতু উপস্থিত হইয়াছিল। সে হেতু পূর্ণ কি অপূর্ণ তাহার বিচার করা নিষ্প্রয়োজন, কেন না তাঁহারা হয়তো সে বিষয় কোন হেতু অন্বেষণ করেন নাই, প্রথমে তাঁহাদের যাহা প্রতিভাত হইয়াছিল, অবিচারে হয়তো তাহারই তাঁহারা অনুসরণ করিয়াছিলেন। এখন বহুকাল সাধনের পর, আমাদের মনের উপর উহাদের একটি প্রভাব দৃঢ়মূল হইয়াছে। সেই প্রভাব ক্রমে আমাদের মনের উপরে কি ক্রিয়াপ্রকাশ করিয়াছে, এবং তাহাতে যে স্বরূপের পরে যে স্বরূপের প্রভাব আমাদের জীবনে প্রকাশ পাওয়া সমুচিত, তাহা

হইয়াছে কি না, ইহা দেখিলেই উঁহাদের সন্নিবেশ যে ঠিক বিজ্ঞানসিদ্ধ তাহা প্রমাণিত হইবে।

সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, এ তিন স্বরূপের প্রথমে সন্নিবেশ কেন হইল? এ তিন স্বরূপ বিনা অন্য কোন স্বরূপ প্রথমে স্থাপিত হইতে পারে কি না? সাধারণ ভাবে কোন বস্তুর জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞানলাভ কখন সম্ভবপর নহে। সর্ব্ব প্রথমে সামান্যতঃ বস্তুর সত্তা আমাদের নিকটে প্রতিভাত হয়। সত্ত প্রতিভাত হইতে গেলেই অন্য বস্তুর সত্তা হইতে তাহার পার্থক্য অনুভূত হওয়া প্রয়োজন; অন্যথা সে বস্তুর আপনার স্বতন্ত্রতারক্ষা করিতে না পারিয়া অন্য বস্তুর সঙ্গে মিশিয়া যায়, বিশেষভাবে লক্ষ্যস্থলে পড়ে না। যিনি সেই বস্তু জানিতেছেন প্রথমতঃ তাঁহা হইতে সে বস্তুর পার্থক্য কি, ইহা সর্ব্বাগ্রে স্থির হওয়া প্রয়োজন। যিনি স্বরূপের আরাধনা করিতেছেন, স্বরূপসমূহের সহিত যদি তাঁহার ঐক্য না থাকে, তবে তাঁহার মনে সেগুলি প্রতিভাতই হইতে পারে না। অন্য দিকে যাঁহার স্বরূপানুভব করিতেছি, তিনি যদি সর্ব্বতোভাবে আমারই মত হন, তাহা হইলে আর তিনি আমার লক্ষ্যস্থলে পড়িতে পারেন না, সুতরাং একতার সঙ্গে সঙ্গে পার্থক্য কোথায়, তাহাও সেই সময়ে নির্দ্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ঈশ্বর আছেন, আমিও আছি, ঈশ্বর জ্ঞান আমিও জ্ঞান, সুতরাং স্বরূপের একতাবশতঃ তৎসম্বন্ধে আমার জ্ঞানলাভ সহজ হইল। কিন্তু তাঁহার সত্তা ও আমার সত্তা, তাঁহার জ্ঞান ও আমার জ্ঞানের মধ্যে যদি কোন পার্থক্য না থাকে, তাহা হইলে উভয়ের বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গম না হওয়াতে তিনি আরাধ্য আমি আরাধক এ সম্বন্ধ রক্ষা পায় না। সুতরাং সত্য ও

জ্ঞানের সঙ্গে অনন্তস্বরূপ থাকা চাই, না থাকিলে এই পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম হয় না এবং আমার সত্তা ও জ্ঞান যে তাঁহার অনন্ত সত্তা ও অনন্ত জ্ঞানে দিন দিন পূর্ণ হইবে, তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ উপস্থিত হয় না। তাঁহার অনন্ত সত্তা ও অনন্ত জ্ঞানে আমার সত্তা ও জ্ঞান ক্রমে দিন দিন পূর্ণ হইতেছে, ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে বলিয়া ঈশ্বর আমার চির আরাধ্য।

অনন্ত আরাধকের সহিত আরাধ্যের ভেদসাধন করিল, এবং নিত্যকাল তিনি যে আরাধ্য থাকিবেন তাহারও কারণ পাওয়া গেল। কিন্তু অনন্ত যদি একেবারে জ্ঞান বুদ্ধির অতীত হইয়া যান, তাহা হইলে আর আরাধ্য ও আরাধকের সম্বন্ধ দাঁড়ায় না, সম্বন্ধ না দাঁড়াইলে ঐখানেই আরাধনা বন্ধ হইয়া যায়। "আনন্দ-রূপমমৃতং" এই বেদান্তবচনটি আরাধ্য-আরাধক-সম্বন্ধ নিত্য-কালের জন্য স্থির রাখে। কিরূপে রাখে তাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, এখানে আর উহা বলিবার প্রয়োজন করে না। সত্য জ্ঞান অনন্ত এবং অনন্তের বস্তুর ভিতরে আত্মপ্রকাশ, ইহার পর "শান্তং শিবমদ্বৈতম্" কি প্রকারে স্বভাবতঃ আইসে ভাল করিয়া তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন। অনন্ত আপনার ভিতরে সমুদায় জগৎ ও জীবকে রাখিয়া তন্মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন কেন? তিনি কি এ সকল নিরপেক্ষ হইয়া আপনি আপনাতে থাকিতে পারিতেন না? তিনি নিরপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারিতেন তাহাতে আর সন্দেহ কি, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মঙ্গল ভাব আপনার স্বরূপানুরূপ কার্য্য করিতে পারিত না। যাঁহাতে মঙ্গলভাব আছে, তিনি অন্যত্র সে মঙ্গলবিস্তার করিবেনই করিবেন, কেন না মঙ্গলের স্বভাবই এই। জগৎ ও জীবে তাঁহার

সেই মঙ্গলভাব বিস্তৃত হয়। অনন্তের ভিতরে জগৎ ও জীবকে বিবিধ প্রকারে সম্পন্ন দেখিয়া তাঁহার মঙ্গলভাবের ক্রিয়া স্বতঃ আমাদের চক্ষুর সন্নিধানে প্রতিভাত হয়। মঙ্গল চিরনির্ব্বিকার পক্ষপাতশূন্য, অন্যথা মঙ্গল মঙ্গলনামে অভিহিত হইতে পারে না, সুতরাং মঙ্গলস্বরূপের সঙ্গে শান্ত অর্থাৎ নির্ব্বিকার ভাব চির-সংযুক্ত।

নির্ব্বিকার মঙ্গলই প্রেম। এই প্রেমে অনুরক্ত হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। অনুরাগের স্বরূপ এই যে, অনুরাগের পাত্রেতে উহা হৃদয়-মন প্রাণকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে, আর অন্যত্র উহাদিগকে যাইতে দেয় না। একেতে চিত্তের একান্ত অভিনিবেশ প্রেমের ফল। সুতরাং মঙ্গল বা প্রেমস্বরূপের সঙ্গে সঙ্গে একত্ব অখণ্ডত্ব অদ্বৈতভাব চিরসংযুক্ত।

একের প্রেমে অনুরক্ত হইয়া তাঁহাতে মগ্ন হইলে আর তাঁহার ইচ্ছার বিরোধে কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্তিই হয় না, সুতরাং ঈশ্বরের একত্বে মগ্ন হওয়াতে পুণ্য স্বতঃ হৃদয়ে উদিত হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা বা ক্রিয়াশক্তি পুণ্যনামে অভিহিত। ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীনতা একমাত্র তৎপ্রতি অনুরাগবশতঃ উপস্থিত হয়, ইহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। ঈশ্বরের ইচ্ছা বা ক্রিয়াশক্তির আনুগত্যে সাধকে যে উদ্যম, উৎসাহ ও সমুদায় বৃত্তির বিকাশ-লাভ হয়, তন্মধ্যে রসস্বরূপ আনন্দস্বরূপ তাঁহার নিকটে প্রকাশ পান। একথা রসস্বরূপের ব্যাখ্যায় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আর এখানে তৎসম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

একটী কথা বলিয়া আজকার বক্তব্য শেষ করিতে হইতেছে। সত্য জ্ঞান অনন্ত ইত্যাদি কেবল স্বরূপ এবং সে স্বরূপও বেদান্তে

প্রথম পুরুষেই উল্লিখিত হইয়াছে। আরাধনাকালে মধ্যম পুরুষে ঐ সকলের সঙ্গে তুমি সংযুক্ত করা হয় কিরূপে? এরূপে তুমি সংযোগ করা মনে হয় খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতে আসিয়াছে। হইতে পারে, প্রথমে যাঁহারা তুমি পদ সংযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহারা খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবেই উহা করিয়াছিলেন। কিন্তু বেদান্তের উপাসনা-প্রণালী যাঁহারা জানেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, এরূপে তুমি সংযুক্ত করা বেদান্তবিরোধী হয় নাই। উপাসনার উদ্দেশ্য এই, উপাসক উপাস্যের অনুরূপ হইবেন। উপাস্যের অনুরূপ হইতে গেলেই উপাসকের স্বরূপ উপাস্যের স্বরূপের অনুরূপ হওয়া চাই। এজন্য ব্যতিহার অর্থাৎ বদলাবদলির প্রণালীতে বেদান্তে উপাসনা হইয়া থাকে। "তিনি আমি আমি তিনি" অথবা "তুমি আমি আমি তুমি" এইরূপ ব্যতিহার বেদান্তসিদ্ধ উপাসনা। ঈশ্বরের স্বরূপ সাধকেতে প্রবিষ্ট হইয়া সাধক ঈশ্বরের অনুরূপ হইবেন, আরাধনা যখন সেইজন্য, তখন "তুমি আমি আমি তুমি" এই ব্যতিহারগ্রহণ করিয়া স্বরূপগুলি মধ্যমপুরুষের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই একত্ব ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী নহে। ঈশা বলিয়াছিলেন "আমি এবং আমার পিতা এক" অর্থাৎ পুত্রত্বে পিতার সঙ্গে এক, বেদান্ত-সিদ্ধপ্রণালী মধ্যে তাহার বিরোধী ভাব কিছু নাই, এ কথা বুঝাইতে গেলে বৈদান্তিক ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে হয়, সুতরাং সে বিচারে আমাদের প্রবৃত্ত হইবার কোন প্রয়োজন নাই।

[বেদান্তের ধর্ম্ম কি? সংক্ষেপে ইহার উত্তর এই, ব্রহ্মবিজ্ঞান। অন্যান্য বিজ্ঞান 'কার্য্য' বা প্রকৃতি লইয়া; ব্রহ্মবিজ্ঞান 'কারণ' বা ব্রহ্ম লইয়া। বেদান্তে প্রকৃতিসম্বন্ধে কোন কথা নাই তাহা

নহে, কিন্তু ব্রহ্মকে বিজ্ঞানের বিষয় করিতে হইলে প্রকৃতির যত-টুকু প্রয়োজন, তাহাই উহাতে আছে। বেদান্তমতে প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র নহে, উহা তাঁহারই শক্তি। গীতায় প্রকৃতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতি। পরা প্রকৃতি জীব, অপরা প্রকৃতি দৃশ্যমান জগৎ। জগৎ ও জীবের উপাদান প্রকৃতি, এই প্রকৃতি ঈশ্বরেরই শক্তি, তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে। জগতে যেমন শক্তি, জীবে তেমনি চিচ্ছক্তি নিত্যপ্রকাশমান। জগৎ ও জীব হইতে শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিলে যেমন জগৎ ও জীব থাকে না, তেমনি ঈশ্বরকে বিচ্ছিন্ন করিলেও উহারা থাকে না, কেন না শক্তি ও ঈশ্বর স্বতন্ত্র নহে। কারণকে পশ্চাতে রাখিয়া কার্য্যকে সম্মুখে আনয়নপূর্ব্বক সমুদায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। এই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে যে সকল কারণের উল্লেখ হয়, সেগুলি কারণ নয় কার্য্য, এক কার্য্য অন্য কার্য্যের উপরে যে ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহা দেখিয়া কার্য্যকেও কারণনামে অভিহিতকরা হয়। এসকল যথার্থ কারণ নয়, অবান্তর কারণ। বিজ্ঞান কি তবে ঈশ্বরকে অস্বীকার-করেন? অস্বীকার-করেন না, কিন্তু স্বীকার-করিয়া সম্মুখ হইতে তাঁহাকে সরাইয়া রাখেন, অবান্তর কারণরূপী কার্য্যকেই কারণরূপে উপস্থিত করেন। বেদান্তের ব্রহ্মবিজ্ঞান কার্য্যকে উড়াইয়া দেন না, কার্য্যকে পশ্চাতে রাখিয়া কারণকে সম্মুখে আনয়ন-করেন। ঈশ্বর হইতে জগতের জন্ম, তাঁহাতে জগতের লয় বা অপৃথক্ ভাবে স্থিতি, তাঁহারই ক্রিয়া জগতে প্রকাশিত (তজ্জলানিতি), এই প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক, কার্য্যরূপী সমুদায় জগৎকে কারণরূপী ব্রহ্মে লয় বা অপৃথক্ ভাবে স্থাপিত করিয়া কারণ-ব্রহ্ম উহাকে

লইয়া নিয়ত কি করিতেছেন, তাহাই সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষকরিবার জন্য বেদান্তের ব্রহ্মবিজ্ঞান সাহায্য করিয়া থাকে। এই সাক্ষাৎ দর্শন দুই প্রণালীতে সাধিত হইয়া থাকে, এক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আর এক চক্ষু জগতের উপর স্থাপন করিয়া। চক্ষু মুদ্রিত করিলে সমুদায় জগৎ বিলীন হইয়া গেল, এক অখণ্ড সত্তামাত্র সম্মুখে প্রকাশ পাইল। এই সত্তা কারণসত্তা, ব্রহ্মসত্তা। এখানে জগৎ ব্রহ্মসত্তাতে সম্যক্ প্রকারে বিলীন। চক্ষু মেলিয়া চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, প্রাণের প্রাণ, সূর্য্যের সূর্য্য, চন্দ্রের চন্দ্র (রূপং রূপং প্রতিরূপঃ) ইত্যাদি প্রণালীতে যিনি 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা', সকলের স্থিতি-আদির যিনি কারণ, যাঁহার জন্য চক্ষু চক্ষুরূপে, কর্ণ কর্ণরূপে, প্রাণ প্রাণরূপে, সূর্য্য সূর্য্যরূপে, চন্দ্র চন্দ্ররূপে প্রকাশিত, তাঁহাকে সাধক সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষকরিয়া থাকেন। এখানে কার্য্য একেবারে বিলীন হইল না, কিন্তু কারণের সঙ্গে অপৃথক্ ভাবে স্থিতি করিল। এই দ্বিবিধ দর্শনেরই প্রয়োজন আছে, কেন না চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জগতের নিকট বিদায় গ্রহণ এবং সমগ্র জগৎকে বিলীনকরা দিনের মধ্যে কিছুকালের জন্য সম্ভব, অধিকাংশ সময়ের জন্য ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ের সহিত সংযুক্ত রাখিয়া সংসারে জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করিতে হয়। বেদান্তের ব্রহ্মবিজ্ঞানে এই দুই প্রণালী সমানভাবে উল্লিখিত থাকিলেও পূর্ব্বাচার্য্যগণ আপনাদের ভাবানুসারে একটি বা আর একটিকে প্রধান করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই, তবে যিনি যেটির পক্ষপাতী যুক্তিবলে সেইটিকে প্রধান আর অপরটিকে অপ্রধান করিয়াছেন। এইরূপে দুই প্রণালীর সামঞ্জস্য কোথায় তাহা প্রকাশ পায় নাই। অনেকে ভাবেন, বেদান্তের মতে সমুদায়

জগং ও জীব ব্রহ্ম, জগৎ ও জীব মিথ্যা এক ব্রহ্মই কেবল সত্য, ব্রহ্মেতেই জগং ও জীব ভ্রান্ত দৃষ্টিতে আরোপিত হয়। ব্রহ্মেতে উহাদের আরোপ হইলে, কেহ এক জন আরোপ করিবে, কোন কিছু আরোপিত হইবে, তাহা না হইলে আরোপই হইতে পারে না। সুতরাং জগং, জীব ও ঈশ্বর তিনেরই স্থিতি বিনা আরোপ বা ভ্রান্তদৃষ্টিও সিদ্ধ পায় না। যাঁহার নামে এই মত এদেশে প্রচলিত হইয়াছে, তিনি স্বয়ং এ মতের যে দোষ জানিতেন না তাহা নহে। বেদান্তসিদ্ধ যোগের দ্বিবিধ প্রণালীর মধ্যে সমুদায় উড়াইয়া কেবল ব্রহ্মসত্তাধারণের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া তিনি কারণরূপী ব্রহ্মেতে একেবারে জগং ও জীবকে বিলীন করিয়া ফেলিয়া কেবল ব্রহ্মকেই অবশেষ রাখিয়াছেন এই মাত্র। যদি তাহা না হইবে তবে জগং ও জীব আছে তাহাকে কেহই চেষ্টা করিয়া উড়াইয়া দিতে পারে না, ইহা তিনি আপনি স্পষ্ট কথায় বলিলেন কেন?]

ব্যতিহার।

উপাসনাকালে "তুমি আমি, আমি তুমি" বেদান্তের এই রীতি অবলম্বন-করিয়া সকল স্বরূপের সঙ্গে তুমি যোগ-করার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যাঁহাকে তুমি বলি তিনি আমার সম্মুখস্থ; আর যাঁহাকে তিনি বলি তিনি দূরস্থ। ব্রহ্ম যখন মানুষের ধারণার অতীত, তখন তাঁহাকে তুমি না বলিয়া তিনি বলাই উচিত, অনেকের এইরূপ মত। উপনিষদ্ ব্রহ্মের স্বরূপনির্ণয়কালে তাঁহাকে তিনি বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মের সহিত জীব আপনার একত্বানুভব করিবে, উপনিষদের এই উদ্দেশ্য। যেখানে

একত্বানুভবের প্রণালী লিখিত আছে, সেখানে জীবকে তুমি ও ব্রহ্মকে তিনি বলিয়া "তিনি তুমি" এইরূপ অভেদভাব উপদিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মমুখে "আমি আছি" এ কথা উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রসিদ্ধ উপনিষদ্গুলিতে ব্রহ্মসম্বন্ধে 'তুমি' শব্দের প্রয়োগ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

'ভগবতি দেবতে, তুমিই আমি, আমিই তুমি' জাবালগণের এই উক্তি তুলিয়া ভাষ্যকার শঙ্কর উপাসনায় ব্রহ্মসম্বন্ধে 'তুমি' শব্দের ব্যবহার দেখাইয়াছেন। 'তুমি আমি, আমি তুমি' উপাসনায় এরূপ ব্যতিহার (বদ্লাবদলি) আমরাও এই উক্তি-অবলম্বনে প্রদর্শন করিয়াছি। এইরূপ ব্যতিহারে আরাধনা কি আকার-ধারণ করে, সর্ব্বাগ্রে সেইটি দেখা প্রয়োজন। উপাস্য ও উপাসক এ দুইয়ের একত্র স্থিতি বিনা কখন উপাসনা সিদ্ধ হয় না। যাঁহাকে উপাসনা করিতেছি তিনি 'তুমি', আর উপাসনা করিতেছি 'আমি', এ দুইয়ের একত্র সন্নিবেশ হইলেই যে ব্যতিহার হইল তাহা নহে। আরাধনা করিতে গিয়া যদি ঈশ্বরের ভাব আমাতে প্রবিষ্ট না হয়, আমার ভাব তাঁহাতে প্রবিষ্ট না হয়, তাহা হইলে পরস্পরের ভাববিনিময়রূপ ব্যতিহার হইল না। ঈশ্বরের ভাব আমাতে প্রবিষ্ট হয় এবং আমাতে সেই ভাবের প্রবেশে আমি উন্নত হই, এ কথা সত্য, কিন্তু আমি অতি হীন, আমি ঈশ্বরের নিকটে কিছুই নই, আমার ভাব তাঁহাতে প্রবেশ করিবে, উহা তো দূরের কথা, আমার ভাব তাঁহাকে স্পর্শ করিতেই পারে না। এরূপ স্থলে বেদান্তের ব্যতিহারের ব্যবস্থা-গ্রহণ করিয়া উপাসনা করা কি কখন উচিত? যাহা সত্যের বিরোধী, সেরূপ উপায়াবলম্বন কখন শ্রেয়স্কর নহে।

বেদান্তবাদিগণ এস্থলে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, এই ব্যতিহারে দ্বারা চরমে জীব ও ব্রহ্মের যখন একত্ব সাধিত হয়, আপনাকে ব্রহ্মেতে এবং ব্রহ্মকে আপনাতে না দেখিলে যখন একত্বসাধন হইতে পারে না, তখন ব্রহ্ম মহৎ আমি ছোট, এ জ্ঞানে ঈদৃশ উপাসনা হইতে বিরত হওয়া কখন উচিত নয়। আমি যত কেন ক্ষুদ্র হই না আমি ব্রহ্মেতে আছি ব্রহ্ম আমাতে আছেন, আমাতে যে সত্তা ও জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে, তাহা ব্রহ্মের সত্তা-ও জ্ঞাননিরপেক্ষ নয়। তাঁহারই সত্তাতে আমার সত্তা, তাঁহারই জ্ঞানে আমার জ্ঞান। আমার জ্ঞান ও সত্তা সামান্য হইতে পারে, কিন্তু সামান্য হইলেও আমি ব্রহ্ম হইতে আমার সত্তা ও জ্ঞানকে যখন পৃথক্ করিয়া লইতে পারি না, পৃথক্ করিয়া লইতে গেলে যখন আমি থাকি না, তখন তাঁহাতে আমি, আমাতে তিনি, এ না ভাবিয়া আমার সম্বন্ধে আর উপায়ান্তর কি আছে। এরূপ না ভাবিয়া যদি আমি থাকিতে না পারিলাম, তাহা হইলে সুতরাং উপাসনায় ব্যতিহার আসিয়া পড়িতেছে। তবে এখানে এই আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে, আমার দিক্ দিয়া যখন আমি চিন্তা করি তখন তাঁহাতে আমি, আমাতে তিনি ইহা আমি হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকি, কিন্তু ব্রহ্ম কি আমাতে আপনাকে এবং আপনাতে আমাকে দেখেন? বেদান্ত বলেন, হাঁ। বেদান্তের এরূপ বলা কত দূর সত্য আমাদের বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।

"এই পরমাত্মা ব্রহ্ম সকল অনুভব-করেন" (অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ) ইহার অর্থ এই যে, যতগুলি আত্মা আছে, তাহারা যাহা অনুভব-করে, ব্রহ্মও সে সকল আপনি অনুভব-করেন।

ব্রহ্ম যাহা অনুভব না করেন, জীব তাহা অনুভব করিতে পারে না, ব্রহ্মের অনুভবই জীবের অনুভব, বেদান্তের এ মতে আমরা কত দূর সায় দিতে পারি, ইহা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। আমাদের মনে কত প্রকারের কুচিন্তা উদিত হয়, আমাদের কুচিন্তা কি আর ঈশ্বরের চিন্তা? সকল সুচিন্তা তাঁহার, কুচিন্তা আমাদের, এরূপ বিভাগ করিলে জীবের সকল অনুভব তাঁহার অনুভব, একথা আর দাঁড়ায় না। এই দাঁড়ায় যে, জীবের ভাল ভাল চিন্তা ব্রহ্মের, মন্দ চিন্তা গুলি তার আপনার। মানুষ সর্ব্বদা সংসার ভাবে, ক্ষুদ্র তুচ্ছ বিষয় সমুদায় তাহার চিন্তার বিষয়, ঈশ্বরেরও যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর কি মানুষের মত তুচ্ছ হইলেন না? কথাটী বড়ই গুরুতর। বেদান্তের কোন একটি মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ হওয়া ভাল, তবু বেদান্তের অনুরোধে ঈশ্বরকে হীন করিয়া ফেলা কিছুতেই উচিত নয়। ব্রহ্মের দিক্ দিয়া চিন্তা করিলে বেদান্তের মতটি সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় কি না, দেখা যাউক।

জগতে যত কিছু পদার্থ আছে,—কি জীবে, কি অজীবে,—সমুদায়েতে ঈশ্বরের জ্ঞান প্রকাশ পায়, একথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। জগতে এমন কিছুই নাই যাহা ঈশ্বরের জ্ঞানের অনুপযুক্ত। আমরা যদি অনুপযুক্ত মনে করি, তাহা আমাদের জ্ঞানের অভাবের জন্য, সে ব্যক্তি বা পদার্থ কখন তাঁহার জ্ঞানের অনুপযুক্ত নয়। প্রত্যেক বস্তুর গূঢ়তত্ত্ব যদি সমগ্র ভাবে আয়ত্ত করিতে পারি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, ঈশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান বিনা সেই বস্তুকে সমুদায় জগতের সহিত সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিয়া আর কেহ জন্মাইতে পারিত না। অতি ক্ষুদ্র

ুকা কণা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের যে
ন্থর যোগ আছে সে যোগ আমরা অনুভবগোচর করিতে পারি
বলিয়া আমাদের নিকটে বালুকাকণা অতি তুচ্ছ, স্থূল ব্রহ্মাণ্ড
তি অদ্ভুত। ঈশ্বরের সৃষ্টির সামান্য কোন এক খণ্ড লইয়া বিচার
রিলে তাহার ভিতরে বিবিধ অপূর্ণতা প্রতীত হইবে, ইহা আর
চিত্র কি? একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকার কোন এক সামান্য অংশ
দি আমাদের নয়নগোচর হয়, আর তার অবশিষ্ট সমুদায় অংশ
চ্ছন্ন থাকে, তাহা হইলে সমুদায় অট্টালিকার সহিত সে অংশের
ক সম্বন্ধ তাহা হৃদয়ঙ্গম না হওয়াতে সে অংশটি নিতান্ত অপূর্ণ
লিয়া প্রতীত হইতে পারে; অসীম জগতের ক্ষুদ্রাংশ লইয়া বিচার
পস্থিত করিলে যে সেইরূপই হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি?
শ্বরের সৃষ্টিসম্বন্ধে বিচার যে আমাদের নিকটে ঐরূপই হইয়া
াকে, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। এই ক্ষুদ্র দৃষ্টি
ড়িয়া দিয়া প্রশস্ত দৃষ্টিতে সমুদায় না দেখিলে সর্ব্বত্র ঈশ্বরের
ানের প্রকাশ দেখা কখনই সম্ভবপর নহে।

সর্ব্বত্র ঈশ্বরের জ্ঞানের প্রকাশকে বেদান্ত ব্রহ্মের অনুভব
লয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মের জ্ঞান, ব্রহ্মের চিন্তা, ব্রহ্মের
নুভব, এগুলিকে আমরা এক করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি,
দান্তের মতটি হঠাৎ যেরূপ দূষিত বলিয়া মনে হয়, সেরূপ দূষিত
। মানুষের সুচিন্তা ও কুচিন্তা, মানুষের সুজ্ঞান ও কুজ্ঞান,
নুষের উত্তম অনুভব এবং মন্দ অনুভব, এগুলির তত্ত্ব বিচার
রিয়া দেখিলে এই দেখিতে পাওয়া যায়, চিন্তা, জ্ঞান ও অনুভব,
রা স্বয়ং দূষিত নয়, মানুষ যেরূপে ঐগুলির নিয়োগ করে,
নুসারে উহারা ভাল বা মন্দ বলিয়া অভিহিত হয়। আমাদের

প্রতিদিনের ব্যবহারের বস্তু আপনি মন্দ নয়. উহা ঈশ্বরের হস্ত হইতে উৎপন্ন বলিয়া তিনি কিছু নিন্দনীয় নন, কিন্তু আমরা উহার ভাল মন্দ উভয় ব্যবহারই করিতে পারি। সেইরূপ আমাদের চিন্তা, জ্ঞান বা অনুভব কিছু মন্দ নয়, তাহাদিগকে যেরূপে নিয়োগ করা ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ সেইরূপে উহাদিগকে নিয়োগ করিলে উহারা মন্দ হয়। কোন একটি বস্তু বা বিষয় লইয়া চিন্তা উপস্থিত হয়, সে চিন্তা যদি ঈশ্বরের তৎসম্বন্ধে যে চিন্তা অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকাশ তাহার অনুরূপ হয় তাহা হইলে উহা সুচিন্তা হইল, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান উহাকে যাহা করিয়াছে, যে উদ্দেশে করিয়াছে, তাহার বিপরীতে যদি আমাদের চিন্তা ধাবিত হয়, তাহা হইলে আমাদের চিন্তা সুচিন্তা না হইয়া কুচিন্তা হইল। ঈশ্বরের সঙ্গে উপাসনা দ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধস্থাপনকরার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের চিন্তা যে ঈশ্বরের চিন্তা বা জ্ঞানের বিপরীত দিকে ধাবিত হয় সেইটিকে অবরুদ্ধ করা। উপনিষদে যেখানে "এই পরমাত্মা ব্রহ্ম সকল অনুভব করেন" ইহা লিখিত হইয়াছে, সেখানে প্রকৃতি, জীব ও পরমাত্মা, এ তিনের মধ্যে যোগেতে একতা অগ্রে উল্লেখ করিয়া তাহার পরে ঐ কথাগুলি নিবিষ্ট হইয়াছে। যেখানে বিরোধ নাই কেবলই একতা সেখানে তিনে এক, একে তিন হইবে না কেন? প্রকৃতি তাঁহার নিয়ন্তার অভিপ্রায় নিয়ত অনুসরণ করিতেছেন। সুতরাং প্রকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির নিয়ন্তার কোন বিরোধ নাই। জীব যদি আপনার নিয়ন্তার নিয়মাধীন হয় তাহা হইলে প্রকৃতির সঙ্গেও তাহার কোন বিরোধ থাকে না। কেন না যাহার সহিত জীব যেরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ সেই সম্বন্ধানুসারে তিনি তাহাকে নিয়মিত করিয়া থাকেন।

এতৎপক্ষলে বিস্তীর্ণ জনসমাজ ও প্রকৃতি এ উভয়ের সহিত জীবের সম্বন্ধ এমনই একতালাভ করে যে, কোথাও কোন বিরোধের কারণ থাকে না। যখন এইরূপ একতা হইল, তখন সকলকে যিনি আপনাতে অন্তর্ভূত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার ভাব, চিন্তা ও জ্ঞানের সঙ্গে জীবের ভাব, চিন্তা ও জ্ঞানের ঐক্য ঘটিল। সুতরাং ব্রহ্মের চিন্তা জীবের চিন্তা, ব্রহ্মের অনুভব জীবের অনুভব, ইহা নির্দ্ধারণ করা কিছু অনুচিত হইল না, এবং বেদান্তের ঐ মতটি উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে ব্যতিহার বা ভাববিনিময়ের উপযোগী বলিয়া গ্রহণ করাতে কোন দোষ পড়িল না। ইহার পর আরাধনায় এক একটি স্বরূপের নিয়োগের বিষয় যখন বলা হইবে, তখন এই ব্যতিহারের নিয়ম সেখানে কিরূপে নিয়োগ করা হইয়া থাকে তাহার উল্লেখ করা যাইবে।

স্বরূপারাধনা।

ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে উপাস্য-ও-উপাসক-সম্বন্ধ সম্ভবপর না হইলে কখন উপাসনা সম্ভবে না। ব্রহ্ম সকল সম্বন্ধের অতীত, সুতরাং তাঁহার উপাসনা হয় না, শঙ্কর প্রভৃতি নির্গুণ-ব্রহ্মবাদিগণের এই মত। ব্রহ্ম যদি সর্ব্বাতীত না হন, তাহা হইলে তিনি জগতে ও জীবে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। এরূপে আবদ্ধ হইলে, তিনি জগৎ ও জীবের সম্পূর্ণরূপে প্রভু হইতে পারেন না, কতকটা উহাদিগের মুখাপেক্ষী হইয়া তাঁহাকে চলিতে হয়। আমরা শরীরে বদ্ধ। যদিও আমরা শরীরকে চালাই, তবুও শরীরও যে আমাদিগকে কতকটা চালায়, ইহা কি আমরা অস্বীকার করিতে

পারি? জগৎ ও জীব সম্পূর্ণ ঈশ্বরের অধীন, তাঁহার সত্তানিরপেক্ষ হইয়া তাহাদের অস্তিত্বই থাকে না। এরূপ অবস্থায় ঈশ্বর তাহাদিগেতে বদ্ধ, ইহা কি প্রকারে আমরা স্বীকার করিব? তিনি জগৎ ও জীবের অতীত, ইহা মানিলেই যে জগৎ ও জীবের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ থাকে না, ইহাই বা কি প্রকারে বলা যাইবে? যিনি সকলের অতীত, তিনি কি সকলকে আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিতে পারেন না? অতীত না হইলে কে কাহাকে আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়? ঈশ্বর সমুদায় জীব ও জগৎকে আপনার অনন্তসত্তার অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং আমরা অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া তাঁহার সহিত সম্বন্ধানুভব করি। সমুদ্রের ভিতরে যে মৎস্য বিচরণ করিতেছে, উহার যদি মানুষের মত জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে উহা সমুদ্রের পারগমনে সমর্থ না হইলেও সে যে সমুদ্রের মধ্যে বিচরণ করিতেছে, এবং উহার সহিত বিবিধ সম্বন্ধে সম্বন্ধ আছে, ইহা কি আর উহা বুঝিত না? অতএব ঈশ্বর সর্ব্বাতীত হইয়া সকলকে যখন আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তখন তাঁহাতে স্থিতি, এবং আমাদের সঙ্গে তাঁহার বিবিধ ক্রিয়া আমরা সহজে উপলব্ধি করিতে পারি, এবং উপলব্ধি করিতে পারি বলিয়াই তাঁহার সহিত আমাদের উপাস্য ও উপাসক সম্বন্ধ।

ঈশ্বরের সহিত আমরা সম্বন্ধবর্জ্জিত নই, ইহা মানিয়াও আর একটি অন্তরায় দ্বারা নিপীড়িত হইতেছি। সর্ব্বাতীত বস্তুকে আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে আনিতে গেলেই তাঁহার সর্ব্বাতীতত্ব বিদায় করিয়া দিতে হয়, যত টুকু আমরা ধারণ করিতে পারি, সেই টুকু লইয়া আমাদিগকে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়।

উপাসনাপ্রণালীতে সত্যস্বরূপের আরাধনা এইরূপ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে :—

"তুমি সত্য, সর্ব্বস্থানে তোমার জীবন্ত সত্তা। সমুদায় বিশ্বের আশ্রয় স্থান তুমি, চেতন ও অচেতন তাবৎ পদার্থের তুমি মূলাধার। তোমাতেই আমরা জীবিত রহিয়াছি এবং বাস করিতেছি। তোমা ছাড়া সকলই অসার ও মিথ্যা। হে সর্ব্বত্র বিদ্যমান ঈশ্বর, তুমি আমাদের জীবনের জীবন।"

প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যিনি দেশ কালের অতীত তাঁহাকে 'সর্ব্বস্থানে তোমার জীবন্ত সত্তা' বলিয়া দেশের সহিত সম্বদ্ধ করা হইয়াছে। এরূপে দেশের সহিত সম্বন্ধে তাঁহাকে না আনিলে, আমরা কিরূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিব, কিরূপেই বা তাঁহার উপাসনা করিব? সর্ব্বস্থানে তিনি আছেন, অতএব তিনি আমার সম্মুখেও আছেন, ইহা মানিয়া লইয়া তাঁহার পূজায় আমরা প্রবৃত্ত হই। এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে দেশকালের যিনি অতীত তাঁহাকে এইরূপে দেশকালের অন্তর্গত করিয়া লওয়াতে কি তাঁহাকে খর্ব্ব করা হইতেছে না? 'সর্ব্বস্থানে তোমার সত্তা' যদি এই মাত্র বলা হইত, আর 'সমুদায় বিশ্বের আশ্রয় স্থান তুমি' ইহা না বলা হইত, তাহা হইলে তিনি যে সকল বিশ্বের অতীত, এ জ্ঞান উপাসকের নাই, আমরা মনে করিতে পারিতাম। আমাদের জ্ঞানে যদি ঈশ্বরের সর্ব্বাতীতভাব থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে স্থানে দর্শন করিলেও কোন দোষ পড়ে না, কেন না সকল স্থান যখন তাঁহার ভিতরে, তখন তাঁহার সর্ব্বাতীত ভাবের সঙ্গে সর্ব্বগত ভাবতো আসিবেই। যখন বলা হইতেছে, 'চেতন ও অচেতন তাবৎ পদার্থের তুমি মূলাধার', তখন তাঁহারই সত্তাতে যে সকলের

সত্তা, যাঁহার সত্তা-নিরপেক্ষ হইয়া কিছুই যে থাকিতে পারে না, এ জ্ঞান উপাসকে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। তিনি সমুদায় বিশ্বের আশ্রয়, চেতনাচেতন যাহা কিছু তাহার মূল তিনি, এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়া নিবৃত্ত হইলে উপাসকের সঙ্গে উপাস্যের বিশেষ সম্বন্ধ কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম হইত না। কিন্তু যখন উপাসক বলিতেছেন, 'তোমাতেই আমরা জীবিত রহিয়াছি এবং বাস করিতেছি', তখন উপাস্য ও উপাসকের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ প্রকাশ পাইল। জগৎ ও জীব ব্রহ্মসত্তাতে স্থিতি করিতেছে, এ জ্ঞান জন্মিলেও ব্রহ্মসত্তা যে সর্ব্বনিরপেক্ষ, এ সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান জন্মিল না। যখন উপাসক হৃদয়ঙ্গম করিলেন, 'তোমা ছাড়া সকলই অসার ও মিথ্যা,' তখন সমুদায় জগৎ-ও-জীব-নিরপেক্ষ সত্তা তাঁহার জ্ঞান-গোচর হইল। ব্রহ্মসত্তা হইতে পৃথক্ করিলে সকলই অসৎ ও মিথ্যা হইয়া যায়, কেবল এক সত্তাই সর্ব্বনিরপেক্ষ হইয়া স্থিতি করে, ইহা যখন উপাসকের প্রত্যক্ষ হইল, তখন সাক্ষাৎ ব্রহ্মসত্তা উপাসকের উপলব্ধির বিষয় হইয়াছে, ইহা বুঝা গেল। এই সাক্ষাৎ উপলব্ধির পর তিনি বলিতে পারিলেন, 'তুমি আমাদের জীবনের জীবন'।

এখানে সত্য স্বরূপের আরাধনায় যে সকল কথার উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে সত্যস্বরূপসম্বন্ধে যে সকল কথা উচ্চারণ করিলে তৎসহ উপাসকের যথার্থ সম্বন্ধ কি, তাহা প্রতীত হয় সেই সকল কথাগুলি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। আরাধনাকালে ইহার অপেক্ষা অনেক কথার উল্লেখ হইয়া থাকে, কিন্তু সে সকল যদি এ সমুদায়ের বিরোধী হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানসঙ্গত আরাধনা হইল ইহা কখন বলা যাইতে পারে না। 'তোমাতেই আমরা

জীবিত রহিয়াছি এবং বাস করিতেছি' এই কথাগুলি বিস্তৃত করিতে গিয়া যখন বলা হয়—'তুমি আমার বল, তুমি আমার শক্তি, তোমা বিনা আমি কিছুই করিতে পারি না, তুমি আমার চক্ষু কর্ণের শক্তি হইয়া সকল দেখাও ও শুনাও, তুমি আমার হস্তে বল হইয়া আছ, তাই আমি তোমার বলে বলী হইয়া কার্য্য করি',—তখন ব্যতিহার উপস্থিত। একজন শক্তি দিতেছেন, আর একজন শক্তি গ্রহণ করিতেছে, গ্রহণ করিয়া তাহার ব্যবহার করিতেছে, এস্থলে দাতা ও গ্রহীতার সম্বন্ধ হইল বটে, কিন্তু উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে বিনিময় ব্যাপার তো হইল না। ব্রহ্ম যখন শক্তি দিতেছেন, তখন তিনি জানেন যে আমি অশক্ত, তাঁহার শক্তি বিনা আমি কিছুই করিতে পারি না। আমরা অশক্ত জানিয়া শক্তিদান, অশক্ত বোধে আমার তাঁহা হইতে শক্তিগ্রহণ, এ দুই ব্যাপারের মধ্যে ভাববিনিময় ঘটিল। তিনি যে শক্তিমান্ তাহা তিনিও জানিতেছেন আমিও জানিতেছি। আমি যে অশক্ত তাহা তিনিও জানিতেছেন আমিও জানিতেছি, এই জ্ঞাননিবন্ধন ব্রহ্ম ও আমার মধ্যে ভাবের একতা ঘটিতেছে, এবং এই ভাবের একতাবশতঃ তাঁহার ও আমার মধ্যে ভাববিনিময় সহজ হইতেছে। আমাকে অশক্ত জানিয়া শক্তিদান, তাঁহাকে শক্ত জানিয়া তাঁহা হইতে শক্তিগ্রহণ, ইহা ভাববিনিময় ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। যদি এরূপ বিনিময় চলিতে না পারিত, তাহা হইলে উপাস্য-ও-উপাসক-সম্বন্ধ কিছুতেই দাঁড়াইতে পারিত না, এবং জীবনের জীবন বলিয়া তাঁহার সহিত নিগূঢ়-সম্বন্ধ-স্থাপনে উপাসকের প্রগাঢ় যত্ন উপস্থিত হইত না। সত্যস্বরূপের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইলে কিরূপ আরাধনা হয় তাহার আদর্শ এই:—

"কে তুমি চারিদিকে বসিয়া আছ? কে তুমি, যাঁহার গম্ভীর সত্তা অঙ্গে অঙ্গে শরীরকে রোমাঞ্চিত করিতেছে? কে তুমি আমার প্রাণের প্রাণ হ'য়ে আছ? কে তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় হ'য়ে আছ? এই বুঝি তুমি সেই, যাঁহাকে ব্রাহ্মেরা পূজা করেন? কি আশ্চর্য্য তোমার সত্তা!! কি আশ্চর্য্য!! অন্ধকারের বসন পরিয়া লুক্কায়িত থাক কেন? এ অন্ধকার সাধকের পক্ষে আলোক। পরমেশ্বর, এত পাতলা চাদর পরে এলে? একটা নামমাত্র আচ্ছাদন থাকিবে, এ কি ক'রে এসেছ? তোমার প্রকাশের কি কম হ'ল? জগদীশ্বর! আর কে আছে? এমনি প্রকাশ আপনাকে কর্‌লে যে একেবারে সব ঢেকে ফেল্লে। আর কিছু দেখা যায় না, সব বিলুপ্ত। তোমার এই জ্বলন্ত জীবন্ত সত্তা প্রকাশিত হ'ল, আর এই সত্তার মধ্যে ডুবিয়া সদসৎ কে বিবেচনা করিবে? সৎ রহিল, অসৎ মরিল, এখন কেবল তুমিই আছ। প্রাণস্বরূপ, জীবনের জীবন তুমি।"

জ্ঞান।

আমি তাঁহাকে জানিতেছি, তিনি আমাকে জানিতেছেন এরূপ না হইলে তিনি কি আমার উপাস্য হইতেন? তিনি যদি কেবল শক্তি হইতেন, তাঁহাতে জ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলে তিনি হইতেন অন্ধ, আমি হইতাম চক্ষুষ্মান। কি বিপরীত সম্বন্ধ! জ্ঞান নাই অথচ তাঁহার সৃষ্টি জ্ঞানে পূর্ণ, এ বিপরীত কথায় কে বিশ্বাস করিবে? যখন চারিদিকে তাঁহার জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে, তখন তাঁহার সে জ্ঞান আমার ভিতরেও আছে। তিনি যেমন

জ্ঞানে সকল জানিতেছেন, তেমনি আমার ভিতরের সমুদায় বিষয় জানিতেছেন। ঈশ্বরের জ্ঞানস্বরূপসম্বন্ধে ঈদৃশ জ্ঞানবশতঃ তাঁহার আরাধনা এইরূপে করিতে পারা যায়:—

"তুমি জ্ঞান, তোমার অপার জ্ঞান জলে স্থলে আকাশে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। চারিদিকে কেমন সুন্দর কৌশল, কেমন আশ্চর্য্য নিয়ম। তোমার অসংখ্য জ্ঞানচক্ষু আমাদের উপরে স্থির রহিয়াছে এবং আমাদের বাহ্যিক ও আন্তরিক সমুদায় পাপ দেখিতেছে। তোমার দৃষ্টির আলোকে আমরা কিছুই ঢাকিতে পারি না। তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তুমি অন্তর্যামী ও সর্ব্বসাক্ষী।"

জগতের চারিদিকে ব্রহ্মের জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে, উপাসক সর্ব্বপ্রথমে ইহাই দেখিয়া থাকেন। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র তাঁহার জ্ঞানকৌশলদর্শন করিয়া তিনি অবাক্ হইয়া তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। পরিশেষে তিনি যখন আপনার শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তখন তাঁহার দেহের প্রত্যেক যন্ত্রের ভিতরে কি সকল আশ্চর্য্য কৌশল বিদ্যমান তদ্দর্শনে তিনি তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন। তিনি যে জীবনের জীবন, তাঁহাকে নইলে যে দেহে জীবনের ক্রিয়া নিয়ত চলিত না, প্রত্যেক যন্ত্র উপযুক্তরূপে গঠিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতে পারিত না, ইহা বুঝিয়া তিনি তাঁহার জ্ঞানস্বরূপের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। এখনও জ্ঞানস্বরূপের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ হয় নাই। নানা বস্তুতে নানা পদার্থে তাঁহার জ্ঞানের প্রকাশমাত্র ইহাতে দেখা হইল। কিন্তু যাই উপাসক বুঝিলেন,—'তোমার অসংখ্য জ্ঞান চক্ষু আমাদের উপর স্থির রহিয়াছে এবং আমাদের বাহ্যিক ও আন্তরিক সমুদায় পাপ দেখিতেছে। তোমার দৃষ্টির আলোকে আমরা কিছুই ঢাকিতে পারি

না।'—অমনি বাহিরের দিক্ হইতে অন্তরের দিকে দৃষ্টি আসিল, অন্তরে ঈশ্বরের জ্ঞানের সহিত সাক্ষাৎকার হইল। এই সাক্ষাৎ-কারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিলেন, 'তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তুমি অন্তর্য্যামী ও সর্ব্বসাক্ষী।' ঈশ্বরের জ্ঞানচক্ষুর নিকটে কিছুই প্রচ্ছন্ন থাকে না, কেন না তিনি সর্ব্বজ্ঞ; তিনি আমাদের অন্তরে থাকিয়া আমাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন, এবং আমাদের সকল কার্য্যের সাক্ষী হইয়া আছেন।

আধুনিক অনেক পণ্ডিত ঈশ্বরকে শক্তি বলেন, কিন্তু তাঁহাকে জ্ঞান বলিতে কুণ্ঠিত। জ্ঞানের বিষয় বিনা জ্ঞান থাকিতে পারে না, জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের অতিরিক্ত হওয়া চাই। ঈশ্বরের অতিরিক্ত কিছু থাকিলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব থাকে না, কেন না যাহা কিছু তাঁহার অতিরিক্ত, তাহার তিনি ঈশ্বর নন, তাহার তিনি স্রষ্টা নন। অধিকন্তু তাঁহা ছাড়া কিছু থাকিলে তিনি সেই পরিমাণে পরিমিত হইলেন। এ সকল কথার উত্তর এই, তাঁহার জ্ঞানের পক্ষে তাঁহাকে ছাড়িয়া তাঁহার বাহিরে যাইবার কোন প্রয়োজন হয় না। তাঁহার আপনার ভিতরে সমগ্র জগৎ ও জীব বিদ্যমান, সেই সকল তাঁহার জ্ঞানের বিষয়। আমাদের ভিতরে যাহা আছে তাহা জানা কি জ্ঞান নহে? আমাদের ভিতরে সমগ্র জ্ঞানের বিষয়ের সমাবেশ হয় না, এজন্য আমাদের বাহিরে অনেক জ্ঞানের বিষয় আছে, ঈশ্বরেতে যখন সকলই অন্তর্ভূত, তখন আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান এ দুই তাঁহাতে পৃথক্ নহে একই। জানা বলিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে না জানা আসে। যাহা জানিতাম না তাহা জানিলাম, তবেইত জানা হইল। মানুষের সম্বন্ধে জানা এইরূপই বটে, কিন্তু ঈশ্বরসম্বন্ধে জানা এরূপ নহে। যখনই

আমরা কিছু জানি না বলিয়া জানিতে চাই, তখনই জানিবার জন্ত চিন্তা উপস্থিত হয়। চিন্তার অর্থ এই, জ্ঞান সহজে প্রবাহিত হইতেছিল, হঠাৎ অবরুদ্ধ হইল আর সহজে প্রবাহিত হইতে পারিল না। যেখানে জ্ঞান অবরুদ্ধ হইল, সেখানে চিন্তা উপস্থিত। চিন্তা দ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞানলাভ অপূর্ণতার লক্ষণ। ঈশ্বরেতে ইহা কোনকালে সম্ভবপর নয়। তাঁহার জ্ঞান নিয়ত অপ্রতিহত-ভাবে প্রবাহিত হইতেছে, এরূপ স্থলে চিন্তা আসিবে কেন? কোন একটি বিষয় অভ্যাস দ্বারা আমাদের আয়ত্ত হইয়া গেলে তবে তৎসম্পর্কীয় জ্ঞানের ক্রিয়া অপ্রতিহত ভাবে চলে। ঈশ্বরের জ্ঞান সর্ব্বদা অপ্রতিহত, কেন না সকলই তাঁহার চির আয়ত্ত। সকলই তাঁহার চির আয়ত্ত বলিয়া তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। তিনি যদি সর্ব্বজ্ঞ হন, তাহা হইলে তিনিতো আজ আমরা কি করিব, তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানেন। আমরা যাহা করিব তাহা যদি তিনি জানেন, তাহা হইলে তাহা পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট আছে। যাহা পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা আমাদের তো করিতেই হইবে। যাহা করিতেই হইবে, না করিয়া থাকিতে পারিব না, তৎসম্বন্ধে আমাদের দায়িত্ব কি প্রকারে ঘটিবে? যদি দায়িত্বই না ঘটিল তাহা হইলে পাপ পুণ্য কিছুই নয়, উহা মানবীয় কল্পনা। 'ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ' এস্থলে সর্ব্বজ্ঞশব্দে তিনি সকলই জানেন, এ অর্থের কোন প্রতিবাদ হইতে পারে না, কিন্তু তাঁহার জানা আমাদের জানার মত নয়। তিনি ভাবেন চিন্তা করেন তবে জানেন, এ কথা তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় না। অধিকন্তু তিনি জানেন বলিয়াই যে, সকলই পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট আছে, এ কথাই বা সত্য হইবে কি প্রকারে? সকলই পূর্ব্ব

হইতে আছে, কিছুই নূতন হইতেছে না, ইহা বলিলে এই বুঝায় যে, ঈশ্বর একবার সকল করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন, আর তাঁহার কিছুই করিবার নাই। বরং এই কথাটী ঠিক, তিনি ক্রমাগত করিয়া যাইতেছেন, তাঁহার ক্রিয়ার নিবৃত্তি নাই, যাহা কিছু হইতেছে তাঁহার ক্রিয়া হইতে নিত্য নূতন হইতেছে। আমরা যেমন চিন্তা করিয়া ভাবিয়া তার পর কিছু করি, তিনি সে প্রকারে সমুদায় করেন, তাহা নহে। তিনি কি না সর্ব্বজ্ঞ, তিনি কি না পূর্ণ জ্ঞান, সুতরাং তাঁহাকে করিতে গিয়া ভাবিতে হয় না, চিন্তা করিতে হয় না। আমরা যেমন আমাদের কল্পনায় ছবি দাগিয়া তার পর সেইটি চিত্র করি, তদনুসারে বস্তু গড়ি, সেরূপ তাঁহাকে কেন করিতে হইবে? তিনি যাহা করেন তাহাতে জ্ঞান প্রকাশ পায়, সুতরাং তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ না হইলে সকলেতে জ্ঞানপ্রকাশ পাইবে কিরূপে? তিনি সর্ব্বত্র 'এখানে', সর্ব্বদা 'এক্ষণে' অর্থাৎ তিনি কোথাও কখন অবিদ্যমান নাই। আমার নিকটে ভূত আছে ভবিষ্যৎ আছে, তাঁহার নিকটে ভূতও নাই ভবিষ্যৎও নাই, সকলই বিদ্যমান। কেন না যিনি নিত্য ক্রিয়াশীল, যাঁহার ক্রিয়ার ভিতরে কোন বিচ্ছেদ নাই, ক্রিয়ার বিচ্ছেদজ্ঞাপক ভূত ভবিষ্যৎ তাঁহাতে থাকিবে কি প্রকারে? আমাদের ক্রিয়ার বিচ্ছেদ আছে, আরম্ভ আছে শেষ আছে, সুতরাং আমাদের সম্বন্ধে ভূত ভবিষ্যৎ আছে। তাঁহার নিত্য ক্রিয়া হইতে আমাদের জীবনের ব্যাপার সমুদায় প্রতিমুহূর্ত্তে উৎপন্ন হইতেছে, আমরা উহার সঙ্গে ভূত ভবিষ্যৎ সংযুক্ত করিতেছি। আমি আমার সম্বন্ধে যাহাকে ভবিষ্যৎ বলি তাহা তাঁহার ক্রিয়াসমুৎপন্ন, তাঁহার নিরবচ্ছেদ ক্রিয়ার অন্তর্গত।

যাহা হইতেছে, তাহা যখন তাঁহার বর্ত্তমান ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইতেছে, তখন তিনি আমাদের অনেক দিন পূর্ব্বে ভাবিয়া চিন্তা করিয়া যাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাই অদ্যকার জীবনে ঘটিল, একথা বলিব কি প্রকারে? ইহাতে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব থাকিল না, এ কথা বলা যাইতে পারে না, কেন না তাঁহার ক্রিয়া যেমন নিরবচ্ছেদে বর্ত্তমান, জ্ঞানও তেমনি নিরবচ্ছেদে ক্রিয়ার সঙ্গে বর্ত্তমান, তাঁহার ক্রিয়া ও জ্ঞান কখন ভিন্ন নহে। করা ও জানা তাঁহাতে কখন স্বতন্ত্র নহে। আগে ভাবা তার পরে কাজ করা, ইহা কি কখন তাঁহাতে সম্ভব? ইহাতে কি অনবচ্ছেদ জ্ঞানে ব্যবচ্ছেদ কল্পনাকরা হয় না? আমাদের অপূর্ণ জ্ঞানশক্তির সঙ্গে তুলনাপূর্ব্বক তাঁহার জ্ঞানশক্তিকে আমাদের মত করিতে গিয়াই যত প্রকার ভুল ঘটিয়াছে। যাহা আমাদের ভুল সেইটিকে ঈশ্বরের স্বরূপপরিগ্রহে বিঘ্ন করিয়া তোলা কখন জ্ঞানোচিত কার্য্য নহে। আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের নিরবচ্ছেদ ক্রিয়া যেমন চলিতেছে, আমরাও তেমনি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতেছি চিন্তা করিতেছি, কখন তাঁহার অভিপ্রায়ের অনুকূলে কখন প্রতিকূলে কার্য্য করিতেছি। আমাদের যাহা কিছু মন্দ, যাহা কিছু অপূর্ণতা, তাহা তিনি আত্মক্রিয়ায় ক্রমান্বয়ে শোধিত করিতেছেন। এ শোধনের মধ্যে যেমন তাঁহার ক্রিয়া আছে তেমনি জ্ঞানও আছে, সুতরাং তিনি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া আমাদের পাপপুণ্য পাপপুণ্য নয়, উহা পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট, ইহা সিদ্ধ হইতেছে না, কেন না তাঁহার প্রত্যেক ক্রিয়া আমাদের সম্বন্ধে দণ্ড বা পুরস্কাররূপে প্রকাশ পাইতেছে।

অনন্ত।

উপাসনাপ্রণালীতে অনন্তের আরাধনাতে এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে :—

"তুমি অনন্ত, তোমার আরম্ভ নাই, তোমার শেষ নাই। কালে তুমি নিত্য, দেশে তুমি সর্ব্বব্যাপী; তোমার উচ্চতা ও গম্ভীরতা কে পরিমাণ করিবে? এই প্রকাণ্ড বিশ্ব তোমার পদতলে সর্ষপকণার ন্যায়। তুমি ইন্দ্রিয়ের অতীত। তুমি ভূমা মহান্, তুমি পূর্ণ ব্রহ্ম।"

ঈশ্বর অনন্ত, কেন না তাঁহার আরম্ভ ও শেষ নাই; জগতের আদি ও অন্ত আমরা চিন্তাপথে আনিতে পারি না, সুতরাং জগৎ অনন্ত, ইহা আমরা বলিতে পারি না। আরম্ভ ও শেষ নাই, আর আরম্ভ ও শেষ চিন্তা করিতে পারি না, এ দুই কিছু এক কথা নহে। জগতের আদি অন্ত ভাবা আমাদের জ্ঞানের অতীত হইলেও ঈশ্বরের জ্ঞানের অতীত নহে, কেন না যদি তিনিও উহার আদি অন্ত না দেখেন, তাহা হইলে জগৎ তাঁহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি তাহার অতীত, এ কথা কিছুতেই বলা যাইতে পারে না। ঈশ্বরও অনন্ত, জগৎও অনন্ত, দুই অনন্ত সমানে আছে, কেহ কাহাকেও খর্ব্ব করিতেছে না, ইহা জ্ঞানের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত। জগতের আদি ও অন্ত আমাদের ধারণার বিষয় না হইলেও উহার আদি আছে অন্ত আছে, ইহা আমাদিগকে মানিয়া লইতে হইতেছে। এক ঈশ্বরসম্বন্ধে এরূপ করিবার কোন কারণ নাই, কেন না তাঁহার আরম্ভ নাই শেষ নাই বলিয়াই তিনি সমুদায় জগৎ ও জীবকে আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

যাঁহার আরম্ভ নাই শেষ নাই, তিনি কালদেশের অতীত। যদি তিনি কালদেশের অতীত হইলেন তাহা হইলে 'কালে তুমি নিত্য, দেশে তুমি সর্ব্বব্যাপী' এ কথা কেন বলা হইল? 'কালে তুমি নিত্য' এ বাক্যের অর্থ—নিত্য বিদ্যমান। আমাদের চিন্তা কালে বদ্ধ। যখনই আমরা তাঁহাকে ভাবিতে যাই, তখনই দেখিতে পাই, তিনি নিত্য বিদ্যমান; পূর্ব্বেও ছিলেন, এখনও আছেন, পরেও থাকিবেন। অনন্ত বিনা এরূপ নিত্যবিদ্যমানতা আর কাহারও হইতে পারে না। আমাদের চিন্তা যত দূর গেল, তাহার ও দিকেও তিনি নিত্য বিদ্যমান, এ দিকেও তিনি নিত্য বিদ্যমান। তিনি যদি কালাতীত না হইতেন, তাহা হইলে এরূপ নিত্যবিদ্যমানতা তাঁহাতে কখন সম্ভবপর হইত না। কালসম্বন্ধে যাহা বলা হইল, দেশসম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। আমরা যাহা কিছু দেখি দেশেতে দেখি। দেশেতে যখন জগৎ দেখি, তখন তিনি জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, জগতে এমন একটি স্থান নাই যাহাতে তিনি বিদ্যমান নাই, সুতরাং তাঁহাকে 'সর্ব্বব্যাপী বলিতে হয়।' কিন্তু এইরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান দেখিলেও তিনি যে সকলের অতীত, এ জ্ঞান আমাদের পরিষ্কার থাকা চাই; অন্যথা তিনি যে সকলই আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন ইহা সিদ্ধ হইবে কি প্রকারে? তিনি যে সকলই আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, 'এই প্রকাণ্ড বিশ্ব তোমার পদতলে সর্ষপকণার ন্যায়' এই বাক্যেতে তাহা প্রকাশ পাইতেছে।

অনন্তস্বরূপ সকল প্রকারের সম্বন্ধবিরহিত। সম্বন্ধবিরহিত না হইলে তাহার অতিরিক্ত আর কিছু থাকা চাই যাহার সহিত তাহার সম্বন্ধ ঘটিতে পারে। অন্য কিছু অতিরিক্ত থাকিলেই

অনন্তের ন্যূনতা উপস্থিত হইবে, অনন্ত আর অনন্ত থাকিবে না। এ বিতর্ক বিফল, কেন না অনন্তের মধ্যগত জগৎ ও জীব লইয়া তাহাদিগের সহিত অনন্তের সম্বন্ধালোচনা করিলে আর সে দোষ পড়ে না। অনন্ত জ্ঞানের অতীত, অনন্তের নিকটে আসিলেই জীব কিছু নয় হইয়া যায়। সে আর তাঁহাকে ধরিতেও পারে না, ছুঁইতেও পারে না, সুতরাং এখানে উপাস্য ও উপাসক সম্বন্ধ আর থাকে না। অনন্তের নিকটস্থ হইলে আপনি ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র, এ জ্ঞান উদিত হইলে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবে কেন? জীব যে অতি ক্ষুদ্র ইহা যখন সত্য, তখন সত্যের ভূমিতে দাঁড়াইলে সম্বন্ধ আরও ঘনীভূত হইবে। আপনাকে ক্ষুদ্র জানিয়া মহতো মহীয়ানের আশ্রিত হওয়া ইহাইতো স্বাভাবিক। 'তুমি ভূমা, মহান্ পূর্ণ ব্রহ্ম' একথাগুলি ঈদৃশ শরণাগততাই প্রকাশ করে। যাহার শক্তি জ্ঞান প্রেম পুণ্য সর্ষপকণাসদৃশ, সে কি আর তাহার পরিপুষ্টি আকাঙ্ক্ষা করে না? অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত পুণ্য ছাড় কে আর তাহার ক্ষুদ্রত্ব মহত্ত্বে পরিণত করে? জীব যখন আপনার ক্ষুদ্রতা বোঝে, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত ঈশ্বর যে তাহার নিত্য কালের আশ্রয়, ইহা আর তাহার বুঝিবার বাকি থাকে না।

শিব।

জীব অনন্তস্বরূপের নিকটবর্ত্তী হইয়া ক্ষুদ্রতা বুঝিল, সে যে একান্ত অসহায়, তখন আর তাহার তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার অবশিষ্ট থাকিল না। এখন তাহার মঙ্গলস্বরূপের আশ্রয় গ্রহণ করিবার

সময় উপস্থিত। অনন্ত যিনি তিনি ব্রহ্ম। যিনি ব্রহ্ম, জগৎ ও জীবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নিত্য। 'ভূমা, মহান, পূর্ণব্রহ্ম' সমুদায় জগৎ পূর্ণ করিয়া বিদ্যমান তিনি স্বয়ং 'ইন্দ্রিয়ের অতীত,' কিন্তু ইন্দ্রিয়গোচর সমুদায় বিষয় তাঁহারই ঐশ্বর্য্য। এই ঐশ্বর্য্য দ্বারা আমরা নিয়ত পরিবেষ্টিত রহিয়াছি। এই ঐশ্বর্য্য বিবিধ প্রকারে আমাদের উপকার সাধন করিতেছে। সুতরাং অনন্ত সত্য, অনন্ত জ্ঞান হইতে ঐশ্বর্য্যের ভিতর দিয়া লীলার ভিতর দিয়া মঙ্গলস্বরূপে আসিয়া অবতরণ করিলে মঙ্গলস্বরূপের কি প্রকারে আরাধনা উপস্থিত হয়, উপাসনাপ্রণালীর এই কথা গুলিতে তাহা প্রকাশ পায় :—

"তুমি শিব তুমি মঙ্গল। এই জগৎ সহস্র মুখে তোমার দয়ার পরিচয় দিতেছে। পিতার ন্যায় তুমি আমাদিগকে স্নেহ ও যত্ন সহকারে প্রতিপালন করিতেছ এবং অন্ন বস্ত্র ও জ্ঞান ধর্ম্ম দিয়া আমাদিগকে সুখী করিতেছ, যাহারা তোমাকে মানে না তুমি তাহাদিগকেও স্নেহ কর। দুঃখী পাপীদের তুমিই সহায়, তুমি দয়াময়, সন্তানবৎসল ও প্রেমসিন্ধু।"

সত্য, জ্ঞান, অনন্ত চিন্তাপথে উদিত হয়, সুতরাং জ্ঞানের সহিত এ সকল স্বরূপের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মঙ্গলস্বরূপ জ্ঞান ও হৃদয় উভয়কে অধিকার করিয়া প্রকাশিত হয়। জ্ঞান সর্ব্বত্র তাঁহার ক্রিয়া দর্শন করে, সেই ক্রিয়া হইতে ক্রমান্বয়ে মঙ্গল প্রসূত হইতেছে, ইহা দেখিয়া হৃদয় তাহাতে অনুরক্ত হয়। 'এই জগৎ সহস্র মুখে তোমার দয়ার পরিচয় দিতেছে' এ কথা গুলিতে জগতের ভিতরে তাঁহার দয়া যে নিয়ত প্রকাশ পাইতেছে তাহা বুঝাইতেছে। দয়ার শত শত নিদর্শন চারিদিকে দেখিলেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ এখনও

ঘটিল না। তখনই সাক্ষাৎসম্বন্ধ ঘটিল যখন সাধক প্রত্যক্ষ করিলেন, 'পিতার ন্যায় তুমি আমাদিগকে স্নেহ ও যত্ন সহকারে প্রতিপালন করিতেছ এবং অন্ন বস্ত্র ও জ্ঞান ধর্ম্ম দিয়া আমাদিগকে সুখী করিতেছ।' এ স্নেহের ভিতরে যে কোন প্রকার বৈষম্য নাই, তাহা 'যাহারা তোমাকে মানে না তুমি তাহাদিগকেও স্নেহ কর' এই কথাগুলি দেখাইতেছে। 'দুঃখী পাপীদের তুমিই সহায়' এ কথাগুলি কেহ যে তাঁহার দয়ার বহিভূর্ত নয় তাহাই দেখাইতেছে।

মঙ্গলস্বরূপ জীবের সহিত ঈশ্বরের ব্যবহার প্রকাশ করিয়া থাকে। তিনি আমাদের সম্বন্ধে যাহা কিছু করেন, তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্য, ইহা তাঁহার ক্রমিক ব্যবহার দেখিয়া আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। আমাদের দুঃখ ক্লেশ বিপদের মধ্যে আমরা তখনই তাঁহাকে মঙ্গলময় পিতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, যখন দেখি যে সেগুলি আমাদের কল্যাণের জন্যই নিয়োজিত হইয়াছিল। যখন আমরা পাপাচরণ করি, তখন আমাদের মনে হয়, তাঁহার করুণা হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি; কিন্তু যখন জীবনে দেখিতে পাই তিনি 'দুঃখী পাপীদের সহায়' তখন সে ভ্রম ঘুচিয়া যায়; পাপে দুঃখে সকল অবস্থায় তাঁহারই আশ্রয়ান্বেষণ করি। এইরূপে তাঁহার দয়া প্রেমে উদ্দীপ্ত-হৃদয় হইয়া ক্রমে তাঁহার স্নেহে মগ্ন হইয়া পড়ি। তখন আর তাঁহা ভিন্ন অন্য কিছু আশ্রয় বা অন্বেষণের বিষয় থাকে না।

অদ্বৈত।

অদ্বৈতশব্দের অর্থ অখণ্ড। যাঁহাতে একই ভাব বিদ্যমান দুই ভাব থাকিতে পারে না, তিনি অদ্বৈত। অদ্বৈতশব্দ অদ্বিতীয় অর্থে গ্রহণ করিয়া আরাধনায় এই প্রকারে ব্যবহৃত হইয়াছে :—

"তুমি অদ্বৈত তোমার দ্বিতীয় নাই। একাকী তুমি সমুদায় রক্ষা ও শাসন করিতেছ। অসংখ্য জীবের, অগণ্য আত্মার তুমি একমাত্র আশ্রয়দাতা। চারিদিকে কেবল তোমারই নামের জয়ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। তুমি সকলের রাজা, সকলের প্রভু, তুমি আমাদের একমাত্র সহায়, সম্বল ও আশা ভরসা।"

"শান্তং শিবমদ্বৈতম্" এস্থলে যে মঙ্গলস্বরূপের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার অগ্রে 'শান্ত' বিকারাতীত, পরে 'অদ্বৈত' দুই-ভাববিরহিত, এই দুইটি শব্দ আছে। মঙ্গল ভিন্ন অন্য কোন ভাব তাঁহাতে বিদ্যমান নাই, জগতে মঙ্গলবিস্তারে তাঁহাতে বিকার বা বৈষম্য উপস্থিত হয় না, মঙ্গলস্বরূপের সঙ্গে এ দুইটি শব্দ গ্রথিত থাকিয়া ইহাই প্রকাশ করিতেছে। মঙ্গল ভিন্ন তিনি আর কিছু নহেন, এইটিতে তাঁহাকে জগৎ ও জীব হইতে একেবারে পৃথক্ করিয়া ফেলিয়াছে। জগৎ ও জীবে যে কল্যাণ প্রকাশ পায়—মঙ্গল প্রকাশ পায়, তাহা তাঁহার, জগতেরও নহে, জীবেরও নহে। জগৎ ও জীব যদি স্বয়ং নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণ হইত তাহা হইলে উহাতে অপূর্ণতা কদাপি দৃষ্ট হইত না; অপূর্ণতাপনয়ন করিয়া উহাকে পূর্ণ করিবারও কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইত না। পূর্ণ মঙ্গল স্বয়ং ঈশ্বর। এস্থলে আর কেহ যে তাঁহার স্থানাধিকার করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তিনি মঙ্গলে এক অখণ্ড

অদ্বিতীয় হইলেন। উপরের আরাধনাবাক্যে যে কথাগুলি নিবদ্ধ হইয়াছে, বলিতে হইবে তাহা ঐ ভাবেই নিবদ্ধ হইয়াছে। ঈশ্বরে নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গল দেখিয়া যখন তাঁহারই রাজ্য সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ হইল, তখন তিনিই যে সমুদায় শাসন করিতেছেন, রক্ষা করিতেছেন, সকলের আশ্রয় হইয়া আছেন, সর্ব্বত্র তাঁহারই নামগান হইতেছে, এ সম্বন্ধে সাধকে আর কোন সংশয় রহিল না। ঈদৃশ নিঃসংশয় চিত্তে কি প্রকার আরাধনা হয়, এই কথা গুলিকে তাহার আদর্শ বলিয়া উপস্থিত করিতে পারা যায় :—

"অদ্বিতীয় তুমি।...সূর্য্য বলে আমার দেবতা, পিঁপড়ে বলে আমার দেবতা। দুই জনে ঝগড়া হ'ল না, ব্রাহ্ম ভাই হ'ল। কোথায় সূর্য্য, কোথায় পিঁপড়ে। একটা সাধু, একটা পাতকী .. দুই তোমায় ডাক্‌ছে। কে আগে তোমার গান ধরে, কে আগে তোমার স্তব করে? নদী আগে ধ্যান করবে? না ফুল আগে ধ্যান করবে? কে আগে নমস্কার করবে? হুড়োহুড়ি লেগেছে। আমি জানতাম, আমরাই ব্রহ্মজ্ঞানী...এখন দেখি ব্রহ্মাণ্ডটা কেমন জোড়হাতে তোমার পূজাটী করে। ব্রহ্মাণ্ডটি কেমন সুন্দর, বড় ভক্ত, এর কাছে ঢের শেখা যায়। সৃষ্টি হ'য়েছে অবধি আজ পর্য্যন্ত তোমার একটী কথা লঙ্ঘন কর্‌লে না। হে ঈশ্বর, খুব বেঁধেছ তোমার শাসনে। এমন রাজ্যশাসনপ্রণালী আর কোথাও নাই। তুমি রাজা বট, প্রভু বট। পাপী তাপী দীন দুঃখীদিগের অদ্বিতীয় সহায় তুমি।"

পুণ্য।

শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ যিনি তিনি পুণ্য ভিন্ন আর কিছুই নহেন। মঙ্গলময়ে চিত্তের অভিনিবেশবশতঃ তিনিই যখন জীবনের একমাত্র নিয়ন্তা হইলেন তখন জীবনে পুণ্যের আবির্ভাব হইল; পাপ কলঙ্ক তিরোহিত হইল, হৃদয়ের অন্ধকার ঘুচিয়া গেল, পুণ্যালোকে সে জীবন পূর্ণ হইল। পুণ্যের আরাধনাবাক্যে দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

"তুমি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, তুমি নির্ম্মলস্বভাব। তোমার ইচ্ছাই পুণ্যের আদর্শ। এমনি প্রেম পুণ্যের তেজ যে ইহার একটি কিরণ পাইলে পাপ হৃদয়ের অন্ধকার দূর হয়; তোমাকে একবার ভাবিলে জীবন পবিত্র হয়। হে ধর্ম্মরাজ, তোমার ভয়ে পাপ পলায়ন করে, তোমার বিচারে পাপী কখন প্রশ্রয় পায় না, তোমার শাসনে দুষ্ট দমন হয়। তুমি পুণ্যের সূর্য্য, তুমি ধর্ম্মের আবহ ও পাপীর পরিত্রাতা।"

এখানে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পুণ্যের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। পুণ্য কি? পুণ্য ঈশ্বরের ইচ্ছা। ঈশ্বরের ইচ্ছা পবিত্রতার বিধি—পুণ্যের বিধির আকারে বিবেক ও বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া আমাদের নিকটে প্রকাশ পায়। এই বিধি অনুসারে আমরা আমাদের জীবন গঠন করি। সুতরাং উহাই আমাদের জীবনের আদর্শ। ঈশ্বরের ইচ্ছা মঙ্গল ইচ্ছা, সুতরাং 'ইচ্ছাই পুণ্যের আদর্শ' এ কথা বলিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে 'প্রেমপুণ্যের তেজ' এ কথা সংযুক্ত করা হইয়াছে। ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছাই পাপীকে শাসন করে, পাপীকে প্রশ্রয় দেয় না, পাপীর পাপ হরণ

করিয়া পুণ্য-ভূষণে তাহাকে ভূষিত করে। এই ইচ্ছার অনুবর্ত্তনই ধর্ম্ম, তদ্ব্যতীত আর ধর্ম্ম নাই। স্বয়ং ঈশ্বরই ধর্ম্মাবহ পাপীর পরিত্রাতা। উদ্দীপ্ত হৃদয়ের পুণ্যের আরাধনা এইরূপ :—

"হে পুণ্যময়! হে পুণ্যময়! আমার বাড়ীতে এলে তুমি? পুণ্যাত্মার বাড়ী যাও না? তাঁরা জলগ্রহণ করেন নাই তোমাকে দেখ্‌বেন বলে।...এই পাপীটাকে তুমি ছুঁইও না। আমার বাড়ীতে তুমি আস্‌বে কেন? কেন আস্‌বে? তুমি তো কথা শুন্‌বে না! আস্‌বেই আস্‌বে, ধুপ ক'রে আমার গায়ে পড়্‌লে? কি কর্‌লে বল দেখি? অমন সুন্দর কাপড় তোমার, অমন নির্ম্মল সহবাস তোমার...মলার সঙ্গে একাকার হ'ল? না পরমেশ্বর, মলাগুলি কোন্ দিক্ দিয়া পালালো। পুণ্যসিন্ধু! হৃদয়ের মলাগুলি ধু'য়ে কোথায় চ'লে যায়। আমি মনে করিলাম বুঝি একাকার হয়ে যায়, আগুনের কাছে কি পাপ থাকে? সাধুসহবাস বটে, জ্যোতি বটে আলো বটে, সমস্ত শরীরের চারিদিকে পুণ্যপ্রবাহ চলিতেছে, এই পাতকী ছিলাম আমি, কিন্তু এখন পাতকী কে বলে? আমি যে দেবভাবে বসে আছি, আমার যে সুন্দর কাপড়। হে জগদীশ্বর, তোমার জ্যোতির ভিতরে বসিলে কি আর পাপ মলা থাকে? দগ্ধদারুনিঃসৃত অগ্নির ন্যায় তোমার জ্বলন্ত শিখা বাহির হইয়া পাপ দগ্ধ করিতেছে। হে পুণ্যের বাড়ী আলোকের ঘর...হে ধর্ম্ম, হে পুণ্য, তুমিই আমার বাড়ী, তুমিই আমাদের সংসার, এই পুণ্য বাড়ীতেই চাই থাক্‌তে! আমরা তোমার শরণাপন্ন হই।" ইত্যাদি।

আনন্দ।

প্রেমপুণ্য মিলিত হইয়া আনন্দ। পুণ্য যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা, প্রেম যখন ঈশ্বরের মঙ্গলভাব, তখন আনন্দের ভিতরে উভয়ই ভাব বিরাজিত থাকিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? বলিতে গেলে, জ্ঞানাদি সকল স্বরূপ একাকার হইয়া আনন্দ। ঈশ্বরে স্বরূপগত ভিন্নতা নাই, তিনি একই স্বরূপ, আনন্দে তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। আনন্দ সকলকে অন্তর্ভূত করিয়া লয়, কাহাকেও বাহিরে থাকিতে দেয় না। আনন্দস্বরূপে মন মগ্ন হইলে সাধকেতে সকলকে অন্তর্ভূত করিয়া লইবার ভাব উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, 'ঈশ্বরের নিত্যক্রিয়াশীলতাই তাঁহার নিত্য আনন্দ।' এই নিত্যক্রিয়াশীলত্বের মধ্যে যখন তাঁহার জ্ঞানাদি সকলই প্রকাশ পায়, তখন এক আনন্দের ভিতরে সমুদায় স্বরূপের নিবেশ সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। উপাসনাপ্রণালীস্থ আনন্দের আরাধনা এই :—

"তুমি আনন্দ, তুমি অমৃত, তুমি দুঃখীকে সুখী কর, তুমি তাপিত প্রাণকে শীতল কর, তুমি অমৃত হইয়া মৃত্যু যন্ত্রণা পরিহার কর। তোমাকে দেখিলে তোমার সুমিষ্ট কথা শুনিলে তোমার নিকটে বসিলে হৃদয় জুড়ায়। তুমি সুখসিন্ধু হৃদয়রঞ্জন।"

এখানে 'অমৃত' শব্দের ব্যবহার দেখাইয়া দিতেছে "আনন্দরূপমমৃতম্" এই হইতে আনন্দ গৃহীত হইয়াছে, "রসোবৈ সঃ" এ শ্রুতি তখন উপস্থিত হয় নাই। কেবল এই পর্য্যায় নহে, প্রথমে প্রথমে 'আনন্দ, অমৃত, শান্তি তুমি' এই বলিয়া আরাধনা হইত। এ শান্তি শব্দ 'আনন্দরূপমমৃতমের' পরেই উপস্থিত 'শান্তং শিবমদ্বৈতমের' শান্ত শব্দ শান্তি শব্দে রূপান্তর করিয়া গৃহীত। শ্রুতির

বিশেষ পর্য্যালোচনার অভাবে যে তৎকালে এরূপ ব্যাখ্যা হইত এখন তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। শ্রুতির সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে কিন্তু ব্যাখ্যায় কোন দোষ পড়ে না। আনন্দই যখন জীবন, আনন্দেই যখন মৃত্যুভয়াতিক্রম হয়, তখন 'তুমি আনন্দ, তুমি অমৃত' একথা বলাতে কোন ক্ষতি হয় নাই। 'তুমি দুঃখীকে সুখী কর, তুমি তাপিত প্রাণকে শীতল কর, তুমি অমৃত হইয়া মৃত্যুযন্ত্রণা পরিহার কর' এ সকল কথাই আনন্দস্বরূপের উপযোগী। আনন্দের সর্ব্বাবির্ভাবকতা উপরিউদিত আরাধনাবাক্যগুলির মধ্যে নাই, কিন্তু প্রথম প্রথম নিরতিশয় উদ্দীপ্ত-হৃদয়ে যে আরাধনা হইয়াছিল, তন্মধ্যে উহা অভিনিবিষ্ট আছে। "এই ঘরেতে, এই উপাসনার ঘরেইত সব দেশের ভক্তেরা ব'সে আছেন। সকলেরই প্রাণের ভিতর হইতে আরাম-সমুদ্রের ঢেউ উঠিতেছে।" এ কথাগুলি আনন্দেতে সকল ভক্তের সহিত একত্ব স্পষ্ট প্রকাশ করিতেছে।

সম্পূর্ণ।

শ্রৌতাচারের পুনরাবৃত্তি।
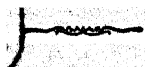
নববিধানমণ্ডলীর উপাধ্যায় কর্ত্তৃক উদ্ভাসিত।

কলিকাতা।

৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট্
"মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"
কে. পি. নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৩০ শক।

মূল্য ৵০ আনা মাত্র

শ্রৌতাচারের পুনরাবৃত্তি।

বেদাৎ ভ্রষ্টঃ স্মৃতিপ্রোক্তপ্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখঃ।
ক্রমেণ শ্রৌতসিদ্ধার্থং ব্রাহ্মণস্তন্ত্রমাশ্রয়েৎ॥ শাম্বপুরাণ।

মাতৃভাবে তন্ত্রের পরিসমাপ্তি *, পরাত্মাগ্নিতে শব্দাদির হবনে শ্রৌতাচারের পুনরাবৃত্তি †।

---

* মহানির্ব্বাণতন্ত্র তান্ত্রিক ব্যভিচারনিবৃত্তির জন্য যত্ন করেন—

ধাতুপ্রতিগ্রহং নিন্দামনৃতং ক্রীড়নং স্ত্রিয়া।
রেতস্ত্যাগমসূয়াঞ্চ সন্ন্যাসী পরিবর্জ্জয়েৎ।
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ২৭৯ শ্লো. ৮ উল্লাস।

তৎপূর্ব্বে নির্ব্বাণতন্ত্র বিধি দিয়াছেন,

গুপ্তভাবেন দেবেশি শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে।
সন্ন্যাসিনাং সদা সেব্যং পঞ্চতত্ত্বং বরাননে॥ নির্ব্বাণতন্ত্র ১৪পটল

আজ কয়েক বৎসর হইল এক জন লোকাতীত সাধকের অভ্যুদয়ে মহানির্ব্বাণের যত্ন সফল হইয়াছে এবং তৎকৃত ব্যবস্থা জনসমাজের ব্যবহার হইতেছে।

স্বভাবাৎ কলিজন্মানঃ কামবিভ্রান্তচেতসঃ।
তদ্রূপেণ ন জানন্তি শক্তিং সামান্যবুদ্ধয়ঃ॥
অতস্তেষাং প্রতিনিধৌ শেষতত্ত্বস্য পার্ব্বতি।
ধ্যানং দেব্যাঃ পদাম্ভোজে ষ্টইমন্ত্রজপস্তথা॥

শক্তিকে জননীরূপে দর্শন করিয়া তৎপদাম্ভোজ চিন্তা এবং ইষ্টমন্ত্রজপ এই সাধকপুরুষের অনুগামিবর্গের ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে তন্ত্রের পরিসমাপ্তি এবং শ্রৌতাচারের পুনরাবৃত্তি সম্ভবপর হইয়াছে।

† আজ সপ্তবিংশ বর্ষ পূর্ব্বে নববিধানাচার্য্য—"হে অগ্নির

গৃহস্থ *। আপনি সন্ন্যাসী, আমাদের নমস্থ। আমাদের অধম জীবন অবশ্য আপনার কৃপাপাত্র।

সন্ন্যাসী *। অমন কথা মুখে আনিও না। এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা শোনাতেও পাপ হয়। শাস্ত্রমতে

দেবতা, তোমার আজ্ঞায় ইন্দ্রিয়াসক্তিসকলকে বিনাশকরিবার জন্য অগ্নিহোত্রী হইয়া প্রকৃত হোম করিতে আমি নিযুক্ত হই" এই প্রার্থনায় হোমানুষ্ঠানপূর্ব্বক বিশ্বাসিমাত্রকে অগ্নিহোত্রী করেন। তাঁহাদের অগ্নিহোত্রিত্ব গূঢ়ভাবে কার্য্য করিতে করিতে শ্রৌতাচারের প্রবৃত্তি হইয়াছে।

* গৃহস্থ—সন্ন্যাসী।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

এতদনুসারে যাঁহারা ঈশ্বরে সমর্পিতহৃদয় তাঁহারা সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী। বর্ত্তমানবিধানে ঈদৃশ নরনারীর পরিণয়বন্ধনে বদ্ধ হইবার ব্যবস্থা। সুতরাং ইহাতে যিনি গৃহস্থ তিনি সন্ন্যাসী, যিনি সন্ন্যাসী তিনি গৃহস্থ, কেন না ইঁহারা আপনার নহেন ঈশ্বরের। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে যখন যেরূপ ভাবে প্রবর্ত্তিত করিবেন তখন তাঁহাদের জীবন ও ব্যবহার তদ্রূপ হইবে। এই জন্যই পরিণয়কালে নরনারী এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন ;—

যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।
যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যএতে হৃদয়ে নৌ তাবুভয়োরীশ্বরস্তু॥

গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের আশ্রয়, * উহাতে সকল আশ্রমের ধর্ম্ম নিহিত হইয়া আছে। গৃহস্থাশ্রমোচিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে পাষণ্ড হইতে হয় †, এজন্য আমি বাহিরে সন্ন্যাসী অন্তরে গৃহী।

গৃহস্থ। আপনি কি বলিতেছেন, বুঝিতে পারিলাম না। গৃহস্থাশ্রমীকে সন্ন্যাসিমাত্রে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তাঁহাদের চক্ষে সে যে পশু; আর তাঁহারা দেবতা।

---

* শাস্ত্রমতে গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের আশ্রয়, উহাতে সকল আশ্রমের ধর্ম্ম নিহিত আছে।

ঐকাশ্রম্যং গৃহস্থস্য চতুর্ণাং শ্রুতিদর্শনাৎ।
তস্মাদ্গার্হস্থ্যমেবৈকং বিজ্ঞেয়ং ধর্ম্মসাধনম্॥ কূর্ম্মপুরাণ।

একো বাপ্যাশ্রমানেতান্ যোঽনুতিষ্ঠেদ্যথাবিধি।
অকামদ্বেষসংযুক্তঃ স পরত্র বিধীয়তে॥ শান্তিপর্ব্ব।

† গৃহস্থাশ্রমোচিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে পাষণ্ড হইতে হয়।

যঃ স্বকর্ম্মপরিত্যাগী পাষণ্ডীত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
তৎসঙ্গকৃৎ তৎসমশ্চ তাবুভাবতিপাপিনৌ॥
বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

স্বকর্ম্ম কি? আত্মার কর্ম্ম। আত্মার কর্ম্ম কি? পরাত্মার প্রেরণানুবর্ত্তন। পরাত্মার প্রেরণানুবর্ত্তনে যে ব্যক্তি অবহেলা করে, সে পাষণ্ডী, কেন না সে আপনার রক্ষার উপায় আপনি নিষ্ফল করে। মনু এজন্যই বলিয়াছেন ;—

যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ।
তৎ প্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতন্তু বর্জ্জয়েৎ॥

সন্ন্যাসী। এরূপ প্রতিষ্ঠাদিলাভে লোভী সন্ন্যাসীর মুখদর্শন নিষিদ্ধ *। আচণ্ডাল সকলের চরণতলে † যাহার দৃষ্টি স্থাপিত নয়, সে ব্যক্তি সন্ন্যাসী কিরূপে? সে যে অহঙ্কারের দাস, তাহার জীবনতো ভগবানে অর্পিত নয়; সে তো সর্ব্বত্র তাঁহাকে দেখে না।

গৃহী। আপনি বাহিরে সন্ন্যাসী অন্তরে গৃহী একি কথা বলিলেন, বুঝিতে পারিলাম না।

সন্ন্যাসী। গৃহীর ধর্ম্ম যজ্ঞানুষ্ঠান। আমি যজ্ঞানুষ্ঠায়ী, সুতরাং লোকে যাহাকে সন্ন্যাসী বলে আমি তাহা নহি।

গৃহী। সর্ব্ববিধ যজ্ঞের পরিত্যাগ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম আপনি যজ্ঞানুষ্ঠায়ী, এ যে অত্যন্ত বিপরীত কথা।

সন্ন্যাসী। যে ব্যক্তি মনে করে যে আমি যজ্ঞানুষ্ঠায়ী নহি, সে মিথ্যাচারী, যজ্ঞানুষ্ঠানে অবহেলা তাহাকে

---

* এরূপ প্রতিষ্ঠাদিলাভলাভী সন্ন্যাসীর মুখদর্শন নিষিদ্ধ।

বিপ্রা যদি যতির্লোভাৎ প্রত্যুত্তদণ্ডকো ভবেৎ।
স চণ্ডালসমো জ্ঞেয়ো বর্ণাশ্রমবিগর্হিতঃ ॥ বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

† আচণ্ডাল সকলের চরণতলে যাহার দৃষ্টি স্থাপিত নয়, সে ব্যক্তি সন্ন্যাসী কিরূপে?

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥
বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্ ॥ ভাগবত।

ত্ত করিয়াছে, সে যে মনুষ্যনামের উপযুক্ত নয়, সেতো দবহিষ্কৃত। বিজ্ঞানভিক্ষু এজন্যই নিত্যযজ্ঞানুষ্ঠান ্যাসীর ধর্ম্ম বলিয়াছেন *, ইহা কি তুমি জান না? রাত্মা বৈশ্বানরাগ্নি +। তাঁহার উপাসক নৃপতি অশ্ব-

* বিজ্ঞানভিক্ষু এজন্যই নিত্যযজ্ঞানুষ্ঠান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লয়াছেন।

নন্বেবমপি (৩। ৪। ২৫। ২৬) সূত্রদ্বয়োক্তয়োরগ্ন্যাদ্যপেক্ষানপেক্ষয়ো- রোধ এবেতি চেৎ, ন, সন্ন্যাসিনাং বাহ্যাগ্ন্যাদ্যভাবেঽপি স্বসমারোপিতানাং হ্যগ্ন্যাদীনামন্তরগ্নিহোত্র কালেঽপেক্ষণীয়ত্বেনাবিরোধাৎ। তথা বিষ্ণুপুরাণে াসপ্রকরণে "কৃত্বাগ্নিহোত্রং স্বশরীরসংস্থং শারীরমগ্নিং স্বমুখে জুহোতি। বিপ্রস্তু ভিক্ষোপগতৈর্হবির্ভিশ্চিতাগ্নিনা স ব্রজতি স্ম লোকান্।

একটি সূত্রে বাহ্য অগ্ন্যাদির অপেক্ষা আর একটি সূত্রে বাহ্য গ্ন্যাদির অপেক্ষা নাই বলাতে বিরোধ উপস্থিত হইতেছে তাহা হে, কেন না সন্ন্যাসিগণের বাহ্যাগ্নি না থাকিলেও যখন তাঁহারা ন্তরে অগ্নিহোত্রানুষ্ঠান করেন তখন আপনাতে আরোপিত হ্যাগ্ন্যাদিতে উহা সম্পন্ন করেন। তাই সন্ন্যাসপ্রকরণে বিষ্ণু- রাণ বলিয়াছেন—"অগ্নিহোত্রকে আপনার স্বশরীরস্থ করিবে। ারীর অগ্নিকে আপনার মুখে হবন করিবে। ভিক্ষালব্ধ হবি ্মুচিতাগ্নিতে হবন করিয়া তিনি লোকলোকান্তরে গমন রেন।" মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্মেও এই শ্লোকটির উল্লেখ আছে।

+ পরাত্মা বৈশ্বানরাগ্নি।

কস্তু ত্বা এতমাত্মানং বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ থগ্‌বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদৌ উর এব বেদি- র্লোমানি বর্হির্হৃদয়ং গার্হপত্যো মনোঽন্বাহার্য্যপচন আস্যমাহবনীয়ঃ।

পতি কি গৃহস্থ ছিলেন না? ইন্দ্রিয়াগ্নিতে নিত্য হবন-শীল দ্বেষ-ও-আকাঙ্ক্ষাবিরহিত ব্যক্তি কি সন্ন্যাসী নহেন * ?

পরমাত্মা বৈশ্বানরের দ্যুলোক মস্তক, সূর্য্য চক্ষু, পৃথক্‌পথগামী বায়ু স্বভাব, আকাশ দেহের মধ্যভাগ, বারি বস্তি (মূত্রকোষ), পৃথিবী পাদ, বেদি বক্ষ, কুশ লোম, গার্হ্যপত্যাগ্নি হৃদয়, দক্ষিণাগ্নি মন, আহবনীয়াগ্নি মুখ।

* ইন্দ্রিয়াগ্নিতে নিত্য হবনশীল দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষাবিরহিত ব্যক্তি কি সন্ন্যাসী নহেন ?

শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি।

কেহ কেহ শব্দাদি বিষয়নিচয়কে ইন্দ্রিয়াগ্নিতে হবন করেন। ইন্দ্রিয়যোগে পরাত্মাগ্নিতে শব্দাদিবিষয়ের হবন ইন্দ্রিয়াগ্নিতে হবন।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্য সন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥

হে মহাবাহু, তাহাকেই সন্ন্যাসী জানিবে যে দ্বেষ করে না ও আকাঙ্ক্ষা করে না। ঈদৃশ ব্যক্তি সুখদুঃখাদির অতীত বলিয়া সহজে বন্ধনমুক্ত হয়।

দ্বেষ করে না ও আকাঙ্ক্ষা করে না এই কথা বলাতে সে ব্যক্তির গুণাতীতত্ব লাভ হইয়াছে, ইহাই বুঝাইতেছে। চতুর্দ্দশাধ্যায়ে যে গুণাতীতত্বের উল্লেখ হইয়াছে, উহাই গীতার ধর্ম্মের চরম ফল। গুণাতীতত্বের অবস্থায় শরীর থাকিতেও শরীর থাকে না, এজন্য উহার এত উচ্চতা।

অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ। শ্রুতিঃ।

গৃহী। আপনি এ কি বলিতেছেন, আপনাকে
য লোকে পাগল বলিবে ?

সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী কি অন্য দশজন ব্যক্তির মত
ন্নাহার করেন না ? যজ্ঞ না করিয়া অন্নভোজন কি
শুধর্ম্ম নহে ? অন্নভোজন কেন ? দৈহিক মানসিক
্রত্যেক ক্রিয়াতে যাহার যজ্ঞদৃষ্টি নাই, সেতো পশু।

গৃহী। আপনি কি বলিতেছেন, আমি কিছুই
ুঝিতে পারিতেছি না।

সন্ন্যাসী। এখনকার যে সকল আচরণ দেখিতেছ,
ইহা বেদভ্রষ্টগণের আচরণ। ভ্রষ্টাচারপরিত্যক্ত হইয়া
পুনরায় শ্রৌত আচার প্রবর্ত্তিত হইবে ইহারই জন্য
যে ভগবানের বর্ত্তমান লীলা, তাহা কি তুমি অবগত
নও ?

গৃহী। শ্রৌতাচার কি ?

সন্ন্যাসী। তুমি কি উপনিষৎ পড় নাই ? * যোগা-

---

* তুমি কি উপনিষৎ পড় নাই ? যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি
বৈদিক ঘোর ঋষির বৈদিক ধর্ম্মোপদেশ এই ;—

স যদশিশিষতি যৎ পিপাসতি যন্ন রমতে তা অস্য দীক্ষা।
অথ যদশ্নাতি যৎ পিবতি যদ্রমতে তদুপসদৈরেতি।
অথ যদ্ধসতি যজ্জক্ষতি যন্মৈথুনং চরতি স্তুতশস্ত্রৈরেব তদেতি।
অথ যত্তপোদানমার্জ্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি তা অস্য দক্ষিণা।
তস্মাদাহুঃ সোষ্যত্যসোষ্টেতি পুনরুৎপাদনমেবাস্য তন্মরণমেবাস্যাবভৃথঃ।

চার্য্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৈদিক ঘোর ঋষির বৈদিক-ধর্ম্মোপদেশ এই ;—

"সেই পুরুষ যাহা ভোজন করিতে ইচ্ছা করে, যাহা পান করিতে ইচ্ছা করে, যাহা ভাল না লাগে, সেইগুলি ইহার দীক্ষা *।"

"অনন্তর সে যাহা ভোজন করে, সে যাহা পান করে সে যাহাতে সুখ পায় সেইটি উপসদের [অভোজনান্তে অল্পভোজনের] সমান হয়।"

"অনন্তর সে যে হাসে, সে যে ভোজন করে, সে যে মিথুনধর্ম্মাচরণ করে, উহা স্তুত শস্ত্রেরই (স্তোত্রেরই) সমান হয়।"

"অনন্তর তপ, দান, ঋজুতা, অহিংসা ও সত্যবচন এগুলি ইহার দক্ষিণা।"

"সে জন্যই এই পুরুষের জন্মকে—জন্ম ও যজ্ঞ-বাচক একই ধাতুনিষ্পন্ন শব্দে [জ্ঞানিগণ] আখ্যাত করিয়া থাকেন। মরণই এই পুরুষের অবভৃথ †।"

এ পুরুষযজ্ঞের ফল কি? উত্তমজ্যোতি পরব্রহ্ম

---

* আহারাদির সংযমে পাপক্ষয়সূচক কৃশত্বলাভ দীক্ষা—দশাহমবরার্দ্ধ্যং দীক্ষিতো ভবতি মাসং সংবৎসরং বা যদা কৃশঃ স্যাৎ। "এতদ্বৈ পরমং তপো যদ্ব্যাহিতস্তপ্যতে" এই নিয়মানুসারে স্বাভাবিক রোগাদিই তপস্যামধ্যে গণ্য। তাই ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগাদি উপতাপ পুরুষযজ্ঞে দীক্ষা। † অবভৃথ—যজ্ঞান্তে স্নান।

প্রাপ্তি। যোগাচার্য্য এই বিদ্যাপ্রাপ্তিতে বিদ্যান্তরের প্রতি স্পৃহাশূন্য হইয়াছিলেন, এবং অনুগীতায় এই বৈদিক ধর্ম্মেরই শিক্ষা দিয়াছেন।

গৃহী। সে কিরূপ?

সন্ন্যাসী। অনুগীতায় যোগাচার্য্য বলিয়াছেন *;—"বৈশ্বানরাগ্নি সাতপ্রকারে দীপ্তি পায়। ঘ্রাণ, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্ শ্রোত্র, মন ও বুদ্ধি এই সাতটী বৈশ্বানরাগ্নির রসনা। ঘ্রেয়, পেয়, দৃশ্য, স্পৃশ্য, শ্রব্য, মন্তব্য ও বোদ্ধব্য, এই সাতটি যজ্ঞের ইন্ধন। ঘ্রাতা, ভক্ষয়িতা, দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বোদ্ধা, এই সাতটি পরম ঋত্বিক্। ঘ্রেয়, পেয়, দৃশ্য, স্পৃশ্য, শ্রব্য, মন্তব্য ও বোদ্ধব্য, এই সপ্ত প্রকার হব্য সামগ্রী। হে সুভগে, সপ্তজন হোতা সপ্ত অগ্নিতে সপ্ত প্রকারে হবন করিতেছেন।" এই

---

* অনুগীতায় যোগাচার্য্য বলিয়াছেন ;—

অগ্নির্বৈশ্বানরো মধ্যে সপ্তধা দীপ্যতেঽন্তরা।
ঘ্রাণং জিহ্বাচ চক্ষুশ্চ ত্বক্ চ শ্রোত্রঞ্চ পঞ্চমম্।
মনো বুদ্ধিশ্চ সপ্তৈতা জিহ্বা বৈশ্বানরার্চ্চিষঃ।
ঘ্রেয়ং দৃশ্যঞ্চ পেয়ঞ্চ স্পৃশ্যং শ্রব্যং তথৈব চ।
মন্তব্যমথবোদ্ধব্যং তাঃ সপ্ত সমিধো মম।
ঘ্রাতা ভক্ষয়িতা দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা চ পঞ্চমঃ।
মন্তা বোদ্ধা চ সপ্তৈতে ভবন্তি পরমর্ত্বিজঃ।
ঘ্রেয়ে পেয়ে চ দৃশ্যে চ স্পৃশ্যে শ্রব্যে তথৈব চ।
মন্তব্যে অথ বোদ্ধব্যে সুভগে পশ্য সর্ব্বদা।
হবীংষ্যগ্নিষু হোতারঃ সপ্তধা সপ্ত সপ্তসু॥

কথায় কি তুমি বুঝিতেছ না, স্বয়ং ঈশ্বর নিত্যযজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত যজ্ঞের প্রতি উদাসীন থাকিয়া যে ব্যক্তি আহারাদি স্বাভাবিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তিকে পশু বিনা আর কি বলা যাইতে পারে?

গৃহী। এরূপ নিত্য যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইল কেন?

সন্ন্যাসী। বৈদান্তিক যোগে সিদ্ধমনোরথ হইবার নিমিত্ত।

গৃহী। সে কিরূপ? এরূপ যোগের বৈদান্তিক মূলই বা কি?

সন্ন্যাসী। জীব কর্ত্তা, ঈশ্বর ইন্দ্রিয়যোগে কারয়িতা, * বেদান্তের এই বিশেষ মতটি নিয়োগ করিলেই ঈদৃশ যজ্ঞ যে এই বৈদান্তিক যোগের মূল তাহা তুমি অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। মনে কর আমি দেখিতে ইচ্ছা করিলাম। দেখিতে হইলে চক্ষুর নিয়োগ প্রয়োজন। চক্ষু কিছু আমার অধীন নয়, ঈশ্বরের অধীন। আমি দেখিতে ইচ্ছা করিলাম, আর ঈশ্বর তাহাকে দর্শনে নিয়োগ করিলেন, তবে আমি দেখিলাম।

---

* জীব্ কর্ত্তা, ঈশ্বর ইন্দ্রিয়যোগে কারয়িতা।

যঃ কর্ত্তা সোঽয়ং বৈ ভূতাত্মা করণৈঃ কারয়িতান্তঃ পুরুষঃ।

মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ।

যাহারা ঈশ্বরের এই নিয়োগ পুঁছিয়া ফেলিয়া আমিই দেখিলাম এইরূপ অভিমান করে, তাহারা অসত্যদর্শী, সুতরাং অযোগী পশু। আমি দেখিতে চাহিলাম, আর ঈশ্বর চক্ষুর যোগে আমাকে দেখাইলেন এইটি প্রত্যক্ষ করা ব্রহ্মযোগ। চক্ষুর সম্বন্ধে যাহা বলিলাম সকল ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়ার সম্বন্ধেই এই কথা বলা যাইতে পারে। দর্শনাদি সকলই তখনই যজ্ঞ বা ঈশ্বরারাধনা হয়, যখন দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হন। যোগাচার্য্য এই যোগে যোগী ছিলেন, এবং এই যোগই বৈদান্তিক যোগ। যোগী আহারাদি আনন্দের সহিত নির্ব্বাহ-করেন কেন? ঐ সকলেতে অবিচ্ছেদে ঈশ্বর-দর্শন হয়, তাহারই নিমিত্ত। পশু ও যোগীতে এখানেই পার্থক্য জানিও।

গৃহী। আহারাদিকে পশুসমুচিত জানিয়া যাহারা ঐ সকলকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, তাহারা কি তবে ভ্রষ্টাচারী?

সন্ন্যাসী। শাস্ত্রদৃষ্টিতে ভ্রষ্টাচারী পশু বিনা আর কিছুই নহে।

গৃহী। একথা বলিলে হইবে কেন? পঞ্চতপ ইত্যাদি কত কঠোর উপায় অবলম্বন করিয়া ইঁহারা যে ধর্ম্ম সাধন করেন।

*সন্ন্যাসী। তুমি কি গীতা পড় নাই? * ইহারা যে এইরূপে অশাস্ত্রবিহিত অসুরধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছে।

গৃহী। অসুর ধর্ম্ম কেন?

সন্ন্যাসী। অহঙ্কার মনুষ্যের ভিতরে অসুর। সেই অহঙ্কারের আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা আসুরিক ধর্ম্ম বিনা বল আর কি হইতে পারে।

গৃহী। শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম তবে কি?

সন্ন্যাসী। আহারাদি স্বাভাবিক ক্রিয়ায় নিত্য যজ্ঞ, নিত্য হোম এবং সেই যজ্ঞ ও হোমে ব্রহ্মদর্শন।

---

* তুমি কি গীতা পড় নাই? ইহারা যে এইরূপে অশাস্ত্রবিহিত অসুরধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছে।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপোজনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়াম্॥

দম্ভ, অহঙ্কার, কাম, আসক্তি ও সাহসিকতাবশতঃ যে সকল লোক অশাস্ত্রবিহিত ঘোর তপস্যাচরণ করে এবং অবিবেকী হইয়া শরীরস্থ ভূতনিচয়কে এবং তৎসহ অন্তঃশরীরস্থ আমাকেও কৃশ করে, তাহাদিগকে আসুরনিশ্চয় বলিয়া জানিও।

ত্রিবিধ জন্ম।

ত্রিবিধ জন্ম।

অসম্মিলনের সম্মিলন, এই ভাবে দীক্ষিত হইয়া আমরা অগ্রসর হইতেছি। যতক্ষণ অসম্মিলন সম্মিলনে পরিণত না হয়, ততক্ষণ এ নিমিত্তই মনে শান্তি অনুভব করি না। প্রথম প্রথম যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হই, তখন এ ভাব প্রবল ছিল না, বরং সম্মিলনাপেক্ষা অসম্মিলনের দিকে চিত্তের গতি প্রবল ছিল, কেন না ইহাতে নিজধর্ম্মের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে, অন্য ধর্ম্মের হীনতা সেই মহত্ত্বকে আরও উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে, এইটি মনে হইয়া একটি গর্ব্ববিমিশ্র আনন্দ জন্মিত। আজ মনে করিতে বড়ই লজ্জা হয়, অপর ধর্ম্মের দোষদুর্ব্বলতা যেখানে দেখিতাম, সেখানে আজ তাহার গূঢ় মহত্ত্ব দেখিয়া অবাক্ হইতেছি। নিজ-গুণে জীবনে ঈদৃশ মহৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এ কথা বলিতেছি না, বিধানের গুণে—নববিধানের গুণে এ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিতেছি। বেদান্ত এ দেশের ধর্ম্মবিজ্ঞান। এ বিজ্ঞা-নের বিরোধে ব্রাহ্মসমাজে আজ পর্য্যন্ত অপরাধ চলিতেছে, সেই অপরাধের কথঞ্চিৎ নিষ্ক্রয় হয়, তাহারই জন্য আজ আপনাদের নিকটে উপস্থিত। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "সোঽহমস্মি" "তত্ত্বমসি" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" জীবের পুনরাগমন ইত্যাদি বিষয়ে পরিষ্কার ভাষায় প্রতিবাদ রহিয়াছে। এ সকল প্রতিবাদ মূলশূন্য এ কথা বলিতেছি না। সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন

* অষ্টাসপ্ততিতম মহোৎসবোপলক্ষে উপাধ্যায়প্রবর বক্তৃতামূলক।

লোকদিগের অবিচারে বেদান্তের বিরুদ্ধে যে সকল নিন্দা দৃঢ়মূল হইয়া রহিয়াছে তাহারই প্রতিবাদের জন্য এ সকল কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকিবে, ইহাতো ভগবানেরই অভিপ্রায়, কিন্তু এ সকল প্রতিবাদের উপযোগী কথাগুলির মধ্যে এমন কি সত্য নিহিত আছে, যাহার জন্য ইহারা কোন কালে বিলুপ্ত হইবার নহে ; তাহার উদ্ধারের জন্য এত দিন যত্ন হয় নাই, এক্ষণে সে যত্ন উপস্থিত। মানুষের নিজ ইচ্ছায় এ যত্ন উপস্থিত হয় নাই, যথাসময় বিধান সে যত্ন উপস্থিত করিয়াছেন, তাই আমাদের মনের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভক্তিভাজন প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের শেষ জন্মোৎসবে যখন তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই এবং শেষ উপহার অর্পণ করি, তখন প্রতিজ্ঞা ছিল

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥

পরলোকসম্বন্ধে বেদান্তের এই কথায় তৎপ্রচারিত মতের সঙ্গে বেদান্তের মিলন প্রদর্শিত হইবে। বেদান্তের পারলৌকিক তত্ত্ব সমুদায় আয়ত্ত হইয়াছে, এ কথা বলিতেছি না, যত দূর হইয়াছে তাহাই বলিবার জন্য অদ্য অগ্রসর। জীবজন্ম বিষয়ে এত দিন যে বিরোধ চলিয়া আসিয়াছে, সে বিরোধ যদি কথঞ্চিৎ ঘুচিয়া থাকে, তজ্জনিত আনন্দ নিজে ভোগ করিয়া অপরকে তাহার ভাগী করিতে কেনইবা ইচ্ছা হইবে না।

গীতার সমন্বয়ভাষ্য যখন লিখি, তখন যে সকল তত্ত্ব চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছিল, উপযুক্ত প্রমাণ বিনা সে সকল সিদ্ধান্তরূপে সাধারণের নিকটে উপস্থিত করি নাই, কেবল আভাসমাত্র নিবদ্ধ করিয়াছি। গীতার পর ভাগবত, ভাগবতের পর মূল বেদান্তে

আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। অসম্মিলন নয় সম্মিলন— বিধানের এই মূল তত্ত্ব বেদান্তে নিয়োগ-করিয়া কি ফললাভ হইয়াছে, নানা আকারে তাহা ইতঃপূর্ব্বে সকলকে অবগত করিয়াছি। পুনর্জ্জন্মের মত লইয়া সাধারণের সঙ্গে যে বিরোধ চলিয়াছে, তাহার নিঃসংশয় মীমাংসা করিতে পারি নাই, সুতরাং এ সম্বন্ধে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে আমি যে উত্তর দিতাম তাহাতে না আমি আপনি তুষ্ট হইয়াছি না অপরকে তুষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইনি গীতার সমন্বয়ভাষ্যকার সুতরাং এ সম্বন্ধে ইনি অবশ্য বিশেষজ্ঞ, ইহা মনে করিয়া যাঁহারা নিকটস্থ হইয়াছেন, তাঁহারা পরিষ্কার কথায় বলিয়া গিয়াছেন, ইঁহাকে আমরা যাহা মনে করিয়াছিলাম, ইনি তাহা নন। তাঁহাদের এ কথায় আমার মন ক্ষুব্ধ হয় নাই, কেন না ভাষ্যরচনা করিয়া আমি নিখিলশাস্ত্রের পারগমন করিয়াছি, ইহা আমি মনে করি না। এখনও শিখিবার অনেক অবশিষ্ট আছে, ইহা তখনও জানিতাম এখনও জানি। গীতাভাষ্য যখন লিখি সে সময়ে বেদান্তের বিশেষ সমালোচনা করি নাই। সংস্কৃত বেদান্তসমন্বয়ের সমাপনান্তে আশা করা যাইতে পারে, বেদান্তের বিশেষ আলোচনা হইয়াছে, সুতরাং আর কি নূতন তত্ত্ব প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু তাহাও নয়। এই আর এক দিন বেদান্তের অবতরণিকা লিখিতে গিয়া যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, তাহাতে জানিতে পাইলাম বেদান্ত জীবের ত্রিবিধ জন্ম সিদ্ধ করিয়াছেন, চতুর্থ জন্ম বেদান্তে নাই। এত দিন মনের মধ্যে বেদ ও বেদান্তে যে বিরোধ ছিল সে বিরোধ সহসা ঘুচিয়া গেল। বেদান্ত বলিতেছেন, পিতৃদেহে জীবের বীজরূপ প্রথম জন্ম, মাতৃজরায়ুতে দ্বিতীয় জন্ম, মৃত্যুতে তৃতীয় জন্ম। মৃত্যুর পর কি পিতৃদেহে বীজরূপে কি মাতৃজরায়ুতে ভ্রূণ-

রূপে আর জন্ম নাই, বৃত্তিরহিত বা বৃত্তি লইয়া আত্মার স্থিতি হয় এবং তদনুসারে তাহার বিবিধ গতি ঘটে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, যদি বেদান্ত পরিষ্কার ভাষায় এ কথা বলিয়া থাকেন, তবে এত দিন এ দেশে পণ্ডিতদের মধ্যে এ সম্বন্ধে বিপরীত মত কেন চলিয়া আসিয়াছে? বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবে, এ উত্তর দিয়া পার পাইবার উপায় নাই। এক শ্রীমচ্ছঙ্কর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবাধীন হইয়াছিলেন তাঁহার বিরোধী সম্প্রদায়গণ ইহা বলিয়াছেন প্রমাণও দিয়াছেন, কিন্তু সকল আচার্য্যই কি জীবজন্মবিষয়ে সে ধর্ম্মের কুহকে পড়িয়াছিলেন? ব্রহ্ম-ভিন্ন স্বতন্ত্র জীব নাই, এ কথার প্রতিবাদ অনেকে করিয়াছেন, এবং এই প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধমত নিরস্ত হইয়াছে, জীবের জন্ম নাই উপাধির সঙ্গে যোগই তাহার জন্ম, এ কথায় সকল আচার্য্যই এক মত, শঙ্করও এ কথা বলেন কিন্তু কোনও আচার্য্য ওতো স্পষ্ট এ কথা বলেন নাই মৃত্যুর পর আত্মা ইহলোকে আসে না, দেহের উপাদান সকলের আগমন হইয়া থাকে। ভ্রূণ পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলে উহাতে আত্মার প্রবেশ হয় তৎপূর্ব্বে নহে। যে আত্মার প্রবেশ হয়, উহা কোথা হইতেও আইসে না, কেন না আত্মার স্থিতি নিত্যকাল প্রাজ্ঞেতে (পরাত্মাতে)। দেহ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বিশ্লিষ্ট হয়। আধুনিক মতে শ্মশানে প্রতিদিনের পিণ্ডদানে দেহবিশিষ্ট হইয়া জীব পিতৃলোকে প্রবেশ করে, প্রাচীন মতে অগ্নিই তাহার সমস্ত দেহের একত্র যোজনা করেন; দেবী অগ্নুনীত স্বর্গে তাহার প্রকৃষ্ট তনুনির্ম্মাণ করেন। বৃহদারণ্যক বলিতেছেন:—"(প্রাজ্ঞ আত্মা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত)* আত্মা উৎক্রান্ত হইলে প্রাণ তাহার পশ্চাতে উৎক্রমণ করে।

---

* প্রাজ্ঞ (পরাত্মা) হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া আত্মা উৎক্রমণ করে না, কারণ

আত্মা বিজ্ঞানময়, সুতরাং সে বিজ্ঞানকে লইয়াই নিক্রমণ করে। বিদ্যা কর্ম্ম এবং পূর্ব্ব প্রজ্ঞা তাহাকে সম্যক্ আপনার অনুরূপ করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাই তৃণজলোকা যেমন তৃণের অন্তভাগে গমন করিয়া অন্য আশ্রয় আশ্রয়-করে এবং সেখানেই আপনাকে উপসংহৃত করে, তেমনি এই আত্মা এই শরীরকে ছাড়িয়া এবং অচেতনাবস্থা অতিক্রম করিয়া অন্য আশ্রয়কে আশ্রয়-করত সেখানে আপনাকে উপসংহৃত করে। ["তাই যেমন স্বর্ণকার স্বর্ণখণ্ড লইয়া অন্যনবতর কল্যাণতর রূপ (প্রস্তুত) করে, তেমনি এই আত্মা এই শরীরকে ছাড়িয়া এবং অচেতনাবস্থা অতিক্রম করিয়া পৈত্র্য বা গান্ধর্ব্ব, বা দৈব বা প্রাজাপত্য, বা ব্রাহ্ম বা অন্যান্য ভূতগণের অন্য নবতর কল্যাণতর রূপ (গ্রহণ) করে।

"সেই এই আত্মা ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বময়—বিজ্ঞানময় মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ময়, শ্রোত্রময়, পৃথিবীময় জলময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়, অতেজময়, কামময়, অকামময়, ক্রোধময়, অক্রোধময়, ধর্ম্মময় অধর্ম্মময়, সর্ব্বময়, তৎ-যৎ-এতৎ-এবং-ইহাময় এবং উহাময়। সুতরাং যে যেমন করিয়াছে যেমন আচরণ করিয়াছে সে তেমনি হয়, সাধুকর্ম্মকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপ হয়, পুণ্যকর্ম্মে পুণ্য হয়, পাপকর্ম্মে পাপ হয়। পুরুষকে কামময় বলা হইয়া থাকে। তাহার কামনা যেমন সে তেমনি ক্রিয়াশীল হয়। সে যেমন ক্রিয়াশীল হয় তেমনি ক্রিয়া করে। যে ক্রিয়া করে সে তাই হয়।

ইহারাই পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে সেই সময় "ভারাক্রান্ত শকট যেরূপ শব্দ করিতে করিতে চলে তেমনি শরীরস্থ আত্মা প্রাজ্ঞ আত্মার আলিঙ্গনে আক্রান্ত হইয়া শব্দবিশেষ প্রবৃত্ত হয়। যে কালে এইটি হয় সে কালে পুরুষের উর্দ্ধশ্বাস উপস্থিত হয়।"

"উক্ত অর্থে এই শ্লোক :—[আত্মা] যে কর্ম্মসহকারে পরলোকে আগমন করে তাহার লক্ষণ মন, কেন না যাহাতে ইহার মন নিরতিশয় আসক্ত তাহাতেই সে আসক্ত হয় ইহলোকে যে কোন কর্ম্ম করে সেই কর্ম্মের অন্ত পাইয়া সে লোক হইতে পুনরায় এই লোকে কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত আইসে *। যে ব্যক্তির কামনা আছে [তাহার সম্বন্ধে এই নিয়ম। অনন্তর যে ব্যক্তির কামনা নাই সে ব্যক্তি অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম আত্মকাম। তাঁহার প্রাণ সকল উৎক্রমণ করে না। ব্রহ্মসহ অভিন্ন হইয়া তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।

"উক্ত মর্ম্মে এই শ্লোক - ইহার হৃদয়ে যে সকল কামনা আশ্রিত হইয়া আছে সে সকল যখন খসিয়া পড়ে, তখন মর্ত্ত্য অমৃত হয়, এখানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। তাই মৃত সর্পের নির্ম্মোক বল্মীকে নিক্ষিপ্ত হইয়া যেমন শয়ান থাকে তেমনি এই [মৃত] শরীর শয়ান থাকে আর ব্রহ্মই এই অশরীর অমরণশীল প্রাণের প্রাণ হন তেজের তেজ হন †।" বৃহদারণ্যকের ‡ এই কথাগুলির বিশেষ আলোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে,জীব দেহস্থ নয় চিরদিনই পরমাত্মস্থ সৃষ্টির দিনে পরমদেবতা বলিয়াছিলেন "এই জীবাত্মার সঙ্গে প্রবেশ করিয়া আমি নামরূপ অভিব্যক্ত করিব" সেই দিন হইতে জীবকে

---

* "কর্ম্মণ ইতি। পুনঃ কর্ম্মকরণায়। পুনঃ কৃত্বা কামসঙ্গবশাৎ পুনরমু লোকং যাতীত্যেবং"। ভাষ্যকার এরূপ বলাতে লোকলোকান্তর ভ্রমণ সুস্পষ্ট বুঝাইতেছে।

† প্রাণ হন তেজ হন—প্রাণস্য প্রাণঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ এই বিধিতে

‡ বক্তৃতাকালে ভাবমাত্রে এই সকল কথা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছিল এখন উহার পুনরুদ্ধার কালে বৃহদারণ্যকের সে অংশের অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল। প্রমাণসম্বন্ধে সর্ব্বত্র এইরূপ সংযোগ বুঝিয়া লইতে হইবে।

লইয়া সর্ব্বত্র তাঁহার নিত্য একত্র বাস। মাণ্ডুক্য উপনিষৎখানি সমুদায় উপনিষদের তত্ত্ব অল্প কথায় বিবৃত করিয়াছেন। এই উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাজ্ঞ (পরাত্মা) কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া জীবের বাস, জাগৎ ও স্বপ্নাবস্থায় জীবের সহিত ইন্দ্রিয়াদির যে সম্বন্ধ অনুভূত হয় উহা অভিনিবেশবশতঃ তাই সুষুপ্তাবস্থায় প্রজ্ঞানঘনরূপে প্রাজ্ঞে উহার স্থিতি হয়। "আত্মা বিজ্ঞানময়, সুতরাং সে বিজ্ঞানকে লইয়াই নিষ্ক্রমণ করে" এখানে যে এ কথার উল্লেখ হইয়াছে মাণ্ডুক্য উপনিষদে তাহারই প্রতিধ্বনি। আত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই ঋগ্বেদে অজোভাগ উল্লিখিত হইয়াছে! দেহেন্দ্রিয়ের প্রতি অভিনিবেশবশতঃ যদিও জীবাত্মা আপনাকে পরাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করিয়া শোকে মোহে অবসন্ন হয়, তথাও কিন্তু এ অবস্থা তাহার স্বাভাবিক অবস্থা নয় বলিয়া সে আপনি কে তদ্বিষয়ে জ্ঞানোদয়মাত্র তাহার শোকোপনয়ন হয়। বিজ্ঞানময় আত্মা যখন পরলোকে গমন করে তখন তাহার সঙ্গে কি যায়? বিদ্যা কর্ম্ম এবং পূর্ব্ব প্রজ্ঞা। বিদ্যা কর্ম্ম এবং পূর্ব্বপ্রজ্ঞা সঙ্গে গিয়া কি হয়? তদনুযায়ী জীবনলাভ হয়। ঋগ্বেদ বলিতেছেন, অচিরে এ জীবন লাভ হয়, বেদান্ত কি তাহার বিপরীত কিছু বলিয়াছেন? কৈ বিপরীত কোথায় বলিয়াছেন, উৎক্রান্ত আত্মা "এই শরীরকে ছাড়িয়া এবং অচেতনাবস্থা অতিক্রম করিয়া অন্য আশ্রয়কে আশ্রয়" করে, এ কথা বলাতে বেদের সহিত উহার বিরোধ ঘটিতেছে না। এ আশ্রয় কি? পৈত্র্যাদিরূপ। পৈত্র্যাদিরূপ গ্রহণের সম্ভাবনা হইল কিরূপে? আত্মা বাহিরের শরীর ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু এখন যে সে বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়। তত্তৎ সামর্থ্য থাকাতে চক্ষুরাদির

সম্ভাবনা এখনও সকলই যে তাহাতে আছে। দেহ ত্যাগ-করিয়াই কি সে সম্পন্ন হয়? কখনই নহে। যদি হইত তাহা হইলে কামময়, অকামময়, ক্রোধময়, অক্রোধময়, ধর্ম্মময়, অধর্ম্মময় ইত্যাদি বিশেষণ তাহার থাকিত না, সাধু অসাধু ইত্যাদি প্রভেদ তখনও তাহাতে উল্লিখিত হইত না। সে এখনও নিষ্ক্রিয় নয় ক্রিয়াশীল, তাই সে যেমন করে তেমনই হয়।

পরলোকগত আত্মার অবস্থা নিরভিলাষ ও সাভিলাষ-ভেদে দুই প্রকার। একটি শ্লোকে সাভিলাষ আর একটি শ্লোকে নিরভিলাষ আত্মার গতি উল্লিখিত হইয়াছে। নিরভিলাষ আত্মার গতি সম্বন্ধে ভ্রম হয় নাই, বরং অনেকে উহার এতদুর নিয়োগ করিয়াছেন যে পরলোক ও ইহলোকের একত্বসত্বেও দেহভঙ্গ না হইলে ওটির প্রয়োগ হয় না একথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যেমন নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন "তত্বজ্ঞান জন্মিলেও দেহপাত পর্য্যন্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রতিবন্ধবশতঃ বিদেহ কৈবল্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যদি তাহাই না হইত তাহা হইলে জ্ঞান জন্মিবামাত্রই দেহপাত ঘটিত।" জীবিতাবস্থাতেও শরীর থাকিয়াও শরীর নাই এরূপ ভাব অনেক সাধকের উপস্থিত হয়, ইহা দেখিয়া কোন কোন আচার্য্য দেহবান্ ব্যক্তিতেও ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন। সাভিলাষ আত্মার গতি-সম্বন্ধে যে শ্লোকটি উক্ত হইয়াছে ঐটির নিয়োগে ভ্রম জন্যই বেদ ও বেদান্তে বিরোধ ঘটিয়াছে। "তদেষশ্লোক" :—উক্ত বিষয়ে শ্লোক এই—বেদান্তে যেখানেই এ কথায় উল্লেখ হইয়াছে সেখানেই যে বিষয়টি বলা হইয়াছে সেই বিষয়টির সার শ্লোকে নিবদ্ধ হইয়াছে, শ্লোকের মধ্যে উক্ত বিষয়টিকে অতিক্রম করিয়া অন্য কোন বিষয় নিবদ্ধ হয় নাই। এখানেও এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই,

এইটি, বুঝিতে না পারিয়া এই শ্লোকটি হইতে বেদ ও বেদান্তের বিরোধী কুমতের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্লোকস্থ 'মন' শব্দটি বিদ্যা কর্ম্ম এবং পূর্ব্বপ্রজ্ঞার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত। বিদ্যা কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞা থাকে কোথায়? মনে। এই বিদ্যা কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞানুসারে আত্মার রূপপরিগ্রহ হয়। পরলোকে এ রূপপরিগ্রহ মানস, তাই যাহার মন যেরূপ তাহার সেইরূপ রূপপরিগ্রহ হয়। পুরাণে মানস-পুত্র মানসী কন্যার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে বীজ হইতে যেমন দেহের উৎপত্তি হয়, সেখানে তাহা নাই। আছে কি? মন। সেই মন হইতে পুত্রকন্যা প্রাপ্তি ঘটে। পুত্রকন্যাপ্রাপ্তির অর্থ এই যে, এক জন যখন অপর আর এক জনের ভাবাপন্ন হয়, তখন সে তাহার পুত্র বা কন্যা হইয়া থাকে। শ্লোকে সাধারণ ভাবে মন এই শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, যাহার মন যেমন সে সেইরূপ পৈত্রাদিরূপ ধারণ করে অর্থাৎ তদ্ভাবাপন্ন হয়। শ্লোকে মনকেই লক্ষণ বলা হইয়াছে এই জন্য যে, পরলোকে কে কি হইবে এক মনের দ্বারা তাহা অবগত হওয়া যায়। "ইহলোকে যে কোন কর্ম্ম করে তাহার অন্ত পাইয়া" এ অংশের সহিত তৃণ জলৌকার দৃষ্টান্তটি অতি সুন্দররূপে সংযুক্ত। ইহলোকে যে কোন ব্যক্তি যাদৃশ দেহেন্দ্রিয়মনোযুক্ত ছিল তাহার সেরূপ হইবার কারণ কর্ম্ম বা প্রাণশক্তি। দেহ ও বাহ্য ইন্দ্রিয়গণ পরিত্যক্ত হইল, এখন রহিল মন। মন রহিল কেন? এখনও ক্রিয়াশক্তির বিচ্ছেদ হয় নাই, তাই উহার বিলোপ হইল না। এ ক্রিয়াশক্তি বেদান্তে মুখ্য প্রাণ, তাই বেদান্তে মুখ্য প্রাণের উৎক্রমণের কথা আছে। কেবল এই পর্য্যন্ত নহে, অকাম ব্যক্তিরও অস্তিত্বের বিলোপ হয় না তাই দ্বিতীয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে "অশরীর অমরণশীল প্রাণের প্রাণ ব্রহ্মই হন

তেজই (জ্ঞানালোকই) হন।" আচ্ছা মনই যদি বিদ্যা কর্ম্ম ও পূর্ব্ব-প্রজ্ঞার আধার এবং তাহা হইতেই বিবিধরূপ পরিগ্রহ হয় তাহা হইলে ইহলোকে "যে কোন কর্ম্ম করে সেই কর্ম্মের অন্ত পাইয়া" এ কথা বলা হইল কেন? দেহেন্দ্রিয় মনোযুক্ত জীবের তৎকালে যেরূপ ছিল তাহা যে কর্ম্মের উপযোগী, সে কর্ম্মের অন্ত না হইলে আর পৈত্র্যাদিরূপ হইতে পারে না। তৃণজলৌকা তৃণের অন্তভাগে গমন না করিলে যেমন আশ্রয়ান্তরে আপনাকে উপসংহৃত করে না, এস্থলেও তাহাই বুঝিতে হইবে। দেহবিমুক্ত আত্মা যখন বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, তখন তাহার সম্বন্ধে যে

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।

এ বাক্যের পূর্ণ পরিমাণে প্রয়োগ হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি?

বিদ্যা কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞানুসারে দেহবিমুক্ত আত্মার বিবিধরূপ-গ্রহণ হইবে এবং তত্তল্লোকে বিচরণ ঘটিবে, ইহা বুঝিতে পারা গেল, কিন্তু চন্দ্রলোক হইতে বৃষ্টিধারায় পৃথিবীতে আসিবার যে কথা আছে, সে কথাটা কি *? চন্দ্রলোকে কাহারা যায়? কর্ম্মিগণ। কর্ম্মিগণের প্রথম গতি কোথায়? পিতৃলোকে।

---

* কৌষীতকী উপনিষদে মৃতব্যক্তিমাত্রের চন্দ্রলোকে গমন বর্ণিত আছে। উহার মতে সূর্য্য নহে কিন্তু চন্দ্রই স্বর্গের দ্বার, সুতরাং পৃথিবীতে আসা বা স্বর্গে গমন উভয়ই চন্দ্র হইতে হয়। যাহারা সেই চন্দ্রকে অতিক্রম করে তাহারা আর পৃথিবীতে আসে না, যাহারা তাহাকে অতিক্রম করে না তাহারা বৃষ্টি হইয়া পৃথিবীতে অবতরণ করে এবং জ্ঞান ও কর্ম্মানুসারে কীটপতঙ্গ মনুষ্যাদি হয়। এখানে সংক্ষেপে যাহা উক্ত হইয়াছে অন্যান্য উপনিষদে তাহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। এই উপনিষদে ব্রহ্মলোকে গমনের যে বিস্তৃ বৃত্তান্ত আছে অন্যান্য উপনিষদে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

পিতৃলোকে গমন করিয়া অবশ্য তাহারা পৈত্ররূপ প্রাপ্ত হয়। পৈত্ররূপপ্রাপ্তি হইলেই মোক্ষার্থে যত্ন অবশ্যম্ভাবী *। অন্যথা সে রূপ ধারণ বিফল। এই যত্নে পরাত্মালিঙ্গিত আত্মা ইন্দ্রিয়গণ হইতে বিযুক্ত হয়, ইন্দ্রিয়গণ অন্ন হইয়া চন্দ্রে গমন করে। সেখানে সেই অন্ন দেবগণের ভোগ্য হয়। ভোগদ্বারা যখন উহারা ক্ষয় পায়, তখন অব্যাকৃতাবস্থা উপস্থিত হয়। এই অব্যাকৃতাবস্থা আকাশ অনন্তর আকাশ হইতে বায়ু,—বায়ু হইতে বৃষ্টি হইয়া পৃথিবীতে পতন, পৃথিবীতে পতন হইয়া অন্নাকার ধারণ, সেই অন্ন পুরুষাগ্নিতে হুত হইয়া যোষাগ্নিতে জন্মগ্রহণ। যখন জন্মগ্রহণ হয় তখন বীজমধ্যে অমরাংশ ছিল কি? ছিল বৈকি? প্রাণই সেই অমরাংশ। প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ। এই ইন্দ্রিয়গণ দেবতা, এবং গর্ভস্থ বামদেব তাঁহাদিগেরই জন্ম প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এখানে বামদেব আত্মা, তিনি অজ তিনি জন্মিলেন না, কিন্তু দ্রষ্টা হইয়া সকলই দেখিলেন। তিনি ছিলেন কোথায়? সেই জায়মান দেহে নয়, কিন্তু পরাত্মাতে।

এখানে সকলেই দেখিতে পাইবেন "তত্তু সমন্বয়াৎ" আমরা এই বেদান্তসূত্রের বলে এক স্থানে যাহা উল্লিখিত হয় নাই অন্য স্থান হইতে তাহা আনিয়া অনুক্ত বিষয়ের আমরা পূরণ করিয়াছি। এরূপে পূরণ না করিলে যথার্থ তত্ত্ব কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম হইত না। এইরূপে পূরণ করিয়া আমরা বুঝিতে পারিতেছি আত্মার লোকলোকান্তরে ভ্রমণ এবং দৈহিক ইন্দ্রিয়গণের পৃথিবীতে পুনরাগমন হইয়া জন্মজন্মান্তরসিদ্ধ হয়। আমরা আমাদের এই দেহকে অতি তুচ্ছ মনে

* "এতস্মজ্জায়মান উভয়মেব ভবতি মর্ত্যং চৈবামৃতঞ্চ। তস্য প্রাণা এবামৃতাভবন্তি শরীরং মর্ত্যম্। শ, ব্র, ভা, ১০। ১১। ১।

করি। আমাদের মনে হয়, ইহার সহিত আমাদের যোগ হঠাৎ হইয়াছে, ইহার যেন কোন পূর্ব্ব বৃত্তান্ত নাই। এ দেহের প্রত্যেক বিন্দুর সহিত লক্ষ লক্ষ যুগের সম্বন্ধ আছে, এ কথা আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয় না। একটি জীবের ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে তৎস্মৃতিতে লক্ষ লক্ষ জন্মের কথা প্রতিভাত হওয়া আমাদের নিকটে রূপক, কিন্তু সেরূপক যে বৈজ্ঞানিক সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত ইহা আমাদের মনেও আসে না। জন্মিয়াই স্তন্যপানাদি ক্রিয়া যে শত শত বর্ষে দেহের ধর্ম্ম হইয়া গিয়াছে, এ কথায় কি আমরা বিশ্বাস করি? একটি জীবদেহের উৎপত্তি মহারহস্যে পূর্ণ ঋষিগণ দিব্য চক্ষে ইহা দেখিয়াছিলেন, তাই আজ বিজ্ঞানবিদেরা সেই রহস্যের উদ্ঘাটনে তাঁহাদের সমুদায় শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। রাজাধিরাজ ঈশ্বরের তনয় আত্মা দেহের অধীন নহে কিন্তু উহার দ্রষ্টা, যখনই সে অধীন হয় তখনই তাহার তনয়ত্ব আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, এ কথা সত্য, কিন্তু দেহের সমুচিত ব্যবহারে সে যে প্রকাণ্ড বিশ্বরাজ্য আপনার অয়ত্তাধীন করিয়া লইতে সমর্থ হয়, ইহাতে কি আর কোন সংশয় আছে? চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে আমরা তুচ্ছ মনে করি, মাতৃগর্ভস্থ বীজে উহাদিগের প্রকাশ এবং সে প্রকাশে দেবগণের প্রকাশ আমাদের নিকটে অলীক অত্যুক্তি, কিন্তু দেহস্থ ইন্দ্রিয়গণের স্বাধীন ক্রিয়া দেবস্পর্শে দেবত্বপ্রাপ্ত দেবগণের দ্বারা নিয়ত নিষ্পন্ন হইতেছে এ কথা কি অস্বীকার করিতে পারি? বিজ্ঞানবিদ্গণ ইহাকে সংস্থানসম্ভূত-স্মৃতি (Organic memory) নামে অভিহিত করিতে পারেন, কিন্তু স্মৃতি বলিলেই উহাতে দেবত্বের সংক্রমণ ঘটিতেছে। দেহপিণ্ডে প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশ যে বহুলক্ষবর্ষের ইতিহাস বিজ্ঞানচক্ষে আনিয়া

উপস্থিত করে, আজ কাল বিজ্ঞানপ্রধান সময়ে ইহা আর অযুক্ত অনুমান নহে প্রত্যক্ষ ব্যাপার। দেহের সুস্থ বা অসুস্থ একটি উপাদানেরও বৃথা ক্ষয় হয় না, স্থলবিশেষে সুস্থ ও অসুস্থ উপাদানের পুনঃ পুনঃ আগমন হয় বেদোপনিষৎ এ কথা বলিয়া বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কথা বলিয়াছেন কে ইহা বলিবে? বেদান্তে ইন্দ্রিয়গণের এত প্রাধান্য কেন? তাহাদেরই পুনরাগমনের বর্ণনা কেন? বেদান্তের এই প্রাচীন বাক্যটি তাহার কারণ প্রদর্শন করে।

করণৈঃ কারয়িতান্তঃ পুরুষঃ।

অন্তরস্থ পরমপুরুষ ইন্দ্রিয়গণের যোগে কারয়িতা। তিনি এই সকলের দ্বারা আমাদের কর্ত্তৃত্বের সর্ব্বতোমুখী গতি রুদ্ধ করেন বলিয়াই ইন্দ্রিয়গণ আমাদের বশে নহে, উহারা স্বয়ং ভগবানের বশে অবস্থিত। আমরা তাঁহার বশ না হইলে কখন তাহাদিগের উপরে আধিপত্য করিতে পারি না। মধু ব্রাহ্মণ এ জন্যই প্রকৃতি, অন্তর্য্যামী এবং জীব এ তিনের একত্বে ব্রহ্মের সহিত একত্ব বর্ণন করিয়াছেন। তাই পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, শরীরকে তুচ্ছ করিয়া কেহ যে যোগী হইবেন, ব্রহ্মের সহিত এক হইবেন, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। স্বয়ং ব্রহ্ম যাহার প্রতি এত আদর করেন, তৎপ্রতি অনাদরকে উচ্চ ধর্ম্ম মনে করা যে ভ্রম, ইহা অল্পদিনের মধ্যেই সকলেরই প্রতীতির বিষয় হয়।

চন্দ্রলোক হইতে পুনরাবৃত্ত দেহোপাদানসমূহ ভাল বা মন্দ আচরণানুসারে ভিন্ন ভিন্ন যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, উপনিষদের এ কথা শুনিবামাত্র নিরতিশয় অযুক্ত বলিয়া কাহার না প্রতীত হয়? এ সকল উপাদান আসিয়া হয় কি? উপনিষৎ বলিতেছেন—"ব্রীহিযব ওষধি বনস্পতি তিল মাষ হয়।" যে সকল

প্রাণী এই গুলিকে ভোজন করে তাহাদিগের দেহগত হইয়া ইহারা বীজাকার ধারণ-করে। সেই বীজকেই ঐতরেয় পিতৃদেহে জীবের প্রথম জন্ম বলিয়াছেন এবং মাতৃগর্ভে ইন্দ্রিয়াদির বিকাশ এবং আত্মাকে উহাদের দ্রষ্টা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এইটি জীবের দ্বিতীয় জন্ম। এখন কথা হইতেছে, যবাদি ভোজ্য সামগ্রীর মধ্যে সত্বাদি গুণের তারতম্য আছে কি না? এবং সে তারতম্য প্রাণশক্তি হইতে উদ্ভূত হইতেছে কি না? এক প্রাণশক্তি ঈদৃশ তারতম্য ইবা কেন উপস্থিত করিল? অবশ্য দেহের ভাল মন্দ আচরণ এরূপ তারতম্যের কারণ, এ ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? আচরণে দেহের ক্রিয়া ভিন্ন হয়, ভিন্ন ক্রিয়া হইতে উপাদানসমূহের ভিন্ন গুণপ্রাপ্তি হয় ইহা কি প্রত্যক্ষ নয়? ভিন্ন গুণের উৎপত্তি রাসায়নিক প্রক্রিয়া ইহা আর আজ কাল কাহার অবিদিত নহে। যে প্রাণী যে গুণযুক্ত সে প্রাণী তদ্গুণযুক্ত আহার্য্য ভোজন করিয়া থাকে, সুতরাং তত্তদ্যোনিসম্ভূত প্রাণিগণকে উপনিষৎ যে প্রকার অবধারণ করিয়াছেন সেরূপ অবধারণ করা কাহারও পক্ষে অসম্ভব নহে। উপনিষদে যে কথাটী সংক্ষেপে নিবদ্ধ হইয়াছে, অন্যান্য স্থলে উক্ত বিষয়গুলির তাহাতে সন্নিবেশ না করিলে উহার প্রকৃতার্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না। প্রকৃতার্থ হৃদয়ঙ্গম না হইয়া কি যে অনিষ্ট হইয়াছে, এখন উহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন।

তদ্য ইহ রমনীয়চরণা অভ্যাশোহয়ন্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রযোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাথ য * ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশোহয়ন্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা।

---

* ব্যাখ্যাতৃগণ এখানে 'যে' পদে অনুপরিগণ করিয়াছেন, আমরা শতপথ ব্রাহ্মণের কথায় 'প্রাণাঃ' করিয়াছি। মূল বেদান্তে অনুপরিগণ কোথাও নাই।

আমরা শুনিতে পাইয়াছি যে ত্রিবিধ জন্মবিষয়ে আমাদের বক্তব্য বলিবার কিছু দিন পর এক জন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পুনর্জ্জন্মবাদ বাদ দিলে হিন্দুধর্ম্ম বিপদ্‌গ্রস্ত হইবে, কেন না পুনর্জ্জন্মবাদ বাদ দিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে লোকের সকল ভয় চলিয়া যাইবে, যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিবে, কেন না লোকে যে ধর্ম্মকর্ম্ম করে সে কেবল ইহলোকে বা কষ্ট পাইতে হয়, এই ভয়ে। সে ভয় চলিয়া গেলে আর রহিল কি?

সুতরাং আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, এ শব্দ পরবর্ত্তী সময়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কর্তৃক উদ্ভাবিত। বেদান্তের প্রকৃত অর্থ করিতে গেলে বেদান্ত যে সকল শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, সেই সকল গ্রহণ করিয়া তাহার অর্থ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য যত্ন করা সমুচিত। পরবর্ত্তী চিন্তাপ্রধান সময়ের শব্দগুলি আমাদিগকে বেদান্ত হইতে বিভ্রান্ত করিয়া বিপথে লইয়া যায়। বেদান্ত প্রত্যক্ষ শাস্ত্র। অন্তরাত্মার সহিত যোগবশতঃ যে সকল সত্য ও তত্ত্ব ঋষিগণের অন্তশ্চক্ষুতে প্রতিভাত হইয়াছে, সেইগুলি তাঁহারা বেদান্তে প্রবচনাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী চিন্তাপ্রধান সময়ে যে সকল তত্ত্ব ও সত্য প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলি প্রত্যক্ষ শাস্ত্রমধ্যে পরিগণিত নহে, এজন্য উহাদিগকে অনুমান বলে। প্রত্যক্ষশাস্ত্রকে শ্রুতি ও অনুমানের শাস্ত্রকে স্মৃতি বলে, স্মৃতির ব্যবহৃত শব্দকে শ্রুতির অর্থগ্রহণে নিয়োগ এজন্যই আমরা বিধিসিদ্ধ মনে করি না। আমরা বেদান্তের তত্ত্ব প্রকাশ করিতে গিয়া এজন্য কোথাও তৎপরবর্ত্তী সময়ের ব্যবহৃত শব্দকে প্রমাণ বলিয়া উপস্থিত করি নাই। সকলে দেখিতে পাইবেন, আমরা অনুশয়িশব্দের প্রত্যাখ্যান করিয়া শতপথ ব্রাহ্মণের উক্ত প্রাণশব্দ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছি। এরূপ করাতে ঐতরেয় এবং প্রশ্নোপনিষৎ প্রভৃতি যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহার সহিত আমাদের উক্তি যথাযথ মিলিয়া গিয়াছে। আমরা আশা করি তত্ত্বার্থিগণ ভালরূপে উপনিষৎসকল পাঠ করিয়া জীবতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিবেন, এরূপ করিলে আর ভ্রমে পড়িবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না।

আর্য্যঋষিগণের সন্তানের মুখে ঈদৃশ কথা শুনিয়া বড়ই ক্ষোভ হয়, তাই আমরা ইহার উত্তরে বেদান্তসমন্বয়ের অবতরণিকার নিম্নোদ্ধৃত অংশ তুলিয়া দিলাম। ইহার পর যেন আমাদিগকে ঈদৃশ অবিশ্বাসের কথা শুনিতে না হয় ইহাই আমাদিগের আত্মীয়বর্গের নিকটে প্রার্থনা।

"আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকিবে। ব্রহ্ম স্বয়ং শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ, জীবকে তাঁহার সহিত এক হইতে গেলে তাহাকেও অপাপবিদ্ধ হইতে হইবে, বেদান্তের এ উক্তি আমাদিগের নিকটে অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হয়। এই এক স্বরূপ লইয়াই জীব ও ব্রহ্মে প্রভেদ যখন স্বাভাবিক তখন এ প্রভেদ কোন কালে তিরোহিত হইবার নহে, ইহা সহজে আমাদের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। বেদান্ত যদি জীবের শুদ্ধত্ব অপাপবিদ্ধত্ব বিনা ব্রহ্মের সহিত ঐক্যস্বীকার না করেন, তাহা হইলে বেদান্তের ঐক্যবাদ— ব্রহ্মের সহিত একত্ব,—কথার কথা হইয়া উঠে। শ্রীমদ্রামানুজ এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সে সিদ্ধান্ত আমাদিগকে আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে *। ব্রহ্মের সহিত একত্বানুভব সমগ্র

* "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি" ইতি ব্রহ্মণি নানাত্বং পশ্যতো ভয়প্রাপ্তিরিতি যদুক্তং তদসৎ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" ইতি তদাত্ম্যানুসন্ধানস্য শান্তিহেতুত্বোপদেশাৎ। তথাহি সর্ব্বস্য জগতস্তদুৎপত্তিস্থিতিলয়কর্ম্মতয়া তদাত্মকত্বানুসন্ধানেনাত্র শান্তির্বিধীয়তে অতো যথাবস্থিতদেবতির্য্যঙ্মনুষ্যস্থাবরাদিভেদভিন্নং জগৎ ব্রহ্মাত্মকমিত্যনুসন্ধানস্য শান্তিহেতুত্বাদভয়প্রাপ্তিহেতুত্বেন ন ভয়হেতুত্বপ্রসঙ্গঃ। এবং তর্হি "অথ তস্য ভয়ং ভবতি" ইতি কিমুচ্যতে? ইদমুচ্যতে "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি" ইত্যভয়প্রাপ্তিহেতুত্বেন ব্রহ্মণি যা প্রতিষ্ঠোক্তা-

বেদান্তের উদ্দেশ্য এজন্যই উহাতে ভেদদর্শন নিষিদ্ধ হইয়াছে। যখন ব্রহ্ম এবং তাঁহাতে নানা বিষয় নিত্য বিদ্যমান আছে, তখন এই নানাত্বকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া 'নাই করিয়া ফেলা' কি প্রকারে সম্ভবে, এইটি মীমাংসিতব্য বিষয়। নানাবিষয়ে মনের অভিনিবেশবশতঃ ব্রহ্ম হইতে চিত্তের যে বহির্মুখগতি হয়, এই গতি যোগের অন্তরায়। এই বহির্মুখগতি নিবারণ-করিয়া ব্রহ্ম সহ জীবের অবিরোধভাবে স্থিতি যোগে আকাঙ্ক্ষণীয়। সাধক যখন ব্রহ্মের প্রেরণানুবর্ত্তী হইয়া দর্শন শ্রবণাদি ব্যাপার নিষ্পন্ন করেন, তখন তাঁহার চিত্ত এক ব্রহ্মেতেই স্থিতি করে, তখন আর উহা বহির্মুখ হয় না, সাধক ব্রহ্মেতে আনন্দানুভব করেন। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া উপনিষৎ বলিয়াছেন,

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

বেদাদির অনুশীলন বা অন্য কারণে সাধকের চিত্ত যখন অল্পমাত্রও ব্রহ্ম হইতে অবসৃত হয় তখন তাহার ভয় উপস্থিত হয়।

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি।

কি জানি বা পাপাদি বিরোধী বিষয় দ্বারা ব্রহ্মযোগের অণুমাত্র বিচ্ছেদ হয়, এ ভয় যখন সাধকে স্বভাবতঃ উপস্থিত হয়, তখন সেই ভয়ই পাপপ্রবৃত্তিনিবৃত্তির প্রকৃষ্ট কারণ। কি জানি বা ব্রহ্মের সহিত বিচ্ছেদ ঘটে বেদান্তবিৎ সাধকের চিত্তে এ ভয়ের বিদ্যমানতা-সত্ত্বে পাপে নিপতন কি প্রকারে সম্ভবিবে? পাপে পতনের সম্ভাবনা সত্ত্বে তাহা হইতে নিবৃত্তি জীবের শুদ্ধতা এবং সেই শুদ্ধতাই

হিত্বা তন্মাবিচ্ছেদে ভয়ং ভবতীতি। যথোক্তং সংবিতিঃ "যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে। সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা ভ্রান্তিঃ সা চ বিক্রিয়া" ইত্যাদি। ব্রহ্মণি প্রতিষ্ঠায়া অন্তরমবকাশো বিচ্ছেদএব।

তাহাকে পাপস্পর্শবর্জ্জিত করিয়া রাখে। এই আপেক্ষিক শুদ্ধত্ব ও অপাপবিদ্ধত্ব যখন জীবে সম্ভবপর তখন বেদান্তসিদ্ধ মোক্ষ—ব্রহ্মের সহিত একত্ব—আর অসম্ভব রহিল কোথায় ?"

মূল কথা প্রায় সকলই বলা হইল, এখন কর্ম্মসম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। উপনিষদের মতে কর্ম্ম আত্মার না দেহের ? বৃহদারণ্যক বলিতেছেন ;—"অনন্তর কর্ম্মনিচয়ের দেহ এইটি [সামান্য] [সেই দেহ সামান্য] এই সকল কর্ম্মের উক্থ [উত্থানকারণ] ; কেন না এই [দেহ সামান্য] হইতে এই সকল কর্ম্ম উত্থান করে। এই [দেহ সামান্য] ইহাদের সমান। কেন না এইটী সকল কর্ম্মের সঙ্গে সমান। এইটি ইহাদের ব্রহ্ম (অন্তর্ভাবক)। কেন না এইটি সকল কর্ম্ম ধারণ করে। সেই এই [নামরূপ কর্ম্ম] তিনটি হইয়া একটি—এই দেহ, দেহ এক হইয়া এই তিনটি [নামরূপ কর্ম্ম]। সেই এই [তিনে এক একে তিন] অমৃত, সত্য দ্বারা আচ্ছন্ন। প্রাণই অমৃত। নাম ও রূপ সত্য, তদ্দ্বারা প্রাণ আচ্ছন্ন।" এ স্থলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে দেহ—নাম-রূপ-ও-কর্ম্মের সমষ্টি, দেহ লইয়াই নাম-রূপ-ও-কর্ম্মের স্থিতি। নাম-রূপ-কর্ম্মও সত্য, দেহও সত্য কর্ম্মের কারণ প্রাণ নিত্যকাল স্থায়ী। সত্য কি ? নাম ও রূপ। নিত্যকাল স্থায়ী কি ? প্রাণ। প্রাণ—ক্রিয়াশক্তি বা কর্ম্ম, ইহা সমগ্র জগদ্রূপ দেহব্যাপী। ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া কদাপি বিনাশ পায় না উহা ক্রমান্বয়ে প্রবাহিত হইতে থাকে, সুতরাং উপনিষৎ উহাকে অমৃত বা অবিনাশী বলিয়াছেন। আমরা যাহা করি, তাহা কর্ম্ম, তাহার কোন কালে বিনাশ হয় না। এ কথা বলা কিছু অযুক্ত নয়। আত্মার উপাধি প্রাণ, এই উপাধি যোগেই আত্মার বাহিরে প্রকাশ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এই

প্রাণেরই বিশেষ বিশেষ সংস্থান, এ জন্ত উপনিষদে প্রাণ শব্দে ইন্দ্রিয় বুঝায়। ইন্দ্রিয়গণের আধার দেহ। উপনিষৎ যদি দেহকে কর্ম্মের আধার বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে ভোগের নিমিত্ত জীবের দেহবত্তা এ কথায় কোন আপত্তি হইতে পারে না, কেন না উহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। আত্মা দেহবিহীন চৈতন্ত, সংযোগ বিনা উৎপত্তি হয় না, সুতরাং তাহার উৎপত্তি নাই এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত। চৈতন্যের দ্রষ্টৃত্ব স্বভাবসিদ্ধ সুতরাং সংযোগোৎপন্ন দেহের উহা দ্রষ্টা উপনিষদের এ কথা আমরা অমান্ত করিতে পারি না। দেহ ইন্দ্রিয়-ও-মনোযুক্ত হইয়া আত্মা ব্যক্তিত্ব লাভ করে, আত্মা কিন্তু ইহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র। গীতা তাই বলিয়াছেন,

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥

দেহেন্দ্রিয় মন—প্রকৃতির বিকার, ইহাদের হইতেই সকল প্রকার ক্রিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু আত্মা মূঢ়তাবশতঃ মনে করে আমিই এ সকল ক্রিয়ার কর্ত্তা। এই কর্ত্তৃত্বাভিমানের ফল এই হয় যে, সে আপনাকে দেহেন্দ্রিয়মন মনে করে। আত্মার বন্ধন এ জন্তই হইয়া থাকে। আত্মা ও প্রাণ এ দুইয়ের তত্ত্ব প্রকাশক, সাংখ্য দর্শন। সাংখ্য-দর্শনে প্রকৃতি ও পুরুষ এ উভয়কে কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি ও বেদান্তের প্রাণ সাংখ্যদর্শনের পুরুষ ও বেদান্তের জীব একই। প্রকৃতি ও প্রাণের ক্রিয়া—জগৎ, দেহ জগতের ক্ষুদ্রাংশ। আত্মা—চৈতন্ত-মাত্র, অনন্ত চৈতন্তে উহার নিত্য স্থিতি। প্রকৃতি বা প্রাণ জীবের ভোগ্য। প্রকৃতি ও প্রাণযোগেই উহার বহিঃপ্রকাশ। প্রাকৃতিক ক্রিয়া বা কর্ম্মের অনুষ্ঠানে দেহপ্রাপ্তি, ব্রহ্ম ও তাঁহার জ্ঞানে

আত্মার স্বভাবে স্থিতি। যদি ইহাই তত্ত্ব হয় তাহা হইলে দেহের সংসরণ বা গমনাগমন, আত্মার লোক লোকান্তরে বিচরণ এ মতে সায় দেওয়াতে কোন আপত্তি হয় না।

আমরা যাহা বলিলাম তাহা শুনিতে ভাল, কিন্তু আমাদের কথা যে বেদান্তসিদ্ধ এটি দেখাইতে না পারিলে আমাদের কথা কথামাত্রে পর্য্যবসন্ন হইবে। বৃহদারণ্যক শত পথ ব্রাহ্মণের অন্ত-ভাগ. আমরা সেই শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে আমাদের উক্তি সপ্রমাণ করিতে যত্ন করিব। যাঁহারা জ্ঞানাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের আর প্রত্যাবর্ত্তন হয় না, প্রত্যাবর্ত্তন হয় কর্ম্মীর। কর্ম্মীর আত্মা কি? তনু কি? যজ্ঞ।

এষ হ বৈ যজমানস্য অমুষ্মিন্ লোকে আত্মা ভবতি যদ্যজ্ঞঃ। স হ সৰ্বতনুরেব যজমানো অমুষ্মিন্ লোকে সম্ভবতি যএবং বিদ্বান্ নিষ্কৃত্যা যজতে। ১১। ১ ৮। ৬।

যজ্ঞের আহুতিই কর্ম্মীর আত্মা।

এষা হ বা অস্যাহুতি রমুষ্মিন্ লোকে আত্মা ভবতি। স যদৈবংবিদস্মা-ল্লোকাৎ প্রৈতি অথৈতমেবাহুতিরেতস্য পৃষ্ঠে সত্যাহ্বয়তে—অহং বৈ তইহা-ত্মাস্মীতি। তথাহ্বয়তি তস্মাদাহুতির্নাম। ১১। ২ ২। ৩।

যজ্ঞ কর্ম্মীর আত্মা বলাতে জীব বা পুরুষ কর্ম্মীর আত্মা নহে, কর্ম্মীর আত্মা প্রাণসমূহ। শতপথ ব্রাহ্মণ তাহাই বলিয়াছেন,

উভয়ে হৈতদগ্রে প্রজাপতিরাস—মর্ত্ত্যং চৈবামৃতং চ, তস্য প্রাণা এবামৃতা আসুঃ শরীরং মর্ত্ত্যং স এতেন কর্ম্মণৈতয়াবৃতৈকধাজরমমৃতমকুরুত। তথৈ বৈতদ্যজমান উভয়মেব ভবতি মর্ত্ত্যং চৈবামৃতং চ, তস্য প্রাণাএবামৃতা ভবন্তি শরীরং মর্ত্ত্যং স এতেন কর্ম্মণৈতয়াবৃতৈকধাজরমমৃতমাত্মানং কুরুতে। ১০। ১। ৪। ১।

ব্যক্তিস্থ প্রাণ আত্মা মনকে লইয়া লোকলোকান্তরে বিচরণ

করে, ক্রিয়াপ্রধান প্রাণ সংসরণ করে, এ বিষয়ে এই সকল প্রমাণে আমাদের মনে কোন সংশয় নাই। আত্মার লোক লোকান্তরে বিচরণে ভাষ্যকারের সম্মতি আমরা তাঁহার ভাষ্যেতেই ["উক্ত অর্থে এই শ্লোক"—ইহার টিপ্পনী দেখ] দেখিতে পাই, আমরা যাহাকে প্রাণ বলিয়াছি, তিনি তাহাকে অনুশয়ী বলিয়াছেন, এ প্রভেদ প্রভেদ কি না ইহা একটি বিচার্য্য বিষয়। দেহারম্ভক ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্ম অনুশয়। পুণ্য কর্ম্ম ও পাপ কর্ম্ম যদি অনুশয় হয়, তবে উহার আধার আত্মা নহে প্রাণ এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণই নাই, কেন না প্রাণকে বিনা আত্মাকেতো আর উপনিষৎ কর্ম্মের আধার বলেন নাই। মূল বিষয়ে ভাষ্যকারের সঙ্গে আমাদের বিরোধ নাই, এই পর্য্যন্ত জানিলেই আমাদের সন্তুষ্টি আর আমরা অধিক চাই না।

এই কর্ম্মিগণ প্রথমে পিতৃলোকে গমন করে, সেখান হইতে আকাশে * আকাশ হইতে চন্দ্রলোকে গিয়া অন্ন হয়। এই অন্ন দেবগণ ভোজন করিয়া নিঃশেষ করিলে পুনরায় আকাশত্বপ্রাপ্তি হয়। পিতৃলোকে যাঁহাদের বাস তাঁহারা স্থূল দেহধারী নহেন, তাই হরিবংশ বলিয়াছেন

অমূর্ত্তয়ঃ পিতৃগণাস্তেবৈ পুত্রাঃ প্রজাপতেঃ।

পিতৃলোকে গিয়া কর্ম্মিগণের পৈত্ররূপ অমৃতত্বসাধক, তাই

---

* বৃহদারণ্যকে আকাশের কথা না থাকিলেও ছান্দোগ্যে আছে, অতএব সেই অযুক্ত কথাটী এখানে সংগৃহীত হইয়া তত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইল। উৎক্রমণ কালে সমুদায় প্রাণ যেমন একপ্রাণ হয়, তেমনি পিতৃলোক হইতে চন্দ্রে যাইবার পূর্ব্বে ভূতগণ এক ভূতাকাশ হয়। চন্দ্রে গিয়া আবার সমুদায় ভূত স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া অন্ন হয়। তৈত্তিরীয় এবং অন্যান্য উপনিষদের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় আলোচনা করিলে এখানকার তত্ত্ব সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

তাহাদের অন্ন হইবার উপযোগী বিশ্লিষ্ট অংশ চন্দ্রলোকে অন্নত্ব প্রাপ্ত হয়। এই পিতৃলোক কিছু সামান্য নহে যোগভ্রষ্টগণের পুনরায় যোগিত্বলাভ এখানেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। গীতায় যোগভ্রষ্টগণের উত্তম লোকে গিয়া যোগিকুলে জন্ম হইবার যে কথা আছে উহা সেই এই পিতৃলোক এবং তৎপরবর্ত্তী উৎকৃষ্টলোক। আত্মা সোপাধিক না হইলে পরাত্মার সহিত অবিভক্তভাবে স্থিতি করে, তাই উহাকে মনউপাধি বা প্রাণোপাধিরূপে উপনিষদে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। মনউপাধি আত্মার লোকলোকান্তরে এবং প্রাণোপাধি আত্মার পিতৃলোকে গমন হইয়া থাকে। প্রাণোপাধি আত্মা ভূতাত্মা সুতরাং পৈত্ররূপ গ্রহণকালে উহার ভূতাংশ বিশ্লিষ্ট হইয়া আকাশে একত্ব-লাভ করে এবং সেই ভাবে চন্দ্রে গিয়া অন্নাকারে পরিণত হয়। সেখানে পুনরায় আকাশত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে আবার প্রাণসমূহের অবতরণ হয়। উপনিষদের প্রথমেই চন্দ্রলোকে গমন বর্ণিত থাকিবার কারণ এই প্রতীত হয় যে, সকল আত্মাই প্রথমে পিতৃরূপ ধারণ করিয়া শ্রদ্ধাগ্রহণ করেন, পরে উপযোগিতানুসারে গন্ধর্ব্বাদি রূপধারণপূর্ব্বক তত্তল্লোকবাসী হন। যাঁহারা মনোনিবেশপূর্ব্বক উপনিষৎ এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণগুলি পাঠ করিবেন তাঁহাদিগের নিকট এই সকল তত্ত্ব প্রতিভাত হইবে, সুতরাং তাঁহারা আপনারা তত্ত্ব সংগ্রহ করিবেন এই আশা করিয়া আমরা বক্তব্য বিষয়ের উপসংহার করিতেছি।

উপসংহারে একটি বিষয়ের উপরে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ নিতান্ত প্রয়োজন। মাণ্ডুক্য উপনিষদ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এ উভয় অবস্থার মধ্যে আত্মার উল্লেখ করেন নাই উহার উপাধিমাত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। এরূপ করিবার কারণ কি? আত্মার স্বরূপে স্থিতি

আর পরাত্মাতে স্থিতি এ দুই ভিন্ন নয় একই। কোন পদার্থ স্বরূপতঃ কি তাহা না জানিলে, সে পদার্থই জানা হয় না, এ জন্ম মাণ্ডুক্য আত্মাকে প্রজ্ঞানঘনরূপে প্রজ্ঞ বা পরাপ্রকৃতিসহ একীভূত করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ এ উভয়ের জ্ঞান যাহাতে ঘনীভূত হইয়া বিদ্যমান সেই জীবাত্মা। স্বরূপতঃ তাহার স্থিতি পরাত্মাতে, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতে তাহার স্থিতি অভিনিবেশ বশতঃ *। যদি এ কথাই সত্য হয়, তাহা হইলে তাহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি পরাত্মার উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্য উপনিষদের তত্ত্ব প্রকাশে এত প্রয়াস পাইবার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, এই এক উদ্দেশ্য যে, আত্মা ও পরাত্মা যুগপৎ আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইবেন। সাধারণতঃ লোকে দেহেন্দ্রিয়সহ আত্মাকে এক করিয়া দেখে। জাগ্রৎ অবস্থাতে যখন বহির্জগতের প্রতি এবং স্বপ্নাবস্থাতে যখন অন্তর্জগতের প্রতি নিজের অভি-নিবেশ হয়, তখন আর চিত্ত হইতে আত্মাকে কেহ পৃথক্ করিয়া লইতে পারে না, আত্মাকে চিত্তবৃত্তি বলিয়াই সকলের প্রতীতি

---

* এক সময়ে এক জন বন্ধু কেশবচন্দ্রকে মন ও আত্মার বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি অতি সহজে মন ও আত্মার তত্ত্ব তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন, আমাদের এই হস্ততল ও হস্তপৃষ্ঠ, দুই কিছু স্বতন্ত্র নয়, কিন্তু হস্ততলের অঙ্গুলিসকল সঙ্কুচিত করিয়া সকল বস্তু ধরিতে পারা যায়, হস্তপৃষ্ঠ দ্বারা সেরূপ করিতে পারা যায় না, মন ও আত্মার এইরূপ একত্বেও স্বতন্ত্রতা। এ দৃষ্টান্তটি অতি সুন্দর। আত্মার যে দিক্ পরাত্মার দিকে সে দিক্ হস্তপৃষ্ঠ, আর যে দিক্ বিষয়ের দিকে সেটি মন. মনোহস্তমেবং চক্ষুঃ. এই মন প্রতিবিষয়গ্রহণে সমর্থ। বিষয় দুই প্রকার—পার্থিব ও আত্মিক। আত্মার যখন কেবল আত্মিক [illegible] সহিত সম্বন্ধ, তখনও মনের প্রয়োজন, কেননা আত্মিক বিষয়গুলি তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। পার্থিব বিষয়গুলি আমাকারে যখন [illegible] সহিত অভিন্নভাবে অবস্থিত তখন তদ্গ্রহণে প্রয়োজন বলিয়া পর-[illegible] মন আত্মার উপাধি।

হয়। এই প্রতীতি আত্মা নহে, আত্মা সে প্রতীতি হইতে স্বতন্ত্র তাহার স্থিতি নিরন্তর পরাত্মাতে, সাধক যাহাতে এইটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন, সমুদায় উপনিষদের সেই দিকে যত্ন। আজ উপনিষদের তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া যদি আমাদের এই লাভ হইয়া থাকে যে, আত্মা ও পরাত্মা যুগপৎ উপলব্ধির বিষয় একটিকে ছাড়িয়া আর একটির উপলব্ধি কোন কালে হয় না, তাহা হইলে আমাদের প্রযত্নের ফললাভ হইল। এরূপে উপলব্ধি বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎকে বা একেবারে বিলুপ্ত করিয়া ফেলে এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই, কেন না এতদবস্থায় পরাত্মার প্রাধান্যবশতঃ তিনিই দেখান তিনিই শুনান ইত্যাদি প্রতীতি আত্মাতে উপস্থিত হয়। ইহাতে এই হয় যে জগৎ পরাত্মার অভ্যন্তরে থাকিয়া সাধকের প্রতীতির বিষয় হয়। তাঁহাকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্র ভাবে উহার প্রতীতি হয় না। পরাত্মাতে বাস করিয়া নবাভিব্যক্ত আত্মা তাঁহার বলে শরীরের দুর্জ্জাতিত্বদোষ অপনয়ন করে, ইহাই উহার মহত্ত্ব। এই মহত্ত্ব শরীরে অভিনিবেশবশতঃ অস্তুত্থির থাকে, সে আপনার অশক্তি অনুভব করিয়া শোকগ্রস্ত হয়। এ শোক তাহার চির দিন থাকিবার নহে কেন না সে অতিসত্বর আপনাতে ভগবানের মহিমা ভগবানের নিয়মন অনুভব করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হইবে। এরূপ উপলব্ধি এবং যুক্তি যখন সত্য, তখন তাদৃশ উপলব্ধিতে ও যুক্তিতে আত্মা সত্যের রাজ্যে বাস করিল, অসত্যের নহে। যখন এইরূপই হইল তখন এই সত্য উপলব্ধির নিমিত্ত উপনিষদের পন্থাবলম্বন সকল সাধকের পক্ষে শ্রেয়ের কারণ।

প্রাচীন ও নবীন ভাগ।
দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রাচীন ও নবীন যোগ।*

জগতে পর্য্যায়ক্রমে সংযোগ ও বিয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সংযোগ ও বিয়োগ, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, বিরোধ ও সম্মিলন, এ উভয়ই নিরন্তর ঘটিতেছে। জগতের প্রত্যেক ব্যাপারে প্রকৃতির নিয়মানুসারে নিয়ত দুইটি বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে যখন যোগের বিষয় বলিতে উদ্যত, তখন অগ্রে বিয়োগের বিষয় বলা সমুচিত। যোগ প্রয়োজন, এই কথা বলিবামাত্রই বুঝিতে হইবে, বিয়োগ হইয়াছে, বিচ্ছেদ হইয়াছে। বিয়োগ অবস্থিতি না করিলে যোগ আসিতে পারে না। যেখানে বিয়োগ নাই, সেখানে যোগ নাই। যোগ ও বিয়োগ, বিয়োগ ও যোগ, এই রূপে বিয়োগান্তে দুই বিভিন্ন বস্তুর একত্র সংযোগ—যোগ। যোগের পূর্ব্বে বিয়োগ কি তাহাই অগ্রে বলা যাইতেছে। বিয়োগ কাহাকে বলে? যেখানে স্বাতন্ত্র্য আছে, ভিন্নতা আছে, বিরোধ আছে, সেখানেই বিয়োগ বর্ত্তমান। পরমাত্মা হইতে জীবাত্মার বিয়োগ ঘটিলে সংসারের সঙ্গে দারা পুত্রের সঙ্গে জীব যোগে আবদ্ধ হয়। সাধন দ্বারা সমুদয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া সাধককে ক্রমে যোগে উপনীত হইতে হয়। যেখানে বিয়োগ নাই, সেখানে যোগশাস্ত্রের আরম্ভ হইতে পারে না। কেন না যদি যোগ থাকে, তাহা হইলে যোগানুশাসন করা নিষ্প্রয়োজন। বৈরাগ্যে যোগের আরম্ভ। বৈরাগ্যের ভিতরে

---

* ত্রিষষ্টিতম মাঘোৎসবোপলক্ষে প্রদত্ত দ্বিতীয় বক্তৃতা।

আমরা বিয়োগ দর্শন করিয়া থাকি। বৈরাগ্য বিযুক্ত করে, বিচ্ছিন্ন করে; সংসারে আবদ্ধ জীবকে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়। অনুরাগেই যোগ, বিরাগেই বিয়োগ। সংসারে অনুরাগ হইলে ঈশ্বর হইতে বিয়োগ এবং ঈশ্বরে অনুরাগ হইলে সংসার হইতে বিয়োগ ঘটে।

এক্ষণে দেখা যাউক, বৈরাগ্যের প্রয়োজন কি? ভগবানের সহিত—পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার বিচ্ছেদ হইয়াছিল। বিষয় ব্যাপারে আবদ্ধ সংসারে আবদ্ধ জীব সেই আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া পুনরায় ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ সংস্থাপন জন্য বিষয়বাণিজ্যের প্রতি নিস্পৃহ হইয়া পড়িল। সংসার চিত্তকে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, বৈরাগ্য উদিত হইয়া উহার অনর্থকতা দেখাইল। ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াই সংসারের সহিত যোগের কারণ। ঈশ্বর হইতে বিচ্ছেদে সংসারের সহিত যোগ ঘটিয়াছিল, আবার সংসার হইতে বিচ্ছেদে ঈশ্বরের সহিত যোগের আরম্ভ হইল। ফলতঃ যেখানে বিয়োগ সেখানেই যোগ, যেখানে বিরোধ সেখানে সম্মিলন অবশ্যম্ভাবী। বৈরাগ্য যখন সংসারের প্রতি বিরাগ উৎপাদন করে, তখন তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয় হয়। এই তত্ত্ব-জ্ঞান অভ্যুদয়ের হেতু এই যে, বিষয়ের অসারতা, অস্থায়িতা, দুঃখ-করত্ব, এই সকল দেখিয়া তৎপ্রতি বিরাগই সাধককে তত্ত্বাভ্যাসে নিয়োগ করে। এই স্বাভাবিক প্রণালী অবলম্বন করিয়াই যোগ-শাস্ত্রকারগণ এই তত্ত্বাভ্যাসকে যোগের একটি উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অন্য দশটি উপায়ের মধ্যে নিশ্বাসসংযমকরা একটি উপায় নির্দিষ্ট আছে। পরবর্ত্তী সময়ে হঠযোগিগণ অন্য সমুদায় উপায় পরিহার করিয়া এইটিকে অবলম্বন করত বিবিধ

অনিষ্টের মূল হইয়াছেন। ১০ মিনিট, কি ১৫ মিনিট, কি ২০ মিনিট, কি ততোধিক সময় নিশ্বাস অবরুদ্ধ করিয়া রাখা যোগের পক্ষে প্রকৃষ্ট প্রণালী নহে। এরূপ করিতে গিয়া বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়, এমন কি হঠাৎ মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। অস্বাভাবিক প্রণালী অবলম্বন করাতে এরূপ ঘটিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

তত্ত্বাভ্যাস প্রকৃষ্ট উপায়। এক্ষণে দেখা যাউক, তত্ত্বাভ্যাস কি ? যে বস্তু যেরূপ তাহাকে তদ্রূপে গ্রহণ তত্ত্বাভ্যাস। এই তত্ত্বাভ্যাসে অভিনিবেশ হইলে যে বস্তুর সহিত যে সম্বন্ধ প্রকৃত, সেই বস্তুর সহিত সেইরূপ সম্বন্ধ নিবদ্ধ হয়। যে বস্তুতে চিত্ত অভিনিবিষ্ট রহিয়াছে, সে বস্তু নিত্য কি অনিত্য, এ চিন্তা যখন উপস্থিত হয়, তখনই তত্ত্বাভ্যাসের আরম্ভ। যে পরিমাণে এই তত্ত্বাভ্যাস প্রগাঢ় হয়, সেই পরিমাণে বৈরাগ্যের উদয় হয়। কি প্রকারে তত্ত্বাভ্যাসের আরম্ভ হয়, মহামতি শাক্যের জীবনে আমরা দেখিতে পাই। তিনি রাজসন্তান ; রাজপ্রাসাদে বাস করিয়া কোথায় সুখে কালহরণ করিবেন, না তাঁহার মনে প্রথম হইতে বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা দেখা দিল। পিতা বুঝিলেন, সন্তানের বিষয়বিতৃষ্ণা উপস্থিত ; অতএব সংসারে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য বিবিধ ভোগের সামগ্রীতে তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিলেন ; ভোগ বিলাস দ্বারা আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত পুত্রকে নানারূপ আমোদ প্রমোদে নৃত্য গীতাদি ব্যাপারে প্রমত্ত রাখিতে যত্ন করিলেন। পিতা মনে করিলেন, এইরূপে পুত্রকে চিরদিন সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন ; কিন্তু যাঁহার মন বিষয়বিতৃষ্ণ হইয়াছে, তাঁহাকে বিষয়নিগড়ে বান্ধিয়া রাখিতে কে সমর্থ হইবে ?

এক দিন শাক্য কুসুমোদ্যানে যাইবার সময় সহসা পথি-মধ্যে দেখিলেন, এক বৃদ্ধ কম্পিতকলেবর, দন্তহীন, স্খলিতপদ, শরীর জীর্ণ শীর্ণ, অবসন্নগতি, যষ্টি ধারণ করিয়া রাজপথে চলিতেছে। তিনি সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার এরূপ দশা কেন হইল? ইহা কি ইহার কুলধর্ম্ম, না সকলকেই এই দশাপন্ন হইতে হইবে? সারথি উত্তর করিল, মনুষ্যমাত্রকেই জরানিমিত্ত এইরূপ দশা প্রাপ্ত হইতে হয়। আপনারও এই পুষ্ট দেহ, সুন্দর কান্তি, রূপ লাবণ্য তিরোহিত হইয়া এই বৃদ্ধের দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে। বুদ্ধদেবের আর কুসুমকাননে যাওয়া হইল না। যৌবনের পরিণাম কি, ইহা বুঝিতে পারিয়া আর তাঁহার ভোগে অভিলাষ হইল না। কোন ব্যক্তিতে তত্ত্বজ্ঞানের উদ্রেক হইলেও সংসার নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া আবার তাহাকে উহা ভুলাইয়া দেয়। কয়েক দিন অতীত হইলে শাক্যের আর সে ভাব রহিল না। আবার আর এক দিন সমীরণসেবনে বাহির হইয়া পথে দেখিলেন, রোগগ্রস্ত এক যুবক চলচ্ছক্তিহীন হইয়া কাঁপিতেছে, মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, শরীর অস্থিচর্ম্মাবশেষ হইয়াছে, অঙ্গে শিরাসমুদায় দেখা যাইতেছে, বিষ্মূত্রদূষিত বস্ত্রে পরিবৃত রহি-য়াছে। সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ আবার কি? সারথি বলিল, রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহার এই দশা, আপনারও এক দিন এই দশা ঘটিবে। জরা ও ব্যাধির চিন্তায় তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল; কিন্তু কিছু কাল পরে আবার বিস্মৃত হইলেন। আর এক দিবস বাহিরে গমন করিয়া দেখি-লেন, খট্টার শায়িত বস্ত্রাচ্ছাদিত দেহ লইয়া কতকগুলি লোক

গমন করিতেছে। বন্ধুবর্গ রোদন করিতেছে, কেহ বা ধূলায় অবলুণ্ঠিত হইতেছে, সঙ্গিগণ সঙ্গে সঙ্গে অধোমুখে গমন করিতেছে। শাক্য সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সারথে, এ ভয়ানক দৃশ্যের মর্ম্ম কি? এ সকল লোক এরূপে আর্ত্তনাদ করিয়া শোকসাগরে ভাসিতেছে কেন? সারথি উত্তর করিল, আপনি আর এক দিন যে ব্যক্তিকে ব্যাধিগ্রস্ত দেখিয়াছিলেন, তাহার মৃত্যু হইয়াছে। বন্ধুবর্গ তাহার মৃতশরীর শ্মশানে লইয়া যাইতেছে। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে এক দিন না এক দিন সকলকেই এই পথে গমন করিতে হইবে। মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কাহারও সাধ্য নাই। কালক্রমে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবকে কাঁদাইয়া সংসারের মায়াপাশ হইতে ছিন্ন করিয়া মানুষকে উহা অজ্ঞাত দেশে লইয়া যায়। আপনারও এই পরিণাম। শাক্য জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর চিন্তায় একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সে রাজপ্রাসাদ, সে ভোগ্য সামগ্রী, সমুদায় তাঁহার নিকট বিষতুল্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আজ যাহা মনোহর আজ যাহার জন্য মন আকুল, মৃত্যুরূপ বিষধর আসিয়া তাহাকে দংশন করিবে, তাহাকে বিনাশ করিবে, জরারাক্ষসী আসিয়া সমুদায় কান্তি হরণ করিবে, ব্যাধিতে দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িবে, এই চিন্তা করিতে করিতে তিনি অধীর হইলেন। এমন কি কোন উপায় নাই, যাহাতে জরা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারা যায়, এইরূপ চিন্তায় তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। সে চিন্তায় বিশেষ কোন ফল ফলিল কি না কে জানে, কিন্তু উহা যে নিষ্ফল হয় নাই ইহা নিশ্চয়, অন্যথা শেষ দৃশ্যে তাঁহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন কেন ঘটিবে?

অনন্তর শাক্য এক দিন পথিমধ্যে এক প্রশান্তমূর্ত্তি ভিক্ষুকে অবলোকন করিলেন। ইনি অতি ধীর এবং স্থির, দুঃখের লেশমাত্রের চিহ্নও ইহাতে নাই, কপাল প্রশান্ত, প্রকৃতি গম্ভীর। এই সৌম্য মূর্ত্তি দেখিবামাত্র বুদ্ধ সারথিকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন, ইনি ভিক্ষু, সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়া শান্তিধামের দ্বারে উপনীত; জরা মৃত্যু ব্যাধি ইহাকে ভীত করিতে পারে না; ইনি সর্ব্বদা অন্তরে আনন্দসম্ভোগ করিতেছেন, কল্যকার জন্য ইনি চিন্তিত নহেন; আকাশের বিহঙ্গের ন্যায় ইনি চিরমুক্ত, সংসার হইতে বিরত। এই অবস্থা লাভ করিবার জন্য শাক্য সংসার ছাড়িয়া রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুবেশ অবলম্বন করিলেন, উদাসীন ভাবে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বুদ্ধের এই আচরণের ভিতরে তত্ত্বাভ্যাসের প্রণালী নিবিষ্ট রহিয়াছে। তিনি জ্ঞানদৃষ্টিতে যাহার সহিত যে সম্বন্ধ তাহা বুঝিলেন, বুঝিয়া অনিত্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ ছেদন করিলেন। এই পর্য্যন্ত করিয়াই তিনি নিবৃত্ত হইলেন না; তিনি এমন কোন বস্তুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন যাহা স্থায়ী এবং নিত্য।

প্রত্যেক বস্তুর তত্ত্ব আলোচনা করিয়া উহার অনিত্যতা ক্ষণভঙ্গুরতা বিচার করা, এ বস্তু নিত্য নয়, উহার বিবিধ দোষ আছে, উহা আজ আছে কাল নাই, ইহা স্থির করিয়া যাঁহার সহিত নিত্যকালের সম্বন্ধ, অনন্তকাল যিনি বর্ত্তমান থাকিবেন, কেহ যাঁহার বিনাশ সাধন করিতে পারিবে না, যাঁহার প্রতি প্রেমে বিয়োগ নাই, বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই, তাঁহাকে অন্বেষণ, তৎপ্রতি সম্বন্ধস্থাপন,—তত্ত্বাভ্যাস। এইরূপে অনন্ত ভূমা নিত্য-বিদ্যমান পরমেশ্বরে চিত্তাভিনিবেশ করিলে সংসারের সম্বন্ধ

বিরক্ত হইয়া যায়। যাঁহাতে সকল সৃষ্ট পদার্থ স্থিতি করি-তেছে, এই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাঁহাতে চিত্ত অভিনিবিষ্ট হয়। এই অভিনিবেশে নিবৃত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। এ সময়ের চিন্তা আর কিছুই নয়, কেবল সম্বন্ধ নির্ণয়। যোগার্থী তখন বলিতে থাকেন, "তুমি ভাই, তুমি প্রিয়তম পুত্র। তোমাদের প্রতি আমার এই স্নেহ নিত্য কি অনিত্য? তোমরা আমার চিরকালের সঙ্গী কি না? যখন আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইব, তখন তোমরা আমার কি করিবে? সে সময়ে যখন আমি 'হা হতোস্মি' করিতে থাকিব, তখন তোমরা কি আমার সান্ত্বনা হইবে? আমি যখন অন্তিম সময়ে উপনীত হইব, তখন কি তোমরা আমার সহায় হইবে? পাপপিশাচের কবলে পড়িয়া যখন আমি মরিতে বসিব, তখন তোমরা কি আমার উদ্ধার করিবে? পাপের জ্বালা হরণ করিবার ক্ষমতা তোমাদের নাই। নিত্য কাল তোমরা আমার সঙ্গে সংযুক্ত থাকিতে পার না। আজ না হয় কাল তোমরা আমায় পরিত্যাগ করিবেই করিবে।" এইরূপে যোগার্থী অনিত্য সংসারের অনিত্যতা যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই উহার সহিত তাঁহার বিচ্ছেদের আরম্ভ হইল। এত দিন সংসারের সহিত যোগ ছিল, এক্ষণে সংসারের সহিত বিয়োগের সময় উপস্থিত। এ সময় যোগার্থী বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন, "হে বন্ধু বান্ধব স্বজন আত্মীয়গণ, এত দিন তোমাদের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলাম, এখন আর তোমাদের সঙ্গে বিযুক্ত না হইলে পরমা-ত্মার সহিত সংযোগের সম্ভাবনা নাই। এত দিন তাঁহার সহিত বিযুক্ত ছিলাম, তোমাদের সহিত যোগ ছিল। তোমাদের মায়ায় ভুলিয়া সংসারের বস্তুকে প্রিয় বস্তু জ্ঞান করিয়া জীবন কাটাই-

চেছিলাম। পরমেশ্বর নিত্যবন্ধু, সমুদায় সুখশান্তিবর্দ্ধনে সহায়। তোমাদের সঙ্গে বিয়োগ না হইলে তাঁহার সহিত যোগ ঘটিবে না। তোমাদের সহিত বিয়োগ বিনা দেখিতেছি তাঁহার সহিত যোগের সম্ভাবনা নাই।" ফলতঃ এক দিকে যোগ আর এক দিকে বিয়োগ, ইহাই স্বভাবের নিয়ম। যাহারা ঈশ্বরকে বিদায় করিয়া দিয়াছে, তাহারা তদ্বিপরীত সংসারের সহিত যোগ সংস্থাপন করিয়াছে। এইরূপে যে দিকে যোগ ঘটিবে, তাহার অন্য দিকে বিয়োগ ঘটিবেই ঘটিবে।

তত্ত্বাভ্যাসের পর ঈশ্বরপ্রণিধান উপস্থিত হয়। ইহাই যোগের তৃতীয় অবস্থা। প্রথমে বৈরাগ্য, দ্বিতীয় অবস্থায় তত্ত্বাভ্যাস। এই তত্ত্বাভ্যাসে জগতের ক্ষণভঙ্গুরতা, সংসারের অনিত্যতা, মায়া, মোহ যত ক্ষণ হৃদয়ে দৃঢ় মুদ্রিত না হয়, তত ক্ষণ ঈশ্বরপ্রণিধান হয় না। তত্ত্বাভ্যাসের পূর্ব্বে বিষয়বাণিজ্যব্যাপারে যোগ ছিল, অভিনিবেশ ছিল, এক্ষণে তত্ত্বাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরে অভিনিবেশ হইল। সংসারের দিকে বিয়োগ, আর এক দিকে যোগ, স্বভাবের নিয়মই এই। যখন সংসার সহ যোগ, তখন ঈশ্বর সহ বিয়োগ এবং যখন ঈশ্বর সহ যোগ, তখন সংসার সহ বিয়োগ। প্রণিধান ঈশ্বর সহ যোগের উপায়। এই প্রণিধান নানা সাধক নানা উপায়ে অর্জ্জন করিয়াছেন। যোগশাস্ত্রে বিবিধ উপায়ের কথা লিখিত আছে, সে সমুদায় এখানে আলোচনা করিয়া সময়ক্ষেপে প্রয়োজন নাই। বিষয়ে বিরক্ত হইয়া, উহার অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ঈশ্বরের দিকে মন ফিরিল, উহার চাঞ্চল্যও প্রশমিত হইল। সকলের মূল যিনি তাঁহার দিকে যখন মন ফিরিল, তখন বিষয়ব্যাপারে আর

কি উহা আবদ্ধ থাকিতে পারে? সমুদায় বন্ধনের কারণকে দুঃখের মূল বলিয়া জানিলে তৎপ্রতি বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়। এই বিতৃষ্ণাই বৈরাগ্য। অন্যান্য লোক আহারে আসক্তি চরিতার্থ করে, রসনায় লালসায় আবদ্ধ হইয়া সুখাস্বাদে লিপ্ত থাকে। কিন্তু যোগী কি করেন? যোগী শরীরধারণের নিমিত্ত আহার করেন, অন্য উদ্দেশ্য তাঁহার নাই। ইনি উদাসীন হইয়া আহার করিতেছেন, সুতরাং ইঁহার আহারে আসক্তি হয় না। সংসারে থাকিয়া যোগী যোগাভ্যাস করেন, অথচ সংসার তাঁহার কিছু করিতে পারে না। তিনি সংসার-চিন্তায় বিরত, সুতরাং তাঁহার চিত্তবিকার নাই। তখন আর লালসা আসিয়া তাঁহাকে বিক্ষিপ্ত করে না, বাসনা আর তাঁহাকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে না। স্বভাবের নিয়মে চন্দ্র যেমন উঠিতেছে, বায়ু বহিতেছে, সূর্য্য কিরণ দিতেছে, সেইরূপ তিনি স্বাভাবিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন করেন, অথচ ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি হইতে বাসনাজনিত বিমূঢ়তা হইতে সম্পূর্ণ বিরত থাকেন। তিনি শুনিয়াও শোনেন না, দেখিয়াও দেখেন না, ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়াও ভোগ করেন না। ইঁহাকে কার্য্যনিরত দেখিয়া লোকে বলে, ইনি যোগভ্রষ্ট হইয়াছেন; আমরা যেমন কার্য্য করি, ইনিও তো তেমনই কার্য্য করেন। তাহারা জানে না যে, যোগী কার্য্য করিয়াও করেন না। যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে, যত দিন দেহ আছে, ইন্দ্রিয় আছে, প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ আছে, তত দিন কার্য্য করিতে হইবে। এই কার্য্য ঈশ্বর সহ বিচ্ছিন্ন হইয়া নহে, ঈশ্বরে সমুদায় অর্পণপূর্ব্বক উহার অনুষ্ঠান। যোগশাস্ত্রে ইহাই ঈশ্বরপ্রণিধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

দিন দিন অধিকতর ঈশ্বরে আকৃষ্ট হওয়া প্রণিধানের ফল। এই প্রণিধান হইতে আর এক অবস্থাতে যোগী উপনীত হন, সে অবস্থার নাম স্বরূপে অবস্থান। ঈশ্বরপ্রণিধানে যোগী আপনার স্বভাব, আপনার প্রকৃতি বুঝিলেন। যখন ঈশ্বরের স্বরূপে চিত্ত অভিনিবিষ্ট হইল, তখন আপনি কত ক্ষুদ্র তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলেন; অনন্ত চিচ্ছক্তির মধ্যে আপনি ডুবিয়া গেলেন। এখন আর প্রকৃতি জড় প্রকৃতি নাই, যোগী সমুদায় জ্ঞানবস্তুতে পরিপূর্ণ দেখিলেন। এইরূপে ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে স্বরূপে অভিনিবেশ, স্বরূপে অভিনিবেশ হইতে প্রকৃতির সহিত সম্যক্ প্রকারে বিয়োগ উপস্থিত হইল। ঈশ্বরে অভিনিবিষ্ট না হইলে, আপনাকে ঈশ্বর হইতে অস্বতন্ত্র জ্ঞান করিতে না পারিলে ঈশ্বরে স্থিতি হয় না। এইরূপে ঈশ্বরে স্থিতি হইয়া যখন চিত্ত বাহিরের দিকে ধাবিত হয়, তখন বৃক্ষ লতাদি দেখিতে গিয়া উহার মধ্যে ঈশ্বরাবির্ভাব উপলব্ধি হয়। এইরূপে সমুদায় বস্তু ঈশ্বরাভিনিবেশের হেতু হয় এবং দিন দিন ঈশ্বর সহ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। পূর্ব্বকালে স্বরূপে অবস্থানই যোগ ছিল; কিন্তু এই স্বরূপে অবস্থান দ্বিবিধ ছিল। বিয়োগ হইতে যোগ আরম্ভ করিয়া আপনি যাহা তাহা জানিয়া আপনাতে অবস্থান, দ্বিতীয় স্বরূপের ঐক্যে ঈশ্বরে স্থিতি। যাঁহারা প্রথম পক্ষ অবলম্বন করিতেন, তাঁহারা ঈশ্বরপ্রণিধান উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াও জীবের আপনাতে আপনি স্থিতি লক্ষ্য স্থলে রাখিতেন।

পুরাকালে যোগিগণ মুক্ত পুরুষে অথবা ঈশ্বরের স্বরূপে চিত্ত স্থাপন করিতেন। এই উভয় প্রকারে চিত্তনিবেশের বিধি থাকিলেও মুক্ত পুরুষে চিত্তস্থাপনই অধিকাংশের অনুষ্ঠিত পন্থা

দেখিতে পাওয়া যায়। যাদৃশ বিষয় লোকে চিন্তা করিবে, যেরূপ শক্তি বা বস্তুর প্রকৃতি ও গুণাবলি ভাবিবে, সে সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইবে। সুতরাং এই মুক্ত পুরুষে চিত্তস্থাপনে যোগীর চরিত্র ও মন যে উন্নত হইবে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। মুক্ত পুরুষে চিত্তস্থাপন কেবল আর্যাযোগিগণের অনুষ্ঠিত পন্থা নহে, ইহার প্রচার সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ খ্রীষ্টেতে সমস্ত চিন্তা অভিনিবিষ্ট করিয়া থাকেন। নির্ব্বাণের আশায় বৌদ্ধগণ বুদ্ধের সহিত যোগস্থাপন করিতে যত্ন করেন। কিন্তু দেখিতে হইবে, এরূপে চিত্তস্থাপনে চিত্ত প্রশান্ত হয় বটে, কিন্তু ঈশ্বরে স্থিতি হয় না। ঈশ্বরকে গ্রহণ করিবার জন্য বর্ত্তমান যুগের প্রণালী প্রাচীন যোগীদের প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। জরা মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় তখন কিরূপ ছিল, এবং এখনই বা কি আকার ধারণ করিয়াছে সে বিষয়ও আলোচনা করা কর্ত্তব্য। এখনকার যোগের নূতন আকার বিজাতীয় নহে, স্বজাতীয়। স্বজাতীয় বলি এই জন্য, আমাদিগের পূর্ব্বতন যোগিগণ যে উপায় অবলম্বন করিয়া যোগ সাধন করিতেন, তাঁহারই ক্রমবিকাশে এই নূতন যোগ। প্রাচীন হইতে নূতনের উদ্ভব। প্রাচীন কালে যে কোন বস্তুতে চিত্ত অভিনিবিষ্ট করিয়া উহার চাঞ্চল্য অপনয়ন করা উদ্দেশ্য ছিল। চাঞ্চল্য অপনীত হইলে আত্মা আপনাতে আপনি স্থিতি করিতে সমর্থ হয়। আপনাকে আপনি না জানিলে ঈশ্বরকে জানিতে পারা অসম্ভব, এ জন্য প্রাচীন যোগকে নূতন যোগের উদ্ভাবক বলিতে হইবে। প্রাচীনকালে মুক্ত পুরুষে চিত্ত অভিনিবিষ্ট করিয়া আপনার স্বরূপজ্ঞান সহজে উপলব্ধি হইত। বর্ত্তমানে এ প্রণালী

সর্ব্বথা পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। ঈশ্বরপ্রণিধান বর্ত্তমানে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আমরা ঈশ্বর চিন্তা করি, ঈশ্বর মনন করি ও ঈশ্বরের স্বরূপে চিত্তাভিনিবেশ করিয়া থাকি। পূর্ব্ব কালে স্থূল ভূত, ইন্দ্রিয়গণ, প্রাণ, বুদ্ধি আদিতে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া ক্রমে সমুদায়ের অতীত আত্মাতে গিয়া যোগী উপস্থিত হইতেন; এখন আত্মা হইতে পরমাত্মাতে গিয়া একেবারে সাধক উপস্থিত হন। সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন কালে ভূতাদিতে চিত্ত অভিনিবেশ তত্ত্বাভ্যাস জন্য অবলম্বিত হইত। অন্যথা 'নেতি নেতি' করিয়া পরিশেষে আত্মাতে গিয়া উপস্থিত হইয়া যোগের পর্য্যবসান কখন হইতে পারিত না। অনন্ত মহান্ ভূমা পদার্থে এই আত্মাকে নিমগ্ন করিয়া প্রাচীন যোগিগণ কৃতার্থ হইতেন, বর্ত্তমানে আমরা এই অনন্ত মহান্ ভূমা পদার্থ হইতে প্রথমেই যোগারম্ভ করিতে অধিকারী হইয়াছি।

এই নবীন যোগ এক ঈশ্বরে অভিনিবেশ হইতে উপস্থিত হইয়াছে। এ যোগ আমাদের গুণে সিদ্ধ হয় নাই, ইহা পূর্ব্বতন যোগের অবশ্যম্ভাবী ফল। ৬৩ বৎসর পূর্ব্বে যিনি এ দেশে ব্রহ্মজ্ঞান জনসাধারণের গোচর করিলেন, বলিতে হইবে তাঁহা হইতে এ যোগের সূত্রপাত হইয়াছে। তিনি স্পষ্ট যোগশব্দ মুখে উচ্চারণ করেন নাই, কিন্তু অন্য সমুদায় উপায় দূরে পরিহার করিয়া এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে ব্রাহ্মগণের আশ্রয়ণীয় করাতে এ যোগের মূল তাঁহাকেই বলিতে হইবে। পূর্ব্বতন ঋষিগণ ব্রহ্মেতে স্থিতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং এ যোগ প্রাচীন যোগের ভূমি পরিহার করিয়া নূতন ভূমির উপরে সংস্থাপিত এ কথা আমরা বলিতে পারি না। ব্রাহ্মধর্ম্মের গুণে এখন বালক

বা বৃদ্ধ এই যোগের ফলভোগে সমর্থ। অনন্ত মহান্ ভূমা পরব্রহ্মে চিত্তনিবেশ এখন প্রথম হইতে সকলে অভ্যাস করেন। এখন আর কাহারও পরব্রহ্মে চিত্তনিবেশ ভিন্ন উপায়ান্তর গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় না। দুঃখের বিষয় এই যে, এই মহত্তম যোগপ্রণালী আমাদিগের হস্তগত থাকিতেও ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন লোক ভ্রান্তিবশতঃ পশ্চাদ্গমন করিতেছেন, প্রাচীন অস্বাভাবিক যোগের পথ অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রাজা রামমোহন ব্রহ্মজ্ঞান পুনরুদ্দীপন করিয়া অনন্ত মহান্ ভূমা পরমেশ্বরকে প্রাণের প্রাণ জীবনের জীবনরূপে আমাদিগের নিকটে উপস্থিত করিলেন। যিনি আমাদিগের প্রাণের প্রাণ হইয়া নিশ্বাসের নিশ্বাস হইয়া অন্তরে বাহিরে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহাকে লাভকরিবার নিমিত্ত হঠযোগের আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে, নিশ্বাস প্রশ্বাস অবরোধ করিতে হইবে, বিবিধ অস্বাভাবিক প্রণালীর আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে, এ কি ভয়ানক কথা!! পূর্ব্বকালের যোগ যেখানে শেষ হইয়াছে, সেই শেষ ভূমি—চরমভূমি হইতে নবীন যোগের আরম্ভ। দুঃখের বিষয় এই যে, ইহা কেহ কেহ বুঝিতে না পারিয়া পরিত্যক্ত ভূমি মধ্যে যাহা নিকৃষ্ট তাহারই আশ্রয়গ্রহণ করিতেছেন। সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মের আশ্রয়গ্রহণ না করিয়া অন্য প্রণালীতে যোগসাধনকরিবার নিমিত্ত প্রয়াস যে বৃথা সময়ক্ষেপ এবং বিঘ্নসঙ্কুল, ইহা ভাগবতাদি শাস্ত্রে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। অধিক কি, যোগমধ্যে অস্বাভাবিক প্রণালী আছে বলিয়া পূর্ব্বতন ভক্তগণ যোগপথপরিহার করিয়া ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়াছেন। এই ভক্তির পথে মুক্ত পুরুষগণের চিন্তন মনন প্রধান। বর্ত্তমানে নূতন যোগে ভক্তিযোগও ব্রহ্মযোগে সুসিদ্ধ হইয়াছে।

এক ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে কি প্রকারে সমুদায় সিদ্ধি হয়, আমাদের সকলেরই ইহা ভাল করিয়া বুঝা উচিত। নবীন যোগ আমরা বুদ্ধি ও-বিচারপূর্ব্বক অধিকার করি নাই, ইহা স্বাভাবিক গতিতে আমাদিগেতে উপস্থিত হইয়াছে। যে দিন হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞান স্থান পাইল, সেই দিন হইতে মুক্তপুরুষচিন্তা দূরে পলায়ন করিল। কি জানি বা অবতারগণ ব্রহ্মের স্থানাধিকার করেন, এই ভয়ে ব্রহ্মবাদিগণ সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাদিগের সংস্রবপরিহার করিলেন। ব্রহ্মচিন্তা ব্রহ্মমনন ব্রহ্মে চিত্তাভিনিবেশ, ব্রাহ্মগণের ইহাই সাধনভজনের বিষয় হইল। অনন্ত মহান্ ভূমা ঈশ্বর যখন ব্রহ্মবাদীর হৃদয় অধিকার করিলেন, তখন তিনি আপনি যে কিছুই নন, ইহা দেখিতে পাইলেন। যখন আপনি কিছুই নই, এই দৃষ্টি স্থিরতালাভ করিল, তখন তাঁহার ভিতরে গৌতম ও ঈশা জন্মগ্রহণ করিলেন। প্রথমতঃ তিনি এই সন্তানদ্বয়কে চিনিতে পারেন নাই, কেন না তখনও তাঁহার আমিত্বের লেশ ছিল। ঈশ্বরের আবির্ভাবে 'আমি' ক্ষুদ্র হইয়া গেল বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র হউক, তবু সে 'আমি' রহিল। যখন ব্রহ্মবাদী, এ আমি কে, এই বলিয়া স্বরূপনির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন দেখিলেন, এ আমির সমুদায় প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হইয়াছে, ইহার আর স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই, তখন তিনি জানিলেন, এ আমি আর কেহ নহে, গৌতম ও ঈশা। তিনি দেখিলেন, ঈশ্বর একা তাঁহাতে আবির্ভূত নহেন, তাঁহাতে তাঁহার সন্তানগণও অবস্থিত। এই সন্তানগণ সাধকের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া যান, সাধক সন্তানগণসম্বন্ধে অদ্বৈতভাবাপন্ন হন। ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি হইলে দেবগণ আসিয়া সে হৃদয়ে বাস করেন,

ভাগবতও এ কথা বলিয়াছেন। কেন না উহাতে উল্লিখিত আছে,—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

"যাহার ভগবানেতে অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, তাহাতে দেবগণ সমুদায় গুণ লইয়া আসিয়া বাস করেন, হরিতে অভক্ত ব্যক্তিতে মহজ্জনগণের গুণ কোথা হইতে আসিবে, সে যে মনোরথ-যোগে বাহিরে অসদ্বিষয়ে ধাবিত।" ভগবান্ ও ভক্ত উভয়ে মিলিত হইয়া নবযোগীর আমিত্বের মূলচ্ছেদন করিলেন। এক আমির ভিতরে দুই আমি। এক আমি স্বয়ং ভগবান্, আর এক আমি জীব। ভগবান্ প্রকাশ পাইলেন, জীব কৃতার্থ হইল, কিন্তু এই জীবে 'আমি ভক্ত' 'আমি দাস' এ অভিমান রহিল। বৈষ্ণবগণ এই অভিমানের প্রশংসা করেন, তাঁহারা বলেন, এই অভিমানে জীবের বন্ধন হয় না। নবীন যোগ এ আমিত্বও অবশিষ্ট রাখিলেন না। এই আমিত্বে ঈশ্বরের সন্তানগণকে দেখিয়া 'আমি ভক্ত' 'আমি দাস' এ অভিমানও নবীন যোগী দূরে পরিহার করিলেন।

ভক্তিতে চৈতন্য যখন প্রমত্ত হইতেন, তখন বৃক্ষ লতা প্রভৃতি সমুদায়ে তাঁহার ইষ্টদেবতাকে দর্শন করিতেন। কখন কখন বা ভগবদ্ভক্তগণের ভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে এক হইয়া যাইতেন। বৈষ্ণবগণ এই শেষ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ;—

"আবিষ্টু'র মনোবৃত্তো ব্রজন্তি তৎস্বরূপতাম্।"

ভক্তগণের নিত্য ভাব মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া তৎস্বরূপতালাভ হয়।" ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তিনি আমাদিগের প্রাণ, আমাদিগের শক্তি ও বল, তাঁহার সঙ্গে যোগ নিত্যসিদ্ধ। তবে যে বিয়োগানুভব হয়, তাহা অজ্ঞানতাজন্য অবিদ্যানিমিত্ত। বিষয়বাসনায় চিত্ত মোহে আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া নিত্যযোগসত্ত্বেও যোগানুভব হয় না। ঋষি-মহর্ষি মহাজনগণ ভক্তগণসম্বন্ধে এরূপ কথন বলা যায় না। তাঁহাদের সঙ্গে একত্বানুভব যদি সত্যমূলক না হয়, বিজ্ঞানসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে কেবল ভাবুকতার অনুরোধে আমরা এরূপ একত্বানুভব করিতে চাই না, কেন না যাহা সত্য নহে, বিজ্ঞানসিদ্ধ নহে, তাহা হইতে বিবিধ কুসংস্কার ও অযুক্ত ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইবে। অতএব আমাদিগকে দেখিতে হইতেছে, বিজ্ঞানসিদ্ধ প্রণালীতে ইঁহাদিগের সহিত আমাদিগের একতা আছে কি না?

আমরা এ কথা স্বীকার করিতে পারি না যে, মানুষ যখন প্রথম জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তখন সে সমুদায় শক্তি সমুদায় ভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আজও যে সকল বর্ব্বর জাতি আছে, তাহাদিগের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের আজও অনেক ভাব ও শক্তি প্রস্ফুটিত হয় নাই। মনে করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, যখন জ্ঞানাদির উদ্ভেদ হয় নাই, সে সময়ে সকল মানুষই এই বর্ব্বরগণের ন্যায়, বা তদপেক্ষা হীন ছিল। জনসমাজের মধ্যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ক্রিয়াতে ক্রমে জ্ঞানাদি প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এক এক ব্যক্তিতে ঈশ্বরের বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া পরিশেষে সেই সেই ব্যক্তি হইতে অনেক লোকের মধ্যে ঐ জ্ঞানাদি প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই সকল বিশেষ

ক্তি সেই সেই জ্ঞান ও ভাবের সহিত নিত্য সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের রক্তমাংসের দেহ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে দেহের আর পুনরুত্থান নাই, কিন্তু তাঁহাদের ভাবময়ী আত্মার শক্তি বিনষ্ট হয় নাই, উহা মানবসমাজের মধ্যে জীবন্ত শক্তি হইয়া প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। আজ যে শিশু জন্মগ্রহণ করিল, ঐ সকল শক্তি তাহার আত্মার উপাদান হইল। এই সকল উপাদানকে সাধারণতঃ উপযোগিতা নাম দেওয়া হইয়া থাকে। এই সকল উপাদান উপযুক্ত অবস্থামধ্যে স্থাপিত হইলেই প্রস্ফুটাকার ধারণ করে। এই উপযুক্ত অবস্থা কি ? উপযুক্ত অবস্থা ঈশ্বরে চিত্তাভিনিবেশ। যখন জীব ঈশ্বরে অভিনিবিষ্ট হয়, তখন সে কালদেশের অতীত ভূমিতে গিয়া উপস্থিত হয়। জীব জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রেম দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম, শক্তির দ্বারা ঈশ্বরের শক্তি, পুণ্য দ্বারা ঈশ্বরের পুণ্য ধারণ করে। যদি তাহাতে এই সকল মূলেই না থাকিত তাহা হইলে ঈশ্বরের সহিত তাহার যোগের কোন সম্ভাবনা ছিল না। সাধু-মহাজন-ঋষি-মহর্ষিগণের যে সমুদায় ভাব আত্মাতে উপযোগিতারূপে বিদ্যমান, সেই সকল ঈশ্বরে স্থিত সাধু-মহাজন-ঋষি-মহর্ষিগণের সঙ্গে একতা-সাধনের পক্ষে সহায় হয়, কেন না সে সমুদায় না থাকিলে আমাদের পক্ষে তাঁহাদিগের পরিচয়লাভ কোন প্রকারে সম্ভবপর হইত না। অধ্যাত্মযোগে ইঁহাদের সহিত আমাদের যত পরিচয় হয়, তত বাহিরে ইতিহাসে তাঁহাদিগের যে জীবন বর্ণিত আছে, তাঁহাদিগের উক্ত যে সমুদায় সত্য লিপিবদ্ধ আছে, তাহা আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় এবং সে সকল আমাদিগের জীবনের সহিত একীভূত হইয়া যায়। এই প্রণালীতে পূর্ব্ববর্ত্তী ভক্ত-সাধু-

মহাজন-ও-ঋষিগণের পরিচয়লাভ এমনই সত্য যে, এ বিষয়ে আমি দৃঢ়তার সহিত সাক্ষ্যদান করিতে পারি। মহর্ষি ঈশাকে আজ আমি অতি পবিত্রচরিত্র পরমযোগী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহার জীবনী ও তাঁহার উক্তির আধার বাইবেল এখন আমার নিকটে অতীব শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এক সময়ে মহর্ষি ঈশাকে অতি কদর্য্যচরিত্র, বাইবেল সর্ব্বথা ভ্রমাত্মক বলিয়া এ উভয়ের সংস্পর্শে আমার অরুচি ছিল। কিন্তু যখন আত্মার অবস্থা ভগবানের কৃপায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তখন সেই ঈশা, সেই ঈশার জীবনী, সেই ঈশার উক্ত সত্য, নূতন ভাবে হৃদয়কে স্পর্শ করিল। তখন বুঝিতে পারা গেল, ঈশ্বর যে ঈশাশক্তিকে জনসমাজের আত্মার উপাদান করিয়াছেন, তাহার কোন দিন বিনাশ নাই।

ঈশ্বরেতে আমরা ও সমুদায় বিশ্ব নিত্য বিদ্যমান। যত সমুদায় অমর আত্মা তাঁহাতেই নিত্যকাল স্থিতি করিতেছেন। তিনি আপনার ভিতর হইতে যে শক্তি উদ্ভূত করিয়াছেন, তাহার কোন দিন বিনাশ নাই। ঈশ্বরের অবিনাশিত্ব হইতে এই সমুদায়ের অবিনাশিত্ব উপস্থিত হইয়াছে। যখন এ সমুদায় ঈশ্বরের ভাবসম্ভূত, তখন ঈশ্বরের ভাবও নিত্য, ইহারাও নিত্য। যেখানে ঈশ্বর, সেখানেই এই সকল উদ্ভূত শক্তি বিদ্যমান। কৃষ্ণশক্তি, খ্রীষ্টশক্তি, শাক্যশক্তি, চৈতন্যশক্তি, এই এক অনন্ত শক্তিরই বিবিধ প্রকাশ। যাঁহারা ঈশ্বরেতে প্রবিষ্ট হইবেন, তাঁহাদের সঙ্গে এই সকল উদ্ভূত শক্তির জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক, একত্র সমুপস্থিত হইবে। এদেশে শাস্ত্রকারগণ একটি অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিয়াছেন। শিশু জন্মমাত্র

ত্রিবিধ ঋণে আবদ্ধ হয় ;—পিতৃঋণ, ঋষিঋণ ও দেবঋণ। যে কুলে শিশু জন্মগ্রহণ করিল, সে কুলের নিকটে সে ঋণী, যে সকল ঋষিগণের প্রণীত অধ্যাত্মতত্ত্ব সে অভ্যাস করিল, আত্মস্থ করিল, তাঁহাদিগের নিকট সে ঋণী হইল। এইরূপ যে দেবতা তাহার শরীর মন প্রাণ ও আত্মা অর্পণ করিলেন ও নিয়ত কাল তাহার প্রতিপালনে নিযুক্ত, সে দেবতার নিকটে সে ঋণী। মনুষ্যমাত্রের যদি এই ঋণবোধ প্রবল থাকে, তাহা হইলে সে কখন অকৃতজ্ঞ হইতে পারে না। আমাদিগের এই দেহের জন্য আত্মার বিবিধ শক্তির জন্য কত জনের নিকটে আমরা ঋণী, ইহা যদি আমরা বুঝিতাম, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সঙ্গে আমাদিগের অচ্ছেদ্য যোগ আমরা কখন বিস্মৃত হইতাম না। এ দেশের পূর্ব্বতন ঋষিগণের যাঁহারা শিষ্য ছিলেন, তাঁহারা আচার্য্যের সহিত এমনই আপনাদের অভিন্নতানুভব করিতেন যে, তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থ তাঁহারা স্বনামে প্রচার না করিয়া আচার্য্য ঋষিগণের নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। যেখান হইতে ভাব প্রথম সমাগত হয়, সেই ভাবে উদ্দীপ্ত ব্যক্তিগণের তন্নামে পরিচিত হওয়া এই জন্য একপ্রকার চিরন্তন প্রথা হইয়া পড়িয়াছে।

এখন হয়তো সকলে বুঝিলেন, অনন্ত মহান্ ভূমা পরমেশ্বরকে দেখিয়া, যে আমি ক্ষুদ্র হইয়া তাঁহার সঙ্গে সংযুক্ত রহিল, সে আমি মুক্তপুরুষগণে মিশিয়া কি প্রকারে সর্ব্বথা আমিত্বশূন্য হইল। ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রতিপালন করিতে গিয়া যে ত্যাগস্বীকার করিতে হইল, সে ত্যাগস্বীকার আমি করিলাম না, আমার ভিতর যে ঈশা বাস করিতেছেন তাঁহারই গুণে এ ত্যাগস্বীকার হইল। আমি কিছুই নই, আমার ভিতর হইতে যাহা কিছু ভাল হইতেছে,

তাহা এক দিকে ঈশ্বরের প্রভাবে, আর এক দিকে ঈশ্বরের সন্তান-গণের গুণে। এরূপে আত্মাভিমানত্যাগ মিথ্যা নহে, কল্পনা নহে, কেন না আমার ভিতরে যে সমুদায় অধ্যাত্মশক্তি আছে, তাহা এক দিকে ঈশ্বর হইতে সমুৎপন্ন আর এক দিকে সাধু মহাজনগণ হইতে আমাতে সংক্রামিত। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ 'বংশ-পরম্পরাসম্ভূত' বলিয়া যে একটি বৈজ্ঞানিক মত স্থাপন করিতে যত্ন করিতেছেন, তাহা এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে সত্য। অজ্ঞানতার দৃষ্টিতে দেখিলে, সকলই আমার নিজ শক্তিতে হইতেছে এই প্রকার অভিমান উপস্থিত হয়, কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানদৃষ্টিতে ইহার বিপরীত আমরা অনায়াসে উপলব্ধি করি। যাহা বিজ্ঞান-সিদ্ধ, যাহা দর্শনসঙ্গত, তাহার প্রতি আমরা কখন উপেক্ষা করিতে পারি না। আমাদের সমুদায় সাধন ভজন, যোগ সমাধি, এই সত্য অবলম্বন করিয়া অনুষ্ঠিত হওয়া সমুচিত।

সকলেই জানেন, নববিধানবাদিগণের মধ্যে সাধুসমাগম বলিয়া এক সময়ে বিশেষ অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠান সত্যমূলক না কল্পনামূলক? খ্রীষ্টানগণ খ্রীষ্টের প্রতি অনুরাগবশতঃ আকাশে ক্রুশ দেখিয়াছেন, কখন বা ক্রুশ হস্তে লইয়া স্বয়ং খ্রীষ্ট দণ্ডায়মান অবলোকন করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণকে সপার্ষদ দর্শন করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদিগের গ্রন্থে লিখিত আছে। তবে এই দর্শনে আনন্দজন্য মূর্চ্ছা এবং মূর্চ্ছামধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পার্ষদগণের সহিত সম্ভাষণ বর্ণিত থাকাতে এখানে কল্পনার ক্রিয়া স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। খ্রীষ্টানগণের দর্শনমধ্যেও যে সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশ্রিত রহিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা যে সাধুসমাগমের কথা বলি, তাহার মধ্যে কোন কল্পনার

ব্যাপার নাই। আমরা এ কথা বলি না যে, তাঁহারা সর্ব্বত্র আছেন, বা আপনারা আসিয়া আমাদিগকে দেখা দেন। আমরা ঈশ্বরেতে যত মগ্ন হই, তত আমাদিগের চরিত্র তাঁহাদিগের অনুরূপ হয়, যত চরিত্র অনুরূপ হয়, তত তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের একতা উপস্থিত হয়। এই চরিত্রের একতাভিন্ন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বুঝিবার আমাদের সামর্থ্য নাই। আমরা ঈশ্বরসম্বন্ধে অদ্বৈতবাদী নহি, কিন্তু সাধুমহাজনগণসম্বন্ধে অদ্বৈতবাদী।

বৈরাগ্যে যোগের আরম্ভ এবং প্রাচীন কালে বৈরাগ্যেই যোগের শেষ। বৈরাগ্য সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ কাটিয়া দিল, কিন্তু আবার পুনরায় তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটাইয়া দিল না। সংসারের সহিত বিয়োগ ঈশ্বরের সহিত যোগ, এ কথাতেই সে কালে যোগ শেষ হইল। বিরাগের বিপরীত অনুরাগ, সে অনুরাগ আর যোগীর জীবনে আসিল না। যোগী বলিলেন, দূর হও অনিত্য সংসার, আমি আর তোমায় চাহি না, এই বলিয়া তিনি সংসারকে বিদায় করিয়া দিলেন, সংসারের প্রতি তাঁহার ঘৃণা জন্মিল। সংসারের অসারতাচিন্তা করিতে গিয়া উহার কুৎসিত দিক্ ক্রমান্বয়ে তিনি দেখিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে সুন্দর সুদৃশ্য মনোহর সামগ্রী সকল তাঁহার নিকটে অতি কদর্য্য বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। তিনি দেহকে মল-মূত্র-ক্লেদাদির আধার বলিয়া তাহার নির্য্যাতনে প্রবৃত্ত হইলেন। স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গ মায়ার কুহক বলিয়া তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন। এখানে অনুরাগ নাই কেবলই ঘৃণা। যোগ যদি এখানে শেষ হয়, তবে তাহা কখন পূর্ণ যোগ নহে। যোগে বিয়োগ হইল, সমুদায় সংসার উড়িয়া গেল, এক ব্রহ্মমাত্র অবশেষ রহিলেন।

ব্রহ্মব্যতীত যাহা কিছু সকলই মিথ্যা, কুহক, ছায়া ভোজবাজী, জাগ্রৎস্বপ্ন, এই বলিয়া যোগী সকলই অলীক করিলেন। আরম্ভে যোগী সংসার হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর তিনি সংসারে ফিরিলেন না। নববিধান আসিয়া বলিলেন, এ যোগ পূর্ণ যোগ নহে, ব্রহ্মকে লইয়া মধ্য পথে থাকিলে চলিবে না; নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে প্রাচীন যোগী বিশ্রামলাভ করিলেন, এখন সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে লইয়া সবিশেষ ভূমিতে অবতরণ করিতে হইবে। নবযোগী ব্রহ্মকে লইয়া সংসারে ফিরিলেন, সমুদায় সংসার ব্রহ্মময় হইল। স্ত্রী পুত্র পরিবার, সমুদায় পার্থিব সামগ্রী মৃতবৎ উড়িয়া গিয়াছিল, আবার ব্রহ্মের সমাগমে নবীন সৌন্দর্য্যে যোগীর নিকট উপস্থিত হইল। এখন আর ইহারা যোগীর পক্ষে বন্ধন রহিল না। যোগী সকলের ভিতর দিয়া এক সত্য শিব সুন্দর ব্রহ্মেরই সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে বস্তুসমুদায়কে ঈশ্বরহীন দেখিয়া যোগী তৎপ্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন, এখন আর তিনি ঈশ্বরকে না দেখিয়া কোন বস্তু দেখিতে পান না, যাহা দেখিতে যান তাহাতেই আগে ঈশ্বরকে দেখিতে পান। তাঁহার যোগ পূর্ণতা লাভ করিল, অথচ পৃথিবীর লোক তাহা বুঝিল না। তাহারা মনে করিল, যোগী যোগভ্রষ্ট হইয়া আবার সংসারে লিপ্ত হইয়াছেন।

এই নূতন যোগ প্রাচীন কোন শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। জনকাদি সংসারে থাকিয়া যোগ করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ কোথাও উল্লেখ নাই যে, তাঁহারা স্ত্রীপুত্রপরিবারবর্গকে যোগক্ষেত্রে আনিয়াছেন, তাঁহাদের ভিতরে ব্রহ্মের বিচিত্র লীলা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। শুষ্ক যোগিগণের মধ্যে এ নবযোগ না থাকিলেও

ভক্তগণের মধ্যে থাকিতে পারে, কিন্তু সেখানেও এ নবযোগ দেখিতে পাই না। শ্রীচৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। তিনি কি আর তাঁহাকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন ? না, দেন নাই,কিন্তু আর তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে আপনার সঙ্গিনী করিলেন না, চির ঔদাসীন্যব্রতে সময়ক্ষেপ করিলেন। প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ কর, কোথাও এ যোগ পাইবে না। নারীগণমধ্যে বিশুদ্ধ নয়নে মাতৃমূর্ত্তি দেখা সে কালের যোগিগণের মধ্যে ছিল না। তাঁহারা নারীগণমধ্যে ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রমূর্ত্তি দেখিতেন। তাঁহারা অকুণ্ঠিত ভাবে বলিয়াছেন,

"স্ত্রিয়ো হি নরকাগ্নীনামিন্ধনং চারুদর্শনম্।

"স্ত্রীগণ দেখিতে মনোহর নরকাগ্নির ইন্ধন।" শুককে বিমুগ্ধ করিয়া সংসারে রাখিবার জন্য ব্যাস রম্ভাকে আনয়ন করিলেন। শুক যে প্রকার বীভৎস কথায় রম্ভাকে লজ্জিত করিয়া বিদায় করিয়া দিলেন, তাহা পাঠ করিলে কে আর বলিবে, সে কালে এ নবীন যোগ ছিল। ফলতঃ অনেক শাস্ত্র পড়িয়াও এ নবীন যোগের চিহ্ন কোথাও আমি দেখিতে পাই নাই। যদি কেহ অন্যত্র ইহার অস্তিত্ব দেখাইতে পারেন, তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ হইব, কিন্তু ইহা যে সর্ব্বথা নূতন, আর কেহ আমাদিগকে ইহা শিক্ষা দেন নাই, এ কথা অকুণ্ঠিত মনে সকলকে বলিব।

সকলে জিজ্ঞাসা করিবেন, এ নূতন যোগ কে প্রবর্ত্তিত করিলেন ? তিনি করিলেন, যিনি সার্ব্বভৌমিক (নির্ব্বিশেষ) ও সবিশেষকে এক ভূমিতে আনয়ন করিয়াছেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র এই নবীন যোগের জন্য চিরস্মরণীয় থাকিবেন। আমি এ কথা প্রকাশ্যে সকলের নিকটে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে,

এ যোগ তাঁহারই নিকটে শিক্ষা করিয়াছি, আর কাহারও নিকটে শিখি নাই। তিনি বিয়োগ ও যোগ, বিরাগ ও অনুরাগ, অসম্মিলন ও মিলন, এ সমুদায় বিরুদ্ধ সামগ্রীকে একীভূত করিয়াছেন, সামঞ্জস্যের ভূমিতে আনিয়াছেন, এ কীর্ত্তি তাঁহার কেহ বিলুপ্ত করিতে পারিবে না। যাহা তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি, তাহা অস্বীকার করা ঘোর অপরাধ বলিয়া মনে করি। তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধবিষয়ে অনেকের মনে অনেক প্রকার অযুক্ত সংস্কার আছে, কিন্তু যাঁহারা না জানিয়া মিথ্যা কোন সম্বন্ধ আরোপ করিবেন, তাঁহারা তজ্জন্য কখন নিরপরাধী হইবেন না। তিনি আমাদিগের আচার্য্য, নিত্য কালের জন্য আচার্য্য, এই সম্বন্ধ স্থিরতর রাখিবার জন্য ব্রহ্মমন্দিরে বেদী সংরক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার সহিত সহসাধকত্ব, একত্র ঈশ্বরপূজানিরতত্ব দেখাইবার জন্য এই বেদী। ইহা চিরদিন অবতারবাদের প্রতিবাদ করিবে। সে কথা যাউক, কেশচন্দ্র কোন গ্রন্থ পাঠ করিয়া এ নবীন যোগ প্রবর্ত্তিত করেন নাই। প্রাচীন শাস্ত্র, বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানবিৎ ও দার্শনিকগণের আবিষ্ক্রিয়া, এ মতের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়াছি, কাহারও সাধ্য নাই যে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত নব যোগ নব ধর্ম্মের অণুমাত্র খণ্ডন করে। আমাদের আচার্য্যের বিশেষ মত এই যে, যদি কোন একটি মত বিজ্ঞানের নব আবিষ্ক্রিয়ার বিরুদ্ধ হয়, তখনই সে মতকে জলাঞ্জলি দিতে হইবে। আমি প্রথম হইতে সংশয়বাদিগণের গ্রন্থ বহুল পরিমাণে পড়িয়াছি, এখনও অধ্যয়ন পরিত্যাগ করি নাই। বন্ধুগণ অনেক সময়ে অনুযোগ করেন, কিন্তু আমি কেবল নব ধর্ম্মের গৌরববর্দ্ধনের জন্যই অধ্যয়ন করিয়া থাকি। লুইস, কমট্

স্পন্সার প্রভৃতি কেহই এ নব ধর্ম্মের অণুমাত্র বিপর্য্যস্ত করিতে পারেন নাই, এবং এ বিষয়ে আমার স্থির বিশ্বাস আছে যে, কেহই এ ধর্ম্মের বিপ্লব সাধন করিতে পারিবেন না। ধর্ম্মের তুলনায় দর্শনবিজ্ঞানপাঠ অতি সামান্য ইহা আমি জানি, বিদ্যাবত্তার অভিমান যে অতি তুচ্ছ ও হেয়, ইহা আমার জানা আছে; কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী মত খণ্ডন করিয়া ধর্ম্মের মূল দৃঢ় করা কর্ত্তব্য, ইহা আমি বিশ্বাস করিয়া থাকি। যাহা কিছু নবধর্ম্মের বিরোধী তাহা খণ্ডন করিবই করিব, সত্যকে সংশয়জাল হইতে মুক্ত করিবই করিব, ইহাই বিধানবিশ্বাসীর আন্তরিক প্রতিজ্ঞা। আমাদিগের ধর্ম্ম যখন দর্শন ও বিজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত, তখন এ কার্য্যকে কাহারও সম্বন্ধে কখন লঘু মনে করিতে পারি না। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যে, সকলের মনে এই নবধর্ম্ম দর্শন ও বিজ্ঞানের ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া চিরকাল তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অক্ষুণ্ণ থাকে।

৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট কলিকাতা, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"
কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও নববিধান প্রচারকার্য্যালয়
হইতে প্রকাশিত।

বৈদান্তিক পরলোকতত্ত্ব।

বৈদান্তিক পরলোকতত্ত্ব *।

হে প্রজ্ঞানঘন পরমদেব, তুমি আমার হৃদয়ের সকল প্রকার সংস্কারদোষ হরণ-কর। যদি পূর্ব্বসংস্কারের দ্বারা আমার হৃদয় দূষিত থাকে, সত্য কখন আমার হৃদয়ে অবতরণ-করিবে না। বেদান্তমধ্যে পরলোকসম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব আছে, সে সকল যদি সংস্কারকলুষিত চিত্তে বুঝিতে যাই, উহারা সেই সংস্কার দ্বারা প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে, উহারা যাহা নয় সেইরূপে মনে প্রতিভাত হইবে। অতএব, দেব, বিষয়টির অবতারণার পূর্ব্বে তোমার চরণাশ্রয়গ্রহণ করিতেছি, তুমি হৃদয়ের সমুদায় আবরণ উন্মোচন কর এবং তন্নিহিত সত্য সকল যথাযথ ব্যক্ত কর। তোমার কৃপায় অখণ্ডিত সত্য ব্যক্ত হইবে, এই আশা করিয়া তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

ধর্ম্মবিজ্ঞানের তিনটি প্রধান অঙ্গ ;—উপাস্য ; উপাস্যের পরিচয়লাভের উপায় বা সাধন ; প্রাপ্য বিষয় বা গতি। বেদান্তের ধর্ম্ম ধর্ম্মবিজ্ঞানের অন্তর্গত, সুতরাং উহাতে এই তিনটি অঙ্গই আছে। "আর্যধর্ম্ম ও তদ্ব্যাখ্যাতৃগণ" এই বক্তৃতায় বেদান্তসিদ্ধ উপাস্য দেবের তত্ত্ব এবং "বেদান্তের অপবাদখণ্ডন" এই বক্তৃতায় সংক্ষেপে বেদান্তসিদ্ধ সাধন উল্লিখিত হইয়াছে। অদ্য পরলোকতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইলেই বেদান্তধর্ম্মের বিজ্ঞানসিদ্ধ তৃতীয় অঙ্গের পূর্ণতা হয়। কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া পরলোক-তত্ত্ব আলোচিত হইবে, প্রথমে তৎসম্বন্ধে দুচারিটী কথা বলা

* সপ্তসপ্ততিতম মাঘোৎসবোপলক্ষে উপাধ্যায়-প্রদত্ত-বক্তৃতামূলক।

প্রয়োজন। এই সকল তত্ত্বের আলোচনায় আমি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট যে আলোকলাভ করিয়াছি তাহার যদি কোন উল্লেখ না করি, তাহা হইলে অকৃতজ্ঞতাদোষে আমায় দোষী হইতে হয়। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ যে ভাবে প্রাকৃতিক তত্ত্বের অনুসরণ করেন, সেই ভাবে আমি মানবপ্রকৃতি হইতে যে সকল তত্ত্ব উদ্ভূত হইয়াছে সে সকলের অনুসরণ করিয়া থাকি। কোথা হইতেও কোন তত্ত্ব উদ্ধার করিতে হইলে হৃদয়কে সর্ব্বপ্রকার পূর্ব্বসংস্কারবিযুক্ত করিয়া সাদা কাগজের মত করিতে হয়, বেক-নানুগত টিণ্ডাল প্রভৃতি বিজ্ঞানবিদ্‌গণের তত্ত্বান্বেষণের এই রীতি। এই রীতি অবলম্বন না করিয়া যাঁহারা তত্ত্বান্বেষণ করিয়াছেন, তাঁহারা যে বলপূর্ব্বক আপনাদের পক্ষসমর্থন করিয়াছেন, যাহা হইতে যাহা কিছুতেই আসিতে পারে না তাহা হইতে তাহা কষ্টকল্পনায় বাহির করিয়াছেন, ইহা কে না অবগত আছেন? ব্যাখ্যানদোষে সত্য প্রকাশ না পাইয়া সত্য প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। বিশ্লেষণরীতি অবলম্বন করিয়া সত্যোদ্ধার, এ বিষয়ে আমি পাশ্চত্য পাণ্ডিতগণের নিকটে ঋণী। সংশয় তত্ত্বজ্ঞানের অগ্রদূত। স্থিরতর সিদ্ধান্তসমূহের প্রতি সংশয় না জন্মিলে তাহাদের বন্ধন হইতে কেহ মুক্ত হইতে পারে না। সে সকল বন্ধন ছিন্ন করিতে না পারিলে হৃদয়কে শূন্য করা খালি করা সাদা কাগজের মত করা কখন সম্ভবে না। আমার ঈশ্বরকে এই জন্য ধন্যবাদ, তিনি সর্ব্বপ্রথমে লক হিউম প্রভৃতি সংশয়বাদিগণের নিকটে আমায় লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা যত দূর পূর্ব্বসংস্কারবিনাশের কার্য্য হইতে পারে, তাহা করিয়া লইয়া তিনি আমায় তত্ত্বজ্ঞানের দিকে উন্মুখ করিয়া-

ছিলেন। এই সংশয়ী পণ্ডিতগণের নিকটে আমি চিরকৃতজ্ঞ, এজন্য যখন তখন তাঁহাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকি। ধর্ম্মসম্বন্ধের তত্ত্বনির্ণয়ে আমি যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের আক্ষরিক অনুসরণ করিয়াছি এ কথা বলিতে পারি না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে দুইটি পক্ষ প্রধান। এক পক্ষ প্রাচীন ধর্ম্মসকলের মধ্যে কবিত্ব ও কল্পনার সাম্রাজ্য, আর এক পক্ষ জনসমাজের নেতৃগণের আধ্যাত্মিকার প্রাধান্য দেখেন। পণ্ডিতবর মোক্ষমূলর প্রথম পক্ষের, স্পেন্সর দ্বিতীয় পক্ষের নেতা। বৈদিক ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রাকৃতিক শক্তি, কবিত্ব ও কল্পনাযোগে দেবরূপে বর্ণিত প্রথম পক্ষের এই মত; দ্বিতীয় পক্ষের মতে ইহাদের প্রতি-জন জনসমাজের নেতৃপুরুষ, দেবতা বলিয়া সাধারণ লোকদিগের কর্ত্তৃক গৃহীত। ধর্ম্মের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল এ বিষয়ে অনু-সন্ধান করিতে গিয়া প্রেতাত্মার বিশ্বাস উহার মূল, হক্সেলে প্রভৃতি বিজ্ঞানবিদ্গণ এই সিদ্ধান্তে আসিয়া পঁহুছিয়াছেন। স্পেন্সরও এ মতের অনুমোদন করেন। রজনীতে স্বপ্নে ভ্রমণ লক্ষ্য করিয়া যখন আদিমকালের লোক জানিতে পাইল যে সে শয্যায় যেমন শয়ন করিয়া আছে তেমনি শয়ন করিয়া ছিল, কোথাও উঠিয়া যায় নাই, তখন সে এই সিদ্ধান্ত করিল যে সে একজন নয় দুইজন, অন্যথা এক স্থানে শুইয়া থাকিয়া নানাস্থানে সে বেড়াইল কি প্রকারে? কোন একটি অন্যায় কার্য্য করিতে উদ্যত হইলে কে যেন তাহাকে ধমকাইয়া সে কার্য্য হইতে বিরত করিতে প্রবৃত্ত, এ দেখিয়া জীবিতকালে যিনি শাসন করিতেন তাঁহারই প্রেতাত্মা এখনও শাসন করিতেছে, আদিমকালের লোকের মনে এ বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল। একটিকে যাঁহারা ধর্ম্মের মূল বলেন, তাঁহারা

প্রেতাত্মা (Ghost) নহে কিন্তু পরাত্মা (Holy Ghost) ধর্ম্মের মূল ইহাই নির্দ্দেশ করেন। এ সিদ্ধান্তে আমাদের কোন আপত্তি নাই, কেন না আমরা যাহা ইচ্ছা করি তাহা হয় না, আর একটী ইচ্ছা দ্বারা আমাদের ইচ্ছা নিয়ত প্রতিরুদ্ধ হয়, এই প্রত্যক্ষ দর্শনের উপরে আমাদের ইচ্ছার অতিরিক্ত আর একটী ইচ্ছা যে জগতে নিয়ত আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, ইহা নিঃসংশয় সপ্রমাণ হয়। আমাদের ইচ্ছার (শক্তির) প্রতিরোধক আর একটী ইচ্ছা (শক্তি) নিরন্তর প্রত্যক্ষ হয় বলিয়াই জীবাত্মার অতিরিক্ত পরাত্মা বিদ্যমান, এ বিশ্বাস আদিমকাল হইতে জনসমাজে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। কোন একটি বিশ্বাস প্রতিজনের প্রত্যক্ষভূমিতে নিয়ত আবির্ভূত না হইলে, উহা সমগ্র জনসমাজের বিশ্বাসরূপে কদাপি পরিণত হয় না। জড় চৈতন্য ও ঈশ্বর লইয়া বিরোধ একালে নিবৃত্ত হইয়া আসিয়াছে, কেন না একালের বিজ্ঞানবিদ্‌গণ ঈশ্বরে অবিশ্বাস অযৌক্তিক (illogical), জড় সাঙ্কেতিকমাত্র (x y z), চৈতন্যই প্রধান, এ কথা প্রমাণসিদ্ধ করিয়া বিরোধ মূলশূন্য করিয়া দিয়াছেন।

ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং পরলোকে বিশ্বাস এইরূপে সমকালিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আমরা একজন নই প্রতিজন দুই জন, স্বপ্নদর্শনে আদিমকালের লোকের যদি এ বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে, এবং সেই দুই জনের এক জন যদি শাস্তা বলিয়া গৃহীত হন, তাহা হইলে জীবাত্মা ও পরাত্মা নিত্য একত্র স্থিত সপ্রমাণিত হইল। জীবিতকালে যিনি শাস্তা ছিলেন, মৃত্যুর পর তাঁহার আত্মা পশ্চাতে পশ্চাতে থাকিয়া শাসন করিতেছেন এ বিশ্বাসও যাহা, আর একটু অগ্রসর হইয়া কোন একটি অন্যায় কার্য্য করিতে গিয়া

ভিতরে মন্দ আত্মা ও ভাল আত্মার বিরোধ উপস্থিত,এমন বিরোধ যে সমুদায় রাত্রি তাহার জন্য নিদ্রা হয় না, এ বিশ্বাসও তাহা। যিনি যে দিক্ দিয়া যাউন না কেন, দুই আত্মার একত্র স্থিতি তাঁহাকে মানিতেই হইবে, সুতরাং শাস্তা ঈশ্বর এবং শাস্য জীব নিরত একত্র বাস করেন এবং দেহান্তেও এই দুইয়ের এ সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এ বিশ্বাস একই সময়ে মানবের হৃদয়ে উদিত হয়। বেদের মত প্রাচীন গ্রন্থ আর নাই। তন্মধ্যে যদি অতি প্রথম হইতে এই বিশ্বাস লিপিবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। বৈদান্তিক পরলোকতত্ত্বের কথা বলিতে গিয়া অগ্রে বৈদিক সময়ের পরলোকে বিশ্বাসের কথা বলা প্রয়োজন, কেন না সেই বিশ্বাসই প্রবাহক্রমে জনসমাজে প্রচলিত হইয়া বৈদান্তিক সময়ে সূক্ষ্মাকার ধারণ-করিয়াছে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, যে সকল বিশ্বাস মনুষ্যপ্রকৃতিসিদ্ধ তাহাকে দৃঢ়মূল করিবার জন্য প্রাচীন গ্রন্থগুলির আশ্রয় লইবার কি প্রয়োজন? তাঁহাদের এ প্রশ্নের আমরা এই উত্তর দি, আমাদের সম্মুখে বিশ্বরূপ বিস্তৃত প্রকৃতিগ্রন্থ যেরূপ বিদ্যমান, তেমনি মনুষ্য-প্রকৃতিরূপ গ্রন্থও বিদ্যমান। যে ভাবে যেরূপে বাহিরের প্রকৃতির অধ্যয়ন করিতে হয় সেই ভাবে সেইরূপে আন্তরিক প্রকৃতির অধ্যয়নকরাও প্রয়োজন। সকল পদার্থ সকল বস্তু সকল জীবের ভিতরে যে প্রজ্ঞা বিদ্যমান, সেই প্রজ্ঞা আমাদের ভিতরেও বিদ্যমান, সুতরাং অন্তর ও বাহির হইতে প্রজ্ঞার একত্ববশতঃ আমাদের নিকটে যে নব নব জ্ঞান প্রকাশ পায় সেই জ্ঞান বাহ্য ও আন্তর বিজ্ঞানরূপে পরিণত হয়। বাহ্য ও আন্তর প্রকৃতির মধ্যে কোন বিরোধ নাই, বিরোধ মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়,

মনকে বিশুদ্ধ রাখিয়া সংস্কারদোষবর্জ্জিত করিয়া উভয় প্রকৃতির অধ্যয়ন আমাদের প্রতিজনের কর্ত্তব্য। একই প্রজ্ঞা যদি উভয় প্রকৃতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত না থাকিতেন, তাহা হইলে বিজ্ঞান বলিয়া কিছুই দাঁড়াইত না। মহাত্মা সক্রেটিস প্রজ্ঞাকে মূল করিয়া তত্ত্বান্বেষণ করিয়াছেন, তত্ত্বশাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়াছেন, আমিও সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তত্ত্বনির্ণয়ে যত্ন করি। বেদ ও বেদান্তের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বর-জীব-ও পরলোকতত্ত্ব-নির্ণয়ে যত্ন করি কেন, জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর এই, চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী বৃক্ষলতা প্রভৃতির জন্মবৃদ্ধির ইতিহাস লইয়া যেমন বাহ্য প্রকৃতি, মানবজাতির জন্মবৃদ্ধি লইয়া তেমনি আন্তর প্রকৃতি। আন্তর প্রকৃতির তত্ত্ব জানিতে হইলে জনসমাজের ইতিহাসের মধ্যে এই জন্যই প্রবেশ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অদ্য যে বৈদান্তিক পরলোকতত্ত্বের কথা আলোচিত হইতেছে উহা এ প্রণালী অবলম্বন বিনা কদাপি সুসিদ্ধ হইতে পারে না।

স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে সূক্ষ্মতমে উত্থান জনসমাজের উন্নতির নিয়ম। সকল বিজ্ঞানেই এই নিয়মে উন্নতি দৃষ্ট হয়, কিন্তু আজ অন্য বিভাগে এ নিয়মের নিয়োগ দেখাইবার কোন প্রয়োজন করে না, পরলোকবিষয়ে এ নিয়মের নিয়োগ প্রদর্শন অত্যাবশ্যক। স্থূল শরীর—আমি, প্রথমাবস্থায় এ জ্ঞান সকলেরই স্বাভাবিক। কেবল এ সময় আমিকে স্থূল শরীর বলিয়া গ্রহণ করা হয় তাহা নহে, উপাস্যদেবপর্য্যন্ত স্থূল ভাবে গৃহীত হইয়া থাকেন। প্রকৃতির যে অংশে দেবশক্তি প্রকাশ পায়, আদিম কালের লোকদিগের নিকটে সেই স্থূল অংশ দেবতা। ঋগ্বেদের সময়ে ইন্দ্র অগ্নি বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক দেবতার স্তোত্রবন্দনা

ভূলোকে দেবশক্তিদর্শন দেখাইয়া দেয়। সে সময়ে ভস্মীভূত, মৃত্তিকায় প্রোথিত বা জলে নিক্ষিপ্ত মনুষ্যদেহ যে পরলোকে পুনরুত্থান করিবে, এ বিশ্বাসকরা আর অসম্ভব কি? আজও সাধারণ লোকে পরলোকে স্থূল দেহ বিনা আত্মার স্থিতি কল্পনা-করিতে পারে না। যাঁহারা জ্ঞানে কথঞ্চিৎ উন্নত হইয়াছেন, তাঁহারা স্থূল দেহের স্থলে সূক্ষ্ম দেহ কল্পনা করিয়া তবে আত্মার পরলোকে স্থিতি বিশ্বাস-করেন। 'মানসশক্তিসমিতির' বিবরণ আমি অতি প্রথম হইতে পাঠ করিয়া আসিতেছি। তন্মধ্যে যে সকল বৃত্তান্ত পড়িয়াছি, সে গুলিতে আমি উপকৃত হইয়াছি ইহাও আমায় স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু উহারা স্থূল বা সূক্ষ্মদেহে আমার বিশ্বাস উৎপাদন-করে নাই। যিনি পরলোকগত আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেন তাঁহার মানসগত প্রতিমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া তাদৃশ মূর্ত্তি সম্মুখে উপস্থিত হয় প্রথম হইতে আমি এইরূপ বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি। সম্প্রতি বিজ্ঞানবিৎ কোরণ সাহেব বিদ্যুদ্‌যোগে দূরস্থ ব্যক্তির নিকটে যে ফটো পাঠাইয়া থাকেন, আমি মনে করি উহা সেই প্রণালীর অন্তর্গত। "মৃত্যুর পরও মানবের ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান থাকে" এই গ্রন্থখানিতে আমি যে একটি বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছি সে বৃত্তান্ত আমার মনে দৃঢ় মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু সে বৃত্তান্তও 'দূরতোভাবসঞ্চারণ' (Telepathy) নিয়মের অন্তর্গত বিনা আমি অন্য কিছু মনে করি না। নয়বৎসর পূর্ব্বে মৃতা ভগিনী—এক মাতা বিনা অপরের অজ্ঞাত গণ্ডদেশে যে ক্ষতরেখা হয় তৎসহকারে দিবালোকে সম্মুখীন হইয়া—কার্য্যসাগরে মগ্ন ভ্রাতাকে গৃহে গমনে প্ররোচিত করিয়াছিলেন, এ বৃত্তান্ত যদিও অদ্ভুত তথাপি নয় বৎসরের পূর্ব্বের ক্ষতকে নবীন ক্ষতের ন্যায়

প্রদর্শন মানসশক্তির ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বাল্যকাল হইতে কত ক্ষত সে দেহে হইয়াছিল, সে সকলের চিহ্ন একটিও নাই, মৃতদেহে যে আঁচড় লাগিয়াছিল, নয় বৎসরে তাহা অবিলুপ্ত আছে, পরন্তু দেহের ক্ষতেতে আত্মা ক্ষত হয়, এ সকলের কোন কথা দাঁড়ায় না, কেবল বিশ্বাসোৎপাদনের জন্য ক্ষতপ্রদর্শন, এ বিনা এ দৃশ্যের কোন অর্থ নাই।

এখন এ সকল কথা যাউক, বেদ হইতে বেদান্তে প্রবেশ স্থূল হইতে সূক্ষ্মে সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে সূক্ষ্মতমে হইয়াছে পরলোকতত্ত্ব-সম্বন্ধে এ নিয়মের প্রয়োগ কিরূপ তাহাই দেখান যাউক। বৈদিক সময়ে শব অগ্নিতে দগ্ধকরাই সাধারণ প্রণালী ছিল, কোথাও কোথাও মৃত্তিকাতে প্রোথিতকরাও হইত। উভয় স্থলেই শব-দেহের উপরে বন্ধুগণের অত্যধিক আদর প্রকাশ পায়, কেন না দহনযোগে বা মৃত্তিকার চাপে যাহাতে শবের ক্লেশ না হয়, তজ্জন্য অগ্নি ও পৃথিবীর নিকটে কাতর প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নি যখন দেহকে দগ্ধ করে তখন কোন কোন অঙ্গ বাহিরে পড়িয়া যায়। যখন পরলোকে অগ্নি দেহের অঙ্গ সকল দেহে সংযোজিত করিবেন, তখন সেই অদগ্ধ অঙ্গ দেহে বা সংযোজিত না হয়, এই ভয়ে উহাকে লইয়া গিয়া দেহে সংযোজিত করিবার জন্য অগ্নিসন্নিধানে ব্যাকুল প্রার্থনা দৃষ্ট হয়। পরলোকে পত্নী পুত্র প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া মৃত ব্যক্তি পৃথিবীর ভোগের ন্যায় ভোগে রত হন, এ বিশ্বাস বৈদিক সময়ে সুস্পষ্ট। কেবল পত্নী প্রভৃতি নহে পালিত পশুপক্ষ্যাদি সকলই সেখানে গিয়া তাহার সুখ বর্দ্ধিত করে। ফলতঃ পৃথিবী ও পরলোক এ উভয়ের মধ্যে

বৈদিক সময়ে কোন পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈদান্তিক সময়ে স্থূলের পরিহার ঘটিয়াছে, সুতরাং এখানে জ্ঞানানুরূপ দেহপ্রাপ্তি কামনানুরূপ লোকপ্রাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পিতৃলোকে স্বাপ্নিক শরীর, গন্ধর্ব্বলোকে সূক্ষ্মোপধিযুক্ত শরীর, পরমাত্মায় জীবের চিন্মাত্রতা, ব্রহ্মলোকে ছায়া ও আতপের ন্যায় উহার স্থিতি বেদান্তে বর্ণিত হইয়াছে। বৈদিক সময়ে মৃত ব্যক্তি লোকলোকান্তরে ভ্রমণ করে এরূপ বিশ্বাস ছিল। এ সকল লোকলোকান্তর পৃথিবীর অনুরূপ পৃথিবীলোক দিব্যলোক নহে, সুতরাং বৈদিক অনুষ্ঠানে মনুষ্যলোক হইতে মনুষ্যলোকান্তরে পুনরাবৃত্তি হয়, বেদান্ত এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন, বেদান্ত যে পুনরাবৃত্তি-বর্ণন করিয়াছেন উহা এই পৃথিবীতে পুনরাবৃত্তি। ব্রাহ্মণবিভাগে সূর্য্যের অধোভাগে স্থিত বহুলোক বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল লোক পৃথিবীধর্ম্মাক্রান্ত মনুষ্যলোক ; সূর্য্যের উদয়াস্ত ঐ সকলে প্রতিনিয়ত হইতেছে, এজন্যই তত্তল্লোকস্থ ব্যক্তিসকল এক স্থানে স্থির থাকিতে পারে না, এক লোক হইতে তাহাদিগকে অন্য লোকে যাইতে হয়। দিবা রজনীর প্রত্যাবর্ত্তনে ঐ সকল লোক ক্ষয়িষ্ণু, সুতরাং উহাদের অধিবাসিগণ এক অবস্থায় থাকিতে সমর্থ নয়। ব্রাহ্মণবিভাগের এই বিশ্বাস বেদান্ত যে গ্রহণ করিয়াছেন ছান্দোগ্য স্পষ্টবাক্যে তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন *। লোকসমূহের প্রতি উত্থিত হয়, এ কথা বলিয়া বৃহদারণ্যকও ঐ কথা বলিয়াছেন †। "সে লোক হইতে কর্ম্মকরিবার জন্য এ লোকে আইসে" এখানকার 'এ লোক' যে পৃথিবীবাচক—মনুষ্যলোকবাচক তাহা স্বয়ং বৃহদারণ্য-

* ৩।৬।৮। ৩।৭।৬ † ৮।২।১৩।

কই "আকাশ হইতে বায়ু বায়ু হইতে পৃথিবী" এই কথা বলিয়া নিঃসন্দিগ্ধ করিয়া দিয়াছেন। বৈদিকক্রিয়াকলাপ যাহারা অনুষ্ঠান করে, বাপী তড়াগ কূপাদি খনন আরামাদি স্থাপন ইত্যাদি পূর্ত্ত কার্য্য যাহারা করে, তাহাদের লোকলোকান্তরে ভ্রমণ হয়, ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক চিরদিনের জন্য সেখানে বাস হয় না, বেদান্ত এ কথা বলিয়া বেদের অবমাননা করেন নাই, কেন না স্বয়ং বেদ কর্ম্মানুষ্ঠায়িগণের এইরূপ গতিতেই বিশ্বাস করিয়াছেন। বেদান্তসিদ্ধ উপাসনা অবলম্বন-করিয়া যে গতি হয় সে গতিতে আর পুনরাবর্ত্তন নাই, দিব্যলোকে নিত্য কাল বসতি হয়। বৈদান্তিক পরলোকতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইলে এই মুখ্য অপুনরাবর্ত্তনী গতিরই উল্লেখ প্রয়োজন।

অপুনরাবর্ত্তনী গতি দ্বিবিধ। প্রথমটীতে যদিও পৃথিবীলোকে পুনরাগমন হয় না, তথাপি ইচ্ছামত বিবিধ দিব্যলোকে ভ্রমণ হইয়া থাকে। সেই সেই লোকের ঐশ্বর্য্যসম্ভোগ ঈদৃশ গতির কৃতার্থতা। যাঁহারা গৃহস্থ হইয়া গভীর ধর্ম্মাচরণ করেন সত্য ও ব্রহ্মচর্য্যনিরত, তাঁহারাই এইরূপ স্বেচ্ছামত দিব্যলোকসমূহে ভ্রমণ করিতে অধিকারী হন। এতন্মধ্যে যাঁহারা ছল-কপট-মিথ্যাচরণ-শূন্য তাঁহারা অপুনরাবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মলোকে স্থিতি করেন। সত্যের যিনি পরমনিধান তাঁহাকে পাইবার জন্য এক সত্যই উপায়। সত্যের দ্বারা সমুদায় জয় করিয়া দেবভাবপ্রাপ্তি হয়। রসস্বরূপ পরব্রহ্মে স্থিতিতে সম্যক্ অভয়লাভ হইয়া থাকে। এ অবস্থায় সাধক অণুমাত্রও বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারেন না। শ্রীচৈতন্য রসস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসক ছিলেন। উপাস্য সহ অণুমাত্র বিচ্ছেদে তাঁহার যে কি দশা হইত, যাঁহারা তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত

পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা তাহা কথঞ্চিৎ অবগত আছেন। ব্রহ্ম-স্বরূপী পরব্রহ্মের উপাসনায় সমগ্র জীব ও সমগ্র জগতের সহিত একাত্মতা উপস্থিত হয়। এই একাত্মতায় পরব্রহ্মে নিত্য আনন্দ-সম্ভোগ সাধকের কৃতার্থতা। ওঙ্কারাবলম্বনে আকাশস্বরূপ পর-ব্রহ্মের উপাসনায় পর-পর-উৎকৃষ্ট-জীবনলাভ হয়, এ কথা বলিয়া বেদান্ত অনন্তজীবন প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং তিনি যে ক্ষুদ্র জীবের অনন্তত্ব প্রাপ্যবিষয় বলিয়াছেন তাহা কিরূপে সিদ্ধ হয় তাহা ইহাতেই দেখাইয়াছেন। শোভাদাতা বলিয়া সর্ব্বপ্রকাশক বলিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করিলে নিখিল শোভা-ও-দীপ্তিপ্রাপ্তি হয় এবং জীবনান্তে বৈদ্যুতিক পুরুষ দেবপথে ব্রহ্মপথে উপাসককে ব্রহ্মসন্নি-ধানে উপনীত করেন, আর মনুষ্যলোকে পুনরাবৃত্তি হয় না। এই দেবপথে ক্রমে যে প্রকারে আরোহণ হয় বেদান্ত তাহা বর্ণন-করিয়াছেন। আশ্চর্য্য এই যে, একালের 'মানসশক্তিসমিতির' সিদ্ধান্তের সহিত ইহার একতা আছে। যে দিন কোন ব্যক্তির পরলোকগমন হয়, সেই দিনই কোন কোন বন্ধু তাহার প্রমুক্ত আত্মাকে পূর্ব্বানুরূপ দেখিতে পান। এ দিনের পর দর্শনদানের দিন দূর দূর হইয়া পড়ে, সংবৎসর পরে দর্শনদান নিবৃত্ত হয়। দিন, পক্ষ, ছয়মাস, সংবৎসর এ লোকের সহিত সম্বন্ধ থাকে, সংবৎসর পর আদিত্য চন্দ্র ও বৈদ্যুতিক লোকে তাহার প্রবেশ হয়, সেখান হইতে বৈদ্যুতিক পুরুষ তাহাকে ব্রহ্মলোকে উপনীত করেন আর ইহলোকের সহিত সম্বন্ধ থাকে না, বেদান্ত এ কথা বলিয়া সেই কথাই বলিয়াছেন। 'মানসশক্তিসমিতির' বিবরণে বহু বর্ষ পরেও দর্শনদান নিবদ্ধ আছে, উহাও যে বেদান্তবিরোধী নয় একথা বলিবার অপেক্ষা রাখে না, কেন না পরলোকগত

ব্যক্তি প্রেমসম্বন্ধে সম্বদ্ধ ব্যক্তিগণের সহিত ইচ্ছাক্রমে নিমেষের জন্য মিলিত হইতে পারেন, বেদান্ত একথা স্পষ্টবাক্যে উল্লেখ করিয়াছেন। সূর্য্যরশ্মিযোগে ইহলোক হইতে পরলোকে গমন হয়, বেদান্তের এ সিদ্ধান্ত 'মানসশক্তিসমিতির' সিদ্ধান্তের বিপ-রীত ইহাও বলিতে পারা যায় না। দূরবর্ত্তী আত্মার সহিত দূরবর্ত্তী আত্মার যোগ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারা ইথারকে এই যোগের কারণ নির্ণয় করিয়াছেন, বেদান্ত সে স্থলে চক্ষুর অদৃশ্য সূক্ষ্মতম সূর্য্যরশ্মিকে যদি যোগের কারণ বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন তাহাতে কিছু গুরুতর মতভেদ উপস্থিত হইল না, বরং কাল্পনিক ইথারাপেক্ষা সূক্ষ্মতম সূর্য্যরশ্মি বুদ্ধিস্থকরা সহজ।

সাধনভেদে গতির কিরূপ তারতম্য হয় তাহা এক প্রকার দেখান হইল, এখন বিশেষ বিশেষ সাধনে বিশেষ বিশেষ গতি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যা। এই পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা গৃহস্থগণের সাধনের বিষয়। দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ এই পাঁচটিকে পঞ্চাগ্নি এবং আদিত্যাদিকে সমিধাদি যজ্ঞের উপকরণ কল্পনাকরা হইয়াছে। আকাশ হইতে বর্ষণ হয়, সেই বর্ষণে পৃথিবী শস্যশালিনী হয়, সেই শস্যজীব ভক্ষণ করিয়া সন্তানোৎপাদনে সামর্থ্যলাভ করে। এই সন্তানোৎপাদনব্যাপার-মধ্যে জীবের গতিচিন্তন পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উদ্দেশ্য। যে সকল জীব জন্মগ্রহণ করে তাহাদের আকাশ হইতে বৃষ্টিতে, বৃষ্টি হইতে পৃথি-বীতে অবতরণ হইয়া অন্নযোগে জীবদেহে প্রবেশ এবং সেই জীব-দেহের উপাদান হইতে পুত্রকন্যাকারে প্রকাশ, উপনিষদের এই মত। এ মত এই দেখাইয়া দেয় যে জীব নিত্য অবিনাশী, যত দিন পর্য্যন্ত না তাহার ব্রহ্মে স্থিতি হইতেছে, তত দিন তাহাকে জন্ম-

ভুর অধীন থাকিতে হয়, পৃথিবীর সমধর্মী লোকসকলেতে
ন্নণ করিতে হয়। সন্তানজন্মমধ্যে গৃহস্থ যদি কেবল জীবের
িতিচিন্তা করেন, তদ্ব্যতীত যদি আর কিছু তাঁহার চিন্তার বিষয়
া হয়, তাহা হইলে ইহাকে বিদ্যা বলিয়া গ্রহণকরা যাইতে পারে
া। বেদান্ত যে কোন উপাসনাপ্রণালী নিবদ্ধ করিয়াছেন,
বৈদিক রীতিতে তাহাতে যজ্ঞকল্পনা করিয়া প্রাকৃতিক উপাদান-
সকলকে উহার উপকরণ করিয়া লইয়াছেন। এই সকল উপা-
দান পরাত্মার প্রেরণায় সফল হয়, অন্যথা ইহাদের হইতে কিছুই
হইতে পারে না। বেদান্তের এই প্রতিজ্ঞাবশতঃ সে সকলের সঙ্গে
পরাত্মার কোন উল্লেখ না থাকিলেও উহাদের মধ্যে তাঁহার
ক্রিয়াদর্শন করিলেই বেদ হইতে বেদান্তে অবতরণ হইল। পঞ্চা-
গ্নিবিদ্যামধ্যে পরাত্মাকে না দেখিয়া যদি স্থূল ভাবে সেই অগ্নি
পাঁচটির উপাসনা হইত, তাহা হইলে উহাতে অপুনরাবৃত্তি কথন
বর্ণিত হইত না, ব্রহ্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না, বৈদিক পুনরাবৃ-
ত্তিই উহাতে উল্লিখিত হইত। সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরমাত্মাকে শোভা-
দাতা ও সর্ব্বপ্রকাশক বলিয়া উপাসনা করিলে যে গতি হয়, এই
পঞ্চাগ্নিবিদ্যাসিদ্ধ উপাসনায় সেই গতি হয় এরূপ উল্লিখিত
হওয়াতে এটি যে পরাত্মারাধনাবর্জ্জিত নয়, ইহা সহজে প্রতীত হয়।
সৃষ্টিপ্রক্রিয়ামধ্যে স্রষ্টাকে দর্শন অতি স্বাভাবিক। সন্তানজন্মমধ্যে
এই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া * আমাদের বুদ্ধিগোচর হয়, সুতরাং তন্মধ্যে
স্রষ্টাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে দর্শন করিয়া বেদান্ত এই বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত
করিয়াছেন, এ কথা বলা কিছু অযুক্ত নয়।

---

* পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় মধ্যে যে সকল উপাদানের উল্লেখ হইয়াছে সে গুলি সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মধ্যে উল্লিখিত উপাদানাতিরিক্ত নয়, সুতরাং সন্তানজন্মমধ্যে সৃষ্টির ব্যাপারদর্শন পঞ্চাগ্নিবিদ্যার অন্তীভূত।

অন্যান্য বিদ্যার উল্লেখের পূর্ব্বে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রতি বেদান্তের নিরতিশয় অনুরাগ কেন, ইহার কারণ নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত প্রয়োজন। বেদান্তে "সম্প্রত্তি" বলিয়া একটি অনুষ্ঠান আছে। এই অনুষ্ঠানটি দেখাইয়া দেয় বেদান্তবিদ্গণ এ জগতে পুত্রের কি প্রয়োজন মনে করিতেন। তাঁহারা তিনটি লোক স্বীকার করিতেন, মনুষ্যলোক, পিতৃলোক, দেবলোক। কোন কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা নহে এক পুত্র দ্বারা মনুষ্যলোকজয় হয়। কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক এবং বিদ্যা দ্বারা দেবলোকের জয় হইয়া থাকে। লোকগুলির মধ্যে দেবলোক শ্রেষ্ঠ। বিদ্যা দ্বারা দেবলোকের জয় হয়, এ জন্য বিদ্যার প্রশংসা। যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত, তখন পিতা পুত্রকে বলিতেন, তুমি বেদ, তুমি যজ্ঞ, তুমি লোক। পুত্র ইহার উত্তরে বলিতেন, আমি বেদ, আমি যজ্ঞ, আমি লোক। পিতাপুত্রমধ্যে এরূপ উক্তি প্রত্যুক্তি কেন হইল, স্বয়ং শ্রুতিই তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেদশব্দ উচ্চারণকরার অভিপ্রায় এই যে, পিতার প্রয়াণানন্তর যে নূতন বেদ অবতীর্ণ হইবে তাহার সঙ্গে পিতার সময়ে অবতীর্ণ বেদের এইরূপে একতা হইল। যজ্ঞশব্দ উচ্চারণকরিবার অভিপ্রায় এই যে, যে সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, আর যে সকল যজ্ঞ পিতার প্রয়াণানন্তর পুত্র কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইবে, এ উভয়ের এইরূপে একতা হইল। লোকশব্দ উচ্চারণের অভিপ্রায় এই যে, যে সকল লোক পিতা জয়-করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রয়াণানন্তর পুত্র জয়-করিবেন, তদুভয়ের এইরূপে একতা হইল। এই সম্প্রদান অনুষ্ঠানে গৃহীর এ পৃথিবীতে যাহা কর্ত্তব্য ছিল তাহা পূর্ণ হইল। পিতা অনুষ্ঠানানন্তর এই প্রার্থনা করিলেন, 'ইহলোক হইতে এই

লা আমার পৃষ্ঠবল হইয়া আমাকে রক্ষা করুক।' পুত্রে অধ-
ীর্ণ বেদ, পুত্রের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, পুত্রের অধিকৃত লোক পরলোকে
াতার পৃষ্ঠবল হইবে, এজন্য প্রয়াণকালে পিতা এই সম্প্রদান
নুষ্ঠান করেন। এই অনুষ্ঠানে পিতা মরণকালে সর্ব্বেন্দ্রিয়
হ পুত্রেতে প্রবিষ্ট হন। বহু কর্ম্মে ব্যাপৃতিবশতঃ পিতা যাহা
রিয়া উঠিতে পারেন নাই তজ্জনিত অপরাধ হইতে পুত্র পিতাকে
ক্ত করেন, এ জন্য তাঁহার নাম পুত্র *। পিতা এইরূপে ইহ-
লাকে পুত্রেতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এখন যে সকল দেব প্রাণ
ইন্দ্রিয়) হইয়া তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্বয়ং
তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া পরলোকে তাঁহাকে প্রাণযুক্ত করিলেন।
পৃথিবী ও অগ্নি হইতে তাঁহাতে দৈবী বাক্ প্রবেশ করিল, এজন্য
এখন তিনি যাহা বলেন তাহাই হয়। আকাশ ও আদিত্য হইতে
তাঁহাতে দৈব মন প্রবেশ করিল, এজন্য তিনি চির সুখী হইলেন,
আর তাঁহাতে শোক সম্ভবিল না। জল ও চন্দ্রমা হইতে তাঁহাতে
দৈব প্রাণ প্রবেশ করিল। এই দৈব প্রাণ সেই প্রাণ যিনি
স্থাবরজঙ্গমাদি সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিয়া বা সঞ্চরণ না করিয়া
ব্যথিত হন না, বিনষ্ট হন না। এই প্রাণে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বভূতের
সহিত একাত্মতালাভ করেন এবং প্রাণদেবতাকে সর্ব্বভূত যে
প্রকার রক্ষা-করে, ইহাকেও সেই প্রকার রক্ষা-করে। সর্ব্বভূতের
পাপের সহিত ইহার সংস্রব হয় না, উহাদের পুণ্যের সহিত
সংস্রব হয়, কেন না দেবতাকে পাপস্পর্শ করে না। পঞ্চাগ্নিবিদ্যা
প্রভৃতি সকল বিদ্যারই চরম ফল পাপস্পর্শ-বর্জ্জিততা। পাপ-

* অকরণজনিত অপরাধ হইতে পিতাকে পবিত্র করেন (পু+ত্রৈ)
এজন্য পুত্র।

পাপবর্জ্জিত না হইলে অপাপবিদ্ধ ব্রহ্মের সহিত একত্ব হয় না বেদান্তের এই বিশেষ মত।

এখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি, সমুদায় জগতের সহিত সাধকের একাত্মতা উপস্থিত হওয়াই বেদান্তের মুখ্য গতি। সকল প্রাণের সহিত একপ্রাণ হওয়াই ঈদৃশ একাত্মতার কারণ। প্রকৃতিশক্তি ও জীবশক্তি এ দুই সর্ব্বদা মিশিয়া আছে। জীব-শক্তিকে বেদান্তবিদ্‌গণ প্রাণধারণশক্তি বলেন। আত্মসদৃশ সর্ব্ব-ভূতের উপরে সমাদরকেই আমরা সমগ্র জগতের সহিত একপ্রাণ হওয়া মনে করি। এ অবস্থায় কেবল হিংসাদি নিবৃত্ত হয় তাহা নহে সর্ব্বত্র মৈত্রী উপস্থিত হয়। সে কথা যাউক, দহরবিদ্যা বেদান্তসিদ্ধ অতি প্রধানবিদ্যা। অনেক সাধক এই বিদ্যার নিরতিশয় পক্ষপাতী। হৃদয়ে চিত্তসংস্থাপনপূর্ব্বক ধ্যান মনন চিন্তা সহজে উপস্থিত হয়; এই সহজসিদ্ধতা এ প্রকার পক্ষ-পাতের কারণ। দহরশব্দের অর্থ ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র হৃদয়াকাশে ব্রহ্মদর্শন করিয়া সেই ক্ষুদ্রাকাশকে অনন্তাকাশের সঙ্গে মিশাইয়া অনন্ত ব্রহ্মকে হৃদ্‌গোচরকরা এই বিদ্যার প্রধান উদ্দেশ্য। এখানে পরব্রহ্মের সত্যকাম সত্যকল্পত্বাদি কল্যাণগুণ অনুভব করিয়া সাধক তদ্ভাবাপন্ন হন। এই তদ্ভাবাপন্নতায় পরলোকগত ব্যক্তি ইচ্ছামাত্র পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী সখা প্রভৃতির সহিত কেবল মিলিত হন তাহা নহে, অভিলাষমাত্র সর্ব্বপ্রকার ভোগাবিষয় প্রাপ্ত হন। এস্থলে বেদান্ত একটি অতি গূঢ় তত্ত্ব বিবৃত করিয়া-ছেন। আমরা যে কোন ব্যক্তি বা পদার্থের সহিত সম্বদ্ধ হই, উহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কোন কালে বিচ্ছিন্ন হয় না, উহারা আমাদের হৃদয়ে নিত্যকালের জন্য স্থিতি করে। যদি

হাই হইল তাহা হইলে এ জীবনে কেন আমরা তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ করি না। প্রত্যক্ষ করি না এই জন্য যে উহারা অনৃত দ্বারা প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। সহজ ভাষায় অনৃতশব্দে আমরা মিথ্যা বুঝিয়া থাকি। মিথ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া আছে, এ কথা বলিলে এ মিথ্যা কি, জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। সাংখ্যসূত্র বলিতেছেন, যে সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে কোন বাধা উপস্থিত হয় না সেগুলি সৎ, আর যে গুলি প্রত্যক্ষ করিতে বাধা উপস্থিত হয় সেগুলি অসৎ। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, যে সকল বিষয় চক্ষুরাদির গোচর উহারা সৎ, আর যাহারা চক্ষুরাদির অগোচর উহারা অসৎ। চক্ষুরাদির অগোচর হইলেই যে উহারা অসৎ, মিথ্যা বা নাই এরূপ মনে করা ভ্রম। সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম বিষয়মাত্রই আমাদের চক্ষুরাদির অগ্রাহ্য, কিন্তু বলিতে হইবে দৃশ্যমান সমুদায় বিষয়ের তাহারাই মূল, সুতরাং সত্যের সত্যত্ব তাহাদিগেরই হইতে। শব্দশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ ব্যুৎপত্তিযোগে ঋত ও অনৃত শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যাই আমাদিগকে এস্থলে গ্রহণ করিতে হইতেছে। তাঁহারা বলেন হৃদয়কে যাহা অধিকার করিয়া থাকে তাহা ঋত, সুতরাং যাহা হৃদয় হইতে অপসৃত হইয়াছে হৃদয়কে অধিকার করিয়া নাই, তাহাই অনৃত। এই অর্থই যে বেদান্তের অভিমত, তাহা ঐ স্থানের বর্ণনাই পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেয়। হৃদয়রূপ ব্রহ্মপুরে সেই সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয় আছে। ভূগর্ভে নিহিত হিরণ্যরাশির উপর দিয়া নিধিশাস্ত্রানভিজ্ঞ লোকসকল গতায়াত করে, অথচ যেমন উহার অস্তিত্ব তাহারা অনুভব করিতে পারে না, সেইরূপ মনুষ্য অহরহ সুষুপ্তিকালে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াও

অনভিজ্ঞতাবশতঃ সেই সকল সত্য বিষয়ের কোন সংবাদ পায় না। যাঁহারা দহরবিদ্যার উপাসক তাঁহারা পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়া পরলোকগত হন, এবং তাঁহারাই এই প্রচ্ছন্ন বিষয় সকল যথেচ্ছ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ।

প্রধান প্রধান বিদ্যা অবলম্বন করিয়া কি প্রকার গতি হয়, তাহা এক প্রকার উল্লিখিত হইল, এখন মুক্তিসম্বন্ধে বেদান্তের মত কি, তাহার উল্লেখ প্রয়োজন। মুক্তিতে জীব ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়, তাহার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না, বেদান্তসিদ্ধ মুক্তি সাধারণতঃ লোকে এইরূপই বুঝিয়া থাকে। নদী ও সমুদ্রের দৃষ্টান্ত অবলম্বন-করিয়া বেদান্ত যখন মুক্তির কথা বলিয়াছেন তখন লোকের মনে যে এ প্রকার সংস্কার জন্মিবে ইহা আর একটা অসম্ভব ব্যাপার কি? জলের সহিত জল মিশিয়া একাকার হই-লেও মিশ্রিত জলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না, কেন না মিশ্রিত জলের দ্বারা পূর্ব্বজলের পরিমাণাধিক্য হয়, এ যুক্তি ব্রহ্মসম্বন্ধে খাটে না, কারণ সকলই যখন তাঁহার অন্তর্ভূত, তখন কিছুই তাঁহার ন্যূনা-ধিক্যসাধনে সমর্থ নহে। সৃষ্টির পূর্ব্বে সকলই তাঁহার সহিত অবিভক্ত ভাবে স্থিত ছিল, সৃষ্টিকালে বিভক্তাকারে প্রকাশ পাইল। যদিও বিভক্তাকারে জগৎ প্রকাশ পাইল, তবু তখনও ব্রহ্মের সহিত নিগূঢ় অবিভক্ততা অন্তরিত হইল না, কেন না তাঁহার সত্তা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া উহার অস্তিত্বথাকা অসম্ভব। বাহিরে বিভক্ত ভিতরে অবিভক্ত জগৎসম্বন্ধে এ কথা বলিলে কিছু অতিরিক্ত বলা হয় না। আমরা প্রতিজন বিভক্তভাবে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া আছি ইহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু একই প্রাণশক্তি আমাদের অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান থাকিয়া সেই

শক্তিতে আমাদিগকে অবিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে, এ কথা আমরা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি না। পরস্পরসম্পর্কে যে সকল আশ্চর্য্য নিগূঢ় সম্বন্ধ অবস্থাবিশেষে প্রকাশ পায়, সে গুলি এই দেখাইয়া দেয় যে, আমরা আমাদিগকে যেরূপ স্বতন্ত্র ও পৃথক্ বলিয়া মনে করি বস্তুতঃ সেরূপ স্বতন্ত্র ও পৃথক্ নহি, আমরা বাহিরে বিভক্ত কিন্তু অন্তরে অবিভক্ত। যে জ্ঞান বিভক্তে অবিভক্ত দর্শন করে, সে জ্ঞান সাত্ত্বিক, ভগবদ্গীতা এ জন্যই এ কথা বলিয়াছেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে যে অবিভক্ততা ছিল তাহা তিরোহিত হয় নাই সঙ্গে লাগিয়া আছে। মুক্তিতে সেই অবিভক্তাবস্থার জ্ঞান উজ্জ্বল হইয়া উঠে, কেন না এই জ্ঞানই সত্য জ্ঞান, এ জ্ঞান আমাদের মানসিক বিকারে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, বিকার চলিয়া গেলেই উহা আত্মার সন্নিধানে সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়। ব্রহ্ম সহ আমরা অবিভক্ত ভাবে অবস্থিত, এই জ্ঞানই তবে সত্য জ্ঞান, এবং উহাই মুক্তিনামে অভিহিত। বেদান্ত মুক্তিতে জলের সহিত জলের সংমিশ্রণের যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, উহা এই অবিভক্ততা প্রদর্শনের জন্য। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে জীব নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হয়, এ কথা বলিয়া বেদান্ত ব্রহ্ম ও জীবের প্রাপ্যপ্রাপকসম্বন্ধ কখন উল্লেখ করিতেন না। "যিনি পরম ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হয়েন, ইঁহার কুলে অব্রহ্মবিৎ হয় না" এ কথা বলাতে এই বুঝাইতেছে যে, ব্রহ্মের সহিত যাঁহার একত্বলাভ হইয়াছে পুত্র পৌত্রাদি তাঁহার সেই ভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করে, সুতরাং তাহাদের মধ্যে কেহ অব্রহ্মবিৎ হয় না। শুকের পুত্রকন্যা তদ্ভাবাপন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহারা সকলেই যোগধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছি-

লেন, ইতিহাস এই কথারই সাক্ষ্যদান করে। 'ব্রহ্মই হয়েন', এ কথা শুনিয়া অন্য প্রকার ভাবিবার কোন কারণ নাই, কেন না স্বরূপৈকাস্থলে বেদান্ত ভোক্তা ভোগ্য ও প্রেরয়িতা এ তিনকে একই ব্রহ্মশব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন। জগৎ জীব ও নিয়ন্তা এ তিন বিরোধপরিহার করিয়া এক হইলে ব্রহ্মেতে এ তিনের ভিন্নতা তিরোহিত হয়, বৃহদারণ্যক মধুবিদ্যায় এ কথা অতিস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রকৃতিতে যিনি প্রতিষ্ঠিত, জীবে তিনিই প্রতিষ্ঠিত। যিনি এ উভয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া উভয়ের সম্বন্ধ হইতে কল্যাণ উদ্ভূত করিতেছেন এবং সেই কল্যাণে জগৎ ও জীবকে অবিরোধী করিতেছেন, তিনি ও ব্রহ্ম একই পদার্থ, সুতরাং নিয়ন্তার সহিত এ দুইয়ের অবিরোধী ভাব ব্রহ্মের সহিত একতা উপস্থিত করে। এই একতা ব্রহ্মভাব ও ব্রহ্মেতে স্থিতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

এ মুক্তি দেহে অবস্থানকরিয়াও সিদ্ধ হয়। 'হৃদয়াশ্রিত অভিলাষ সমুদায় যখন খসিয়া পড়ে, তখন মর্ত্ত্য অমৃত হয় এবং ইহ জীবনেই ব্রহ্মসম্পন্ন হয়। সর্পের মৃত নির্ম্মোক বল্মীকে নিক্ষিপ্ত হইয়া যেমন শয়ান থাকে, তেমনি মনুষ্যের এই শরীর শয়ান থাকে। তখন এই মনুষ্য অশরীর হয় অমৃত হয়।" যদি মুক্ত ব্যক্তি শরীরসত্ত্বেও অশরীর হয়, তবে তাহাতে তখনও শরীরচেষ্টা কেন দেখিতে পাওয়া যায়? এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন "ব্রহ্মই প্রাণ হন; ব্রহ্মই তেজ হন।" কেবল এই পর্য্যন্ত নহে "সূক্ষ্ম বিস্তীর্ণ চিরন্তন পথ তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে" মুক্ত ব্যক্তি এইরূপ অনুভব করেন। সে পথ কোন্ পথ?" "সেই পথ যে পথে ধীর ব্রহ্মবিদ্গণ দেহান্তে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন

করেন।” যোগিগণ ইহলোকে থাকিয়াও পরলোকে আছেন এরূপ অনুভব করেন কেন, বেদান্তের এই সকল কথায় তাহা প্রকাশ পাইতেছে। শরীর থাকিতেও অশরীর হইয়া বাস, অথচ শরীরধারিসমুচিত সমুদায় কর্ত্তব্যসাধন অনেকের মনে অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু শ্রুতি এ সম্বন্ধে যে মীমাংসা করিয়াছেন, সে মীমাংসার প্রতিকূলে কোন কথা বলিবার নাই। ঈশ্বরগতজীবন সাধুগণ আপনাদের কর্ত্তৃত্ব একেবারে বিস্মৃত হন। তাঁহাদের দেহ মন আত্মা আপনারা কিছুই করে না স্বয়ং ঈশ্বরের প্রেরণায় তাহাদের ক্রিয়া হয়, যখন তাঁহারা এরূপ বলেন তখন তাঁহাদের সে কথায় কোন সংশয় করিতে পারা যায় না, কেন না এ জীবনে যদি ঈদৃশ অবস্থা হওয়া অসম্ভব হয়, তাহা হইলে উপাসনা-বন্দনা-সাধন-ভজনাদি সকলই অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। যদি পূর্ব্বেও যেরূপ অবিশুদ্ধ জীবন ছিল, বহু সাধনেও সেইরূপ জীবনই থাকিয়া গেল, তাহা হইলে সাধন আত্মবঞ্চনাভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। বেদান্তমতে কোন্ অবস্থালাভ হইলে মুক্তি সুলভ, ইহা আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, বেদান্ত স্বাভাবিক পন্থা পরিত্যাগ করিয়া কোন অনৈসর্গিক পথ আশ্রয় করিতে বলেন নাই। সাধক সর্ব্বপ্রকারের অভিমানশূন্য হইয়া বালভাবাপন্ন হইবেন, বেদান্তের এই সর্ব্বপ্রধান উপদেশ। সাধক যখন বালভাবাপন্ন হন, তখন তিনি পাপের অতীত হন, বেদান্ত এ কথা বলিলেন কেন তাহার কারণ আমরা সেখানেই সুস্পষ্ট বাক্যে উক্ত হইয়াছে দেখিতে পাই। চিত্ত অভিমানশূন্য হইলে অন্তঃকরণের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়। তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইলে পরমাত্মাতে স্থিতি সহজ হইয়া পড়ে। পরমাত্মাতে স্থিতিতে তাঁহার

প্রেরণাই জীবনের নিয়ামক হয়। সমুদায় জীবন তাঁহার প্রেরণায় নিয়মিত হইলে আর পাপের সম্ভাবনা থাকে না। পাপের সম্ভাবনা চলিয়া গেলে চিত্ত বিকারশূন্য হয়, মোহ সংশয় ছিন্ন হয়, ব্রহ্মেতে স্থিতি সিদ্ধ হয়। এই ব্রহ্মেতে স্থিতি বেদান্তে ব্রহ্মলোক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

বেদান্তোক্ত মুক্তি যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে বেদান্তোক্ত মুক্তি নির্ব্বাণমুক্তি উহাতে জীবের অস্তিত্ববিলোপ হয়, এ কথা উঠিল কোথা হইতে? যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর কথোপকথনে আমরা দেখিতে পাই, যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন "অচূর্ণীকৃত সৈন্ধবখণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন জলে মিশাইয়া যায়, আর তাহাকে উহা হইতে তুলিয়া লওয়া যায় না, কিন্তু যেখান যেখান হইতে জল তুলিয়া লওয়া যায় লবণই হয়, তেমনি এই অনন্ত অপার মহৎ ভূত বিজ্ঞানঘন হইয়া যায়; এই সকল ভূত হইতে উত্থান করিয়া সেই ভূত সকলেই অদৃশ্য হইয়া যায়, (দেবদত্তাদি) কোন সংজ্ঞা থাকে না, আমি তাহাই বলিতেছি।" দেবদত্তাদি কোন বিশেষ সংজ্ঞা থাকে না, ইহার অর্থ কি? ব্যক্তিত্ব থাকে না ইহাই কি নহে? কেবল যে এই পর্য্যন্ত তাহা না হয়, জলের ভিতরে লবণ যে প্রকার ভূতসকলের ভিতরে উহা যে সেই প্রকার অদৃশ্য হইয়া যায়। এরূপ অদৃশ্য হওয়া কি আত্মার বিনাশ নহে? ইহা বিনাশ নহে, কিন্তু একাত্মা হইয়া স্থিতি স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্যই এ কথা বলিয়াছেন। "অয়ি মৈত্রেয়ি, আমি মোহকর বাক্য বলিতেছি না, আত্মা যে অবিনাশী অনুচ্ছেদ উহার ধর্ম্ম, আমি তাহাই বলিতেছি।" যদি এইরূপই হইল তাহা হইলে পরে কেন বলা হইল, "যেখানে দুটি থাকে সেখানে এক অপরকে দেখে,

চ অপরকে ঘ্রাণ লয়, এক অপরকে শোনে, এক অপরকে বলে, চ অপরকে চিন্তা করে, এক অপরকে জানে। যেখানে ইহার চলই আত্মা হইয়া গেল সেখানে (আত্মাতিরিক্ত) কাহার রা (আত্মাতিরিক্ত) কাহাকে দেখিবে, কাহার দ্বারা কাহাকে নিবে, কাহার দ্বারা কাহাকে বলিবে, কাহার দ্বারা কাহাকে ন্তা করিবে, কাহার দ্বারা কাহাকে জানিবে। যাঁহার দ্বারা সকলকে জানা যায় কাহার দ্বারা তাঁহাকে জানিবে, বিজ্ঞা- াকে কাহার দ্বারা জানিবে।" এ কথায় এই বুঝাইতেছে, এক জ্ঞাতাই রহিলেন, বিজ্ঞাতার অতিরিক্ত তাঁহাকে জানিবার ার কেহ রহিল না। এখানে এ বিজ্ঞাতা কে? পতঞ্জলির তে পুরুষ (জীব) বেদান্তমতে পরাত্মা যদি এরূপ বলা যায়, তাহা ইলে জীব ও জীবের অন্তর্যামীকেই বুঝায় কেন না পরাত্ম- বরহিত জীবের জ্ঞাতৃত্বই সম্ভবে না। বেদান্তে মুক্তি ও কৈবল্য এ দুইয়ের পার্থক্য কি তাহা বুঝিলে কৈবল্য নির্ব্বাণমুক্তি কি া, তাহা আমাদের সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মুক্তিতে জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপের ঐক্য হইয়া ব্রহ্মেতে তাহার কেবল স্থিতি হয় তাহা নহে, তাঁহার অনুগত হইয়া তাঁহার বিবিধ ঐশ্বর্য্য সে সম্ভোগ করে। কৈবল্যে আত্মভাবাপন্ন জীব ব্রহ্মের সহিত অবিভক্তভাবে স্থিতি করে, সৃষ্টির পূর্ব্বে সে যেমন ব্রহ্মানুভব অনু- ভব করিয়া নিত্য আনন্দসম্ভোগ করিত, তদবস্থাপন্ন হয়। এখানে জীবের বিনাশ হইল না কিন্তু সে ব্রহ্মানুভবানুভবী হইল। "আত্মা অবিনাশী অনুচ্ছেদ উহার ধর্ম্ম" কৈবল্যাবস্থা বলিতে গিয়া বৃহদা- রণ্যক এজন্যই এ কথা বলিয়াছেন। জীবের কৈবল্যাবস্থা উপস্থিত হইলে সৃষ্টির বিলয় হয়, সুতরাং যত দিন সৃষ্টির বিলয় না হইতেছে,

তত দিন কৈবল্য কেবল সম্ভাবনামাত্রমধ্যে গণ্য। সৃষ্টির এবিষয় ঈশ্বরেচ্ছাধীন, জীবের ইচ্ছাধীন নহে, অনেক আচার্য্য এজন্ত মুক্তির পক্ষপাতী কৈবল্যের পক্ষপাতী নহেন। ব্রহ্মের সহিত স্বরূপে ঐক্য মুক্তি, এ মুক্তি আমাদেরও অনুমোদনীয়, কেন না যত দিন পর্য্যন্ত স্বরূপে একতা না হয়, তত দিন পাপজনিত বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। এই বিরোধ চলিয়া গেলে জীব সর্ব্বথা ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্ত্তী হয়, এই ইচ্ছানুবর্ত্তিতাকেই আমরা মুক্তি বলি। এ অবস্থায় ব্রহ্ম জীবের প্রাণ হন, ব্রহ্ম জীবের তেজ (উদ্যম) হন, বেদান্তের এ কথার সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই, আমরাও এই কথা বলিয়া থাকি। যত দিন মুক্তি না হইতেছে, তত দিন জীবের দেহান্তে কিরূপে স্থিতি হয়, বেদান্তের এই কথা গুলি তাহা প্রদর্শন করে :—জীব যখন ইহলোক হইতে লোকান্তরে চলিয়া যায় তখন পরমাত্মা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া প্রস্থান করে। যখন সে দেহবিমুক্ত হইল তখন সে বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ম্ময়, শ্রোত্রময়, জলময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়, কামময়, অকামময়, ক্রোধময়, অক্রোধময়, ধর্ম্মময়, অধর্ম্মময়, সর্ব্বময় হইয়া এরূপ ওরূপ সকলই হইল। ফলতঃ যে যেরূপ কর্ম্ম করে যেরূপ আচরণ করে সে সেইরূপ হয়, সাধুকার্য্যকারী সাধু হয়, পাপকার্য্যকারী পাপী হয়। পুণ্য কর্ম্মে পুণ্য পাপ কর্ম্মে পাপ হইয়া থাকে।" এ সকল কথায় এই দেখাইতেছে, প্রত্যেক আত্মা স্ব স্ব আচরণানুসারে মৃত্যুর পরও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হইয়া স্থিতি করে, প্রাকৃতিক সূক্ষ্ম উপাদানগুলিও তাহার সঙ্গে থাকিয়া যায়। যত দিন আত্মা সকল কামনা হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মকাম না হইতেছে, তত দিন তাহার লোকলোকা-

:য় ভ্রমণ নিবৃত্ত হয় না, "অকাম, নিকাম, আপ্তকাম, আত্মকাম,"
:লে আর তাহার এখানে ওখানে গমন হয় না, ব্রহ্মভূত হইয়া
হ্মতেই তাহার স্থিতি হয়।

বেদান্তসিদ্ধ পরলোকতত্ত্ব একপ্রকার সংক্ষেপে বিবৃত হইল।
:দান্ত ইহলোক ও পরলোক উভয়কে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখেন না।
তন্ত্র দৃষ্টিতে দেখেন না বলিয়াই যে ব্যক্তি ইহলোকে যেরূপ
াচরণ করে পরলোকে সে সেইরূপ হয়, এই এক কথায় উৎকৃষ্ট-
াতি ও অধোগতি উহাতে নির্ণীত হইয়াছে। জীবের আচরণানু-
ারে গতি, এ কথার উপরে বেদান্তের এমনই নির্ব্বন্ধ যে, ভিন্ন ভিন্ন
নুষ্যলোকেও ব্রাহ্মণ চণ্ডালাদিভেদ নির্দ্ধারণ-করিতে বেদান্ত কিছু-
াত্র কুণ্ঠিত হন নাই। ব্রাহ্মণচণ্ডালাদিভেদ বয়োবর্ণজন্মাদিজন্য
য়, কিন্তু গুণ ও কর্ম্ম সেরূপ প্রভেদের কারণ ইহা যখন শাস্ত্রে
নর্ণীত আছে, তখন পরলোকেও ব্রাহ্মণাদিভেদ গুণকর্ম্মজনিত
:বদান্তবিদগণের ইহাই অভিপ্রায়। দেব-ও-পিতৃপথানভিজ্ঞ
্যক্তিগণের ইহলোকেই স্থিতি হয়, পুনঃ পুনঃ কীটপতঙ্গাদি জন্ম
াভ-করে। এ কথার নির্দেশ এ প্রকারে হইতে পারে না, কেন
না কোন না কোন আকারে সর্ব্বত্র ঈশ্বরজ্ঞান বিদ্যমান ইহা যখন
নিত্য প্রত্যক্ষ, তখন পৃথিবী সে অবস্থা অতিক্রম করিয়াছে এ কথা
লা কিছু শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়। শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয় বলিয়াই গীতা স্ত্রীশূদ্রাদি
কলের প্রতি সদ্গতির দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন। নানা অবস্থাপন্ন
ীবের লোকলোকান্তরে ভ্রমণ বেদ হইতে বেদান্তে সমাগত
ইয়াছে তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু এইটি বিবেচ্য যে বেদে
াহার মূলমাত্র আছে, বেদান্তে তাহাই বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত
ইয়াছে। বেদান্ত বেদের ব্যাখ্যান এ কথা বলিলে কিছু অতি-

রিক্ত বলা হয় না। ব্যাখ্যান কখন ভগবন্নিশ্বসিতনিরপেক্ষ হইতে পারে না, বেদান্ত আপনি এ কথা যখন বলিয়াছেন, তখন এ ব্যাখ্যানের অর্থ যে আধুনিক ক্রমাভিব্যক্তি তাহাতে আর সংশয় কি? আমাদের মনে ক্রমাভিব্যক্তির নিয়ম প্রবল থাকিলেও উহার নিয়োগ আমরা বেদান্তের উক্তি অবলম্বন করিয়া করিয়াছি, বলপূর্ব্বক উহার নিয়োগ বেদান্তে করি নাই, আশা করি আলোচনায় ইহা সকলেরই নিকটে প্রতিভাত হইবে।*

---

* বলিবার সময় যে সকল কথা বিস্পষ্ট ছিল না বা বীজাকারে ছিল লিখিবার সময় সে সকল পরিস্ফুট করিয়া দেওয়া গেল, বলিতে গিয়া যে সকল বিস্তৃত হইয়াছিল, সেগুলি লিখিবার সময় সংক্ষিপ্তাকারে লিপিবদ্ধ হইল। স্পেন্সার নির্ব্বাণমুক্তিতে বিশ্বাস করিয়াছেন। জগৎ জীব ও ঈশ্বর এ তিনের নিত্য সম্বন্ধ যখন অপরিহার্য্য, তখন তাঁহার মতে আমরা সায় দিতে পারি না, বেদান্তোক্ত মুক্তিরই আমরা অনুমোদন করি।

কলিকাতা।

৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট।
"মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"
কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।